ষোড়শ বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

# বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

ন্দর থেকে সুন্দরতম...
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১১৭/২, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৬০

বিশ্বাসে যাঁরা অটল
"ভোর হইতে রাত্র অবধি টাটা কোম্পানীর বোম্বাই অফিসে শেয়ার খরিদ্দারগণের অবিশ্রান্ত ভিড় লাগিয়া যায়। বৃদ্ধ ও যুবা, ধনী ও গরীব স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যাহার যাহা ক্ষমতা সেইমত পুঁজি লইয়া আসে। তিন সপ্তাহের শেষে কারখানা গড়িবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় দুই কোটি টাকার (১,৬৩০,০০০ পাউণ্ড) প্রতিটি পাই ৮০০০ ভারতীয় নরনারীর নিকট হইতে উশুল হইয়া যায়।"
—এ্যাক্সেল সাহলিন
এই ভাবে দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে ১৯০৭ সালের ২৬শে আগষ্ট ভারতবর্ষে ভারী যন্ত্রশিল্পের প্রথম উদ্যম টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর পত্তন হয়। আজ টাটা স্টীল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উৎপাদক। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানকে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। ১৯২০ সালের পর থেকে কয়েক বছর যখন কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে তখনও বহু দৃঢ়চেতা অংশীদারগণের আস্থা এতটুকু টলেনি এবং দেশে নতুন শিল্প গড়ার জন্যে তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বার্থত্যাগ করেন।
টাটা স্টীল
১৩-বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ নিবাসী ৭৯ বৎসর বয়স্ক শ্রীরাস বিহারী লাহা। ইনি কোম্পানীর একজন প্রথম অংশীদার, এবং এখনো কোম্পানীতে এঁর শেয়ার আছে।
TN 3726
The Tata Iron and Steel Company Limited

সৌন্দর্য্য সাধনায়...
শরতের নির্মল নীলাকাশের আলোর বাণীতে উৎসবের যে বার্তা আসে তাতে নরনারীর চিত্ত আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।
নিজেকে ঐ পরিবেশের অনুকূল সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে তোলবার আকাঙ্খাও জাগে সকলের মনে।
ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রীগুলি নরনারীর সৌন্দর্য সাধনায় বিশেষ সহায়ক।
লাবণি
স্নো এবং ক্রীম
চন্দন সাবান
ক্যাষ্টরল
সুবাসিত ক্যাষ্টর অয়েল
মরমিয়া সুরভিসার
রেণুকা
ফেস ও ট্যালকাম পাউডার
CASTOROL
CREAM
SNOW
KANTA
SOAP
CALCUTTA CHEMICAL CO
প্রস্তুতকারক
কলিকাতা ২৯

ভারতবর্ষের ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্য সাধনের ওপরই নির্ভর করছে আপনার আগামী দিনের সুখসমৃদ্ধি। সেই লক্ষ্য সফল ক'রে তোলার জন্যে ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড দিনরাত পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।
শিল্পায়ণের গোড়ার কথা
ইস্পাত
আজ ইস্পাত
বাঁচিয়ে চলুন;
কাল বেশী পাবেন।
INDIAN IISCO STEEL
ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ
কারখানা: বার্নপুর ও কুলটি
হেড অফিস: ১২, মিশন রো, কলিকাতা

করতে হলে আপনার পিতল ও
তামার জিনিস পত্র রোজ
সো
দিয়ে পালিশ করুন
BRASSO

**বিশ্বভারতী পত্রিকা** ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক
সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

## বিষয়সূচী



## চিত্রসূচী



মূল্য এক টাকা

জন্মাষ্টমী। কাঙড়া কলমের ছবি

বিশ্বভারতী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক

# চিঠিপত্র

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

আমাদের বালির ঘর ভেঙে পড়েচে। অনেক দিন থেকে এর আয়োজন চলছিল— বারবার করে মনে করেছিলুম একরকম করে উদ্ধার হয়ে যাবে। যা হোক একটা পরিণামে এসেচে ভালই হয়েচে।

আমি দারিদ্র্যকে একটু ভয় করতে চাইনে। আমার ভয় তোদের জন্যে। কেননা তোদের মন ভিতরের থেকে এখনো তৈরি হয়নি। তোদের অল্প বয়স— জীবনের ভিতর দিয়ে সত্যের নিঃসংশয় উপলব্ধি হবার সময় তোদের হয়নি। কাজেই জানি দুঃখ পাবি। কিন্তু সেই দুঃখ ভোগ করে একটা বড় রকমের মুক্তির মধ্যে তোরা উত্তীর্ণ হবি এই আমার প্রার্থনা।

যা আমাদের ছেড়ে যাচ্চে তাকে আমরা নিজের ভিতর থেকে যেন সহজে ছাড়তে পারি। নিরুদ্বিগ্ন হয়ে তার সমস্ত জঞ্জাল কাটিয়ে যেন বেরতে পারি। সংসারের সমস্ত ভাঙাচোরা জোড়াতাড়াকে যেন বুকের মধ্যে আঁকড়ে না জড়িয়ে থাকি। আসলে, বাইরের দিকে মানুষের দরকার খুব কম, ভিতরের দিকেই তার দরকার সবচেয়ে বেশি। বাইরেটা ত নিয়তই ভাঙচে চুরচে, আর আমরাও কেউ চিরদিন বেঁচেও থাকবনা। কেন ঐ ভাঙনের দিকটাতেই আমাদের সর্ব্বস্ব দিয়ে আমাদের বাসের ভিত গড়ব? ঐ দিকটাকে আনন্দিত মনে তুচ্ছ করতে শিখ্‌তে হবে। জীবনটাকে খুবই সরল ক'রে, জীবনের লক্ষ্যকে বিশুদ্ধ ও উন্নত ক'রে, জীবনের নির্ভরকে অন্তরে বাহিরে একান্ত নিষ্ঠায় বেষ্টন করে ধরে মানুষের দিন খুব আনন্দেই কাট্‌তে পারে। বৈষয়িক সঙ্কটের দিনে এই কথাটাকেই সর্ব্বাগ্রে মনের মধ্যে বাজিয়ে নিতে হবে তার পরে অন্য কথা।

তুই তোর সংসার চালাবার জন্যে মাসে যে তিনশো টাকা চেয়েছিস তা দেব। আমেরিকায় যেতে চাস ভালই— কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের সন্দিগ্ধ গবর্মেণ্ট এখন তোকে সেখানে যাবার পাসপোর্ট্‌ কিছুতেই দেবে না। যদি দেয় তাহলে তুই সেখানে গিয়ে শিক্ষা কিম্বা কাজ যদি করিস্‌ আমার তাতে অসম্মতি নেই।

বিষয় ভাগের কথা লিখেছিস্‌। কিন্তু আমার মনে হয় দুতিন লাখ টাকা যা কিছু পাওয়া যায় তাতে বিষয় বিক্রি করাই শ্রেয়। কেননা ভাঙা বিষয় ম্যানেজ্‌ করার ঝঞ্ঝাট কে বহন করবে? ও সমস্ত একেবারে চুকিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়াই ভাল। এতদিন আমরা দারিদ্র্যকে দামী পাল্কীতে চড়িয়ে কাঁধে করে বেড়াচ্ছিলুম, সেই পাল্কীটাকে ফেলে দিয়ে দারিদ্র্যকে স্পষ্ট করে মেনে নিতে পারলেই তবে আমরা

মুক্তি পাব। কি রকম করে বিক্রি হতে পারে সেই কথাটাই ভেবে দেখিস্। প্রমথ গোপাল শীলেদের একটা এস্টেট তো বেচেচেন। তিনি হয়ত কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। যথার্থভাবে গরীব হয়ে বসতে পারলেই আমাদের কল্যাণ হবে। তোদের দরকার অতি সামান্য। জীবনকে বড় করে তুলে এবং জীবিকাকে ছোট করে নিয়ে বেশ আনন্দে এবং নির্ম্মলভাবে কেটে যাবে। আমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সমস্ত উদ্বেগকে ঝাঁটিয়ে ফেলে দেব— আমার জন্যে ভাবিস্‌নে। যদ্‌ভদ্রং তন্ন আসুব। ইতি ১৮ই মাঘ ১৩২৪

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

হ্যারির চিঠি এই সঙ্গে পাঠাই। কম হাঙ্গামা নয়। শেষ পর্য্যন্ত মজুরি পোষাবে কিনা সন্দেহ। এর পিছনে খরচ যথেষ্ট অথচ শেষ ফল অনিশ্চিত। তুই তোর ভাঙা শরীরে আমেরিকার আন্দোলনে যোগ দিবি এ কোনোমতেই চলবে না। তার পরে যদি বা কোনো উপায়ে সেখান থেকে মোটা রকমের একটা ফণ্ড আমাদের অদৃষ্টে জোটে সেটাতে ভালো হবে কিনা সে সন্দেহ মনে আছে। টাকাতে অযোগ্য লোকের লোভকে জাগিয়ে তোলে— নিজের হাতে ক্ষমতা নেবার জন্যে নানা চক্রান্তের সৃষ্টি হয়— শান্তিতে সত্য রক্ষা করে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। একবার ভারতবর্ষে ভিক্ষা করে দেখব— তার পরে যদি কিছু পাই তবে আমাদের কাজকে সেই সীমার মধ্যে বেঁধে রেখে যতটুকু পারি ততটুকুই যথেষ্ট। আমার খুবই মনে হয় কাজকে ধনী করে তুললে ভিতরে ভিতরে তাকে দেউলে করে দেওয়া হয়। আমাদের বেশি কিছু নেই কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে মোটের উপর একটা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য আছে। এখন যতটুকু অভাব আছে সেটা খুব বেশি নয়, সেইটুকু কোনোমতে পূরিয়ে দিতে পারলে বেশ চলে যাবে। এমন কি, আমাদের মূলধন খুইয়ে দিতেও আমার ভয় হয় না। যত দিন চলে তত দিনই লাভ। ভাবীকালের জন্যে আমরা অত্যন্ত বেশি দুশ্চিন্তা করি— এমনি করে বর্ত্তমানকে উপবাসী রেখে দিই। সাহস করে সম্পূর্ণ শক্তিতে বর্ত্তমানকে পালন করলেই কাজ সত্য হয়।

যাই হোক আমেরিকার লোভ মন থেকে সম্পূর্ণ ঘোচাতে না পারলে আরাম পাব না। যদি সেখান থেকে সহজে টাকা আসে তো ভালোই। না আসে তো অত্যন্ত বেশি টানা হেঁচড়া করব না। যদি মনে করিস কালীমোহন সেখানে গেলে কাজে লাগতে পারে তবে সে কথা চিন্তা করে দেখিস।

হ্যারিকে যে ভাবে উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য কালীমোহনকে সেই পয়েন্টগুলো বলে দিস তাহলে তদনুসারে অমিয়কে দিয়ে জবাব ড্রাফ্‌ট করা যাবে।

এখানে বৃষ্টি নেই এবং গরম পড়েচে কিন্তু আমার শরীর ভালোই আছে। সেই যে আলো পাখার যন্ত্রটা এল একদিনো তার ব্যবহারের দরকার হয়নি। আমার তো মনে হয় তোদের নতুন টিউবওয়েলের জন্যে সেটা বিক্রি করে দিলে ভালো হয়।

টিউবওয়েলের সংলগ্ন একটা বড়ো ট্যাঙ্ক করা দরকার হবে নইলে ছ্যাঁচের কাজ কি চলবে? বড়ো ট্যাঙ্ক হলে অন্যান্য নানা রকমে সেটা কাজে লাগতে পারবে। ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রমথ—প্রমথ চৌধুরী
হারি—হারি টিম্বার্স, বিশ্বভারতী পল্লীসংগঠন বিভাগের কর্মী
কালীমোহন—কালীমোহন ঘোষ
অমিয়—শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী

# চর্যাগীতি

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। প্রাচীন সাহিত্য হয় কাব্য নয় সংগীত ; অতএব সাহিত্যের যেখানে শুরু সংগীতের আরম্ভও প্রায় সেখান থেকেই। বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা আরম্ভ হয়েছে বঙ্গভাষায় রচিত চর্যাপদ থেকে এবং এই পদগুলিই বাংলার সংগীতের প্রাচীনতম উদাহরণ। এই কারণে বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসে চর্যার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্যাপদের খোঁজ পেয়েছিলেন নেপালে। ১৯০৭ সালে তিনি নেপাল থেকে একটি পুঁথি পেয়েছিলেন, তার নাম চর্যাচর্যবিনিশ্চয়। এই পুঁথির অন্তর্গত গানগুলির নাম চর্যাপদ। শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করেছিলেন যে এই গানগুলি বাংলার কীর্তনের মত। এ সম্বন্ধে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং সংকীর্তনের গানগুলিকে পদই বলা হত ; তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলত। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই ধারণাটিই পণ্ডিত-সমাজে সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে এবং চর্যার সংগীততত্ত্ব সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আলোচনা আজ পর্যন্ত হয় নি। যদিও চর্যা সম্বন্ধে সংগীতশাস্ত্রে কম উল্লেখই পাওয়া যায় তথাপি যেটুকু পাওয়া যায় তাতে চর্যাগানের প্রকৃতি কি রকম ছিল সেটি বোঝা যায়। চর্যাপদ আসলে গান, অতএব তার সংগীতের দিকটা অবহেলার যোগ্য নয়।

চর্যাগীতির লক্ষণসহ সুস্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় শার্ঙ্গদেব রচিত সংগীত-রত্নাকর নামক গ্রন্থে। সংগীত-রত্নাকরের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে শাস্ত্রকারদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই ; অতএব রত্নাকরের মতকে আমরা বিশেষ নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারি।

শার্ঙ্গদেব তাঁর অমূল্য গ্রন্থ সংগীত-রত্নাকর ১২১০-১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীর থেকে দেবগিরিতে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁরা যাদব-রাজদের অধীনে কাজ করতেন। শার্ঙ্গদেব ছিলেন যাদবরাজ সিংঘনের মহাকরণের প্রধান কর্মচারী। নিজেকে তিনি শ্রীকরণাগ্রণী বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থে চর্যাগানের সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকায় এটা প্রমাণিত হয় যে চর্যাগানের প্রচলন তখনও ভারতে ভালোই ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে অষ্টম-নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে চর্যাপদগুলি রচিত হয়েছিল। কেউ কেউ দশম শতাব্দী থেকে চর্যাগানের উদ্ভব হয় বলে বিশ্বাস করেন। শার্ঙ্গদেবের পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থের দুজন টীকাকার— মহারাজ সিংহভূপাল (চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) এবং কল্লিনাথ (পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ) শার্ঙ্গদেবের বর্ণনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। অবশ্য এই ব্যাখ্যা থেকেই প্রমাণিত হয় না যে তাঁদের সময়ে চর্যাগান প্রচলিত ছিল, কিন্তু ছিল না এটাও প্রমাণিত হয় না। অতএব শার্ঙ্গদেবের পরেও বহুকাল ধরে কতিপয় অঞ্চলে চর্যাগান প্রচলিত ছিল— এই অনুমান অসংগত নয়। এইসঙ্গে এই অনুমানেরও যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে চর্যাপদ কেবলমাত্র বাংলার নিজস্ব সম্পদ নয়, ভারতের অপরাপর জনপদেও তাদের ভাষায় চর্যাগান গাওয়া হত। শার্ঙ্গদেব ছিলেন গুজরাটের লোক, আর সিংহভূপাল এবং কল্লিনাথ

দক্ষিণভারতীয়। এঁদের কেহই যে সে যুগে বাংলায় এসে চর্যাগীতি সংগ্রহ করেছিলেন এমন মনে হয় না এবং তার প্রমাণও নেই। তা ছাড়া, বিশেষ কোনো অঞ্চলের গীতরূপ হলে শার্ঙ্গদেব অপরাপর গীতের মত সেই জনপদের একটা উল্লেখ করতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। অতএব চর্যাগান ভারতের অন্যত্রও প্রচলিত ছিল এ রকম বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এমনকি বেঙ্কটমখী প্রণীত দক্ষিণদেশীয় সংগীতশাস্ত্র চতুর্দণ্ডি-প্রকাশিকাতেও (ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক) চর্যা— এই গীতরূপের উল্লেখ আছে। তবে চর্যাপদ যাঁদের সাধনসংগীত তাঁদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী যে বাংলায় ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, অতএব বাংলায় চর্যাগানের বিশেষ প্রাধান্য ছিল— এটা আমরা নিশ্চয়ই মেনে নিতে পারি।

চর্যাগান সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বৌদ্ধ বা তান্ত্রিকদের কোনো উল্লেখ করেন নি। চর্যাগানকে তিনি কেবলমাত্র বলেছেন 'অধ্যাত্মগোচর'। চর্যাগান আধ্যাত্মিক। এইসব পদের অক্ষরার্থ অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ সাধক ভিন্ন অপরের কাছে স্পষ্ট নয়। টীকাকার কল্লিনাথ 'অধ্যাত্মগোচর' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন— অধ্যাত্মং বিষয়ীকৃত্য প্রবৃত্তেত্যর্থঃ। সিংহভূপাল বলছেন— অধ্যাত্মবাচকৈঃ পদৈরুপনিবদ্ধা সা চর্যা।

চর্যাগীতিকে শার্ঙ্গদেব প্রকীর্ণক প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেসব গীত কোনো বৃহৎ গীতগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, দেশে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে, সেসব গীতকে বলা হয় প্রকীর্ণ। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে চর্যা তৎকাল-প্রচলিত এক প্রকার সাধারণ গান মাত্র, তবে এর এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল যাতে এর সাংগীতিক রূপটি স্বীকৃত হয়েছে।

শার্ঙ্গদেব এবং তদীয় টীকাকারগণ চর্যাগীতিকে তারাবলী জাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সেকালে শ্রেষ্ঠ দেশীয় সংগীতের ছটি অঙ্গ পরিকল্পনা করা হয়েছিল— স্বর, বিরুদ (স্তুতি বা গুণবাচক অঙ্গ), পদ, তেনক (মঙ্গলবাচক অঙ্গ), পাট (তালের বোল উচ্চারণ), এবং তাল। সব গীতেই এই ছটি অঙ্গ থাকত না; পাঁচটি চারটি তিনটি এবং দুটি হিসাবে বিভিন্ন গীত প্রচলিত ছিল। তারাবলী জাতীয় গীত ছিল কেবলমাত্র দুটি অঙ্গে নিবদ্ধ, এবং চর্যার ক্ষেত্রে এই দুটি অঙ্গ ছিল— পদ এবং তাল। পদ বলতে গানের অর্থবাচক অঙ্গ বোঝায়। সংগীতের দিক থেকে এর বিশেষ অর্থ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পদ বলতে সংকীর্তনের গান বোঝায় এইরকম মত প্রকাশ করেছেন। অনেকের মতে মিলযুক্ত পাদযুগলকে বলা হয় পদ। সংগীতশাস্ত্র অনুযায়ী গীতের বাক্যাংশকেই প্রধানতঃ পদ বলা হয়। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলছেন[১] যে অক্ষরকৃত তাবৎ বস্তুকেই 'পদ' আখ্যা দেওয়া যায়। এই বাক্যাংশ নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ অথবা সতাল এবং অতাল— দুই প্রকারই হতে পারে। এই নির্দেশ অনুসারে মনে হয় যে পদ-শব্দে সাধারণভাবে সমগ্র গীতকেই বোঝাত। অতএব পদ-শব্দের ব্যবহার কেবলমাত্র সংকীর্তন অথবা পাদ-যোটক অর্থেই সীমাবদ্ধ নয়।

শার্ঙ্গদেব চর্যার বর্ণনা দিয়েছেন—

> পদ্ধড়ীপ্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতাঃ।
> অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্দ্বিতীয়াদিতালতঃ॥

---

১ নাট্যশাস্ত্র, কাশী সংস্কৃত সিরিজ, ৩২ অধ্যায়।

সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্বপূর্তিতঃ।
সমধ্রুবা চ বিষমধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা ॥
আবৃত্ত্যা সর্বপাদানাং গীয়তে সা ধ্রুবস্য বা ॥[২]

এর অর্থ—

অধ্যাত্মগোচর চর্যাগীতি পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে বিরচিত এবং এর পাদান্ত অনুপ্রাসযুক্ত। এই গীতে দ্বিতীয় তাল বা তদনুরূপ অন্য তাল প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়। চর্যা দুই প্রকার: ছন্দদ্বারা পূর্তিত হলে তাকে বলা হয় পূর্ণা, আর তা না হলে তাকে বলা হয় অপূর্ণা। আরো দুটি প্রকারভেদ এর আছে: একটি সমধ্রুবা, অপরটি বিষমধ্রুবা। চর্যাগীতির সব পাদই আবৃত্তি সহকারে (সম্মেলকভাবে) গাওয়া যেতে পারে অথবা কেবলমাত্র ধ্রুব অংশটিও আবৃত্তি সহকারে গাওয়া যেতে পারে।

চালুক্যবংশীয় নৃপতি (অভিনবপুররাজ) হরিপালও চর্যার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

প্রান্তপ্রাসা নিবদ্ধা স্যাৎপ্রবন্ধৈঃ পদ্ধড়ীমুখৈঃ।
দ্বিতীয় প্রমুখৈস্তালৈর্গেয়াধ্যাত্মোপযোগিণী।
যোগিভির্গীয়তে চর্যা প্রকারৈর্বহুভিস্ত্বসৌ ॥

এই বর্ণনার সঙ্গে শার্ঙ্গদেবের বর্ণনার কোনো তফাত নেই। তবে, যোগীরাই যে চর্যাগান গাইতেন সেটি হরিপাল বিশেষভাবে বলেছেন। আমরা যে চর্যাপদ পেয়েছি তাতে 'যোগী' শব্দের বহু প্রয়োগ আছে; যেমন, "কহ্নে কাপালী যোগী পইঠ আচারে"—১১নং চর্যা, অথবা "অনুভব সহজ মা ভোলরে জোঈ [যোগী]"—৩৭নং চর্যা। হরিপাল ছটি ভাষা জানতেন বলে দাবি করেছেন; অতএব তাঁর পক্ষে বহুস্থান থেকে গীত সংকলন করা সম্ভব ছিল।

চর্যার সংজ্ঞায় রাগের কোনো নির্দেশ নেই বলে এই গীতে রাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল— এমন নয়। রাগের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নেই বলে রাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয় নি। আমরা যেসমস্ত পদ পেয়েছি তাতে রাগেরও উল্লেখ রয়েছে।

চর্যায় ব্যবহৃত পদ্ধড়ী-বা-পদ্ধড়িকা ছন্দ হচ্ছে সংস্কৃত পজ্ঝটিকা ছন্দ। এই পদ্ধড়ী ছন্দ এত জনপ্রিয় ছিল যে এই ছন্দে রচিত পদগুলি একটি বিশিষ্ট সংগীতে পরিণত হয়েছিল, তার নাম ছিল পদ্ধড়ী। শার্ঙ্গদেব চর্যার ঠিক পরেই পদ্ধড়ী পর্যায়ের গীতের বর্ণনা দিয়েছেন। টীকাকার কল্লিনাথ পদ্ধড়ী ছন্দের লক্ষণসহ উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন—

ষোড়শমাত্রাঃ পাদে পাদে
যত্র ভবন্তি নিরস্ত বিবাদে
পদ্ধড়িকা জ-গণেন বিমুক্তা
চরমগুরুঃ সা সদ্ভিরিহোক্তা ॥

পদ্ধড়ী ছন্দের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এর প্রতি পাদে ষোলো মাত্রা থাকবে এবং এতে মধ্যগুরু গণ অর্থাৎ জ-গণ থাকবে না। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রের রীতি অনুযায়ী সংগীতেও গুরু এবং লঘু বর্ণ অনুসারে তিনটি বর্ণের

২ সংগীতরত্নাকর, অ্যাডায়ার সংস্করণ, চতুর্থ, প্রবন্ধাধ্যায় ২৯২-২৯৪।

সমাবেশে এক একটি 'গণ' স্বীকৃত হয়। এইরকম আটটি গণ আছে। তার মধ্যে মধ্যবর্ণটি গুরু, প্রথম ও তৃতীয়টি লঘু— এইরকম গণকে বলা হয় 'জ-গণ'। পদ্ধড়ী ছন্দে এই গণটির প্রয়োগ নিষিদ্ধ। সংগীতশাস্ত্রে এই গণগুলিকে বলা হয় বর্ণগণ। এ হল তিনটি বর্ণের সমাবেশে গঠিত গণ। যেসব ছন্দ জাতির অন্তর্ভুক্ত সেগুলিতে চারটি মাত্রা নিয়ে চারটি গণ আছে— সর্বগুরু অন্তগুরু মধ্যগুরু এবং চতুর্লঘু। পদ্ধড়ী ছন্দ ষোলো মাত্রায় সম্পূর্ণ এবং এতে যে চারিটি ভাগ আছে তার কোনোটিতে মধ্যগুরু গণ থাকবে না। ছন্দ অনুসারে ভাগ করলে এর উদাহরণ হবে এইরূপ—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
কা—আ—| ত রু ব র | প ন্ চ বি | ডা—ল— |
চ ন্ চল | চী—এ— | প ই ঠো— | ক—ল— ॥

কিন্তু, এটি কেবলমাত্র ছন্দের দিক অর্থাৎ কাব্যের দিক, তালের ছন্দ আলাদা। তালের দিক থেকে দ্বিতীয় নামক তালের প্রয়োগ নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

শার্ঙ্গদেব দ্বিতীয় তালের লক্ষণ দিয়েছেন— দৌ লো দ্বিতীয়কঃ। অর্থাৎ, দুটি দ্রুত এবং একটি লঘুর সন্নিবেশে দ্বিতীয় তাল সংগঠিত হয়। অপরাপর শাস্ত্রেও দ্বিতীয় তালের একই লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দ অক্ষরটিতে দ্রুত এবং ল অক্ষরটিতে লঘু বোঝায়। চারটি বা পাঁচটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করতে যতটা সময় ব্যয় হয় সেই সময়টুকু নিয়ে একটি মাত্রা হয়। এর ডবল হলে সেটি হবে গুরুমাত্রা এবং এর তিনগুণ হলে সেটি হবে প্লুত। আর, এর অর্ধ হলে সেটি হবে দ্রুত। যদি আমরা ক চ ত ট— এই চারটি অক্ষরের উচ্চারণকালকে একটি লঘু বলে ধার তা হলে তার অর্ধেক অর্থাৎ ক চ— এই দুটির উচ্চারণকাল হবে দ্রুত। দ্বিতীয় তাল এইরকম দুটি দ্রুত এবং একটি লঘু নিয়ে গঠিত। অতএব তাল-বিভাগ হবে এইরকম—

| ক চ | ক চ | ক চ ত ট |
|---|---|---|
| দ্রু | দ্রু | ল |

এইটি চর্যায় প্রয়োগ করলে সেটি দাঁড়াবে এইরকম—

কা — | য়া — | ত রু ব র |
প ন্ | চ বি | ডা - ল - |
চ ন্ | চ ল | চী - এ - |
প ই | ঠো— | কা - ল - |

এইভাবে পদ্ধড়ী ছন্দ এবং দ্বিতীয় তালযুক্ত হলে সেটিকে বলা হয় পূর্ণাজাতীয় চর্যা। আর ছন্দ এবং তালের বাঁধাবাঁধি না থাকলে সেটি হবে অপূর্ণা জাতীয় চর্যা। শাস্ত্রী মহাশয় যে চর্যাগুলি পেয়েছেন তার একটিতেও তালের উল্লেখ নেই। তা ছাড়া ছন্দও প্রতি গানের প্রতি অংশে সমান নয়। যেমন পূর্বে যে অংশটুকুর উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে ছন্দ ঠিক আছে কিন্তু পরবর্তী অংশে ছন্দের শৈথিল্য দেখা যাচ্ছে। যথা—

এড়িএউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিতি লাহু রে পাস ॥

এইখানে ছন্দ আদৌ রক্ষিত হয় নি। এইসব উদাহরণ থেকে মনে হয় যে এই চর্যাগুলি যথাযথ পূর্ণাজাতীয় নয়।

এইবারে সমধ্রুবা এবং বিষমধ্রুবার প্রসঙ্গে আসা যাক। শার্ঙ্গদেবের মতে সবগুলি পদের আবৃত্তি হলে সেটি সমধ্রুবার পর্যায়ে পড়ে এবং কেবল ধ্রুবের আবৃত্তি হলে সেটি বিষমধ্রুবার পর্যায়ে পড়ে। সিংহভূপালও তাঁর টীকায় বলেছেন— সর্বেষাং পাদানামাবৃত্তৌ সমধ্রুবা। ধ্রুবস্যৈবাবৃত্তৌ বিষমধ্রুবেতি।— এই উক্তিতে শার্ঙ্গদেবের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত চর্যাগুলিতে দেখা যাচ্ছে প্রতি পদের (অর্থাৎ পাদযুগলের) দ্বিতীয় পাদটি ধ্রুব। প্রতি পদেরই শেষ পাদটি যখন ধুয়ার মত আবৃত্তি সহকারে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তখন এই চর্যাগুলিকে সমধ্রুবার পর্যায়ে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। ২৮ এবং ৪৩ সংখ্যক গানের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— পদস্যোত্তরপদেন ধ্রুবপদং বোদ্ধব্যং। চর্যাপদের টীকাকার এই দুটি গানেই প্রথম দুটি লাইনে একটি পদ ধরেছেন। দুটি লাইন মিলিয়ে একটি পদ হলে উত্তরপদ বলতে দ্বিতীয় লাইনটি বোঝায় এবং এটিকেই ধ্রুব বলে বুঝতে হবে। অর্থাৎ প্রতি পাদযুগলের দ্বিতীয় পাদটি ধ্রুব এবং সেটি আবৃত্তি সহকারে গাওয়া কর্তব্য। এই ব্যাখ্যা অনুসারেও পদগুলি সমধ্রুবার অন্তর্গত বলা যায়।

টীকাকার কিন্তু অপর গানগুলির ব্যাপারে ধ্রুবপদ সম্বন্ধে আমাদের সংশয়ের মধ্যে রেখেছেন। প্রায় প্রতি গানের দ্বিতীয় পদটিকে তিনি ধ্রুবপদ বলে উল্লেখ করেছেন এবং অন্য কোনো পদের ধ্রুব অংশ সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ করেন নি। মূলগানগুলিতে প্রত্যেকটি পদের দ্বিতীয় চরণটি হচ্ছে ধ্রুবপদ। টীকাকারের ঈদৃশ উক্তি থেকে অনুমান হয় তাঁর সময় হয়তো চর্যাগুলি বিষমধ্রুবার রীতিতে গাওয়া হত অর্থাৎ কেবলমাত্র ধ্রুব অংশটিই আবৃত্তি করা হত।

সংগীত-রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ সমধ্রুবা এবং বিষমধ্রুবার যে অর্থ করেছেন তা অন্যরকম। কল্লিনাথের টীকা বিচার করবার পূর্বে তৎকালীন কলি বা ধাতু -বিভাগের পরিচয় প্রদান করা প্রয়োজন। কেননা তিনি গীতের কলি হিসাবে সমধ্রুবা এবং বিষমধ্রুবার বিচার করেছেন।

সে যুগের গানে চারটি অংশ ছিল— উদ্‌গ্রাহ মেলাপক ধ্রুব এবং আভোগ। উদ্‌গ্রাহ গীতের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান। মেলাপক অংশটি উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করত। ধ্রুব হচ্ছে গীতের প্রধান অংশ। আভোগে গীতের সমাপ্তি হত এবং এখনো হয়ে থাকে। এই চারটি ভাগের প্রত্যেকটিকে বলা হত ধাতু। সব গানে এই চারটি ধাতু থাকত না, তবে ধ্রুব অংশটি গীতের নিত্য অংশ হওয়ায় এটিকে সব সময় যথাযথভাবে রক্ষা করতে হত।

কল্লিনাথ চর্যাগীতে উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব— এই দুটি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং পৃথক পদে আভোগ রচনার সুযোগ আছে, এ কথাও বলেছেন। কল্লিনাথের ব্যাখ্যা অনুসারে সমধ্রুবা বা বিষমধ্রুবা অর্থে ধ্রুব এই অংশটি গীতের অপর কোনো অংশের সমান বা অসমান এই রকম ধারণা হয়। সম শব্দে তা হলে কিসের সঙ্গে সমতার অপেক্ষা থাকে? স্বভাবতই উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুবের সমত্বই এতে নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ সমধ্রুবা জাতীয় চর্যায় উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব একই রকম কেবল গীতের কাঠামো বজায় রাখবার জন্যই একটি ধাতুবিভাগ পরিকল্পিত হয় মাত্র। অপর পক্ষে বিষমধ্রুবার ক্ষেত্রে ধ্রুব অংশটি উদ্‌গ্রাহ অপেক্ষা অধিক বা ন্যূন— এই রকম একটি বিষমত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। এই অধিক বা ন্যূন অর্থে কল্লিনাথ কি

বোঝাতে চেয়েছেন সেটা অনুমান করা গেল না। বাক্যাংশের আধিক্য বা ন্যূনতা হতে পারে, আবার গীতানুষ্ঠানের অপর কোনো ব্যাপারেও ন্যূনাধিক্য ঘটা সম্ভব। কল্লিনাথ এটি কোনো উদাহরণ সহযোগে দেখান নি। যে চর্যাপদগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে সেগুলি উদ্‌গ্রাহ এবং ধ্রুব অনুসারে ভাগ করা নেই এবং সেভাবে গাওয়াও হত না। কল্লিনাথ নিজে এই ধরণের চর্যাগীতি শুনেছিলেন কি না সেটি বলাও সম্ভব নয়। হয়তো কল্লিনাথের যুগে চর্যাপদ এইভাবে দেশী সংগীতের নিয়মিত পদ্ধতির মধ্যে এসে গিয়েছিল এবং অবশেষে তার বিশেষত্বটি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এই ভাবে বহু গান দেশী সংগীতের অপরাপর গানের মধ্যে মিশে গিয়েছে, আজ তাদের চিনে নেওয়া কঠিন ব্যাপার।

চর্যাগান সংকীর্তনের আদিরূপ এই রকম একটা ধারণা অনেকের আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলছেন—"সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং সংকীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত। তবে এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলিত।" আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরকম। সংগীতের দিক থেকে পদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে প্রথমেই আলোচনা করেছি। তা থেকে বোঝা যাবে যে পদ বলতে সংকীর্তন বোঝায় এমন নয়। অপর পক্ষে আবৃত্তি সহকারে গানের একমাত্র উদাহরণ চর্যাগীতি বা সংকীর্তন হতে পারে না, কেননা বহুদিন থেকেই এই ধরণের বহু গান চলে আসছে। সংকীর্তন বা চর্যাগীতি তাদের অন্যতম এই অনুমানই সংগত। চর্যাগীতি যাঁদের সাধনসংগীত ছিল তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং সম্ভবত তাঁরা বহুপূর্ব হতে প্রচলিত আবৃত্তি সহকারে সংগীতানুষ্ঠানের রীতিটি তাঁদের সংগীতে আরোপ করেন এবং ক্রমে চর্যাগীতিরও একটি বৈশিষ্ট্য স্থাপিত হয়। এও সম্ভব হতে পারে যে পূর্বপ্রচলিত সংকীর্তনের ধারাটি চর্যারচয়িতাগণ তাঁদের সংগীতে প্রবর্তন করেন। নামসংকীর্তন বহুযুগ থেকে চলে আসছে এবং এটিকে ইউনিভার্সাল বলা চলে। সুতরাং চর্যাপদ সংকীর্তনের পূর্বরূপ এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা যেতে পারে না।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংগৃহীত চর্যাচর্যবিনিশ্চয় গ্রন্থে যেসব গান আছে তাতে রাগের উল্লেখ আছে। এই রাগের ব্যবহার কিন্তু এমন নয় যে তাকে দস্তুরমত বর্তমান রাগসংগীতের পর্যায়ে ফেলা চলে। গানগুলি উল্লিখিত রাগগুলির কাঠামো অনুসারে গাওয়া হত মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। বলা বাহুল্য এই ধরণের আবৃত্তিযুক্ত গানে রাগসংগীতের শিল্পগত বিবিধ প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই।

চর্যায় ব্যবহৃত রাগের মধ্যে পটমঞ্জরীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি; তার পরে মল্লারী ভৈরবী কামোদ বরাড়ী গুর্জরী গৌড়ী দেশাখ রামক্রী শবরী অরু দেবক্রী ধানশ্রী মালশ্রী বঙ্গাল। এর মধ্যে একটি কহ্নু গুর্জরী এবং একটি মালশ্রী গৌড়ীও আছে। পটমঞ্জরী (প্রথম মঞ্জরী) বাংলার অতি প্রিয় রাগ ছিল এবং অপর রাগগুলির প্রচলনও মধ্যযুগে বাংলায় যথেষ্ট ছিল।

চর্যাগানে বিবিধ চর্মবাদ্যের উল্লেখ আছে, যথা— ডমরু, পটহ (পড়হা), মাদল, করটা (করণ্ড), কাঁসি (কশালা বা কসালা)। এই বাদ্যগুলি বহুকাল থেকেই বাংলাদেশে চলে আসছে এবং চর্মবাদ্যের প্রচলন বাংলায় খুবই বেশি ছিল। করণ্ড এবং করটা একই বাদ্য বলে মনে হয়। এটি মর্দলজাতীয় বাদ্য—দুটি দণ্ড দিয়ে বাজানো হত। ডমরু বাদ্যটি এখনো বহুলপ্রচলিত। যন্ত্রটির দুটি মুখে চামড়া লাগানো, মাঝখানটি সংকীর্ণ— ইংরেজি Xএর মত দেখতে। মাঝখানে দুটি সুতোর মুখে ধাতুর গুলি থাকে। মধ্যভাগ আন্দোলন করে বাজালে চর্মাচ্ছাদিত মুখে গুলির আঘাত লেগে বাজতে থাকে। পটহ বা পড়হ ঢোল জাতীয় বাদ্য। এর দুটি মুখ ছাগচর্মে আবৃত করা হত। বড় পটহ যাকে মার্গপটহ বলা হত সেগুলি

দণ্ড দ্বারা বাজানো হত এবং একটু ছোট জাতের পটহকে বলা হত দেশী পটহ। এটি হাতেই বাজানো হত। এর বাঁদিকের মুখটি খুব কোমল চর্মে আবৃত হত।

শার্ঙ্গদেব 'মণ্ডি-ডক্কা' নামক একটি বাদ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিশেষ করে চর্যাগানের উল্লেখ করেছেন— "চর্যাগানে চ পূজায়াং শক্তেঃ সা বিনিযুজ্যতে"। অর্থাৎ তান্ত্রিক অনুষ্ঠানাদিতেও এই বাদ্যের ব্যবহার হত। মধ্যযুগের কাব্যাদিতে 'মোড়া' নামক একপ্রকার বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত এই মোড়াই শাস্ত্রোক্ত মণ্ডি-ডক্কা নামক বাদ্য। চালুক্য বংশীয় সোমেশ্বর বলেছেন—

শক্তিদৈবত পূজায়াং চর্যাগানবিধৌ তদা।
বাদনীয়া প্রযত্নেন মণ্ডী-ডক্কা বিচক্ষণৈঃ॥

এটিও দেখতে ছিল ঢোলেরই মত, তবে এর ভিতরে তার লাগানো থাকত তাতে বাজাবার সময় তারের একটা রণন পাওয়া যেত। এটি হাত বা দণ্ড উভয় যোগেই বাজানো হত।

সপ্তদশ সংখ্যক চর্যায় বুদ্ধ-নাটকে ব্যবহৃত বীণার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে লাউ তন্ত্রী দণ্ড এবং সারিকা (সারি বা পর্দা)— এইসব অঙ্গের উল্লেখ আছে। সেকালে তারের যন্ত্র মাত্রই বীণার অন্তর্ভুক্ত, তবে পর্দার উল্লেখে এটি একটি বিশিষ্ট জাতীয় বীণা বলেই মনে হয়। বুদ্ধ-নাটকে হয়তো একতারা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠতর বীণাই ব্যবহৃত হত।

চর্যার আলোচনায় একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ যাঁরা করেছেন তাঁরা গুজরাট-অঞ্চলের লোক। সোমেশ্বর শার্ঙ্গদেব হরিপাল এঁদের গুজরাটের লোক বলা যায়। টীকাকারদের মধ্যে কল্লিনাথ এবং সিংহভূপাল দক্ষিণভারতীয়। এতে মনে হয় চর্যাপদ একদা ভারতের পূর্বাঞ্চলেই নয় পশ্চিমাঞ্চলেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এবং দক্ষিণভারতেও তার কিছু কিছু প্রসার ঘটেছিল। কি ভাবে চর্যাপদের এই ব্যাপ্তি ঘটেছে সেটি গবেষণার বিষয়।

# রূপকথা ও শকুন্তলা

শ্রীসুকুমার সেন

শকুন্তলার গল্প মহাভারতে আছে কালিদাসের নাটকে আছে। তার আগে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও নেই, তবে শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধযাজী দুষ্যন্ত-পুত্রের উল্লেখমাত্র আছে। পরেও মিলেছে, যেমন ভাগবতে ও পদ্মপুরাণে। সে পরের কথা পরে বলছি। মহাভারতের গল্প আগে লেখা হয়েছিল না কালিদাসের নাটক আগে লেখা হয়েছিল এ কথা নিয়ে তর্ক তুললে অনেকে হয়তো বিস্ময়বোধ করবেন। কিন্তু এ সংশয় উড়িয়ে দেবার নয়। মহাভারতের কাহিনীগুলি প্রাচীন নিশ্চয়ই, কিন্তু অষ্টাদশ-পর্ব মহাভারত খুব প্রাচীন নয়। অষ্টাদশ-পর্ব সংস্করণের উৎপত্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে হয় নি। তার পরেও বহুদিন ধরে এতে সংযোজন চলেছে। মহাভারতের আদিপর্বে শকুন্তলার গল্প আছে।[১] আদিপর্ব শেষের সংযোজন। এতে শকুন্তলার গল্প যখন পুনর্লিখিত হয় তার আগে কালিদাসের নাটক লেখা হয়ে গিয়েছিল—এ অনুমান যথার্থ হোক বা নাই হোক, অসম্ভব নয়। মহাভারতে শকুন্তলার গল্পের যে আদিরূপ ছিল তা যখনই লেখা হয়ে থাক্ কালিদাসের গল্পের থেকে স্বতন্ত্র। কালিদাসও যে মহাভারত থেকে কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। মনে হয় তিনি লোককথা থেকে কাহিনীর বীজ নিয়েছিলেন। মহাভারতে কাহিনীটি যে ভাবে আমরা পেয়েছি তাতে কালিদাসের প্রভাব সামান্য-কিছু প্রক্ষিপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়।

ভারত-বংশের বিবরণের আরম্ভ হয়েছে শাকুন্তল উপাখ্যানে।[২] উপাখ্যানটি অখণ্ড, তবে তাতে গল্পটির দুটি পাঠের চিহ্ন লক্ষিত হয়। গোড়া থেকে রাজসভায় সপুত্র শকুন্তলার পৌঁছানো পর্যন্ত প্রথম পাঠের থেকে নেওয়া। তার পর থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় পাঠের অংশ। প্রথম অংশের ঘটনাস্থান কণ্বের আশ্রম, দ্বিতীয় অংশের ঘটনাস্থান দুষ্যন্তের রাজপুরী।

সৈন্যসামন্ত মন্ত্রিপুরোহিত নিয়ে রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়া-যাত্রায় বেরিয়েছে। যে ঘোর অরণ্যে মৃগয়া হল সেখানে পশুবধের তাণ্ডব লেগে গেল। বন্য জন্তুরা মার খেয়ে আরও হিংস্র হয়ে উঠল। বনগজের দৌরাত্ম্য বাড়ল। মৃগয়ায় শ্রান্ত ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হয়ে রাজা সে বন ছেড়ে মরুপ্রান্তর পেরিয়ে এক রম্য কাননে প্রবেশ করলে। তার মধ্য দিয়ে মালিনী নদী প্রবাহিত। মাঝেমাঝে বিদ্যার্থী তপস্বীদের কুটীর। দেবায়তনও আছে। আশ্রমের কুলপতি মহর্ষি কণ্ব কাশ্যপ। বনের প্রবেশদ্বারে সৈন্যসামন্ত রেখে রাজা বললে, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আশ্রম দেখে আসি।[৩] রাজকীয় বেশভূষা ত্যাগ করে রাজা অমাত্য-পুরোহিত সঙ্গে করে এগিয়ে চলল।[৪]

আশ্রমের শোভা দেখে রাজা মুগ্ধ হল। কুটীরে কুটীরে বেদপাঠ হচ্ছে, ব্যাকরণ অভ্যাস হচ্ছে, যজ্ঞকাণ্ড চলছে, ন্যায়ের তর্ক উঠছে, পুরাণপাঠ চলছে; এমনকি নাস্তিক-শাস্ত্রের আলোচনাও শোনা যাচ্ছে। সেখানে দেবমন্দিরও ছিল। রাজা দেবদর্শন করলে আর বামুনদের পূজা করা দেখলে।[৫] তার পর অমাত্যপুরোহিত আশ্রমের বহির্মণ্ডলে রেখে একলা ঋষির আশ্রমপদে প্রবেশ করলে। গিয়ে ঋষিকে দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে বললে, কে এখানে![৬] রাজার ডাক শুনে মূর্তিমতী শ্রীর মত তাপসী-

বেশধারিণী কন্যা কুটীরের বাইরে এল।[৭] এসে রাজাকে স্বাগত বলে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা করলে। তার পর মেয়েটি রাজাকে আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করলে। রাজা বললে, আমি মহাভাগ ঋষি কণ্বকে বন্দনা করতে এসেছি; তিনি কোথায়, আমাকে বল। মেয়েটি বললে, আমার বাবা ফল আহরণ করতে আশ্রমের বাইরে গিয়েছেন। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, তিনি ফিরে এলেই দেখতে পাবেন।[৮] রাজা অপেক্ষা করবার জন্যে প্রস্তুত হল। বললে, তুমি কে? মেয়েটি বললে, আমাকে সকলে ভগবান্ কণ্বের দুহিতা বলে জানে।[৯] রাজা বললে, সে কি করে হয়। মহর্ষি তো সন্ন্যাসী। তখন মেয়েটি বললে, একদিন বাবা এক ঋষিকে আমার জন্মকথা বলছিলেন, আমি তা শুনতে পেয়েছিলুম। আপনাকে বলছি, শুনুন।[১০] ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করছিলেন, সে তপস্যায় দেবলোক বিব্রত হয়ে প'ড়ে অপ্সরা মেনকাকে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মেনকার রূপে ঋষির ব্রতস্খলন হয়। তার ফলে আমার জন্ম। জন্ম হতেই মা আমাকে মালিনীর ধারে ফেলে দিয়ে চলে যান। ঋষি আগেই সরে পড়েছিলেন। নবজাত শিশুকে হিংস্র জন্তুর কবল থেকে রক্ষা করবার জন্যে বনের বড় পাখিরা (শকুনিরা) তাকে আড়াল করে রেখেছিল।[১১] মহর্ষি কণ্ব সেই সময় মালিনীতে প্রক্ষালন করতে যাচ্ছিলেন। শিশুটিকে এইভাবে শকুন্ত-রক্ষিত দেখে তাঁর মায়া হয়। তাকে কুটীরে এনে নিজের মেয়ের মত করে লালন করে মানুষ করেছেন। নির্জন বনে শকুন্ত-দ্বারা পরিবৃত হয়ে রক্ষিত হয়েছিলুম বলে তিনিই আমার নাম রেখেছেন শকুন্তলা।[১২] কণ্বই আমার বাবা, আসল বাবাকে চিনি না।[১৩]

শকুন্তলাকে দেখেই রাজার মন ভুলেছিল, এখন তার কথা শুনে মন মজল এবং আশাও হল। রাজা শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে তখনি বিয়ে করতে চাইলে, কেননা সে তো ঋষিকুমারী নয়, ভূতপূর্ব রাজা বিশ্বামিত্রের কন্যা সুতরাং রাজকন্যা এবং তাঁর যোগ্য পাত্রী। রাজা বললে, তোমাকে ভালো কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি এখনই আনিয়ে দিচ্ছি; আজ থেকে সমস্ত রাজ্য তোমার হল; সুন্দরি, তুমি আমার ভার্যা হও।[১৪] শকুন্তলা বাপের মত না নিয়ে রাজাকে বিয়ে করতে রাজি হল না। বললে, খানিক অপেক্ষা কর, তিনি এসে আমাকে তোমার হাতে নিশ্চয়ই দেবেন।[১৫] অপেক্ষা করা রাজার মতলব নয়। বললে, মানুষ নিজেই নিজের জ্ঞাতি-বান্ধব। আত্মাই আত্মার গতি। তুমি যদি নিজেকে নিজে সম্প্রদান কর তবে অধর্ম হবে না।[১৬] এই বলে রাজা গান্ধর্ব-বিবাহের সমর্থনে যুক্তি দেখাতে লাগল। শকুন্তলা বললে, বেশ, এখনই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হোক। তবে একটি শর্ত স্বীকার কর— আমার ছেলে হলে সে তোমার পরেই যুবরাজ হবে।[১৭] রাজা বললেন, তাই হোক।··তা ছাড়া আমি তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাব।[১৮]

মহর্ষি ফিরে আসবার আগেই রাজা প্রস্থান করলে। তার মনে ভাবনা হতে লাগল, তপস্বী আশ্রমে ফিরে এসে শুনে কী করবেন।[১৯] কণ্ব যথাসময়ে ফিরে এলেন। শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর সামনে বেরোতে পারল না।[২০] কণ্ব সব বুঝে ফেললেন, আর মেয়েকে ডেকে বললেন, বেশ হয়েছে। যে ছেলে হবে সে যেন রাজচক্রবর্তী ইত্যাদি ইত্যাদি হয়— এই আশীর্বাদ করলেন।[২১] তখন শকুন্তলা রাজা ও তার অমাত্যের হয়ে ক্ষমা ও আশীর্বাদ চাইলে। কণ্ব তা দিলেন। শকুন্তলা আশ্রমে রয়ে গেল।

তার পর শকুন্তলা পুত্রলাভ করলে।[২২] কণ্ব শিশুর জাতকর্ম ইত্যাদি অনুষ্ঠান করলেন। শিশুর বৃদ্ধি অসাধারণ রকম হতে লাগল। ছ বছর বয়সেই সিংহ-ব্যাঘ্র নিয়ে যথেষ্ট ঘাঁটাঘাটি করতে লাগল। এইসব দেখে আশ্রমবাসীরা তার নাম রাখলে সর্বদমন। আরও দু-চার বছর কাটলে কণ্ব ভাবলেন, 'সময়ো

যৌবরাজ্যায়'।[২৩] শিষ্যদের ডেকে বললেন, তোমরা অবিলম্বে শকুন্তলা ও তার ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড় আর তার স্বামীর ঘরে সগৌরবে পৌঁছে দিয়ে এস ; বাপের ঘরে মেয়েদের চিরকাল থাকা ভালো দেখায় না।[২৪] গুরুর কথামত শিষ্যেরা সপুত্র শকুন্তলাকে নিয়ে রাজার কাছে পৌঁছে দিয়ে সটান ফিরে এল।[২৫]

শাকুন্তল উপাখ্যানের প্রথম ভাগ এইখানে শেষ।

গুরু-ভাইয়েরা চলে যেতেই শকুন্তলা রাজাকে যথারীতি অভিবাদন করে বললে, কণ্বের আশ্রমপদে আমার সঙ্গে মিলনের পূর্বে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে তা স্মরণ কর। এই তোমার পুত্র, একে যৌবরাজ্যে অভিষেক কর।[২৬] শুনে রাজা সব কথা মনে করেও যেন মনে পড়ছে না এইভাব দেখিয়ে বললে, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। দুষ্ট তপস্বিনী, তুমি কার লোক ? ধর্ম অর্থ কাম কোনো বিষয়েই আমি তোমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্মরণ করতে পারছি না। তুমি এখানে থাকতে পার, চলে যেতে পার, যা খুশি করতে পার।[২৭] রাজার কথায় শকুন্তলা লজ্জায় দুঃখে প্রায় নিঃসংজ্ঞ হয়ে থামের মত স্তব্ধ হয়ে রইল।[২৮] একটু পরে সে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার দিকে তীব্র রোষকটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলতে লাগল, মহারাজ, তুমি জেনেও কি করে বাজে লোকের মত স্বচ্ছন্দে বলছ—আমি জানি না। এ ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তোমার হৃদয়ই তো জানে। নিরপেক্ষ হয়ে সত্য বল, তাতে কল্যাণ হবে। তুমি নিজেকে খাটো কোরো না। আমাকে চিনেও তুমি ইতর লোকের মত অম্লানবদনে বলছ যে চেনো না ! আমি নিজে বয়ে এসেছি বলেই আমাকে তুমি অপমান করতে পার না। পতিব্রতা-সম্মানযোগ্য ভার্যা আমি, অযাচিত এসেছি বলেই আমাকে তুমি অভ্যর্থনা করছ না ! এই সভায় তুমি কেন ইতর লোকের মত আমার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছ ? আমি কি শূন্যে রোদন করছি যে তুমি আমার কথায় কান দিচ্ছ না। আমি নিজের মান নিজে সাধছি। তবুও তুমি আমার কথা, তোমার নিজের শপথ, যদি না রাখ তবে, হে দুষ্মন্ত, তোমার মাথা আজই ফুটি-ফাটা হবে।[২৯] এই তোমার প্রিয়দর্শন পুত্র। একে কোলের কাছে আসতে দাও। সংসারে পুত্রস্পর্শের মত আর মধুর স্পর্শসুখ কি আছে ? যখন এই ছেলে ভূমিষ্ঠ হয় তখন দৈববাণী হয়েছিল যে এই ছেলে শত অশ্বমেধযজ্ঞ আহরণ করবে।[৩০]

তার পর শকুন্তলা রাজাকে তাদের প্রথম সমাগমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে নিজের জন্মকথা বললে। বিশ্বামিত্রকে ধ্যানভ্রষ্ট করে মেনকা তাকে জন্ম দিয়ে হিমালয়ের এক প্রদেশে ('হিমবতঃ প্রস্থে') ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। তার পর থেকে সে ঋষির আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাজা শকুন্তলার কথা উড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার বাপ ভ্রষ্ট তপস্বী, মা বহুচারিণী। সুতরাং তুমিও দুষ্ট। তপস্বিনী, তুমি যা-কিছু বললে সবই আমার অজানা। তোমাকে আমি চিনি না। যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।[৩১] শকুন্তলা বললে, তুমি নিজের বিল্ব-পরিমাণ দোষ দেখতে পাচ্ছ না, আর পরের সর্ষপ-প্রমাণ দোষ দেখছ। কিন্তু তুমি চল মাটিতে আর আমি চরি আকাশে। তোমার সঙ্গে আমার তফাত সর্ষপের সঙ্গে মেরুপর্বতের মতই।[৩২] যাই হোক, এই তোমার ছেলে, একে ত্যাগ করা তোমার উচিত নয়।[৩৩] এই বলে সে পুত্রসঙ্গ-সুখের বহু প্রশংসা করলে।

রাজা তাতেও অচল। তখন শকুন্তলা রাজার শপথ স্মরণ করিয়ে বললে, শপথ হচ্ছে সত্য, আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। রাজা, তুমি শপথ ভঙ্গ কোরো না, সত্যাশ্রয়ী হও। তবে, যখন দেখছি তোমার অসত্যেই আসক্তি আর আমার কথায় অবিশ্বাস, তখন আমি নিজেই চলে যাচ্ছি। তোমার মত লোকের

সঙ্গ করতে নেই। তবে জেনে রেখো, তুমি গ্রহণ না করলেও, হে দুষ্যন্ত, আমার পুত্র শৈলরাজাবতংসক চতুরন্ত এই পৃথিবী পালন করবে। এই বলেই শকুন্তলা প্রস্থান করলে।[৩৪] তখনি দুষ্যন্ত দৈববাণী শুনতে পেলে—মা হাপরের মত, ছেলে বাপেরই। যে জন্ম দিয়েছে সেই সে। দুষ্যন্ত, তুমি পুত্রকে ভরণ কর, শকুন্তলাকে অবমাননা কোরো না।[৩৫] তখন রাজা শকুন্তলাকে ও পুত্রকে গ্রহণ করলে।

কালিদাসের নাটকে বর্ণিত কাহিনী মহাভারতের উপাখ্যানের মত নয়। অবশ্য মূল কথায় মিল আছে।— কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে তাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলে, আর শীঘ্রই রাজধানীতে নিয়ে যাব বলে প্রতিজ্ঞা করে ফিরে এসে সব ভুলে গেল। শকুন্তলাকে ঋষি রাজসভায় পাঠিয়ে দিলেন। রাজা চিনতে পেরেও চিনলে না, অথবা চিনতে পারলে না, প্রত্যাখ্যান করলে। তার পরে দৈব-যোগাযোগ হল, রাজা নিশ্চিন্ত হয়ে শকুন্তলাকে গ্রহণ করলে।

অমিলও বিস্তর।—ক. কণ্ব দূর বন থেকে ফল পেড়ে আনতে গিয়ে দু-চার ঘণ্টা দেরি করেন নি। শকুন্তলার গ্রহদোষ কাটাবার জন্যে সোমতীর্থে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে দু-চার দিন থাকতে হয়েছিল। খ. রাজার সঙ্গে শকুন্তলার সাক্ষাৎ-প্রেমালাপ হয় নি, শকুন্তলাও রাজাকে নিজের পরিচয় দেয় নি। সখীদ্বয়ের সাহায্যেই দুজনের পরিচয় ও প্রেমপরিপুষ্টি হয়েছিল। মহাভারতের উপাখ্যানে শকুন্তলার কোনো সখী-দূতী নেই। গ. শকুন্তলার বিবাহ ও গর্ভসঞ্চার হয়েছে জেনেই কণ্ব তাকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে গিয়েছিল পিসী গৌতমী ও দুজন গুরুভাই, শারদ্বত ও শার্ঙ্গরব। কোনো পিসী-মাসীর উল্লেখ মহাভারতের উপাখ্যানে নেই। ঘ. রাজা রাজধানীতে ফিরে যাবার সময়ে শকুন্তলাকে নিজের সীল-আংটি দিয়ে বলেছিল, তোমাকে আমি শীঘ্র ঘরে নিয়ে যেতে লোক পাঠাব। ইতিমধ্যে আশ্রমে দুর্বাসা ঋষি এসে স্বামী-চিন্তায় মগ্ন শকুন্তলার কাছে অভ্যর্থনা না পেয়ে তাকে শাপ দিয়ে যান। সেই শাপের ফলেই রাজার বিস্মৃতি। আংটি-অভিজ্ঞান দেখলে তবে বিস্মৃতি-মোচন, কিন্তু আংটি গেল হারিয়ে। গৌতমী অনুমান করলেন শচীতীর্থে স্নান করবার সময়েই শকুন্তলার আঁচল থেকে আংটি খুলে পড়েছে। ঙ. শারদ্বত শার্ঙ্গরব ও গৌতমীর সমক্ষেই রাজা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলে। তারা শকুন্তলাকে আশ্রমে ফিরে নিয়ে গেল না। শকুন্তলাকে এক অপ্সরোরমণী ছোঁ মেরে নিয়ে গেল দেবর্ষি কাশ্যপের আশ্রমে। এই আশ্রমে শকুন্তলা পুত্র প্রসব করলে। পুত্র আশ্রমে বাড়তে লাগল। চ. এক রুইমাছ আংটি গিলেছিল। এক জেলের জালে সে মাছ পড়ে। মাছ কুটতে গিয়ে সে পেটের ভিতর আংটি পায় এবং শহরের হাটে তা বেচতে আসে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে রাজদ্বারে নীত হয়। রাজা সেই আংটি দেখবার মাত্রই হারানো স্মৃতি ফিরে পায় আর শকুন্তলার জন্যে হাহুতাশ করতে থাকে। একদিন রাজা দেবরাজের সভা থেকে ফিরবার পথে দেবর্ষির আশ্রমে নামে। সেইখানে পত্নী-পুত্রের সঙ্গে মিলন হয়। দেবর্ষির আশীর্বাদে দু পক্ষেরই মনের কালিমা মুছে যায়।

এই হল কালিদাসের নাটকের গল্প।

ভাগবতের নবম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ে শকুন্তলার গল্প আছে। মৃগয়াপ্রসঙ্গে রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে গিয়েছিল। সেখানে দেখলে, অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে বসে আছে, যেন দেবমায়া। রাজার সঙ্গে লোকজন ছিল, তার উপর পরিশ্রম ও ক্ষুধাও যথেষ্ট। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে রাজা সব ভুলে গেল। জিজ্ঞাসা করায় শকুন্তলা নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, ভগবান কণ্ব উপস্থিত নেই, বলুন আপনার কি করতে হবে। আপনি

বসুন, অর্ঘ্য গ্রহণ করুন, ঘরে বুনো ধানের চাল আছে, ( রেঁধে দিই ) ভোজন করুন, যদি ইচ্ছা হয় ( রাত্রি ) বাস করুন।[৩৬] রাজা বললে, তুমি রাজবংশের মেয়ে সুতরাং স্বচ্ছন্দে আমাকে স্বয়ংবর করতে পার। তাই হল। রাজা রাত কাটিয়ে সকালে চলে গেল। যথাকালে শকুন্তলার ছেলে হল। কণ্ব কুমারের যথোচিত সংস্কার সব করলেন। ছেলে অত্যন্ত দামাল, সিংহকে সবলে ধরে এনে খেলা করে।[৩৭] তার পরে ছেলেকে নিয়ে শকুন্তলা রাজার কাছে গেল। রাজা প্রত্যাখ্যান করলে। তখন দৈববাণী হল। রাজা পত্নীপুত্রকে গ্রহণ করলে।

কিছু কিছু অমিল থাকলেও এই বর্ণনা মহাভারতেরই মত। দৈববাণীর শ্লোকটি মহাভারতেও আছে। শকুন্তলার শিশুপুত্রের সিংহ ধরে এনে খেলা করা মহাভারতে নেই। কালিদাসের থেকে নেওয়া হতে পারে। ভাগবতে শকুন্তলার ভূমিকা অত্যন্ত রূঢ় বাস্তব ক'রে আঁকা।

পদ্মপুরাণের পুরানো পুথিতে শকুন্তলার গল্প নেই। অর্বাচীন পুথি অবলম্বনে প্রস্তুত সংস্করণের স্বর্গখণ্ডে গল্পটি আছে। যিনি বা যাঁরা গল্পটি সংযোগ করেছিলেন তাঁর বা তাঁদের কালিদাসের নাটক বেশ পড়া ছিল।

মহাভারতের উপাখ্যান কালিদাসের গল্পের মূল উৎস বলে ধরে নিলে বুঝতে হবে আংটির প্রসঙ্গ— দুর্বাসার অভিশাপ, আংটি হারানো, মাছের পেটে আংটি পাওয়া ইত্যাদি সব ঘটনা— কালিদাসের সৃষ্টি। দিব্যরমণীর সঙ্গে শকুন্তলার অন্তর্ধানও হয়তো কালিদাসের কল্পনাপ্রসূত। শকুন্তলায় কালিদাসের উত্তুঙ্গ কবিকল্পনার প্রকাশ যথেষ্ট আছে। মহাভারতের শকুন্তলা ঋষির মেয়ে। সে সোজাসুজি বোঝে আর স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কয়। সে সরলপ্রকৃতির, তবে নির্বোধ নয়। প্রণয়ই তার সর্বস্ব নয়, ভালোমন্দ-জ্ঞান তার বেশ আছে। মোট কথা মহাভারতের শকুন্তলা কিছু প্রিমিটিভ ধরণের। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা আমাদের পরিচিত, গৃহস্থকন্যার মতই। সমগ্র নাটকের মধ্যে কালিদাস শকুন্তলাকে চিরকালের কমনীয় কন্যা ক'রে, সদাতনী ধৈর্যশীলা নারী ক'রে এঁকেছেন এবং পারিপার্শ্বিক সমস্ত ভূমিকাই সেই উদ্দেশ্যে কল্পিত হয়েছে। ঋষির শাপ কালিদাসের কল্পনা হতে পারে, নাও হতে পারে। ভারতীয় লোক-উপাখ্যানে ঋষিশাপ একটা বড় মোটিফ। মাছের পেটে আংটি যাওয়াও লোক-উপাখ্যানের মোটিফের মত ঠেকছে। রাজসভায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে শকুন্তলার অন্তর্ধান কালিদাসের কল্পনাপ্রসূত মনে করলে কালিদাসের প্রতি অবিচার হবে বলে মনে করি। এখানে কালিদাসের কল্পনা স্বাধীনতা অবলম্বন করলে সম্ভবত অন্তরিক্ষে শেষ অঙ্কের দৃশ্য আঁকতেন না। আমার মনে হয়, কালিদাস তাঁর নাটকের কাহিনী তাঁর সময়ে প্রচলিত রূপকথা থেকেই নিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ভালো করে "কথা" অর্থাৎ অপরূপকথা বলতে পারা বাহাদুরির ব্যাপার ছিল। তার প্রমাণ মেঘদূতে অবন্তী অঞ্চলে উদয়নকথা-কোবিদ গ্রামবৃদ্ধের উল্লেখ।

কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলা-কাহিনীর মত গল্প লোকের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে রূপকথা রূপে আমাদের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। তার সাক্ষ্য নীচের গল্পটি। এটি হুগলি-বর্ধমান অঞ্চলের রূপকথা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গল্পটি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন ১৯০২ সালে। মেয়েদের মুখে শোনা গল্পটি তিনি প্রায় যথাযথই দিয়েছেন। যতটা সম্ভব তাঁরই ভাষা বজায় রেখে আমি সংক্ষেপে লিখছি। উদ্ধৃতিচিহ্ন-মধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখা অপরিবর্তিত ভাবে পাওয়া যাবে।

"এক বনে এক সন্ন্যাসী বাস করত। তার কুঁড়েঘরের পাশে একটা নটেশাকের গাছ হয়েছিল। সে রোজই মনে করে, আজ নটেগাছটা রেঁধে খাব, আর রোজই ভুলে যায়। একদিন মনে করলে আজ

নিশ্চয়ই খাব। বাড়ি এসে যেই নটেগাছটা তুলতে যাবে, দেখে যে নেই!" সন্ন্যাসী রাগে দুঃখে এই ব'লে শাপ দিলে, নটেশাক যদি মানুষে মুড়িয়ে থাকে তার পেটে জন্তু হবে, আর জন্তুতে খেয়ে থাকলে তার পেটে মানুষ হবে। কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী দেখলে যে তার কুঁড়ের পাশে একটা ছাগল তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল। সন্ন্যাসী দেখলে যে সেখানে একটি সদ্যোজাত কন্যা পড়ে রয়েছে। দেখে তার দয়া হল, সে মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মত মানুষ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মেয়েটি বড় হল। "একদিন সে কুঁড়েঘরের দরজাটিতে বসে আছে, এমন সময় সেই দেশের রাজা খুব ধুমধাম বাজনাবাদ্যি ক'রে বে করতে যাচ্ছেন। যেতে যেতে রাজা মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে আর বে করতে গেলেন না। রাজা মেয়েটির কাছে গিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে বে করব। মেয়েটি বললে, আমার বাবা আছেন, বাবা না বললে আমি যাব না। এমন সময় সন্ন্যাসী এল। রাজা বললেন, আমি আপনার মেয়েটিকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি। সন্ন্যাসীর খুব আহ্লাদ হল।" রাজা মেয়েটিকে বিয়ে করে ঘরে নিয়ে চললেন। "যত দূর দেখা যায়, সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। যখন আর দেখা যায় না, তখন সে একটা প্রকাণ্ড গাছে উঠল। রাজা যত দূর যায়, সন্ন্যাসী তত উঁচু ডালে ওঠে; তার পর যেমনি সরু ডালে উঠবে, অমনি পড়ে মরে গেল।"

রাজা মেয়েটিকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে একটি ছেলে হল। রাজবাড়িতে ধুমধাম পড়ে গেল। "এমন সময় একটা বুড়ি এসে বললে, আমি রানীর মাসী। শুনে সকলে তাকে আদর ক'রে মেয়েটির কাছে নিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। তার আবার কোন্ চুলোর মাসী? কিছু না বলে সে চুপ করে রইল। মাসী রাজবাড়ির গিন্নী বনে গেল। একদিন সে চুপি চুপি কচি ছেলের একটি আঙুল কেটে নিয়ে রানীর চুল বাঁধবার সময় তার খোঁপায় গুঁজে দিলে। এদিকে ছেলের হাতের একটা আঙুল নেই আর রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে দেখে সকলে মনে করলে রানী মানুষ নয়। রাজা ডাইনী বিয়ে করে এনেছেন। রানীকে সঙ্গে সঙ্গে বনবাস দেওয়া হল আর মাসী-বুড়িও অন্তর্ধান করলে।

কিছুদিন পরে বুড়ি ঘটকী সেজে এসে রাজাকে বললে, আপনি যে মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন সে এখনও আইবুড়ো আছে। তাকে বিয়ে করুন। তাকে মনে কষ্ট দিয়ে ভালো করেন নি। রাজা রাজি হয়ে এবার যাকে বিয়ে করতে গেলেন সে হল রাক্ষসী-বুড়ির বোনঝি। রাজাকে দেখে তার মায়া হল। সে বাসর-ঘরে চুপিচুপি রাজাকে সাবধান করে দিলে যে তারা কেউই মানুষ নয়, রাজাকে খাবার জন্যেই ছল করে আনা হয়েছে। সে তার মাসীর কীর্তিকাহিনী সব বললে আর রাজাকে পালাবার সুযোগ ক'রে দিলে। রাজা তখনই পালিয়ে গেলেন। "তার পর বন থেকে সেই রানীকে আনিয়ে আবার ঘরকন্না করতে লাগলেন।"

এখন, কালিদাসের গল্পের সঙ্গে রূপকথাটিকে মিলিয়ে দেখা যাক। রূপকথার সন্ন্যাসী কালিদাসের কণ্ব। তার উপর সে দুর্বাসার ভূমিকাও নিয়েছে। তার শাপ সাক্ষাৎ মেয়েটির প্রতি নয়, কিন্তু তার জন্ম সন্ন্যাসীর শাপের ফলে। গল্পের সন্ন্যাসীর কন্যাস্নেহের প্রকাশ কালিদাসের কণ্বের বেদনার মতই মর্মান্তিক, এবং দু ভূমিকারই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান কন্যা-বিদায়ের সঙ্গেসঙ্গে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ মেয়েকে দেখবার জন্যে গাছের নীচু ডাল থেকে উপর ডালে ওঠা রূপকথা-ঘটিত, অথচ অত্যন্ত স্বাভাবিক সুমিষ্ট কল্পনা। সন্ন্যাসীর মৃত্যুও নাটকীয়। মেয়েটিও শকুন্তলাই। দুজনেই অমনুষ্যগর্ভসম্ভূত, একজন পশুজাত, অন্য জন পক্ষিরক্ষিত। মনে হয় কাহিনী যখন বীজ-আকারে ছিল তখন শকুন্তলা পক্ষিজাত বলেই কল্পিত

ছিল। শকুন্তলা নামটির সংগত ব্যাখ্যা থেকে এই অনুমান করি। মহাভারতে ও কালিদাসের নাটকে শকুন্তলা নামের ব্যাখ্যা আছে। কালিদাস ইঙ্গিত করেছেন যে শব্দটি 'শকুন্ত' থেকে উৎপন্ন। ব্যাখ্যাকারেরা বলেন শকুন্তের দ্বারা লালিত (শকুন্ত+লা) বলেই এই নাম। কিন্তু এই অর্থে লা-ধাতু সংস্কৃতে অপরিজ্ঞাত। সুতরাং এ ব্যাখ্যা লোকনিরুক্তি ছাড়া কিছু নয়। আসলে, 'শকুন্তল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ 'শকুন্তলা'। 'শকুন্ত' মানে পাখি, তাতে ক্ষুদ্র অর্থে 'ল' প্রত্যয় করে স্ত্রীলিঙ্গে 'শকুন্তলা', মানে ছোট পাখিটি। শকুন্তলা যে শকুনশাবক তা শকুনি-রক্ষা থেকেও মনে হয়। ক্ষুদ্র অর্থে '-ল' প্রত্যয়ের অন্য উদাহরণ— বৃষল, শিশুল (বৈদিক), প্রাকৃত মচ্ছলী (স্ত্রীলিঙ্গ, ছোট মাছ; এর থেকে আধুনিক হিন্দী 'মছ্‌লি')। এই অর্থে শকুন্তল-শকুন্তলার প্রতিশব্দ রয়েছে, ক্ষুদ্র-অর্থে '-অক' প্রত্যয়যোগে, 'শকুন্তক-শকুন্তিকা'[৩৯] (বৈদিক)। রূপকথার মাসী কালিদাসের পিসী। এই দু ভূমিকার আচরণ এ দেশের ঐতিহ্য অনুসারেই। অর্থাৎ মাসী প্রতিকূল, পিসী অনুকূল। রূপকথার ধারা অনুসারে মানুষের অত্যন্ত প্রতিকূল ব্যক্তি রাক্ষস-রাক্ষসী। তবে রাজা প্রত্যাখ্যান করলে পর কালিদাসের পিসীও শকুন্তলার নির্বাসনে প্রকারান্তরে সায় দিয়েছিল। রূপকথায় রাজার দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ ও প্রাণ নিয়ে পলায়ন বাংলা রূপকথার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই হয়েছে বলে মনে করি।

কালিদাস যে কতকটা সমসাময়িক রূপকথা অবলম্বন করেছিলেন, আমার মনে হয়, নদীর ঘাটে নাইতে গিয়ে আংটি হারানো আর মাছের পেটে তা পাওয়া তার সুদৃঢ় প্রমাণ। বাংলা রূপকথাটিতে এ ঘটনা নেই, কিন্তু থাকতে পারত। তবে নেই বলেই জোর করে বলতে পারি যে বাংলা রূপকথাটি কালিদাসের গল্পের স্থানকালোচিত আধুনিক সংস্করণ নয়, অন্য একটি পাঠের রূপান্তর।

মহাভারতের শকুন্তলা-উপাখ্যানের প্রথম অংশে— রাজার মৃগয়া থেকে শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাৎ-মুহূর্ত অবধি— কালিদাসের গল্পের প্রভাব আছে বলে মনে করি। মালিনী নদীর উল্লেখ শুধু এখানেই রয়েছে।

---

১ এই আলোচনায় বঙ্গবাসী কার্যালয় -প্রকাশিত পাঠ অনুসরণ করেছি। পুনা সংস্করণে (অধ্যায় ৬৩-৬৯) বিশেষ পার্থক্য নেই।

২ উনসত্তর অধ্যায় থেকে চুয়াত্তর অধ্যায় পর্যন্ত।

৩ অবস্থাপ্য বনদ্বারি সেনামিদমুবাচ সঃ।· ·স্থীয়তামত্র যাবদাগমনং মম (৬৯, ৩২-৩৩)

৪ সামাত্যো রাজলিঙ্গানি সোঽপনীয় নরাধিপঃ। পুরোহিতসহায়শ্চ জগামাশ্রমমুত্তমম্॥ (৬৯, ৩৫)

৫ দেবতায়াতনানাঞ্চ প্রেক্ষ্য পূজাং কৃতাং দ্বিজৈঃ। ব্রহ্মলোকস্থমাত্মানং মেনে· ·(৭০, ৪৯)

৬ ততোঽগচ্ছন্ মহাবাহুরেকোঽমাত্যান্ বিসৃজ্য তান্। নাপশ্যত্তাশ্রমে তস্মিন্ তমৃষিং শংসিতব্রতম্। সোঽপশ্যমানস্তমৃষিং শূন্যং দৃষ্ট্বা তদাশ্রমম্। উবাচ ক ইহেত্যুচ্চৈ র্বনং সন্নদয়ন্নিব॥ (৭১,১-২)

৭ শ্রুত্বাথ তস্য তং শব্দং কন্যা শ্রীরিব রূপিণী। নিশ্চক্রমাশ্রমাৎ তস্মাৎ তাপসীবেষধারিণী॥ (৭১, ৩)

৮ গতঃ পিতা মে ভগবান্ ফলান্যাহর্তুমাশ্রমাৎ। মুহূর্তং সংপ্রতীক্ষস্ব দ্রষ্টাস্যেনমুপাগতম্॥ (৭১, ৯)

৯ কণ্বস্যাহং ভগবতো দুষ্মন্ত দুহিতা মতা। (৭১, ১৫ক) ১০ (৭১-২০ থেকে ৭২-২০।)

১১ দৃষ্ট্বা শয়ানং শকুনাঃ সমন্তাৎ পর্যবারয়ন্। নেমাং হিংস্যুর্বনে বালাং ক্রব্যাদা মাংসগৃদ্ধিনঃ॥ (৭২,১২)

১২ নির্জনে তু বনে যস্মাচ্ছকুন্তৈঃ পরিরক্ষিতঃ। শকুন্তলেতি নামাস্যাঃ কৃতঞ্চাপি ততো ময়া॥ (৭২,১৬)

১৩ কথং হি পিতরং মন্যে পিতরং স্বামজানতী। (৭২, ১৯ক) ১৪ সর্বং রাজ্যং তবাদ্যাস্তু ভার্যা মে ভব শোভনে। (৭৩, ৩খ)

১৫ মুহূর্তং সংপ্রতীক্ষস্ব স মাং তুভ্যং প্রদাস্যতি॥ (৭৩, ৫খ)

১৬ আত্মনো বন্ধুরাত্মৈব গতিরাত্মৈব চাত্মনঃ। আত্মনৈবাত্মনো দানং কর্তুমর্হসি ধর্মতঃ॥ (৭৩, ৭)

১৭ শৃণু মে সময়ং প্রভো।···ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেৎ ত্বদনন্তরঃ॥ যুবরাজো মহারাজ· ·অস্তু মে সঙ্গমস্ত্বয়া॥ (৭৩, ১৫-১৭)

১৮ এবমস্তু· ·অপি চ ত্বাং হি নেষ্যামি নগরং স্বং শুচিস্মিতে॥ (৭১, ১৮)

১৯ ইতি অস্যাঃ প্রতিশ্রুত্য স নৃপো জনমেজয়। মনসা চিন্তয়ন্ প্রায়াৎ কণ্বং প্রতি পার্থিবঃ॥ ভগবাংস্তপসা যুক্তঃ শ্রুত্বা কিং নু করিষ্যতি। (৭৩, ২২-২৩ক)

২০ শকুন্তলা চ পিতরং হ্রিয়া নোপজগাম তম্। (৭৩, ২৪ক) ২১ (৭৬, ২৫-৩১)।

২২ প্রতিশ্রুত্যে তু দুষ্যন্তে প্রতিযাতে শকুন্তলা। গর্ভং সুষাব বামোরুঃ কুমারমমিতৌজসম্॥ (৭৪, ১)

২৩ 'সময়' শব্দের এখানে দুটি মানেই খাটে। এক সর্বদমনের যৌবরাজ্যপ্রাপ্তির কাল। আর, সর্বদমনকে যৌবরাজ্য দিতে রাজার প্রতিজ্ঞা।

২৪ শকুন্তলামিমাং শীঘ্রং সহপুত্রামিতো গৃহাৎ। ভর্তুঃ প্রাপয়তাগারং সর্বলক্ষণপূজিতাম্॥ নারীণাং চিরবাসো হি বান্ধবেষু ন রোচতে। (৭৪, ১১-১২ক)

২৫ নিবেদয়িত্বা তে সর্বে আশ্রমং পুনরাগতাঃ। (৭৪, ১৬ক)

২৬ পূজয়িত্বা যথান্যায়মব্রবীচ্চ শকুন্তলা॥ অয়ং পুত্রস্ত্বয়া রাজন্ যৌবরাজ্যেঽভিষিচ্যতাম্॥· ·যথা মৎসঙ্গমে পূর্বং যঃ কৃতঃ সময় স্ত্বয়া। তৎ স্মরস্ব মহাভাগ কণ্বাশ্রমপদং প্রতি॥ (৭৪, ১৬খ-১৮)

২৭ সোঽথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্যা রাজা স্মরন্নপি। অব্রবীন্ন স্মরামীতি কস্য ত্বং দুষ্টতাপসি॥ ধর্মার্থকামসম্বন্ধং ন স্মরামি ত্বয়া সহ। গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা কামং যদ্বাপীচ্ছসি তৎ কুরু॥ (৭৪, ১৯-২০)

২৮ সৈবমুক্তা বরারোহা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী। নিঃসংজ্ঞেব চ দুঃখেন তস্থৌ স্থাণুরিব নিশ্চলা॥ (৭৪, ২১)

২৯ সা মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা দুঃখামর্ষসমন্বিতা। ভর্তারমভিসংপ্রেক্ষ্য ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ॥ জানন্নপি মহারাজ কস্মাদেবং প্রভাষসে। ন জানামীতি নিঃশঙ্কং যথান্যঃ প্রাকৃতো জনঃ॥ স্বয়ং প্রাপ্তেতি মামেবং মাবমংস্থাঃ পতিব্রতাম্। অর্ঘার্হাং নার্চয়সি মাং স্বয়ং ভার্যামুপস্থিতাম্॥ কিমর্থং মাং প্রাকৃতবদুপপ্রেক্ষসি সংসদি। ন খল্বহমিদং শূন্যে রৌমি কিং ন শৃণোষি মে॥ যদি মে যাচমানায়া বচনং ন করিষ্যসি। দুষ্যন্ত শতধা মূর্ধা ততস্তেঽদ্য স্ফুটিষ্যতি॥ (৭৪, ২৪-২৫, ৩৪-৩৬)

৩০ স্পৃশতু ত্বাং সমালিঙ্গ্য পুত্রোঽয়ং প্রিয়দর্শনঃ। পুত্রস্পর্শাৎ সুখতরস্পর্শো লোকে ন বিদ্যতে।· ·আহর্তা বাজিমেধস্য শতসংখ্যস্য পৌরব। ইতি বাগন্তরিক্ষে মাং সূতকেঽভ্যবদৎ পুরা॥ (৭৪, ৫৮, ৬০)

৩১ সর্বমেতৎ পরোক্ষং মে যৎ তং বদসি তাপসি। নাহং ত্বামভিজানামি যথেষ্টং গম্যতাম্ ত্বয়া॥ (৭৪, ৮১)

৩২ রাজন্ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যসি। আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥ ক্ষিতাবটসি রাজেন্দ্র অন্তরিক্ষে চরাম্যহম্। আবয়োরন্তরং পশ্য মেরুসর্ষপয়োরিব॥ (৭৪, ৮২, ৮৪)

৩৩ · ·পুত্রং ন ত্যক্তুমর্হসি· ·(৭৪, ১০০)

৩৪ রাজন্ সত্যং পরং ব্রহ্ম সত্যঞ্চ সময়ঃ পরঃ। মা ত্যাক্ষীঃ সময়ং রাজন্ সত্যং সঙ্গতমস্তু তে॥ অনৃতে চেৎ প্রসঙ্গস্তে শ্রদ্দধাসি ন চেৎ স্বয়ম্। আত্মনা হন্ত গচ্ছামি ত্বাদৃশে নাস্তি সঙ্গতম্॥ ত্বামৃতেঽপি হি দুষ্যন্ত শৈলরাজাবতংসকাম্। চতুরন্তামিমাং পৃথ্বীং পুত্রো মে পালয়িষ্যতি॥ এতাবদুক্ত্বা রাজানং প্রাতিষ্ঠত শকুন্তলা। (৭৪, ১০৬-১০৯ক)

৩৫ অথান্তরিক্ষাদ্ দুষ্যন্তং বাগুবাচাশরীরিণী। ভস্ত্রা মাতা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ। ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্॥ (৭৪, ১০৯খ-১১০)

৩৬ আস্যতাং হরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ। ভুজ্যতাং শস্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে॥

৩৭ বদ্ধা মৃগেন্দ্রং তরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ॥

৩৮ রাক্ষস-খোক্কস, এস. সি. আঢ্যি এণ্ড কোং কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩০৯, একাদশ সংস্করণ ১৩৩৮।

৩৯ এই প্রসঙ্গে 'কণ্ব' নামটিকেও টানতে পারা যায়। অথর্ববেদে 'কণ্ব' একরকম অপদেবতা (গর্ভনাশকারী) অথবা ব্যাল (গর্ভাদ)। এই ব্যাল হয়তো শকুনি (অথর্ব সংহিতা ২. ২৫.২.)। অনুমান করিতে ইচ্ছা হয়, আদিম কাহিনীতে এমনি কণ্বের কবল থেকে পাখিরা অথবা এক কণ্ব অপর কণ্বদের ধ্বংসকার্য থেকে মেনকার পরিত্যক্ত গর্ভকে রক্ষা করেছিল।

# মেঘদূতের ব্যাখ্যা

শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের লক্ষণই এই যে, তাহা কখনও পুরাতন হয় না। যুগে যুগে সহৃদয় পাঠকের চিত্তে তাহা নব নব ভাব ও রসের উদ্রেক করিয়া থাকে। বিভিন্ন মনীষিগণ তাহার নূতন নূতন অর্থ ও অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন। জগতের মূল-প্রকৃতির রূপ ও অভিব্যক্তির যেমন অন্ত নাই, তেমনই মহাকবিবাণীর দ্যোতনাও সীমাহীন ও অপরিচ্ছেদ্য। মহাকবি শেক্সপীয়রের 'হ্যাম্‌লেট্' 'কিং লীয়র্' প্রভৃতি নাটকের কত শত ব্যাখ্যাই-না টীকাকারগণ প্রচার করিয়াছেন। তবুও মনে হয় যে, উহার মূল অভিপ্রায়টি যেন এখনও আমাদের বুদ্ধির পরিধিকে অতিক্রম করিয়াই রহিয়াছে। অনেক সময় সমালোচকগণের ব্যাখ্যা যে কবির মূল সৃষ্টিপ্রেরণার অনুযায়ী হইয়াছে, তাহা নহে। বরং এমনও দেখা যায় যে, কবি সৃষ্টিক্ষণে যে বিষয় চিন্তাও করেন নাই, সমালোচক তাহাকেই কাব্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে শেক্সপীয়রের নাট্যকলার অন্যতম প্রধান সমালোচক ব্র্যাড্‌লি কর্তৃক প্রচারিত 'কিং লীয়র্' নাটকের সমালোচনার প্রতি নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গোক্তিটি স্মরণীয়—

I dreamt last night that Shakespeare's ghost
Sat for a Civil Service post.
The English papers of the year
Contained a question on King Lear.
Which Shakespeare answered very badly
Because he hadn't studied Bradley.

কবিই যে অনেক সময় তাঁহার সৃষ্টিমুহূর্তের মূল প্রেরণাটি পরবর্তী ক্ষণে যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, এমনও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শাজাহান' কবিতার কয়েকটি দুরূহ পংক্তির[১] ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলিয়া মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন—

"কবিতা লিখেছি বলেই যে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই। মন থেকে কথাগুলো যখন সদ্য উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মানের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্তর্যামীর কাজ সারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এখন বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে বের করতে হবে—সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশ জন আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিয়ে সর্বদাই হট্টগোল বেধে যায়। সেই গোলমালের মধ্যে আমার ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, যদি সন্তোষজনক না মনে কর, তোমার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার অধিকার নেই।"[২]

সুতরাং শ্রেষ্ঠ কবিকর্ম শুধু একটি মাত্র নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিয়াই চরিতার্থ হয় না। তাহার চতুষ্পার্শ্বে একটি অনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনার পরিমণ্ডল রচিত হইয়া থাকে, বিভিন্ন রসিকজনের বিচিত্র ব্যাখ্যা

সেই পরিমণ্ডলের মধ্যে ভিড় করিয়া থাকে—কবিসম্মত অর্থ সেই অনির্দিষ্ট পরিমণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত অন্যতম ব্যাখ্যা মাত্র। সব সময় সহৃদয় পাঠকের চিত্ত যে তাহাতেই সায় দিবে, এমন নাও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সমালোচক ব্র্যাড্‌লি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যেমনই সারবান্ তেমনই সহৃদয়ের অনুভববেদ্য—

"About the best poetry, and not only the best, there floats an atmosphere of infinite suggestion. The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the secret of all. He said what he meant, but his meaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expand into something boundless which is only focussed in it; something also which, we feel, would satisfy not only the imagination but the whole of us...."[৩]

অতএব, জগতের যেসকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি, সেগুলির মধ্যে সহৃদয় পাঠক কেবল কল্পনার নবীনতা, ব্যাপকতা অথবা ভাব ও ভাষার বিশিষ্ট বিন্যাস ও মাধুর্য— এইটুকু মাত্রই সন্ধান করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; তাহারা উহাদের মধ্যে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব, কবিজীবনের কোনো অজ্ঞাত ঘটনা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য প্রভৃতির অন্বেষণও করিয়া থাকেন। হয়তো নিছক সাহিত্যসমালোচনারূপে, অথবা রসদৃষ্টিসম্মত ব্যাখ্যারূপে তাহার কোনো গুরুত্ব নাও থাকিতে পারে; কিন্তু স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, শ্রেষ্ঠ কবিকর্মের এইজাতীয় বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা সমুদিতভাবে পাঠকের কাব্যরসাস্বাদকে গভীরতর ও সমৃদ্ধতর করিয়া তুলে, যাহা কোনো একটি বিশেষ ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া চলিলে সম্ভবপর হয় না।

মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'ও এই জাতীয় একখানি কাব্য। নানা সুরসিক বিদ্বজ্জন ইহারা নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে এই কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছেন; দার্শনিক ইহার মধ্যে দর্শনশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিয়াছেন; মরমী ইহার প্রতিটি মন্দাক্রান্তা ছন্দে যেন নিজেরই একান্ত নিজস্ব অনুভূতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন; আবার, যিনি নিছক কাব্যরসপিপাসু, তিনি শুধু এই খণ্ডকাব্যের অপরূপ ভাষাশিল্প ও বর্ণনার বিচিত্র লীলা দর্শন করিয়াই বিশুদ্ধ কাব্যসৌন্দর্যের এই অতুলনীয় প্রকাশের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন। হয়তো শেষোক্ত সহৃদয়ের চিত্তাবস্থাই নিছক কাব্যসমালোচনার দিক হইতে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাও যে 'মেঘদূত' কাব্যের পরিপূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য সংযোজন, সে বিষয়েও কোনো মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে 'মেঘদূতে'র বিভিন্নমুখী কয়েকটি ব্যাখ্যার আলোচনা করাই উদ্দেশ্য— সহৃদয় পাঠকগণ ইহাদের সারবত্তা নিজ নিজ রুচি অনুসারে বিচার করিয়া দেখিবেন।

২

**পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ**

মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অধিকাংশ সমালোচকই একটি সাধারণ বিভ্রমে পতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই বিভ্রমের জন্য যে তাঁহারা নিজেরাই দায়ী, তাহা বলিতে পারি না। এই বিভ্রমসৃষ্টির

জন্য প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের দায়িত্ব সমধিক। তিনিই সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম টীকাকার যিনি কালিদাসের এই অখণ্ড শিল্পকর্মকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অর্বাচীন পাঠকসম্প্রদায়ের চিত্তমোহ সংঘটিত করিয়াছেন। 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ কালিদাসের কবিকল্পনার মধ্যে একেবারেই স্থান পায় নাই—ইহা যে অন্যান্য একাধিক টীকাকারগণের সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হয় তাহা নয়, মেঘদূতের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যও এই সিদ্ধান্তেরই পরিপোষক।[৪] মেঘদূতের ত্রয়োদশ শ্লোকে যক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে—

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।

"হে মেঘ! তুমি প্রথমে আমার কাছে তোমার যাত্রার অনুকূল পথের বিবরণ শ্রবণ করো। পরে আমার শ্রোত্ররসায়ন বার্তা শুনিও।"

সুতরাং 'মেঘদূতে'র দুইটি প্রধান বিষয়বস্তু—একটি, অলকাগামী মার্গের বর্ণনা; এবং অপরটি, বিরহিণী যক্ষপত্নীর উদ্দেশে যক্ষের বার্তা। খুব সম্ভব মল্লিনাথ এই দুইটি বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিয়াই মেঘদূতকে দুই অর্ধে ভাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, মল্লিনাথ-পরিকল্পিত বিভাগ যে খুব যুক্তিসংগত হয় নাই, তাহা একটু প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 'উত্তরমেঘে'র ৪০শ শ্লোক পর্যন্ত অলকাপুরী, যক্ষের বাসভবন ও যক্ষপত্নীর বর্ণনা। অতঃপর কুশলপ্রশ্নের পর ৪১শ শ্লোক হইতে যক্ষের সন্দেশবাক্য আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং মল্লিনাথের 'পূর্বমেঘ' এবং 'উত্তরমেঘ' -রূপে বিভাগকল্পনা এবং 'উত্তরমেঘে'র প্রারম্ভ নির্ণয় যে একেবারেই অযৌক্তিক, ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। আধুনিক যুগে কালিদাস-রসিক অধিকাংশ বিদ্বজ্জনই কিন্তু 'মেঘদূতে'র এই বিভাগকে অভ্রান্ত ও কবিকল্পিত, অতএব মৌলিক, বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহারা 'মেঘদূতে'র যে-সকল তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট ভাবুকতা ও রসিকতার পরিচয় আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেসকলের মূল ভিত্তি যে নিতান্তই শিথিল তাহা গোড়া হইতেই পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য এই অবতরণিকার প্রয়োজন।

৩

### আবহতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

১৩৪২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আলিপুর আবহতত্ত্ববিভাগের তৎকালীন প্রধানাধ্যক্ষ ডক্টর এস্. এন্. সেন 'মেঘদূতে আবহতত্ত্ব' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। "কালিদাস শুধু ভারতের মহাকবি নন, তিনি একজন প্রধান আবহতত্ত্ববিদ্‌ও ছিলেন"—ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য তিনি একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করতঃ 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। বহু স্থলে তাঁহার ব্যাখ্যান সত্যই চমকপ্রদ, এবং 'মেঘদূতে'র রসাস্বাদকে তাহা বহুলপরিমাণে সমৃদ্ধ করে, ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু স্বয়ং বৈজ্ঞানিক হইয়াও তিনি গোড়া হইতেই একটি কাল্পনিক অযৌক্তিক ভিত্তির উপর আপন সিদ্ধান্তটিকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, 'পূর্বমেঘ' ও 'উত্তরমেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ একেবারেই কল্পনাপ্রসূত; কিন্তু ড. সেন তাহাকেই সত্যরূপে স্বীকার

করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং 'মেঘদূতে'র বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকট অভিনব ও কৌতূহলোদ্দীপক মনে হইলেও ইহার বাস্তব ভিত্তি যে নিতান্তই শিথিল, তাহা মানিয়া লইতেই হইবে। 'পূর্বমেঘ' নামকরণ সম্পর্কে তিনি বলিলেছেন—

"তিনি [ কালিদাস ] মেঘদূত কাব্য দুই অংশে ভাগ করিয়াছেন— প্রথম অংশের নাম পূর্বমেঘ; ইহাই বাদলের মেঘ যাহা আজও আর্যাবর্তের উপর দিয়া কোন্ পূর্বদিক হইতে বহিয়া থাকে। এই মেঘকে পথ দেখাইতে গিয়া কবির মন মেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পাঁচ শত ক্রোশব্যাপী পথ অতিক্রম করিয়াছে। পথে পড়িয়াছে কত গিরি নদী জনপদ। অলকায় পৌঁছিয়া যাত্রাশেষে কবি উত্তরমেঘের সন্ধান পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। দেখা যায় যে আজও পশ্চিম-হিমাচলের উপর এই মেঘ কোন্ উত্তর দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়। অলকা কি তাহা হইলে পূর্ব ও উত্তর মেঘের সন্ধিস্থল এবং এই জন্যই কি কালিদাস মেঘদূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন?"[৫]

হায়! যদি সত্যই পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ কালিদাস-পরিকল্পিত হইত! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা মল্লিনাথেরই প্রাপ্য। কিন্তু এই মৌলিক সর্বসাধারণ ভ্রমের কথা বাদ দিলেও ড. সেন যেরূপ নিপুণতার সহিত রামগিরি হইতে অলকা পর্যন্ত বিস্তৃত মেঘের গতিপথের সহিত বর্তমানকালের বর্ষাকালীন মেঘের গতিপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ। তিনি বলিয়াছেন—

"অতএব দেখা যাইতেছে যে, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে অন্ততঃ ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী জানিতেন যে বায়ুর গতির উপর মেঘের চলাচল নির্ভর করে। এসব তথ্য জানিয়া কালিদাস তাঁহার মেঘকে রামগিরি হইতে অলকা পাঠাইতে প্রয়াসী হইলেন। এই প্রস্তাবকে আমরা কি মহাকবির শুধু একটা অলস কল্পনা কিংবা একটা খেয়াল বলিয়া ধরিয়া লইব, অথবা মনে করিব যে মহাকবি আর্যাবর্তে বহুপর্যটনের ফলে নানা মেঘগতি প্রত্যক্ষ দর্শন করেন এবং এই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন?"

মোটামুটিভাবে, ইহার সহিত আমাদের মতের কোনো বিরোধ নাই। সমগ্র ভারতভূখণ্ডের ভৌগোলিক ও তৎসজাতীয় সন্নিবেশ-বৈশিষ্ট্যের সহিত মহাকবির যে অন্তরঙ্গ ও অপরোক্ষ পরিচয় ছিল, ইহা তাঁহার রচনাবলী পাঠ করিলে প্রত্যেকেরই হৃদয়ঙ্গম হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা এ কথা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে মানিয়া লইতে পারি না যে, শুধু আবহতত্ত্ব বিষয়ক "অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই মহাকবি মেঘদূত কাব্যের অবতারণা করিয়াছিলেন"। কালিদাস-বর্ণিত মেঘপথের সহিত ১৮ই আগস্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্রের তুলনাপ্রসঙ্গে ড. সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক—

"এখন দেখা যাউক আগস্ট মাসের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনের মেঘপথের সহিত কালিদাসের মেঘপথের কতটা সাদৃশ্য দেখানো যায়। এই উদ্দেশে ১৮ই আগস্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্র দেখানো হইল। কালিদাসের মেঘপথও এই চিত্রে বসানো হইয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার উপর দিয়া মেঘপ্রবাহের যেসকল রেখা টানা হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে কালিদাস-মেঘপথরেখার আশ্চর্য সাদৃশ্য বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ মেঘকে রামগিরি হইতে অলকায় যাইতে হইলে উজ্জয়িনী ঘুরিয়া যাইতে হয় না। এইজন্য মহাকবি 'পূর্বমেঘে'র অষ্টবিংশতি শ্লোকে মেঘকে রাজধানী দর্শনের

নানারূপ লোভ দেখাইতে ছাড়েন নাই। বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উজ্জয়িনীর পথে পূর্বমেঘকে টানিয়া আনিতে হইলে কোনো বিশেষ কারণের প্রয়োজন হয়। এই কারণ সাধারণতঃ বাদলের ঝড়ের অভিযান। যখন এইরূপ কোনো ঝড় উৎকল হইতে গুর্জর অভিমুখে অগ্রসর হয় তখন রামগিরি অঞ্চলে বর্ষা প্রবল হয় এবং পূর্বমেঘের রামগিরি হইতে উজ্জয়িনী হইয়া অলকা অভিমুখে যাওয়া খুবই সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে কালিদাস পূর্বমেঘকে বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই তাহার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন। এই তথ্য কি কাব্যরসের সম্যক্ উপলব্ধির সহায়তা করে না?"

ড. সেনের সহিত আমরাও এক বাক্যে স্বীকার করি যে, এই নূতন তথ্যের জ্ঞান কালিদাসের কবি-প্রতিভার বাস্তবমুখীনতা উপলব্ধি করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, কিন্তু 'মেঘদূতে' মেঘের গতিপথ যদি নিতান্ত কাল্পনিকই হইত, তবে কাব্যরস-সম্ভোগের দিক্ দিয়া কিছুমাত্র হানি হইত কি? 'মেঘদূত' এমনই এক কাব্য যাহার সম্পূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে বাস্তব সত্যাসত্যত্ববিচার নিতান্তই বহিরঙ্গ ব্যাপার; উহা আপনার অন্তর্নিহিত কাব্যসত্যের উজ্জ্বল প্রভায় চিরভাস্বর। তবে ড. সেন কর্তৃক উদ্ঘাটিত তথ্য বহিরঙ্গ বিচারের পক্ষে সত্যই উপযোগী ও মূল্যবান্, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। তিনি 'মেঘদূতে'র 'পূর্বমেঘে'র ১৪শ শ্লোকের যে অভিনব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখযোগ্য। শ্লোকটি সুপ্রসিদ্ধ—

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥

ড. সেনের মতে "মল্লিনাথ আবহতত্ত্ববিদ্ ছিলেন না এবং এইজন্য এস্থলে মহাকবির আবহসম্বন্ধে ইঙ্গিত ধরিতে পারা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং তিনি হস্তীশুণ্ডের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমার মনে হয় হস্তীশুণ্ড দ্বারা মহাকবি জলস্তম্ভ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। জলস্তম্ভ যে আমাদের দেশে হাতীশুঁড় নামে পরিচিত ইহা আমরা সকলেই জানি। যাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ আছে তাঁহারা জলস্তম্ভের ছবি হইতে বুঝিতে পারিবেন।

"সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মেঘের উত্তরাস্তে অলকার পথে গমনের সময় মাঝেমাঝে জলস্তম্ভের আবর্তে পড়া সম্ভব। এইজন্যই কি কালিদাস পূর্বমেঘকে সতর্ক করিয়াছিলেন?"

৪

### দার্শনিক ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা'র "শীতে ও বসন্তে" শীর্ষক কবিতায় পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

মেঘদূত লোকে যাহা
কাব্যভ্রমে বলে আহা।
আমি দেখায়েছি তাহা
দর্শকের নবসূত্র।

কিন্তু কৌতুকবশে নহে, সত্যসত্যই গম্ভীরভাবে, 'মেঘদূতের দার্শনিক ব্যাখ্যা' উপস্থাপন করিবার মত মনীষারও আমাদের দেশে অভাব হয় নাই। ১৩৪৪ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় উল্লিখিত শিরোনামায় ড. রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের সূচনায় প্রবীণ অধ্যাপক মহাশয় বলিয়াছেন—

"এই প্রবন্ধে আমরা মেঘদূত কাব্যের তাৎপর্য হইতে কালিদাসের বেদান্তশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিব।"

বেদান্তসম্মতভাবে 'মেঘদূতে'র তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভাব বা অনন্যত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান্ হইয়াই যেন কালিদাস বেদান্তমতের অনুসরণ করিয়া এই উভয়ের অভিন্নতা প্রতিপাদনে যুক্ত হইয়াছেন এবং সেই রসস্বরূপ আনন্দময় পরমাত্মাতে যদি জীবাত্মা নিজেকে ডুবাইয়া দিতে পারেন, তবেই উভয়ের চিরন্তন অন্যোন্য তাদাত্ম্য উপলব্ধ হইতে পারে—এই গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বই কবি লৌকিক ব্যবহার স্বীকার করিয়া যক্ষ ও যক্ষিণীর বিরহব্যথা ও উভয়ের মিলনবার্তার বর্ণনা দ্বারা জগতে প্রকাশ করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন— আমাদের নিকট এইরূপ ভাব প্রতিভাত হয়।"

তাঁহার এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বসমূহের সহিত মেঘদূতে বর্ণিত বিষয়ের যেভাবে সমীকরণ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে পাওয়া যাইবে—

"আমার মনে হয়— কালিদাস যক্ষিণীরূপিণী পরমাত্মার সহিত যক্ষরূপী জীবাত্মার ঐকান্তিক চিরমিলনের সম্ভাবনা বর্ণনা করিতে যাইয়া, সঙ্গেসঙ্গে মেঘরূপী জ্ঞানের পথও নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মেঘ যেমন যক্ষ ও যক্ষপত্নীর মিলনবার্তা বহনে পরম সহায়, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন-মিলন সংঘটনে জ্ঞানও তেমন পরম সহায়। বেদান্তশাস্ত্রোক্ত 'উত্তরপথ' জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পথ। সেই পথ দিয়া মোক্ষ-বিদ্যাধিকারী জীবের জ্ঞানরূপ সহচর বন্ধু বিচরণ করে এবং সেই পথ দিয়াই তাঁহাকে লইয়া যাইয়া, সে অবশেষে হর্ষশোকের অতীত পরমাত্মার সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। ইহা স্মরণ রাখিয়া কালিদাস সম্ভবতঃ মেঘকে দূত করিয়া পার্থিব যক্ষ ও যক্ষিণীর বিয়োগ ও সংযোগের বার্তা বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দময় ও রসময়, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যেন ব্রহ্মলোক-সদৃশ অলকাপুরীর ও ব্রহ্মস্বরূপিণী অলকানিবাসিনী যক্ষবধূর বর্ণনায় এতটা রসময়ী রচনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, কালিদাস বেদান্তশাস্ত্রে নিহিত আত্মবিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে এই ললিতকাব্য রচনা করিয়া থাকিবেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে উত্তরপথে প্রয়াণ দ্বারাই জীবের পক্ষে ব্রহ্মরসের আস্বাদ সম্ভাব্য হয়। তাই বুঝি, যক্ষকে জীবাত্মা, যক্ষপত্নীকে পরমাত্মা ও মেঘের উত্তরদিগ্‌গামী পথকে জ্ঞানের উত্তর-পথরূপে কল্পনা করিয়া কালিদাস নিজেই ব্রহ্মমীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি এত বড় বৈদান্তিক।"

বলিতে হয়, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, কালিদাসের 'মেঘদূত' রচনার মূল অভিপ্রায়ই ব্যর্থ হইয়াছে— সংস্কৃত সাহিত্যরসিক পাঠককুল যে মেঘদূত হইতে বেদান্তের তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করিতে উন্মুখ

হয় না, এই নিতান্ত মোটা কথাটা সহৃদয় পাঠকের এতই অনুভবসিদ্ধ যে, তাহা আর স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিবার কোনো প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। তথাপি ব্যাখ্যাটি অভিনব—সুতরাং প্রাসঙ্গিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

৫

মেঘদূতের রসিক-ব্যাখ্যা

বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ন্যায় কালিদাস-কাব্য-রসিক মনীষী বিরল। তিনি কালিদাসের কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তত আর কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া জানি না। কিন্তু তাঁহার রচনার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, কোথাও তাঁহার সমালোচনা পাণ্ডিত্যভারাক্রান্ত নয়। বরং সংস্কৃতসাহিত্যে ঐরূপ একজন দিগ্গজ পণ্ডিতের লেখনী হইতে ঐ প্রকার লঘু অথচ সরস রচনা কিরূপে বাহির হইল, তাহা আমাদের কাছে পরমবিস্ময়স্থল বলিয়া মনে হয়।

শাস্ত্রিমহাশয় একাধিক প্রবন্ধে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য ও কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন,[৬] কিন্তু সবগুলিতেই এমনই একটি প্রসন্ন পরিহাসরসিকতা বিরাজিত আছে যে, অনেক সময় পাঠকের বুঝিবার অবসরই হয় না যে, সেই আপাতচটুলতার অন্তরালে কতখানি মননশীলতা ও বিশুদ্ধ সাহিত্যসৌন্দর্যবোধ প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'মেঘদূত' নামক পুস্তিকার বিজ্ঞাপনে শাস্ত্রিমহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, কালিদাসের কাব্যব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রিমহাশয় কি অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন—

"হিমালয়ের যেমন পাঁচটি চূড়া— গৌরীশঙ্কর কাঞ্চনজঙ্ঘা ধবলাগিরি মুক্তিনাথ ও গোসাইথান, সংস্কৃত সাহিত্যেও তেমনি রঘুবংশ উত্তরচরিত শকুন্তলা মেঘদূত ও কুমারসম্ভব অতি উচ্চ, অতি গম্ভীর, অতি শোভাময়, অতি পরিষ্কার ও অতি রমণীয়।

"পাঁচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশই সংস্কৃত বুঝাইবার জন্য। ভাব বুঝানো কোনো কোনো ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হইলেও সৌন্দর্য বুঝানো কোনো ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ কাব্যগুলি সৌন্দর্যের খনি, ছোটখাট খনি নয়, একেবারে জোহানেসবর্গ। এই সৌন্দর্যের কিছু কিছু বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করি, অনেকদিন ধরিয়া ইচ্ছা ছিল। এজন্য ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হইতেছিলাম। প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি; ক্রমেই ইহাদের সৌন্দর্য ফুটিয়াছে। দৃষ্টির মণ্ডল যতই বাড়িতেছে, সৌন্দর্যের চমৎকারিতাও ততই বাড়িয়া যাইতেছে। তাই মনে করিয়াছিলাম, সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা কিছু লিখিয়া রাখা আবশ্যক, সেই জন্যই সকলের ছোট যে মেঘদূত, তাহারই ব্যাখ্যায় প্রথম প্রবৃত্ত হই। প্রবৃত্ত হইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্বাপেক্ষা কঠিন কাব্য, উহাতে প্রাচীন ভূগোল ও প্রত্নতত্ত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একরূপ মীমাংসা করিয়া লইলাম। লেখা শেষ হইল। ছাপানোর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছামত লিখিলাম।"[৭]

কিন্তু একটি বিষয়ে শাস্ত্রিমহাশয়ের খটকা লাগিল, তাহা রুচির প্রশ্ন লইয়া। শাস্ত্রিমহাশয়ের নিজের কথাতেই ঐ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য উল্লেখ করি—

"কিন্তু এক কথায় বড় ঠেকিয়া গেলাম। সৌন্দর্যের মুখে রুচির উপর বড় একটা ঝোঁক থাকে না।

রুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলায়, সৌন্দর্য বদলায় না। এখন যাহা কুরুচি, কালিদাসের সময়ে তাহা কুরুচি ছিল না। আমি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি, আমাকে কালিদাসের বশেই যাইতে হইল। অনেক জিনিস এখনকার রুচিসংগত হইবে না, বেশ বোধ হইল· ·।"

এক্ষণে 'মেঘদূত' পুস্তিকা হইতে দুই-একটি স্থল উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি— তাহা হইতে কি দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া শাস্ত্রিমহাশয় 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন মিলিবে। 'মেঘদূতে'র প্রথম শ্লোকেই কালিদাস কুবের শাপে অস্তংগমিতমহিমা নির্বাসিত যক্ষের যে অবতারণা করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যা শোনা যাউক—

"কুবেরের সরকারে সে একটি চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিয়া বোধ হয় না; কেননা, কাজে অবহেলা করে বলিয়া কুবের তাহাকে শাস্তি দিয়াছেন। সল্‌স্‌বরি, চেম্বারলেন হইলে পারিতেন কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ, কুবেরের দৃষ্টি তাহার উপর ছিল; এবং কুবের কিছু রেগেই শাস্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয়, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ রাইজিং ও প্রমিসিং অফিসর ছিলেন। কিন্তু কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটি বড় কাজে অবহেলা করিত। কেন করিত, কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি। পয়সা-কড়ি যেমন হোক কিছু ছিল; বয়স তো যক্ষদের যৌবন ছাড়া ছিলই না। তাহার উপর এ বেচারার বয়স কম; বৌটিও সুন্দরী; বেচারা তাহাকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মনে করিত, বুঝি পদ্ম-শঙ্খেরও উপর কোনো অমূল্য নিধি পাইয়াছি। একটু আসিতে দেরী হইত; কাজে ভুল হইত; প্রথম প্রথম হয়তো কুবের টুকিয়াছিলেন; তারপর ধমকও দিয়াছিলেন; তাহার পর যখন দেখিলেন রোগ অসাধ্য, তখন তাহার প্রতীকার আবশ্যক হইল। অপরাধ তো সাব্যস্তই আছে। কি শাস্তি দেওয়া যায়? যক্ষ-পিনাল-কোডে হুইপিং নাই, কারাবাস নাই, ফাইন নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিলেন। বিরহ, এক বৎসর। উত্থান-একাদশীর পরদিন যক্ষ বেচারা কাঁদিতে কাঁদিতে অলকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া এক বৎসরের জন্য বাহির হইল। কুবের দেখিলেন এ ছোঁড়া যেরকম পাগ্‌লা, লুকিয়ে চুরিয়ে আসিতে পারে। তাই বাহির হইবার সময় তাহার যত মহিমা ছিল, সব কাড়িয়া লইলেন। সে যে তার দেবযোনির ন্যায় অণু হইয়া লঘু হইয়া, চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আবার তাহার স্ত্রীর কাছে আসিবে বা তাহার সঙ্গে দেখাশুনা করিবে, কুবের সে পথ মারিয়া দিলেন। এখন সে বেচারা যায় কোথায়? ভারতবর্ষের যাবতীয় স্থান বিবেচনা করিয়া দেখা হইল। বড় লোকালয়ে পাঠাইলে যক্ষ পাছে বেণেদের সঙ্গে জুটিয়া ব্যবসায় ফাঁদিয়া বসে। কাশী কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে যক্ষ পাছে ধর্মে কর্মে মন দেয়। তাই দুষ্ট বুড়া কুবের মিচকি মিচকি হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, সে রামগিরিতে থাকিবে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে কয়েক বৎসর রামগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তথায় তাঁহার একটি আশ্রমের কুটীর ভাঙিলে তিনি আর-এক আশ্রমে কুটীর নির্মাণ করিতেন। যেখানে জল পাইতেন, সেইখানেই জলক্রীড়া করিতেন; সীতা সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। কুবের বলিয়া দিলেন, তুমি রামায়ণ পড়িয়াছ, তুমি রামগিরিতে থাক গিয়া। মনে মনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন— খুব হয়েছে, এক বৎসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হইবে। বিরহের সময়ে রামসীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহ-বেদনাটা খুব তীব্র করিয়া দিবে।"*

'পূর্বমেঘে'র ১৯শ শ্লোকে যেখানে বিন্ধ্যপাদপ্রবাহিণী রেবার বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন—

রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য।

তাহার ব্যাখ্যায় শাস্ত্রিমহাশয় বলিতেছেন—

"· ·শীঘ্র শীঘ্র খানিক দূর গিয়া দেখিবে নর্মদা নদী। মনের উৎকট আবেগে রোগা হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।[১০] কি উৎকট অবস্থা! বিন্ধ্যের পাগুলা কি যেমন তেমন পা, পাহাড়ে, পাথরে, ডেলায়, ডুমরিতে এবড়ো খেবড়ো। যেন কোনো গোদা মিন্সের পায়ে ধরিয়া নর্মদা আলুথালুভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। নিম্নে স্বচ্ছসলিলা বিস্তীর্ণা নর্মদা, উপরে কূর্মপৃষ্ঠবৎ অবস্থিত বনরাজি-বিরাজিত বিন্ধ্যপর্বত। মাঝে মাঝে সাদা ঝরনা পর্বতপৃষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া নর্মদায় পড়িতেছে, উপর হইতে বোধ হইতেছে, যেন একটা হাতীর শিঙার হইয়াছে। বড় বড় সাদা সাদা লাল লাল কালো কালো ডোরা-দেওয়া হাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই এ উপমার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।"[১১]

দশার্ণের রাজধানী বিদিশার উপকণ্ঠে 'নীচৈঃ' নামে একটি পাহাড়— যক্ষ মেঘকে বিশ্রামের জন্য সেই পাহাড়ে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করিতে অনুরোধ করিয়া বলিতেছে—

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রান্তিহেতোঃ —

এই শ্লোকের শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যা উদ্ধার করিব কি ?—

"সেখানে গিয়া তুমি নীচৈ নামে সহরতলীর পাহাড়ে বাসা লইয়ো। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর পুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে, তাহার পুলক কদম্ব ফুলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পাহাড়টি কূর্মপৃষ্ঠ, ৩০০।৪০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে। উহা বৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ স্তূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে মণ্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাথর দিয়া গাঁথা এক-একটা খালি ঘর নির্জনে পড়িয়া থাকিত। এরূপ নগরের বাহিরে নির্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাইবে। ও ঘরে কি হয় ?— এমন কিছু নয়— একটা ঢেটরা হয়। কিসের ঢেটরা— এই কথা যে নগরবাসীদের যৌবন-দড়ি ছেঁড়ে— স্মৃতির লাগামে, ধর্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাঁধা থাকে না। মিথ্যা কথা; নির্জন ঘর ঢেটরা দিতেছে— সৎপ্রতিপক্ষ বাক্য— ( contradiction in terms ) দূর মূর্খ, দেখিতেছিস্ না— নাক কি নাই ? ও কিসের গন্ধ ? ও যে পরিমল— চটকান ফুলের গন্ধ ; ঐ ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতেছে— বুঝিতেছিস্ না কে ঐ ফুল চটকাইল— কখন্ চটকাইল, কেমন করিয়া চটকাইল— যদি না বুঝিয়া থাকিস্, যা— তোর মেঘদূত পড়িতে হইবে না।"[১২]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি হইতে শাস্ত্রিমহাশয়ের 'মেঘদূত' ব্যাখ্যার শৈলীর কিছু নিদর্শন মিলিবে। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়, সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গিয়া তিনি শিক্ষিত সমাজের শালীনতাবোধকে বেশ কিছুটা উপেক্ষা করিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছেন ; কেননা, মেঘদূতের কবিকল্পনার চমৎকারিত্ব বুঝিতে হইলে ঐ প্রকার নগ্নবিশ্লেষণ ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবপর নয়। তবে কালিদাসের পক্ষে একটু সুবিধা ছিল এই যে, তিনি দেবভাষার মাধ্যমে শিল্পকর্মকে রূপ দিয়াছেন এবং দেবভাষার এমনই এক অলৌকিক শক্তি আছে, যাহাতে আপাত অশ্লীল ভাবরাজিও অপূর্ব সুষমা ও লালিত্যে মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয়কে অসাধ্যসাধন করিতে হইয়াছে, সেই অপরূপ শিল্পকর্মকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার

সৌন্দর্য সাধারণের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে হইয়াছে বঙ্গভাষার মাধ্যমে। শাস্ত্রিমহাশয় যে বলিয়াছিলেন—

"সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা নূতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িয়া, অলংকার ছাড়িয়া, শুদ্ধ সৌন্দর্য বুঝাইতে গিয়া ভূগোল ইতিহাস পুরাতত্ত্ব স্বভাব নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নূতন।" এত নূতন করিতে গিয়া যদি ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে পাঠকবর্গ মার্জনা করিবেন। প্রথম পথিকের ভুল-ভ্রান্তি অনিবার্য।"[১৩]

তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সৌন্দর্যের এই নবীন ব্যাখ্যান-শৈলী প্রবর্তন করিতে গিয়া তিনি যে সভ্য বিদগ্ধ সমাজের প্রচলিত শালীনতাবোধের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতে স্বীকৃত হন নাই, সেজন্য তাৎকালিক বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছিল—শাস্ত্রিমহাশয়ের সাহিত্যজীবনে তাহা এক বেদনাকর অধ্যায়।[১৪]

শাস্ত্রিমহাশয়কৃত মেঘদূতের সৌন্দর্য-ব্যাখ্যার মূল ভিত্তি বুদ্ধিকৃত বিশ্লেষণ। শাস্ত্রিমহাশয়ের রসানুভূতিক্ষমত পুরামাত্রায় থাকা সত্ত্বেও, বিশ্লেষণ-প্রতিভাই ছিল তাঁহার মনীষার প্রধান লক্ষণ। সেই অক্লান্ত গবেষণালব্ধ বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাঁহাকে যতদূর লইয়া গিয়াছে, তিনি ততদূর গিয়াছেন। শ্লীলতা-অশ্লীলতার সংকীর্ণ গণ্ডী তাঁহার বিশ্লেষণী বুদ্ধির গতিপথকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। বুদ্ধির সহিত সাহিত্যিক কল্পনার মিশ্রণ ঘটিলেও, শাস্ত্রিমহাশয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধিই ছিল নিয়ন্ত্রী শক্তি। তাই তাঁহার রচনা রসঘন হইলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর।

উদ্ধৃত সন্দর্ভাংশগুলিতে মনীষার সহিত রসদৃষ্টির যে সমন্বয় হইয়াছে, শাস্ত্রিমহাশয়ের কালিদাস কাব্যসমালোচনার অধিকাংশ স্থলেই তাহা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কালিদাসের কবিকল্পনার মূল প্রেরণাকে বুঝিবার ও সর্বজনবোধ্যভাবে তাহাকে সাধারণ পাঠকসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার এইরূপ ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রয়াস দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজীবন কালিদাসের কাব্যের অনুশীলন করিয়াও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮২ খৃঃ 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় শাস্ত্রিমহাশয় 'মেঘদূতে'র যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে, তাহাই তাঁহার নিজের কাছে অপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে; তাই দ্বিতীয় বার 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার উপক্রমে তিনি বলিয়াছেন—

"অদ্য মেঘদূতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম।[১৫] পড়িয়া দেখিলাম, মনোমত হইল না—ফিকে লাগিল। তখন পূর্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ-লেখকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম। এখন সেরূপ করিতে ভরসা হয় না। করিলে মনে হয়, কালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্বমেঘ মেঘদূতের অর্ধেক, তাই যদি ছাড়িয়াছিলাম তবে ব্যাখ্যা করিয়াছি কি ছাই? উত্তরমেঘেও অনেক স্থান ভাসা ভাসা ছিল, অনেক স্থানের সৌন্দর্য-বোধই হয় নাই। তাই আবার একবার নূতন করিয়া ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব।"[১৬]

'মেঘদূতে'র সৌন্দর্যে, 'মেঘদূতে'র রসসংবেদনে শাস্ত্রিমহাশয় যেন বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন! অলংকার-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে 'মেঘদূত' 'খণ্ডকাব্য' রূপে পরিচিত। কিন্তু শাস্ত্রিমহাশয় ইহার উত্তরে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিয়াই এ প্রসঙ্গ সমাপন করিব—

"মেঘদূতকে অলংকার-শাস্ত্রে খণ্ডকাব্য বলে ; ইংরেজরা লিরিক বলেন। কোন্‌টি সত্য ? খণ্ডকাব্য—অর্থ যতদূর বুঝা যায়—টুকরা কাব্য বলিয়াই বোধ হয়, টুকরা কাব্য বলিয়া মেঘদূতের উল্লেখ করিলে জিনিসটার অবমান করা হয়। মেঘদূত টুকরা নহে— পুরা, সর্বাঙ্গে সুশোভিত, সম্পূর্ণ, এবং অপ্রমেয়। সুতরাং মেঘদূত টুকরা নহে। ছোটকাব্য বলিতে চাও বল। দৈর্ঘ্যে ছোট, কিন্তু ফলে ছোট নয়। কিন্তু খণ্ড বলিতে তো ছোট বুঝায় না।· ·তবে যদি কেহ বলে, খণ্ড শব্দের অর্থ খাঁড় গুড়,—তখনকার প্রধান মিষ্ট সামগ্রী। আমাদের রাতাবী মনোহরা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে কতক রাজী আছি। সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৈষধকার খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য রচনা করেন। আমরা এখন যেমন বলি অমিয়-নিমাই-চরিত। তেমনি সেকালে খণ্ডকাব্য অর্থে মধুময় অমৃতময় কাব্য। টুকরা ফুকরা বলিলে জমে না।"[১১]

৬

মেঘদূত ও রবীন্দ্রনাথ

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পরেই 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যাতারূপে যাঁহার নাম স্বতই মনে উদিত হয় তিনি রবীন্দ্রনাথ। শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যার সহিত রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যার প্রকৃতিগত ভেদ আছে। এই ভেদের মূল নিহিত আছে তাঁহাদের উভয়ের মানসিক সংগঠনের মধ্যেই। একজনের মনীষা বুদ্ধিপ্রধান, আর-একজনের মনীষা কল্পনাপ্রধান। একজন রসবিদ্‌ পণ্ডিত, আর-একজন মার্মিক কবি। ফলে ব্যাখ্যানভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রিমহাশয় তাঁহার প্রখর ধীশক্তির সাহায্যে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন—তাঁহার রীতি analytic বা বিশ্লেষণপ্রধান ; অতএব শাস্ত্রিমহাশয়ের প্রদর্শিত মেঘদূতের সৌন্দর্য বুদ্ধিগ্রাহ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রীতি synthetic—তিনি তাঁহার অলৌকিক কল্পনাপ্রভাবে মেঘদূতের বাহ্যসৌন্দর্য উত্তীর্ণ হইয়া উহার গহন অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই অলৌকিক অখণ্ড শিল্পকর্মের নিগূঢ় মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন ; শাস্ত্রিমহাশয়ের ব্যাখ্যায় আমরা যেন 'মেঘদূতে'র অপরূপ শিল্পশরীরের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পাই ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছে 'মেঘদূতে'র সৌন্দর্য অতীন্দ্রিয় অনুভববেদ্য, বিশ্লেষণী বুদ্ধি সেখানে পরাস্ত। এই উভয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি অপরটির পরিপূরক—উভয়ের সমন্বয়েই 'মেঘদূতে'র সামগ্রিক আস্বাদন সম্ভবপর। তথাপি রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা যে গভীরতর ও অন্তরঙ্গতর তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—এবং সেই কারণেই সেই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সাজাত্য অনুভব করিবার মত মানসিক পটভূমি যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের নিকট তাহা কতকাংশে mystic বা হেঁয়ালি বলিয়াও মনে হইতে পারে। 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দের গম্ভীরমন্থর ধ্বনি যেন কোনো দূরশ্রুত বেদনাবিধুর সংগীতের মূর্ছনার মত কবিমানসে চিরপ্রসুপ্ত জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রতিবোধ সাধন করিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূতে'র ব্যাখ্যা পাঠ করিলে বারংবার আমাদের ইহাই মনে হয়। 'মেঘদূত' কিভাবে কবিমানসকে উদ্বেলিত করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আমরা পাই তাঁহার 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মেঘদূত' শীর্ষক কবিতায়। কালিদাসের 'মেঘদূতে'র ইহা যেন সংক্ষেপিত সংস্করণ। মূলের সেই আস্বাদ, মন্দাক্রান্তার সেই ধীরমন্থর পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কি অপূর্ব কৌশলেই না অমিত্রাক্ষরের বন্ধনে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছেন! ইহারই সমকালিক একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘদূত' সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব

একটু বিস্তৃতভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৯০ সালে লেখা—শান্তিনিকেতন হইতে (?) প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট।[১৮] ইহা যেন 'মেঘদূত' কবিতারই কবিকৃত ভাষ্য বলিয়া বোধ হয়—পাঠকগণের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্তির জন্য উহার কিয়দংশ, দীর্ঘ হইলেও, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে, ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগে, রুদ্ধদ্বার গৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপরে ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে—কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে—অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি না—এই জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী পর্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্তে কর্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়—সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে—সেইখানে চরম বিশ্রাম—সেই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাকলে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই—রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতা সুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে রীতিমত Oriental রাজমাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্চে। যক্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হয়ত ঠিক "ড্রামাটিক" হয় না—একটা দক্ষিণে ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্ করে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধহয় তার পক্ষে ঠিক হত কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বদ্ধ হয়ে আছি—মনটা উদাস হয়ে আছে। আমাদের একবার মেঘের মত মহাস্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগত! আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর কাজকর্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে। কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না—তবুও আমি বদ্ধ হয়ে আছি ছুটি পাচ্ছিনে! আজ এই কর্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘদিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়—আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই—সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্তব্য আজকের এই মহা-দুর্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে—আজ তেমন সুযোগ থাক্‌লে কে ধরে রাখ্‌তে পারত? যে সকল নদী গিরি নগরীর সুন্দর বহু প্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায় মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আস্‌তুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুন্‌লেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য আছে। রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্বিন্ধ্যা;—চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপর নববর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জে ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে—দশার্ণ গ্রামের চতুর্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে—সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুল্‌তে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থ ঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে—রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল তাহলে এসব দেশ না দেখে

কি যাওয়া যায় ? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত—যক্ষ যদি উনবিংশ শতাব্দীর হয় তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিকসম্প্রদায় থাকৃত তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত—তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্, প্যাষ্টোরাল প্রভৃতি ক্রিটিকদের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্ আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে—ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলচি, dramatic হয়নি, কিন্তু আমার বেশ লাগচে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে—যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশ-দেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল—এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের Terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী ষ্টেশনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল, সে সময়কার নানা বিরহকে নানা দেশ বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল—এজন্য হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয়নি—কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বলতে পারি এতে খুসি আছি।···অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহী মণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্ণে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে হবে—আজকের সমস্ত সংসার দুর্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে !"[১৯]

কবির দিক দিয়া বিচার করিলে কাব্যনির্মাণের মূল উৎস যদি নবনবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা হয়, যে প্রজ্ঞার সহিত কবিচিত্তের উচ্ছলিত রসাবেশ তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সহৃদয়ের দিক দিয়া বিচার করিলেও কাব্যপাঠের চরম লক্ষ্য হইল অনুরূপ প্রজ্ঞার বলে কবিবর্ণিত অর্থের সহিত পরিপূর্ণ তন্ময়ীভাব প্রাপ্তি। সৃষ্টিক্ষণে কবি যে রসাবেশে বিবশ হইয়াছিলেন, আস্বাদক্ষণেও সেই রসাবেশেরই সহৃদয়চিত্তে আবির্ভাব যখন সম্ভব হয়, তখনই কাব্যানুশীলন হয় সার্থক। যে সমালোচনার মধ্য দিয়া কাব্যসৃষ্টির সেই মূলীভূত প্রেরণার সহিত তন্ময়ীভবনযোগ্যতা পাঠকচিত্তে সংক্রামিত হইয়া থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ সমালোচনা বলিয়া স্বীকৃত হইবার দাবি রাখে। কাব্যের মূল বীজ যেমন কবির সৃষ্টিধর্মী কল্পনাশক্তির মধ্যেই নিহিত আছে, সেইরূপ কাব্যের সফলতাও পাঠকচিত্তে অনুরূপ সুপ্ত কল্পনাশক্তির উদ্বোধনেই, তাহার ধীশক্তি বা নীতি-বোধের উন্মেষসাধনে নয়।[২০] শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তাই সর্বক্ষেত্রে কবির কাব্যনির্মাণের মূলীভূত শক্তির সহিত পাঠকচিত্তের তন্ময়ীভাবসাধনে প্রধান সহায়ক। কাব্যের বহিরঙ্গ কারুবৈচিত্র্য বা নৈতিক বা দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের বিশ্লেষণ তাহার লক্ষ্য হইতে পারে না। এ বিষয়ে আধুনিককালের একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি-সমালোচকের অভিমত প্রাসঙ্গিকবোধে উদ্ধার করিলাম—

"There can be only two valuable kinds of criticism. The first aims simply to erect signposts for the reader, to help him over difficult places, and to make him feel that the journey is worth undertaking. The second, creative criticism, is rare as any other form of creative writing. Where the

critic has studied an author, lived with him in the spirit over a long space of time, become saturated with him, an affinity may grow up between them, so that some of the original power of the master is transmitted to the disciple."[২১]

রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত-সমালোচনা পড়িয়া মনে হয় যেন তিনি সত্যই কালিদাসের যুগ ও পরিবেশের মধ্যে কল্পনাবলে নিজেকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন, যথার্থই "lived with him in the spirit over a long space of time, become saturated with him." হৃদয়ের যে রসোচ্ছল মুহূর্তে কলিদাস তাঁহার অমরকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই মুহূর্তটিকে যেন পরিপূর্ণরূপে আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহার বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, কবিহৃদয়ের কোন্ বিহ্বলতা 'মেঘদূতে'র গম্ভীর মন্দাক্রান্তার প্রতিটি ছত্রে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কোনো তত্ত্বোপদেশ, বা প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সন্নিবেশের কবিত্বপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার কোনো তাগিদেই তিনি এই খণ্ডবাক্যটি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; নববর্ষার বিরহের যে অব্যক্ত বেদনা যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রেমিকহৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়া থাকে, সেই চিরপুরাতন অথচ চিরনবীন বিরহের অন্তর্নিরুদ্ধ ব্যাকুলতাই এই অপূর্ব কাব্যখণ্ডে শাশ্বত বাণীরূপ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। তাই যখনই নববর্ষার নিবিড় মেঘাড়ম্বরের মধ্যে প্রিয়জনপরিবৃত হইয়াও আপনাকে একাকী নির্বাসিত বলিয়া মনে হয়, তখন মনের সেই অনির্দেশ্য ভাবটিকে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইলে রসিকজন আজও 'মেঘদূতে'র মেঘমন্দ্র শ্লোক আবৃত্তি করিয়াই যেন চরম সফলতা লাভ করে, তাহার হৃদয়ের অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা যেন সেই আবৃত্তির মাধ্যমেই পরিপূর্ণ প্রকাশলাভ করিয়া প্রশান্ত পরিণতির মধ্যে লীন হয়।[২২] সমালোচকসম্প্রদায় যখন মেঘের গতিপথ ঠিক বিজ্ঞানসম্মতরূপে নির্দিষ্ট হইল কিনা, বিরহী যক্ষের পক্ষে মেঘকে দূতরূপে প্রেরণ করিবার কল্পনা যুক্তিসংগত হইল কিনা— ইত্যাদি নানাবিধ গুরুগম্ভীর বিষয়ের সমাধান লইয়া ব্যস্ত থাকেন তখন কালিদাসের লোকান্তরিত আত্মা বোধ হয় কৌতুক বোধ করেন। যক্ষ মিথ্যা হউক,[২৩] মেঘের গতিপথ আদৌ আবহতত্ত্বসম্মত না হউক,[২৪] বিদিশা, বেত্রবতী, নির্বিন্ধ্যা, দশার্ণ, মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতি, দেবগিরিশিখরে বাসবীচমূর অধিনায়ক স্কন্দের নিকেতন, কুবেরের রাজধানী অলকা ও যক্ষের বাসভবন— সবই মিথ্যা হউক, কাল্পনিক হউক, ক্ষতি কি? মহাকবি কি তাহা জানিতেন না? কিন্তু এইসকল অবাস্তব কল্পনারাজির ভিতর দিয়া যে শাশ্বত সত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে কোনো হৃদয়বান্ পাঠকই কি অস্বীকার করিতে পারেন? তাই রবীন্দ্রনাথ যেমন তাজমহলকে শুধু শাজাহানের ব্যক্তিগত প্রেমের প্রকাশরূপে না দেখিয়া চিরন্তন দাম্পত্যপ্রেমেরই মর্মরপ্রকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন, মেঘদূতকেও তেমনি কোনো বিশিষ্ট কাল বা দেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধরূপে না দেখিয়া তিনি উহাকে প্রেমিকহৃদয়ের চিরন্তন বিরহবেদনার শাশ্বত বাঙ্ময় প্রকাশ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। তাই তাজমহলকে উদ্দেশ করিয়া রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন—

রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে

যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।[২৫]

যক্ষকে উদ্দেশ করিয়াও অনুরূপভাবেই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছেন—

হে যক্ষ, তোমার প্রেম ছিল বদ্ধ কোরকের মতো,
একান্তে প্রেয়সী তব সঙ্গে যবে ছিল অনিয়ত
সংকীর্ণ ঘরের কোণে,· ·
অপরূপ রূপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
তোমার প্রেমের সৃষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বজনে।[২৬]

সত্যই, 'মেঘদূতে' যক্ষের বিরহবেদনা যেন ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়া প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে ; কোনো এক অজ্ঞাতনামা সংস্কৃত কবি যে বলিয়াছেন—

সঙ্গমবিরহকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥

বিরহের সেই বিশ্বব্যাপী সার্বভৌম রূপই যেন মেঘদূতের প্রতিটি ছত্রে দেদীপ্যমান। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শুধু নায়কনায়িকার বিরহই 'মেঘদূতে' চিত্রিত হইয়াছে তাহা নহে, যখনই কোনো প্রিয়বস্তুর অদর্শনে আমরা বিমনায়মান হই, তখন সেই প্রিয় বস্তুকে পাইবার জন্য, তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমাদের হৃদয়ের যে গভীর আকুতি, তাহাই যেন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তা ছন্দে।[২৭] শুধু দৈহিক মিলনের আকাঙ্ক্ষাই নয়, দৈহিক সম্ভোগের স্পর্শশূন্য যে আধ্যাত্মিক সমাগমোৎকণ্ঠা সর্বজাতীয় বিচ্ছেদবেদনার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে, তাহারই বাণীরূপ 'মেঘদূত' কাব্য। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

"মনে পড়িতেছে, কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এককালে আমরা এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই সমুদ্রবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্তমান হইতে যখন কাব্যবর্ণিত সেই অতীত ভূখণ্ডের তটের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন মনে হয়, সেই সিপ্রাতীরের যূথীবনে যে পুষ্পলাবী রমণীরা ফুল তুলিত, অবন্তীর নগরচত্বরে যে বৃদ্ধগণ উদয়নের গল্প বলিত, এবং আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখিয়া যে পথিকপ্রবাসীরা নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান। কবির কল্যাণে এখন সেই অতীতকাল অমর সৌন্দর্যের অলকাপুরীতে পরিণত হইয়াছে ; আমরা আমাদের বিরহবিচ্ছিন্ন এই বর্তমান মর্তলোক হইতে সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিয়াছি।"[২৮]

তখন ভাবুক চিত্ত সায় না দিয়া পারে না। তখন মনে হয়, কবি যেন ধ্যানবলে মেঘদূতের মর্মটির সন্ধান পাইয়াছেন— যক্ষ, যক্ষপত্নী, মেঘ, মেঘের গতিপথ, অলকা, যক্ষের বাসভবন— এ'সবই যেন

কল্পনার ইন্দ্রজাল ; 'মেঘদূত' শুধু কবিহৃদয়ের চিরন্তন romantic nostalgia'র অনবদ্য কাব্যরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন "মেঘদূত বন্দীহৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ।"

৭

উপসংহার

আমাদের বক্তব্য আর দীর্ঘ করিতে চাহি না। 'মেঘদূত' কাব্য যে চিরকাল সহৃদয় চিত্তকে আনন্দিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা উহার কোনো তত্ত্বকথার জন্য নহে। তাহা উহার অপরূপ শিল্প সৌন্দর্যের জন্য, উহার মর্মবাণীর সার্বকালিক ও সর্বজনীন আবেদনের জন্য। আজও তাই সংস্কৃত সাহিত্যরসিক সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়পটে 'মেঘদূতে'র প্রতিটি শ্লোক অনপনেয় অক্ষরে মুদ্রিত। তথাপি উৎকৃষ্ট কাব্য বিভিন্ন পাঠকের চিত্তে রুচির তারতম্য ও প্রকৃতিগত প্রভেদবশতঃ বিভিন্ন জাতীয় ভাব ও চিন্তার উদ্রেক করিয়া থাকে— শুধু সাহিত্যিক সৌন্দর্য আস্বাদন করিয়াই যেন আমাদের মন পরিতৃপ্ত হইতে চাহে না। 'মেঘদূত'ও ও তুল্যরূপে বিভিন্ন সহৃদয়চিত্তে কত বিভিন্ন প্রকারের আবেদন লইয়া উপস্থিত হইয়াছে— তাহারই কয়েকটি নিদর্শন কৌতূহলবশে সংকলন করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপন করিলাম। তাঁহারা স্ব স্ব রুচি অনুসারে কোন্‌টি গ্রহণীয় তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কাব্যের তাৎপর্য' শীর্ষক প্রবন্ধে সিদ্ধান্তস্বরূপ যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে প্রাসঙ্গিকবোধে কিয়দংশ উদ্ধার করিয়া আমাদের বর্তমান আলোচনা সমাপন করিতে চাহি—

"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয় ; তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ-বা সৌন্দর্য, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। অনেকেই বলেন, আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু, তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোনও কাব্যের মধ্যে যদি বা কোনো বিশেষ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহ সহকারে কেবল ঐ শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফল হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম ফুল হইতে কেহ-বা তাহার রঙ বাহির করে, কেহ-বা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে, কেহ-বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহ-বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ-বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন— আবার কেহ-বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না। যিনি যাহা পাইলেন, তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না— বিরোধে ফলও নাই।"[২]

---

১ তু° "যে প্রেম সম্মুখপানে· ·
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা" — ইত্যাদি।

২ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী মহাশয়কে লিখিত কবির পত্রাংশ। দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৪।

৩ A. C. Bradley: *Oxford Lectures on Poetry*, p. 26.

৪ দ্র° Dr. R. C. Hazra : *Text and Interpretation of Some Verses of the Megha-dūta,* Indian Historical Quarterly, Vol. XXV, No. 4.

৫ এই প্রসঙ্গে রাজশেখরের 'কাব্য-মীমাংসা' হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, "তত্র 'বর্ষাসু পূর্বো বায়ুঃ'- ইতি কবয়ঃ। 'পাশ্চাত্যঃ, পৌরস্ত্যস্তু প্রতিহন্তা'— ইত্যাচার্য্যাঃ। তদাহুঃ—

'পুরোবাতা হতা প্রাবৃট্ পশ্চাদ্বাতা হতা শরৎ।' — ইতি।..

'বস্তুবৃত্তিরতন্ত্রং, কবিসময়ঃ প্রমাণম্'— ইতি যাযাবরীয়ঃ।" —*Kāvyamīmāṃsā,* Chapter XVIII (GOS Edn.), p. 99. "The wind originates in the eastern horizon. The Ācāryas think that the wind originates from the West in the rainy season, and that by the eastern wind the clouds are dispersed and therefore the rains are obstructed."— ঐ. *Notes,* p. 255 (Third Edn. 1934).

৬ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত শাস্ত্রিমহাশয়ের জীবনীতে 'মেঘদূত' সম্পর্কে নিম্নলিখিত রচনাগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়— (১) মেঘদূত ব্যাখ্যা (১৩০৯ সাল। ২৫ জুন ১৯০২), পৃ. ৮৮; (২) 'মেঘদূত', ক্ষিতিনাথ ঘোষ। ভাদ্র ১৩৪১। হরপ্রসাদ লিখিত পূর্বাভাষের তারিখ— জানুয়ারি ১৯৩০। (৩) 'মেঘদূত' (সমালোচনা): বঙ্গদর্শন, ১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন। দ্র° সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৭৩।

৭ দ্র° 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ), পৃ. ১৯৭।

৮ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৯৮।

৯ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০১।

১০ তু° "এতেন কস্যাশ্চিৎ কামুক্যাঃ প্রিয়তমচরণপাতোঽপি ধ্বন্যতে।" — মল্লিনাথ।

১১ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০৬।

১২ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ২০৭।

১৩ হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী, পৃ. ১৯৮।

১৪ দ্র° ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা— ৭৩)' পৃ. ৩৯-৪০। তু°— "প্রিয়াকে পাইয়া যক্ষ কুবেরের কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন; তিনি সে দিন কিরূপে দিনযামিনী যাপন করিয়াছিলেন, তাহা লিখিলে হয়ত সুরুচিসম্পন্ন আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর বাঙ্গালা কাগজ সম্পাদক মহাশয়েরা বলিবেন এ প্রবন্ধ-লেখকের রুচি-পরিবর্তন আবশ্যক, তিনি একখানি বাঙ্গালা অনুবাদের সমালোচনা করিতে গিয়া অনর্থক অশ্লীলতার অবতারণা-করতঃ আপনার কুরুচি, কুশিক্ষা এবং কুচরিত্রের পরিচয় দিয়াছেন, সভ্য সাময়িক পত্রে উহার ছড়াছড়ি না করিলেই ভাল হইত। সুতরাং যদি কেহ যক্ষ কিরূপে সময় কাটাইয়াছিলেন জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরা বলি যে তাঁহারা যেন উত্তর মেঘের ৫, ৭ এই দুইটী কবিতা প্রণিধানপূর্বক পাঠ করেন।" —৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদের শাস্ত্রিমহাশয়কৃত সমালোচনা হইতে। দ্র° হরপ্রসাদ-রচনাবলী, প্রথম সম্ভার, পৃ. ৪৭২।

১৫ দ্র° বঙ্গদর্শন, ১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফাল্গুন।

১৬ দ্র° 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী' (বসুমতী সংস্করণ), পৃ. ১৯৯।

১৭ 'হরপ্রসাদ-গ্রন্থাবলী' পৃ. ১৯৯-২০০।

১৮ 'মানসী'র অন্তর্গত 'মেঘদূত' কবিতার রচনাকাল— "শান্তিনিকেতন। ৭।৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯০। অপরাহ্ণে। ঘনবর্ষায়।"

১৯ দ্র° চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৪৩।

২০ তু° "Lastly—and this is Shelley's central argument—as poetry itself is directly due to imaginative inspiration and not to reasoning, so its true moral effect is produced through imagination and not through doctrine . . . It strengthens imagination as exercise strengthens a limb, and so it indirectly promotes morality."—A. C. Bradley : *Shelley's View of Poetry, Oxford Lectures on Poetry,* p. 171.

২১ C. Day Lewis : *A Hope for Poetry*, p. 32.

২২ তু° "মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবৎসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কবিত্বগাথা মানবের ভাষায় বাঁধা পড়িয়াছে।" — 'নববর্ষা', সংকলন, পৃ. ২২০।

২৩ কোনও কোনও পণ্ডিত নির্বাসিত যক্ষের চরিত্রে কালিদাসেরই জীবনের একটি অজ্ঞাত ঘটনার প্রতিবিম্বন অন্বেষণ করিয়াছেন। খৃঃ ১৪শ শতকের মধ্যভাগে মালয়ালম্ ভাষায় রচিত ব্যাকরণ ও অলংকারবিষয়ক গ্রন্থ 'লীলা-তিলকে' একটি শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। সেটি নিম্নলিখিতরূপ—

সম্রে পূর্বং মহিত-নৃপতের্বিক্রমাদিত্যনাম্নঃ
পোকাং চক্রে তরুণ-জলদং কালিদাসঃ কবীন্দ্রঃ।

এ বিষয়ে পিশারোটি মহোদয়ের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য—"This verse tells us that Kālidāsa sent a cloud as a messenger to his beloved, who was the sister of the great Vikrama. It is very legitimate to hold that the reference here is to *Meghasandeśa;* and that means that the hero of the exquisite lyric was none other than the prince of Indian bards,—while the heroine was the sister of his own patron.

"The identity of the author and the hero has already been established by a Malayali commentator of the lyric in his unpublished commentary, called *Varavarṇinī,* and he quotes this verse in further support of the position he has taken."—K. R. Pisharoti : *Meghasandeśa —A Note* (*Indian Historical Quarterly,* Vol. XVII, 1946, p. 517). অপিচ—" . . I retain, however, a feeling that the poem has a touch of autobiography, and may be based upon some incident in Kālidāsa's own career, whereby he had incurred the displeasure of a royal patron. The poem would then be in one aspect an indirect conciliative. No one would say that this is not in harmony with Kālidāsa's literary cleverness, which is as markedly characteristic of him as his delicacy."—Dr. F. W. Thomas : *J.R.A.S.,* 1918, pp. 118-122.

২৪ 'মেঘদূতে' বর্ণিত মেঘের গতিপথের সহিত রামায়ণবর্ণিত সীতান্বেষণোৎসুক বানরসেনাপতিগণের উদ্দেশে সুগ্রীব কর্তৃক বর্ণিত উত্তরাভিমুখী যাত্রাপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এ' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের 'কাব্য-কৌতুক' গ্রন্থে সংকলিত 'বাল্মীকি ও কালিদাস' শীর্ষক প্রবন্ধের 'দ্বিতীয় প্রস্তাব' দ্রষ্টব্য।

২৫ বলাকা, কবিতা-সংখ্যা ৯।

২৬ শেষসপ্তক, সংযোজন ('যক্ষ')। দ্র° রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ১২১-১২২।

২৭ তু° 'মেঘদূত' প্রবন্ধ, সংকলন, পৃ. ১০৪-১০৭ : "কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একবারে অনন্ত। কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। ..."— ঐ. পৃ. ১০৬।

২৮ দ্র° 'মেঘদূত' : সংকলন, পৃ. ১০৫-৬।

২৯ দ্র° পঞ্চভূত।

# ‘আমি নারী, আমি মহীয়সী’

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বলাকা কাব্যের শিখর হইতে দুটি নির্ঝরিণী নামিয়া আসিয়াছে, বলাকার ঐশ্বর্যে অভিভূত পাঠকের চোখে সে দুটি বড় পড়িতে চায় না। কিন্তু বলাকার মহিমা বুঝিতে হইলে ও-দুটিকে বাদ দেওয়া যায় না, একটু কান পাতিয়া শুনিলেই বুঝিতে পারা যায় যে নির্ঝরিণী-দুটির তরল কল্লোলে বলাকার বাণীই ধ্বনিত। উহারা বলাকা কাব্যেরই বাঙ্ময় রূপ। কথিত কাব্য দুখানি ফাল্গুনী ও পলাতকা। এখানে আমরা পলাতকার আলোচনা করিব।

পলাতকা কাব্য কেন অবহেলিত হইল? খুব সম্ভব দায়ী ইহার আয়তনের ক্ষীণতা আর কবিতাগুলির বিশেষ প্রকৃতি, অধিকাংশ কবিতাই গল্পচ্ছলে কথিত। কিন্তু এই অতিপ্রকট কারণ দুটিকে চরম বলিয়া গ্রহণ করা উচিত হইবে না। পলাতকা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অতি শ্রেষ্ঠ চার-পাঁচটি কবিতা বিদ্যমান। আর দুটি প্রধান কবিতা বাদ দিলে সবগুলি কবিতাতেই নারী সম্বন্ধে কবির এক নূতন দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাকেই আমরা বলাকা কাব্যের অন্যতম বাণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।[১]

পলাতকা কাব্যের নাম-কবিতা ও শেষ গান যে কারণে বাদ দিয়াছি, বলিলাম। এ দুটি ছাড়া, শেষ

---

১ প্রধান দুটি কবিতা বলিতে নাম-কবিতা পলাতকা, আর শেষের দিকের শেষ গান। শেষ গান কবিতাটির অনিবার্য স্থান পলাতকা কাব্যে নয়, কবির শেষজীবনের যে-কোনো কাব্যে স্থান পাইতে পারে। বস্তুতঃ তাহাই পাইয়াছে। পরবর্তীকালে প্রকাশিত পূরবী কাব্যের ইহা প্রথম কবিতা, নাম হইয়াছে পূরবী, যদিচ কবিতাটি রবীন্দ্র-রচনাবলী সংস্করণের পলাতকা কাব্যে আপন স্থান রক্ষা করিয়াছে— খুব সম্ভব মৌলিক দাবির খাতিরে।

শেষ গান যদি কবির শেষজীবনের যে-কোনো কাব্যে স্থান পাইতে পারে, নাম-কবিতা পলাতকা কবির যে কোনো বয়সের যে-কোনো কাব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

কবিতাটির গল্পাংশে আছে একটি শিশুহরিণ আর একটি কুকুরছানা, গল্পটি তাহাদের অসম বন্ধুত্বের আর বিষম বিচ্ছেদের। একদিন যখন "ফাগুন মাসে জাগল পাগল দখিন-হাওয়া" তখন "হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী, হঠাৎ কখন শুনতে পেল"—বন্ধু কুকুরছানার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া "মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুটলো হরিণ নিরুদ্দেশের আশে"। (কুকুরছানা ও হরিণ-ছানার কাহিনীর মূলে সত্য আছে, শান্তিনিকেতন-পল্লীর একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের হরিণ নিরুদ্দিষ্ট হইবার পরে কবিতাটি লিখিত।) বন্ধুবিচ্ছেদে ম্রিয়মাণ কুকুরছানা "আতুর চোখে" জনে জনে প্রশ্ন করিয়া বেড়ায় "নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে"।

হরিণ ও কুকুরের বন্ধুত্বকে অসম বলিয়াছি, হরিণ কখনো পোষ মানে না আর কুকুর স্বভাবতই পোষমানা, একজন মানুষ-ঘেঁষা, একজন মানুষ-ছাড়া প্রাণী। একজন ঘরের, একজন দূরের। এমন অসমে ক্ষণকালের জন্য মিলিতে পারে কিন্তু স্থায়ী মিলন সম্ভবে না। এ যেন সীমা-অসীম-তত্ত্বের কাহিনীময় রূপ। রবীন্দ্রকাব্যে সীমা ও অসীম নিবিড় প্রেমে বারম্বার পরস্পরকে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ কখন আকাশে দূরের নিশ্বাস সমীরিত হয়, অমনি সীমা-অসীমের ক্ষণিক সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়। 'সীমার মধ্যেই অসীমের মিলন সাধনে'র প্রচেষ্টা আছে রবীন্দ্রকাব্যে— পরিণতি আছে বলিয়া মনে হয় না। কবি সাধক, তিনি যে সিদ্ধপুরুষ হইবেনই এমন কথা নাই। এখন, কবিতাটিতে এই ব্যঞ্জনার আরোপ স্বীকার করিলে ইহাকে সাধারণভাবে রবীন্দ্রকাব্যের ভূমিকারূপেও স্বীকার করিতে হয়।

প্রতিষ্ঠা আর হারিয়ে-যাওয়া কবিতা-দুটি কবির প্রথমা কন্যার মৃত্যুর পরে লিখিত। আর, ঠাকুরদাদার ছুটি কবিতার মূলে আছে কবির শিশু-দৌহিত্রীর প্রেরণা। বাকি দশটি কবিতাই গল্পচ্ছলে কথিত, কোনো কোনোটিতে— যেমন ফাঁকি, নিষ্কৃতি ও মায়ের সম্মানে— গল্পটা বেশ পরিস্ফুট ; বাকিগুলিতে গল্পের সূত্র ক্ষীণ। গল্প প্রকট হোক বা প্রচ্ছন্ন হোক একটি লক্ষণে কবিতাগুলির মধ্যে মিল আছে— সবগুলিতেই নারী নায়িকা বা প্রধান পাত্রী, এমনকি হারিয়ে-যাওয়া, শেষ প্রতিষ্ঠা ও ঠাকুরদাদার ছুটি কবিতাগুলিও এই লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের আর কোনো একখানি কাব্যে নারীকে এমন সর্বৈব প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। পলাতকা কাব্যজগতের প্রমীলারাজ্য।

পলাতকা কাব্যের যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহা কতকটা এই জন্য, কিন্তু ইহাই বৈশিষ্ট্যের সবটা নয়। নারীজীবন সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছে কাব্যখানিতে, আর সে দৃষ্টির মূল প্রেরণা আছে বলাকা কাব্যে। বলাকার শিখর হইতে ফাল্গুনী ও পলাতকার ধারা নামিয়া আসিয়াছে— একটিতে যৌবনের নূতন আদর্শ, আর-একটিতে নারীজীবনের নূতন আদর্শ।

চিরদিনের দাগা কবিতার নায়িকা শৈলবালা অবাঞ্ছিত কিশোরী নারীর প্রতিনিধি, যে নারী জন্মক্ষণ হইতেই অভিভাবকের মনে বিবাহদানের উদ্বেগ জাগাইয়া দিয়া প্রতি মুহূর্তে অবহেলিত হইতে থাকে।

মুক্তি ও ফাঁকি কবিতার বধূদ্বয় বৃহৎ সংসারের জটিল কর্তব্যভারে চাপাপড়া সুকুমার ফুলের গাছ— তাহারাও অবহেলিত। অবশেষে এক সময়ে দারুণ ব্যাধি আসিয়া নিরেট কর্তব্যের দেয়ালে জানলা ফুটাইয়া দেয়— শেষনিশ্বাস ফেলিবার আগে তাহারা একবার মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ পায়, যদিচ তাহার মধ্যেও কখনো কখনো "পচিশ টাকার ফাঁকি" লুকাইয়া থাকে।

মায়ের সম্মান কবিতার কানাই-বলাই-এর জননী অদৃষ্ট-নিগৃহীতা রমণী, তাহার একমাত্র সম্বল চারিত্র-মহিমা। ঐ মহিমার বলেই সুদিনের মুখ দেখিয়াছে, আবার ঐ মহিমার বলেই আপনার দুঃখের আলোয় অপরের দুঃখের নিদারুণতা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে।

নিষ্কৃতির মঞ্জুলী হিন্দু ঘরের বালবিধবা, "ভরা ভোগের মধ্যখানে" ব্রহ্মচর্যের আদর্শ পালন করিতে যে বাধ্য হয়। হয়তো এই-ভাবেই তাহার জীবন শেষনিশ্বাস পর্যন্ত চলিত, এমন সময়ে বাপের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে আর পুলিনের প্রত্যাশিত আহ্বানে নূতন ঘর পাতিবার আশায় সে ফরাক্কাবাদে চলিয়া গেল।

মালা কবিতাটির নায়িকা "সিংহাসনে একলা ব'সে রানী, মূর্তিমতী বাণী"। এই রানীর প্রসাদ পাইবার আশায়

কাশী কাঞ্চী কানোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ মদ্র মগধ হতে
বহুমুখী জনধারার স্রোতে
দলে দলে যাত্রী আসে
ব্যগ্র কলোচ্ছ্বাসে।

রানীর দেওয়া মণিমালার জ্বালায় যখন জীবন পরিতপ্ত হইয়া ওঠে তখন হঠাৎ চোখে পড়ে মণিমালাই রানীর চরম দান নয়, তাঁহার হাতে আরো কিছু আছে, ফুলের মালার প্রসাদ। সে মালা জোটে কবির ভাগ্যে— এ শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে আরো অনেক আছে, একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ সোনার তরীর বিখ্যাত

কবিতা পুরস্কার; প্রভেদ এই— পুরস্কার কবিতায় যিনি রাজা, মালাতে তিনি রানী; আরও একটু প্রভেদ আছে— পুরস্কারের রাজা লৌকিক ব্যক্তি, মালার রানী সেভাবে লৌকিক নন।

ভোলা কবিতার নায়িকা বালিকা কন্যা বিজু, সে "যখন চলে গেল মরণপারের দেশে"। বিজুর মৃত্যুর পরে যখন ঘরের আবহাওয়া শূন্যতায় ও অশ্রুর ভারে থম্ থম্ করিতেছে তখন দমকা হাওয়ার মত পাড়ার ভোলা নামে বালকটির আবির্ভাব। বিজুর যোগ্য প্রতিনিধি রূপে সে বিজুর স্থান অধিকার করিয়া বসিল।

ছিন্ন পত্র কবিতার নায়িকা কিশোর বয়সের বিস্মৃতা সখী মনোরমা। সেদিনের কিশোর আজ প্রখ্যাত পাবলিকম্যান, তায় প্রৌঢ়। এমন কত জনেই কত চিঠিই তাহাকে লেখে। হঠাৎ সেই ছিন্ন চিঠির একটি টুকরা বাতাসে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাজির করিয়া দেয়— ছোট্ট একটি জিজ্ঞাসা— "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে"। মনুর অব্যক্ত আবেদন শত খণ্ড হইয়া ধারণার অতীতে বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে— যে ফুল ছিন্ন তাহার রিক্ত বৃন্তটি প্রশ্ন হানিতেছে "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে"। মনোরমাও অবহেলিতা, না, তার চেয়েও অধিক— বিস্মৃতা। পারিবারিক প্রতিকূলতা ইহার কারণ।

কালো মেয়ের নায়িকা নন্দরানী, গায়ের রঙ যাহার বিবাহের প্রতিবন্ধক, এমন মেয়ে সংসারে অবহেলিত না হইয়া যায় না। কবিতাটিতে গল্পাংশ নাই। পাশের মেসের দরিদ্র ছাত্রটি ঐ মেয়ের মধ্যে আপনার সহায়সম্বলহীন কালো ভবিষ্যতের রূপ দেখিতে পায়।

আসল কবিতার নায়ক কোনো নারী নয়, যদিচ ঝুমি নামে একটা বেগানা মেয়ে আছে, আর তার স্থানও নিতান্ত নগণ্য নয়। কবিতাটির নায়ক ভোলা নামে একটা পাগল। সেই পাগলটা হইতেছে ষাট বৎসর বয়স্ক কর্মব্যস্ত পলিটিশানের মনের পোড়ো জমি— যেমন এক খণ্ড পোড়ো জমি ছিল আট বৎসরের বালকের জানলার সম্মুখে। সেই অনাদরের জমিতে ছিল বালকের ভূস্বর্গ, আর এই অনাদরের মানুষটিতে বৃদ্ধের অবকাশের স্বর্গ, আর সেই স্বর্গের মন্দাকিনী কুড়াইয়া পাওয়া কলস্বরা ঝুমি।

২

পলাতকা কাব্যের বিস্তৃততর আলোচনার মধ্যে প্রবেশের আগে পরবর্তী শিশু ভোলানাথ কাব্যের সঙ্গে এর সম্বন্ধটা বর্ণনা করিতে চাই। যদিচ পলাতকা ও শিশু ভোলানাথ কাব্যের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অল্প নয়,[২] তবু দুখানি কাব্যই অল্পবিস্তর কবির ব্যথাক্লিষ্ট চিত্তের অভিজ্ঞতা বহন করিতেছে। শিশু ভোলানাথে ব্যাপারটা বেশ প্রকট, পলাতকায় আংশিক ও প্রচ্ছন্ন।

"আমেরিকার বস্তুগ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই শিশু ভোলানাথ লিখতে বসেছিলাম। বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি ক'রে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট ক'রে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড় আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার

২ পলাতকা প্রকাশকাল ১৯১৮, শিশু ভোলানাথ প্রকাশকাল ১৯২২— যদিচ অধিকাংশ কবিতাই ১৯২১ সালে লিখিত।

মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে"।[৩]

উদ্ধৃত অংশে যে বেদনার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে শিশু ভোলানাথের জন্ম সেই বেদনায় বা সেই বেদনা হইতে মুক্তি পাইবার আশায়। পলাতকা কাব্যেরও কোনো কোনো কবিতাতেও এই বেদনার অভিজ্ঞতা, ভোলা ও আসল প্রকৃষ্টতম উদাহরণ, যদিচ ছিন্ন পত্র ও ঠাকুরদাদার ছুটিও উল্লেখযোগ্য।[৪]

ভোলা কবিতার বালক ভোলা, আসল কবিতার পাগল মহেশ ও শিশু ভোলানাথের নাম-কবিতার শিশু ভোলানাথে প্রভেদ অল্পই, সে প্রভেদটুকুও আবার বিবর্তনের। ভোলা কবিতায় বালকটির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে—

আমার প্রাণের চিরবালক নতুন ক'রে বাঁধল খেলাঘর
বয়সের এই দুয়ার পেয়ে খোলা।
আবার বক্ষে লাগিয়ে দোলা
এল তার দৌরাত্ম্য নিয়ে এই ভুবনের চিরকালের ভোলা।

বালকটি এখানে স্পষ্টতঃই idealised হইয়াছে।

আসল কবিতার মহেশ পাগলের কাঁধে ঝুমির বর্ণনা দিতে গিয়া কবির মনে পড়িয়াছে—"ভোলানাথের জটায় যেন ধুতরো ফুলের কুঁড়ি"। এখানেও মহেশ উপমায় idealised হইয়াছে আর একটু পরেই প্রত্যক্ষত: idealised—

চিরকালের মানুষ যিনি ঐ ঘরে তাঁর ছিল আবির্ভাব।

শিশু ভোলানাথ কাব্যের শিশু idealised শিশু, তাই সে শিশু ভোলানাথ, এখানেই শিশু কাব্যের সহিত শিশু ভোলানাথ কাব্যের প্রভেদ। শিশুর বালকবালিকা লৌকিক, real ; শিশু ভোলানাথের ideal, অন্তত: অধিকাংশ কবিতাতেই। এখন, শিশু ভোলানাথের পূর্ববর্তী কাব্যে— পলাতকায়— এই idealisationএর সূচনা, যে শিশু কখনো পাগল, যে পাগল কখনো শিশু ; পরবর্তী কাব্যে আসিয়া এই প্রক্রিয়া পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে— শিশু ও পাগল অর্ধনারীশ্বরের মত একাঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

৩

এবারে বিশিষ্ট কবিতাগুলির আলোচনা করিব। প্রথম পর্যায়ে কালো মেয়ে, ছিন্ন পত্র ও চিরদিনের দাগা কবিতা-তিনটি লওয়া যাইতে পারে। তিনটিতেই নারী অবহেলিত, কিন্তু তিন ক্ষেত্রেই সামাজিক পারিবারিক ও সাময়িক (সময় সংক্রান্ত) প্রতিকূলতা এমন প্রবল যে নন্দরানী মনোরমা ও শৈল নিতান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, দৈব এখানে প্রবলতর।

মরচে-পড়া গরাদে ঐ, ভাঙা জানলাখানি ;
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী

---

৩ গ্রন্থপরিচয়, শিশু ভোলানাথ। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৩।

৪ শেষ গান যেমন পরবর্তী কাব্যে স্থানান্তরিত হইয়া যথাস্থান লাভ করিয়াছে, ঠাকুরদাদার ছুটিও তেমনি যথাস্থান লাভ করিতে পারিত শিশু ভোলানাথ কাব্যে স্থানান্তরিত হইলে।

ঐখানেতে ব'সে থাকে একা,
শুকনো নদীর ঘাটে যেন বিনা কাজে নৌকোখানি ঠেকা।

নন্দরানী শুকনো ডাঙায় ঠেকা নৌকা, জোয়ারের জল তাহাকে আর ভাসমান করিল না, ঐখানে ডাঙায় পড়িয়া থাকিয়াই একদা তাহার অসহায় জীবনের অবসান ঘটিবে।

মনোরমা প্রৌঢ় পলিটিশানের বাল্যকালের সখী, কিছুকালের জন্য এক দিগন্তে তাহারা কাছাকাছি হইয়াছিল তার পরে দুরন্ত পারিবারিক স্বার্থ ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে। সেই ঘটনার পরে বয়সের বেশ কয়েকটা দশক গত, সেদিনের বালক আজ প্রৌঢ় কর্মবীর, এমন লোকের পক্ষে বাজে চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলা একটা প্রাত্যহিক কর্ম। ভিক্ষাপ্রার্থী কোনো বিধবার পত্র মনে করিয়া মনোরমার চিঠিখানিও ছিন্ন হইল। এমন সময়ে ক্ষণিক অবসরের সুযোগ লইয়া দক্ষিণবাতাসের এক দমকায় কাগজের যে টুকরোখানা কর্মবীরের কোলের উপরে আসিয়া পড়িল— "মনুরে কি গেছ এখন ভুলে" অক্ষর বহন করিতেছে।

সেই মনু আজ এতকালের অজ্ঞাতবাস টুটে,
কোন্ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে ?
কোন্ বেদনা দিল তারে নিষ্ঠুর সংসার—
মৃত্যু সে কি ? ক্ষতি সে কি ? সে কি অত্যাচার ?
কেবল কি তার বাল্যসখার কাছে
হৃদয়ব্যথায় সান্ত্বনা তার আছে ?
ছিন্ন চিঠির বাকি,
বিশ্ব-মাঝে কোথায় আছে, খুঁজে পাব নাকি ?

কিন্তু আর অনুশোচনা বৃথা। ঝড়ের কপোতের মত এক জানলায় প্রবেশ, অন্য জানলায় প্রস্থান —এমন একটি ঘটনা ঐ ছিন্ন পত্রখানি। দুঃখের এ আর-এক চিত্র। ভবিতব্যের পর্দাখানা একটুখানি তুলিয়া শঙ্কাপাণ্ডু মুখের ছবিখানি এক লহমার জন্য কবি আমাদের দেখাইয়াছেন।

তিনটি মেয়ের পিঠে জন্মগ্রহণের দোষে অপরাধী শৈলবালা বৃদ্ধের বুকে চিরদিনের দাগা রাখিয়া গিয়াছে। অদৃষ্ট বড়ই রসিকপুরুষ। যাহার বর জুটিতেই চায় না, বিবাহ হওয়াই যাহার দায়, তাহার বর জুটাইয়া দিয়া, বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিয়া অদৃষ্ট আর-এক নিষ্ঠুর বিদ্রূপের খেলা দেখাইয়া দিল— বরবধূ স্বগৃহে পৌঁছিবার আগেই—

খবর এলো, ইরাবতীর সাগর মোহনাতে
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে।

এখানে অদৃষ্টই প্রবল ও প্রকট। নন্দরানী ও মনোরমার ক্ষেত্রেও হয়তো সে বর্তমান, কিন্তু নিতান্ত প্রচ্ছন্ন ভাবেই। তিনটি ক্ষেত্রেই দুঃখের তিন মূর্তি, সর্বত্রই নারী নির্যাতিত ও নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু সমস্ত কবিতার নায়িকা এমন নিষ্ক্রিয় মনে করিলে ভুল হইবে, সকলেই অদৃষ্টের শাসন বা সমাজের অনুশাসন নতভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে নাই, কেহ বা চরিত্রশক্তিতে কেহ বা প্রেমের শক্তিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। মায়ের সম্মানের মাতা দুর্ধর্ষ চরিত্রবলে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে মস্তক উন্নত করিয়াছে, তাহার স্থান রাসমণির ছেলে গল্পের রাসমণির সহিত। নিষ্কৃতি কবিতার

নায়িকা মঞ্জুলীও শেষ পর্যন্ত সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী হইয়াছে, এখানে তাহার সহায় পুলিনের প্রতি অন্তঃসলিল অনুরাগ। অনেককাল হইতেই সে ভিতরে ভিতরে অনুরাগের টান অনুভব করিতেছিল, এমন সময়ে পিতার দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ দমকা বাতাসের মত তাহার সংকুচিত ইচ্ছা-শক্তির উপরে আসিয়া পড়িয়া ঘাটের রশি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ফাঁকি কবিতার বিনু জীবনের শেষ দুটি মাস স্বামীকে একান্তভাবে কাছে পাইয়াছিল— ঐ মাস দুটিকেই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের সার বলিয়া তাহার মনে হইয়াছে, মনে হইয়াছে যে এত দিনের শূন্যতা বিধাতা অপ্রত্যাশিত ভাবে শেষ দানে পূর্ণ করিয়া দিলেন। বিনুর স্বামী "পঁচিশ টাকার ফাঁকি"র অভিশাপে ভুগিয়াছে কিন্তু বিনু "এই দুটি মাস সুধায় দিলে ভরে" সান্ত্বনা বহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

মুক্তি কবিতার নায়িকা রুগ্না পত্নী বিনুর মতই রুগ্না। বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সে বন্দিনী, স্বামীকে একান্তভাবে পাইবার উপায় তাহার ছিল না, আর দশ জনের চেয়ে বেশি অধিকার তাহার ছিল না। মায়ের সম্মানের মাতার মত দুর্ধর্ষ চারিত্রশক্তির অধিকারিণী সে নয়, মঞ্জুলীর মত প্রেমের নোঙরছেঁড়া প্রচণ্ড আকর্ষণই বা তাহাতে কি ভাবে সম্ভব, এমনকি বিনুর মত "শেষ দুটি মাসে"র সান্ত্বনাও তাহার ভাগ্যে জোটে নাই— তবু তাহাকে বিদ্রোহিণী বলিতে হয়। দীর্ঘকালব্যাপী রোগ একদিকে যেমন তাহার রক্ত-মাংস শোষণ করিয়াছে আর-একদিকে তেমনি তাহার মনের ও চোখের উপর হইতে সংস্কারের জড়তার ও অভ্যাসের পর্দাগুলি অপসারিত করিয়াছে, রোগ একপ্রকার দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদৃষ্টি দিয়াছে তাহাকে।[১]

বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আঙিনায়।
গন্ধে-বিভোর দক্ষিণবায়
দিয়েছিল জলস্থলের মর্মদোলায় দোল—
হেঁকেছিল, 'খোল রে দুয়ার খোল।'

এ তো পরোক্ষজ্ঞানের কথা, এতদিন পরে রোগযন্ত্রণার পাথর-কাটা পথে—

প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে।
জানলা দিয়ে চেয়ে আকাশ-পানে
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে—
আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাহারা শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।

এই নারীকে বিদ্রোহিণী বলিয়াছি, কিন্তু বস্তুতঃ সে বিদ্রোহেরও ঊর্ধ্বে, সে পরমমুক্ত। বিদ্রোহী অহং-এর শৃঙ্খলে বদ্ধ, সেই শিকল-ঝনঝনানিটাই দূর হইতে মুক্তিসংগীতের মত শ্রুত হয়। এই রুগ্না নারী কোন্

১ রবীন্দ্রসাহিত্যে রুগ্ন নায়কনায়িকার আচরণ ও মনস্তত্ত্ব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ডাকঘরের অমল, মাসির যতীন, ফাঁকির বিনু, দুই কোণের শর্মিলা, মালঞ্চের নীরজা, ব্যবধান ও নিশীথের যথাক্রমে বনমালী ও মনোরমা। রোগযন্ত্রণায় রক্তমাংসের ঐকান্তিক দাবি শিথিল হইলে তবেই কি ভিতরকার মানুষটি আত্মপ্রকাশ করিবার সুযোগ পায়। কবি কি বলিতে চান অনুসন্ধান আবশ্যক।

রহস্যময় প্রক্রিয়ায় প্রত্যহের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবনেশ্বরের মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। স্বামী কর্তৃক অবহেলিত পত্নী চূড়ান্তভাবে অবহেলিত নয়, তাহার পত্নীরূপের অন্তরে তাহার নারীরূপ— সেই নারীরূপের অপেক্ষায় যিনি আছেন শেষ মুহূর্তে তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি অপমানিতার মুখের উপরে পড়িয়া ধন্য করিয়া দেয় তাহার জীবন যৌবন সর্বস্ব—

এতদিনে প্রথম যেন বাজে
বিয়ের বাঁশি বিশ্ব-আকাশ-মাঝে।
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের ধুলায় পড়ে থাক্।
মরণ-বাসর-ঘরে আমায় যে দিয়েছে ডাক
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় সে কেবল প্রভু—
হেলা আমায় করবে না সে কভু।
চায় সে আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।
গ্রহতারার সভার মাঝখানেতে
ঐ-যে আমার মুখে চেয়ে দাঁড়িয়ে হোথায় রইল নির্নিমেষে।
মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী,
মধুর মরণ, ওগো আমার অনন্ত ভিখারি!
দাও, খুলে দাও দ্বার,
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাবার।[১]

মায়ের সম্মানের মাতার জীবনের সার্থকতা গৌরবময় মাতৃত্বে, মঞ্জুলীর জীবনের সার্থকতা প্রেয়সীত্বে, আর বিনুর জীবনের সার্থকতা পত্নীত্বে। কিন্তু বর্তমান নায়িকার জীবনের সার্থকতা কোথায়? তাহার সার্থকতা মাতৃত্বে নয়, প্রেয়সীত্বে নয়, পত্নীত্বে নয়— তাহার সার্থকতার ক্ষেত্র অস্তিত্বের মূলগত ক্ষেত্রে, নারীত্বে। এই বোধটা তাহাকে জাগতিক অস্তিত্বের উর্ধ্বে উন্নীত করিয়াছে— সেইজন্যই সে মুক্ত।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন এই মুক্তির অন্তরায় অনেক, একটি প্রধান— আমাদের একান্নবর্তী পরিবার, যে প্রথা একসময় প্রাণবন্ত ছিল তখন প্রাণদান করিত, এখন প্রাণহীন বলিয়া কেবল প্রাণহরণেই সক্ষম। পলাতকা কাব্যের কাহিনী-কবিতাগুলির সর্বত্র একান্নবর্তী পারবার; তাঁহার শেষজীবনের অধিকাংশ ছোট-গল্পের পরিবেশ একান্নবর্তী পরিবার। কি কবিতায় কি ছোটগল্পে সর্বত্র দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে ব্যক্তির সঙ্গে একান্নবর্তী-প্রথায়, individualএর সঙ্গে জড়সমষ্টিতে।[২]

---

১ এই প্রসঙ্গে স্ত্রীর পত্র গল্পটি স্মরণীয়। দুটি রচনায় ভাবের বিস্ময়জনক মিল, ভাষার মিল অধিকতর বিস্ময়জনক। বস্তুতঃ কবির শেষজীবনে লিখিত অনেক রচনাতেই এই ভাবটি বর্তমান। তিনি যেন বলিতে চান পত্নীত্বে ও মাতৃত্বেই নারীর চরম মূল্য নয়, নারীত্ব বলিয়া তাহার একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে, সেই মূল্যেই তাহার বিচার। তিনি আরও বলিতে চান সে মূল্য যদি সংসার দিতে অক্ষম হয় স্বয়ং বিধাতা দেন, তিনি কৃপণতা করেন না।

২ হালদারগোষ্ঠী বিশেষভাবে স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের রচনা ব্যক্তির বন্ধনমোচনের আহ্বানে পূর্ণ। তিনি দেখিয়াছেন জরা জড়তা অভ্যাস সংস্কার একান্নবর্তী-প্রথা— বন্ধনের আর অন্ত নাই, সমস্তই ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। এইসমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিকে, individualকে, পূর্ণভাবে বিকশিত হইতে তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বানের একপ্রান্তে মুক্তি নামে কবিতাটি; হালদারগোষ্ঠী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর প্রভৃতি— অন্যপ্রান্তে, শেষপ্রান্তে ল্যাবরেটারি গল্প।[১]

৪

গোড়াতে পলাতকা কাব্যকে বলাকার বাঙ্ময়রূপ বলিয়াছি। তবে বলাকার বাণী কি? বলাকার বাণী নবতর যৌবনের বাণী। নবতর যৌবন বলিতে কবি বুঝিয়াছেন 'প্রৌঢ়ের যৌবন', যে যৌবন 'ফল চায় না, ফলতে চায়', যে যৌবন ভোগবতীর পরপারবর্তী 'আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েছে'। যে যৌবন তাজমহলের মত অপূর্ব শিল্পবস্তুকেও অনায়াসে উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রের মত অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া ত্যাগ করিতে দ্বিধা করে না, যে যৌবন বলে

আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।

যে যৌবনের আহ্বানে পরিচিত অভ্যস্ত আরাম ছাড়িয়া অনিশ্চয়ের মধ্যে মানুষ উধাও হয়—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে"। এই বাণীর শিখর হইতে দুটি ধারা নির্গত, একটি ফাল্গুনী, অন্যটি পলাতকা। ফাল্গুনীতে মানুষ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা কথিত, পলাতকায় তাহাই বিশেষ ভাবে নারী সম্বন্ধে কথিত। ফাল্গুনীর নবযুবকের দল চিরযৌবনের দল— তাহারা শেষ মুহূর্তে আবিষ্কার করে বিশ্বে 'বুড়ো' বলিয়া কেউ নাই, আর জীবন সর্দার, "বারে বারেই প্রথম, ফিরে ফিরেই প্রথম"। আর পলাতকা কাব্যের নারীনায়িকার দল মাতৃত্ব-প্রেয়সীত্ব-পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া এক সময়ে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া উপনীত হয়— তখন বুঝিতে পারে "আমি নারী, আমি মহীয়সী"।

---

১ পলাতকা কাব্যের পলাতকা কবিতার হরিণশিশু আর হালদারগোষ্ঠীর বনোয়ারীলাল দুইজনেই নববসন্তের হাতছানিতে ঘর ছাড়িয়া উধাও হইয়াছে।

# বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা

শ্রীভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে অনেকেই বলেছেন যে তিনি য়ুরোপীয় দর্শন এবং চিন্তারীতি দ্বারা অতিরিক্ত প্রভাবিত ছিলেন। আবার এর বিপরীত মতটিও কিছু অসুলভ নয় : রক্ষণশীল ভারতীয় মনোভাব তাঁর চিন্তাকে যথেষ্ট প্রগতিশীল হতে দেয় নি। এই দু রকম মতের মূলে কিন্তু একই ত্রুটি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষাকে ভালো করে এখনও বিশ্লেষণ করে দেখা হয় নি। সেই বিচারে মৌলিক ভারতীয় এবং বিদেশী উপাদানকে পৃথক করে দেখা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ফলে বঙ্কিম যেমন একদিকে যথেষ্ট ভারতীয় নন বলে সমালোচিত হয়েছেন, তেমনি যথেষ্ট সংস্কারমুক্ত নন বলেও বিদ্রূপভাজন হয়েছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তার যথেষ্ট বিশ্লেষণ না হলেও এ বিষয়ে কোনো ধ্রুবসিদ্ধান্তে আসা বোধ হয় ঠিক নয়।

আধুনিক শিল্প এবং জ্ঞান বাঙালীর চিন্তাজগতে আলোড়ন এনেছিল। এইজন্যই আধুনিক চিন্তার কোন্ দিকটি এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রভাবশালী হয়েছিল তার অনুসন্ধানই সবার আগে দরকার। কিন্তু এই জ্ঞানের সাধনা বা জ্ঞানের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি আমরা নিজেরা করে তুলতে পারি নি। জ্ঞান বা চিন্তা আমাদের অনেকটাই আহৃত। য়ুরোপের স্ব-তন্ত্র স্বাধীন জাতীয় জীবনের ছায়ায় জ্ঞানান্বেষণের নতুন নতুন পথও মুক্ত হয়েছে। রেনেসাঁস রিফর্মেশন রাষ্ট্রবিপ্লব শিল্পবিপ্লব— এসব বহিরঙ্গ কারণ ছাড়াও জনশক্তির স্বাধীন চিত্তবিকাশও নতুন নতুন চিন্তা ও মতবাদের পথ প্রশস্ত করেছে। আধুনিক বাংলায় মনীষীর বিভিন্নমুখী প্রকাশ হয়েছে সত্য কিন্তু য়ুরোপীয় মনন-প্রয়াসের সঙ্গে এর একটা মৌলিক প্রভেদ ছিল। আমাদের আগাগোড়া শিল্পই ছিল বিদেশী সংস্কৃতির নির্দেশে পরিকল্পিত। রাজনীতি বা অর্থনীতি-গত কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো মৌলিক ভাবনার অবকাশ ছিল না। য়ুরোপের ইতিহাসে মনীষীদের চিন্তা কর্মে ও ভাবে সমানভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জগতেও মুক্তবুদ্ধির চর্চা অব্যাহত ছিল। খ্রীস্টান ধর্মের শাসন মুক্তবুদ্ধির প্রসারকে বাধা দিতে একবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু অবিলম্বেই তাকে পথ ছেড়ে দিতে হল। শুধু তাই নয়, ধর্মেরও যুগোপযোগী রূপান্তর ঘটল। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পোপের শাসন নতুন জীবনচেতনার কাছে ম্লান হয়ে এল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উত্থানপতনে এটাই যেন পরোক্ষে প্রমাণিত হল যে একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের মানবীয় প্রকৃতি এতদিনকার অধ্যাত্ম মূল্যবোধকে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করে ফেলেছে। ধর্মকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে বিভিন্ন জাতি (National State) এবং যুগপ্রয়োজনের সঙ্গে সন্ধি করে। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ দুটি : চার্চের ক্ষয়িষ্ণু কর্তৃত্ব এবং বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। বিজ্ঞানসাধনা তো মুক্তবুদ্ধিরই অনুশীলন। এই বুদ্ধির চর্চার লক্ষ্য হচ্ছে দেশ জাতি সমাজ ও ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য অথবা জড়জগতের নিয়মনীতির সন্ধান। দৃষ্টির কেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে জীবনের অভীষ্টের ধারণারও পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের নতুন নতুন পন্থার সঙ্গে নতুন মতবাদেরও প্রসার ঘটেছে।

আমাদের রেনেসাঁসে এ রকম হয় নি। ধর্মশাসনের কড়াকড়ি কমেছে বটে কিন্তু বুদ্ধির মৌলিক চর্চায় নতুনকে গড়ে তুলতে পারি নি। আমাদের কাছে যা নতুন, আসলে তা নতুন নয়। কালনিরপেক্ষ মানদণ্ড

দিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে আমাদের মনীষীদের প্রয়াস মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের তথ্যবিশ্লেষণে এবং গ্রহণে। ইংরেজপূর্ব যুগে আমাদের মনীষা বিশেষ একদিকে যথেষ্ট বিকাশ লাভ করলেও আধুনিক কালের মত বৈচিত্র্যধর্মী হয় নি। যতদূর মনে হয় পাশ্চাত্য মনীষা কোনো তত্ত্ব বা নীতির সূত্র মাত্র অবলম্বন করে অগ্রসর হয়ে আসে নি। একটা সাধারণ মনোভঙ্গি সর্বত্র অব্যাহত থাকলেও কোনো সনাতন তত্ত্বের শাসন তাঁদের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। ভারতবর্ষের মনন-প্রয়াস সর্বদাই কোনো সনাতন তত্ত্বের সূত্রকে আশ্রয় করে এসেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গীতার উল্লেখই যথেষ্ট। গীতার মূল বক্তব্যকে মেনে নিয়ে কত ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা গড়ে উঠেছে। আধুনিক যুগ পর্যন্ত মনীষীরা গীতার অভিনব ব্যাখ্যা রচনা করেই এ যুগের নতুন বাণীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। য়ুরোপে খ্রীস্টধর্মতত্ত্বের ভাষ্য অনুভাষ্য হয়েছে কিন্তু পাশ্চাত্য মনীষা আরও বহু বিচিত্র পথে চরিতার্থতা সন্ধান করেছে। ভারতবাসীর জীবনে একটা কোনো মূল বিশ্বাস ছিল অটল। নতুন করে তাকেই এক এক যুগে রূপ দেওয়া হয়েছে মাত্র।[১] আমাদের দেশের মননের এটাই বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শতাব্দীতে যখন সম্পূর্ণ নতুন ধরণের চিন্তাবস্তু এবং চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে, তখন আমাদের এতকালের অভ্যস্ত মনন প্রণালীতেই যেন আঘাত পড়ল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনস্বীই এই অভিনবত্বকে সচেতনভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেছেন,

The very idea that external life is a worthy subject of the attention of a rational being, except in its connection with religion is amongst ourselves unmistakably of English origin.[২]

চিন্তাপ্রণালীর পার্থক্য সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—

"এখন গোলযোগের কথা এই যে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তাপ্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না।··পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা পূর্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই।·· যাঁহারা বিবেচনা করেন, এ দেশীয় পূর্ব পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সকলই ভুল, উহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।"[৩]

---

১ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য মোহিতলাল মজুমদার, বঙ্কিমবরণ, 'বঙ্কিমপ্রতিভার মহত্ত্ব বিচার— পূর্বমীমাংসা'

২ Bankim Chandra Chatterjee, *English Works* (Vangiya Sahitya Parishad). The Confession of a Young Bengal.

৩ শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভূমিকা—

আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাজের মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে বলে অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। লোকজীবন এবং নাগরিক জীবনের মধ্যে বিচ্ছেদের রেখা আজ খুবই স্পষ্ট সন্দেহ নেই কিন্তু গত শতাব্দীতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের চোখেই তার স্বরূপ ধরা পড়েছিল। যাঁরা চিন্তাশীল, তাঁরাও দ্বিধাবিভক্ত। ভারতীয় মনীষা এবং পাশ্চাত্য মনীষার মধ্যে ব্যবধান যে কত দুস্তর বঙ্কিমের উক্তিতেই তা প্রকাশ পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের একটু আলোচনা নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন নিয়ে অনেকদিন ধরেই আন্দোলন চলে। এই বিতর্কে প্রসঙ্গত চিন্তা প্রণালীর পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছিল। র‍্যাশনালিজম্, এমপিরিসিজম বা বেকন প্রবর্তিত আরোহ রীতি— বিষয় পর্যালোচনার বিভিন্ন রীতি রেনসাঁসের পরে য়ুরোপীয় মননসাধনার বৈশিষ্ট্য। নতুন যুগের চিন্তা পদ্ধতি কি হবে— এই নিয়ে বাদবিতর্কে এসব কথা স্বভাবতই এসে গিয়েছিল। রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে লেখা বিখ্যাত শিক্ষা বিষয়ক পত্রে বেকনের পদ্ধতি প্রসারে সাহায্য করতে অনুরোধ করেছিলেন। রামমোহন রায়ের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি। হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের যে পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন দর্শনের ইতিহাসে তা 'কমনসেন্স স্কুল' নামে পরিচিত। এর প্রবক্তারা ছিলেন 'স্কটিশ স্কুল অব ফিলজফার্স'। এই দর্শনের বৈশিষ্ট্য ছিল অভিজ্ঞতাবাদী 'এমপিরিসিষ্ট' এবং মননবাদী 'র‍্যাশনালিস্টদের' মধ্যে মিলন ঘটানো। এই দর্শনের তিনটি বিশেষত্ব হচ্ছে—

To the Scottish School belongs the merit of being the first avowedly or knowingly to follow the inductive method and to employ it systematically to psychological investigation.

It employs the self consciousness as the instrument of observation.

By the observation of consciousness principles are reached which are prior to and independent of experience.[১]

আত্মসচেতন পর্যবেক্ষণ এবং আরোহ রীতি— এই দুটিই পাশ্চাত্য বিচার প্রণালীর বৈশিষ্ট্য। এই দুইটিতেই ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের দীক্ষিত করলেন। এই শিক্ষা কিভাবে তিনি ছাত্রদের মধ্যে দৃঢ়মূল করলেন সে আলোচনা আপাতত অবান্তর। তবে এটুকু অবশ্যই বলতে হবে এই নব শিক্ষিতেরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করে এই বিচাররীতির প্রসারে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের শিক্ষা-বিধিও তাতে সাহায্য করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি পরবর্তী যুগের মনীষীরা এই পরিবেশেই লালিত হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজ ছাড়া সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা অন্য কোনো কলেজে ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথম থেকেই নতুন শিক্ষা এবং মননরীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন।

২

বঙ্গদর্শনে উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ রচনায় মন দিলেন। এ সময়ের প্রবন্ধগুলি বিচ্ছিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত। এই রচনাগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষভাবে ইতিহাসের শরণ নিয়েছেন।

---

১ James McCosh, *The Scottish Philosophy* (1875), pp. 2-6.

ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বিষয় পর্যালোচনার রীতি আমাদের দেশে নতুন। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার পর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ও গবেষণায় বাঙালী চিত্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠে। নব্যবঙ্গের স্থাপিত সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় যে আলোচনা হত সে এই পদ্ধতিতেই। এই আলোচনা রীতিতে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত করেন বিশেষ করে দুজন, অক্ষয়কুমার দত্ত এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বঙ্গদর্শনের আগে বিবিধার্থ সংগ্রহ এবং রহস্যসন্দর্ভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য পত্রিকা যারা পাশ্চাত্যে বহুপ্রচলিত ঐতিহাসিক রীতি বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রবর্তিত করেছে। রাজেন্দ্রলালের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধাও ছিল অপরিসীম।

বঙ্গদর্শন সম্পাদনকালে বঙ্কিমচন্দ্র যেসব প্রবন্ধ লেখেন তাতে এদেশের শাস্ত্র ও গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার সামান্যই ছিল। তিনি এ সময় দুটি নতুন শাস্ত্রের পূর্ণ ব্যবহার করছিলেন। দুটি শাস্ত্রই মূলত য়ুরোপে উদ্ভূত এবং পরিণত। একটি অর্থনীতি আর একটি রাজনীতি। ইতিহাসের কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্কিম মনীষার প্রথম যুগে এই তিনটিই একাধিপত্য করেছে বলা যায়। সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিও ছিল আমাদের দেশে নতুন। ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি যেন নতুন অস্ত্র খুঁজে পেলেন। তারই দ্বারা তিনি বিষয়কে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে নবজাগরণের একটা দিককে আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিছক ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা প্রবন্ধগুলির উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। অন্যান্য প্রবন্ধেও তাঁর ইতিহাস চিন্তা কত প্রখর, তার প্রমাণস্বরূপ তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায় 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'সাম্য' এবং 'ভারতকলঙ্ক'। ইতিহাস অর্থনীতি এবং রাজনীতির আলোচনায় প্রবন্ধ তিনটি পূর্ণ। ইতিপূর্বে বঙ্গদেশের কৃষক নিয়ে আলোচনা আরও কয়েকজন করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের *The Zemindar and the Ryot* বেরিয়েছিল ক্যালকাটা রিভিউতে (১৮৪৬), কিশোরীচাঁদ মিত্রের *The Ryot and the Zemindar* বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়ান ফিল্‌ডে (১৬ই জুন ১৮৫৯), সঞ্জীবচন্দ্রের বই *Bengal Ryots* বেরিয়েছিল ১৮৬৪তে এবং রমেশচন্দ্র দত্তের *The Peasantry of Bengal* প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩-এ। দেশের প্রজাদের আলোচনার সূত্রপাত হয় নব্যবঙ্গদের থেকেই। বিচার প্রণালী এবং বিচারবস্তু—দুদিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র নব্যবঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। তিনি আলোচনা করলেন বাংলায়। পূর্ববর্তীদের আলোচনার তিনি লাভবান্ হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু একটা নতুন মতবাদ এই প্রসঙ্গে তিনি প্রবর্তন করলেন। বাক্‌ল্ তাঁর *History of Civilization in England* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই জাতীয় চরিত্র গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের কতকগুলি সূত্র নির্দেশ করেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়েই ভারতবর্ষের জাতীয় প্রকৃতি তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করে তাঁর পরিকল্পিত সূত্রের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাক্‌ল্-এর ঐতিহাসিক প্রণালীকে স্বীকার করে 'বঙ্গদেশের কৃষক'-এর কোনো কোনো জায়গায় প্রায় অনুবাদই করে দিয়েছিলেন।[১] এই প্রবন্ধটি লেখার সময় আর একটি বইয়ের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, লেকির *History of Rationalism in Europe.* বঙ্গদেশের কৃষক রচনার পর তিনি বঙ্গদর্শনে সাম্যের প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। সাম্যের মূল তত্ত্বটি য়ুরোপ থেকে পাওয়া। সেই হিসাবে মার্ক্স-এর পূর্ব পর্যন্ত সাম্য-

১ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বঙ্গদেশের কৃষক, ৩য় পরিচ্ছেদ এবং বাক্‌ল্ এর পূর্বোক্ত গ্রন্থের (২য় সং) দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ ৬৩-৭৪। এই পরিচ্ছেদটি লুপ্ত 'সাম্য' গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদরূপে লিখিত হয়েছিল।

তত্ত্বের নানা ইতিহাস এবং ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র ধারাবাহিক ভাবেই দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জন স্টুয়ার্ট মিলের মতটাই তাঁর কাছে গ্রহণীয় হয়েছে বলে মনে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে বুদ্ধের নাম করেছেন; কিন্তু তিনি তখন যে সাম্যবাদের পক্ষপাতী সেটা ঠিক বুদ্ধের সাম্যবাদ নয়। অর্থনীতি রাজনীতি এবং সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে সাম্যবাদ য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে, বঙ্কিম তারই পক্ষপাতী। আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে মানুষের সমতার প্রশ্নে তিনি যান নি। পাশ্চাত্যে কল্পিত সাম্যবাদের সূত্রগুলি ভারতীয় সমাজে প্রয়োগ করবার জন্যই এদেশের অবস্থার নানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চিন্তা জীবনের প্রথম দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন তাতে প্রখর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের লক্ষণ আছে। পাশ্চাত্য নব্যবঙ্গের অনুবৃত্তিই তাঁর চিন্তায় দেখা গিয়েছে। কিন্তু একে মনীষা না বলে মনস্বিতা বলাই সংগত। কেবল বিচার এবং বিশ্লেষণের কৃতিত্ব নয় তার থেকে সুস্পষ্ট জীবন-দর্শন গড়ে তোলাতেই মনীষার পূর্ণ লক্ষণ। আমাদের নতুন শিক্ষিতের দল পাশ্চাত্য মনীষার দ্বারা যত প্রভাবিত হয়েছে নিজেরা ততখানি নতুন তত্ত্ব চিন্তা বা দর্শন গড়ে তুলতে পারে নি। হয়তো প্রথম যুগে এমনি বিচ্ছিন্ন ভাবেই ভাবনা দেখা দেয়— এদের সংহত হয়ে উঠে একটি সূত্রে ধরা দেওয়া পরের যুগেই ঘটে থাকে। য়ুরোপের রেনাসাঁসেও বিচ্ছিন্ন ভাবেই নানা দিক দিয়েই জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়েছে— ধর্মচিন্তায়, জাতীয়তাবোধে, বৈজ্ঞানিক দুঃসাহসিকতায় শিল্পকলায়। আমাদের নবজাগরণের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ সেকথা আগেই বলেছি। সমাজসংস্কারে, সাহিত্যিক কল্পনাভঙ্গিতে, বিতর্ক সভায় আলাপে আলোচনায় এর ইঙ্গিত দেখা দিচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই যুগেই কোনো একজনের মনে জীবনের সমগ্র অর্থটি ফুটে ওঠে নি। রেনাসাঁসের প্রথম উন্মাদনা কেটে গেলে য়ুরোপে বিভিন্ন মনীষী নবজাগরণের আলোর স্পর্শে নতুন করে জীবনের দিকে তাকালেন— জীবনের নানা অর্থ তাঁদের চেতনায় ধরা দিল। বিভিন্ন দর্শন, বিভিন্ন বিজ্ঞান, বিভিন্ন সাহিত্যিক কল্পনারীতির ভিতর দিয়ে মনস্বিতা মনীষায় রূপান্তরিত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ রচনার প্রথম যুগ পর্যন্ত তিনি জীবনের খণ্ডিত দিকগুলিরই ভাষ্য রচনা করেছেন। বঙ্গদর্শন সম্পাদনায় অগ্রসর হলে তাঁর প্রথম কাজই হয়েছিল বিভিন্নমুখী চিন্তাকে একটি কেন্দ্রে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসা। বঙ্কিমের নিজের প্রবন্ধগুলির ভিতরেও কোনো একটি সমগ্র দর্শন দেখা যায় নি। এই অর্থেই বঙ্কিমের প্রবন্ধগুলি নব্যবঙ্গদের মতই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন, কোনো পূর্ণ জীবনদর্শন থেকে উদ্‌ভূত নয় যদিও অনেক নতুন আইডিয়া তিনি পেয়েছেন, বিষয়-বিচারের অনেক পদ্ধতি তিনি আয়ত্ত করেছেন। এই সময় তিনি অভিজ্ঞতাবাদী এমপিরিসিস্ট। পারিপার্শ্বিক সমাজে, ইতিহাসে যে তথ্য সঞ্চিত হয়েছে, তারই সাক্ষ্য নিয়ে কতকগুলি চিন্তাকে তিনি গড়ে তুলেছেন। এই চিন্তাগুলি পরে একটা বৃহত্তর জীবনদর্শনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠবে। এদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ একটা বড় ভাবগ্রন্থি। 'ভারতকলঙ্ক' প্রবন্ধটি এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম বলেছেন "যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজির চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম— স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে তাহা হিন্দু জানিত না।" বঙ্কিম অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাশীলদের রচনা থেকেই মূলত প্রেরণা পেয়েছিলেন। জাতীয়তার লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যও তিনি তাঁদের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন বাক্‌ল্‌এর গ্রন্থ থেকে এই ইঙ্গিত পেয়ে থাকবেন। জাতীয়তাবাদের ভৌগোলিক কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা আধুনিককালে ফরাসী

লেখকরাই প্রথম আরম্ভ করেন।[১] ষোড়শ শতাব্দীতে Bodin বলেছিলেন শাসনতন্ত্র জাতি প্রকৃতি অনুযায়ী রচিত হওয়া উচিত। জাতিপ্রকৃতিও আবার ভৌগোলিক কারণে তৈরি হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মণ্টেস্কু এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। টেনের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস এই সূত্র অবলম্বনেই রচিত। বাক্‌ল্‌এর গ্রন্থ এই চিন্তারীতিরই ফল। এখানে উল্লেখযোগ্য, বঙ্কিমচন্দ্র এই চিন্তা দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত ছিলেন যে সাহিত্য সমালোচনাতেও তিনি এই নীতিকে পুরোপুরি স্বীকার করেছিলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটি তার দৃষ্টান্ত।

এগুলি আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন রচনার প্রস্তুতি। পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র র‍্যাশনালিজ্‌মের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু এ যুগের চিন্তার বীজগুলি কোনোটাই হারায় নি। হারবার্ট স্পেন্সারের সিন্থেটিক ফলজফির মত তিনি এক সংগতিপ্রাপ্ত দর্শন তৈরি করতে অনুপ্রাণিত হলেন, তাতে তাঁর এতদিনকার বিচ্ছিন্ন তত্ত্বসন্ধান যোগযুক্ত হয়ে পূর্ণায়ত হয়ে দাঁড়াল। বঙ্কিমের মনস্বিতা এবার এক অভিনব মনীষায় পরিণত হল। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দর্শনের নাম ধর্মতত্ত্ব। ধর্মতত্ত্বকে বোঝাবার জন্য 'কৃষ্ণচরিত্র' বইয়ের অবতারণা এবং গীতার ব্যাখ্যা।

৩

ইংলণ্ডে ধর্মকে পোপের শাসন থেকে মুক্ত করে যখন জাতীয়তার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হল, তখন রাজাই হলেন সেদেশের সমাজপতি। এই অবস্থার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা স্থূল সাদৃশ্য আছে। রাজাই সেকালে ছিলেন সমাজনেতা। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নদীয়ারাজ ধর্মরক্ষক সমাজনেতার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেব খানিকটা যেন এই দায়িত্বই পালন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের যে প্রভুত্ব ছিল, ইংরেজ আমলে ব্রাহ্মণের সেই প্রভুত্ব নেই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের অধিকার ভেদ ক্রমেই লোপ পেয়ে যাচ্ছে অন্তত রাজকীয় আইনের দৃষ্টিতে— একথা বঙ্কিমচন্দ্রই ইতিহাসের গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।[২] ইংলণ্ডে রাজা ধর্মনেতা হলেও ধর্মের স্বার্থ সেখানে গৌণ। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজ আলাদা হয়ে গিয়েছে। ধর্ম এখন সমাজেরই প্রতিপাল্য, রাজার নয়। এদিকে নতুন একটি মূল্যবোধ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় চিত্তকে আচ্ছন্ন করছে। দৈবক্রমে রাজাই এই মূল্যবোধের সংবাদ বহন করে এনেছিল। তাই রাজার বিরুদ্ধাচরণ করা যেন সেকালের বিবেকে বাধছে। নতুন পাওয়া মূল্যবোধকে আমাদের সমাজে গ্রাহ্য করার জন্য সমাজের ধর্মকেও নতুন হয়ে উঠতে হবে। সমাজের দায়িত্ব এখন অনেকটাই বেড়ে গেল। আগে সমাজের হাতে যে শাসন ও শক্তি ছিল, এখন সমাজ ও রাষ্ট্র ভিন্ন হয়ে যাওয়াতে সমাজের আর সেই শক্তি নেই। সুতরাং শক্তিকে বাহুবল নয়, আপন অন্তর্নিহিত স্বভাবধর্মে আয়ত্ত করতে হবে। সমস্যাটা হল অভিনব। রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রাপ্ত নতুন প্রাণের আদর্শকে অধিকার করা দরকার অথচ রাষ্ট্র এবং সমাজ আলাদা— রাষ্ট্রের শাসন সমাজের উপর নেই। রাষ্ট্র আলাদা হলেও

---

১ আধুনিকতর ঐতিহাসিকদের মতে ভৌগোলিক প্রভাব জাতীয়তাবাদের একমাত্র নয়, অন্যতম কারণ মাত্র। দ্রষ্টব্য Sir Ernest Barker, *Nationalism.*

২ ভারতকলঙ্ক।

ক্ষমতাহীন সমাজকে আবার কি করে শক্তিশালী করে তোলা যায়, সমস্যাটা কেন্দ্রীভূত হল সেখানেই। আমরা একালে প্রশ্ন করেছি, সমাজকে যে মানতেই হবে[১] ব্যক্তিকে নিরুদ্ধ করেও, এ কথাই বা নির্বিচারে মেনে নেব কেন?

আমাদের দেশে যোগাযোগ ভিন্ন হলেও খানিকটা এ ধরণের সমস্যা য়ুরোপে কয়েক শতাব্দী ধরে চলে এসেছে। চার্চের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্‌ভব হল। সেকালের ধর্মীয় শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক নৈতিক এবং বুদ্ধিগত সংযম ছিল যুক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং নৈতিক বিশৃঙ্খলা অবশেষে ইতালীতে মেকিয়াভেলীর মতবাদকে সম্ভব করে তুলল। আবার সেই সঙ্গে মনের জড়তা কেটে গেলে নানাদিকে প্রতিভার আশ্চর্য অভ্যুদয় ঘটল। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেছেন,

But such a society is unstable. The Reformation and the Counter Reformation combined with the subjection of Italy to Spain put an end to both the good and the bad of the Italian Renaissance when the movement spread north of the Alps, it had not the same anarchic character.[২]

রাসেল এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা বলেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমাজবন্ধনের লক্ষণ দেখা দিল। প্রকৃতির বশ্যতামুক্ত মানুষ শ্রমশিল্পের প্রসারের সঙ্গে অনেক বেশি ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। এই ক্ষমতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, সমাজকেন্দ্রিক। বিজ্ঞান সাধনায় বহু ব্যক্তির সম্মিলিত সহযোগিতার দরকার।

Its tendency therefore is against anarchism and even individualism since it demands a wellknit social structure. Unlike religion it is ethically neutral.[৩]

এই নতুন সমাজসৃষ্টি য়ুরোপের মুক্তবুদ্ধি অনন্যতন্ত্র জাতির মধ্যে যে রূপ নিয়েছে আমাদের দেশে তা হয় নি। কিন্তু এটাও সত্য যে আমাদের আধুনিক সমাজ প্রাচীন সমাজ থেকে অনেকটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র এটা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন। দেবভীতিগ্রস্ত নির্বিচার বিশ্বাসচালিত গোষ্ঠীবদ্ধ আচারপরায়ণ সমাজের চেহারা যে পরিবর্তিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোযোগ রাজনৈতিক সামাজিক প্রবন্ধে বিশেষ করে ধর্মতত্ত্বে প্রকাশিত। য়ুরোপের মত বৈজ্ঞানিক উদ্যমই হয়তো এর কারণ নয়। তবে মার্জিত শিক্ষিত বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রের আরোপিত জীবনযাত্রার নির্দেশ এবং জীবিকা সংস্থানের নতুনতর পদ্ধতির ফলে স্বভাবতই এক নতুন সমাজের বিকাশ ঘটল। এই সমাজ যে অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বঙ্কিম সেই দিকে নিবদ্ধলক্ষ্য থেকেই ধর্মতত্ত্বে সমাজকে

---

১ ধর্মতত্ত্ব দশম অধ্যায়। সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে মনুষ্যের যত গুণ আছে সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমৎ "মানবদেবীর" পূজার বিধান করিয়াছেন।

২ Bertrand Russell, *History of Eastern Philosophy*, 1946, p. 513.

৩ ঐ p. 514.

ভক্তি করতে বলেছেন। সহজ করে বলতে গেলে রঘুনন্দন সমাজ বলতে যা বুঝতেন বঙ্কিম তা বোঝেন না। এখনকার সংস্কৃতিসম্পন্ন শিক্ষিত মানুষ বিশ্বের ভূমিকায় যে সমাজকে বুঝে থাকেন, এ যুগে বঙ্কিমচন্দ্রই সেই অর্থে 'সমাজ' কথাটির প্রথম প্রয়োগ করেন।

ইংলণ্ডেও নতুন সমাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর র‍্যাশনালিজ্‌ম্‌ এমন একটা চরম আকার ধারণ করেছিল যে ঐতিহাসিক বলেছেন—

Christianity was held to exist not to be lived but like a proposition in Euclid only to be proved.[১]

সাহিত্যে ভাবের অগভীরতা প্রকাশের ঋজুতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হল। বিশ্বের যান্ত্রিক নিয়মে এল একটা সাধারণ বিশ্বাস। ধর্ম এবং দর্শনের মূল্যমান নির্ধারিত হল নিছক যুক্তিতে। কোনো যুগেই নাকি ধর্ম নিয়ে এত লেখা হয় নি যদিও ধর্মপালনে এত উদাসীনতাও কোনো যুগে দেখা যায় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই র‍্যাশনালিজ্‌ম্‌ রেনাসাঁসের increasing authority of science এরই ফল। ব্যক্তির ক্রমবন্ধন-মোচনের ফলে হব্‌স্‌এর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং গাণিতিক যুক্তিপ্রবণতার উদ্ভব হয়েছিল। এই যুক্তি-প্রবণতার ফলে জীবন থেকে অলৌকিক এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাস অন্তর্হিত হবার উপক্রম হল। ব্যক্তিকেন্দ্রিক চিন্তার নানা মত ও বিশ্বাসের সঙ্গে সুশৃঙ্খল সমাজের সংগতি ঘটানো প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটেই ছিল প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। তারই সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত 'ন্যাচারাল রিলিজিয়ন'[২] এবং 'রিভিল্‌ড রিলিজিয়ন' নিয়ে বিবাদ। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদিতায় ইউটিলিটারিয়ান মতবাদের উদ্ভব। এই মতবাদের লক্ষ্য ছিল সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন। আপাতদৃষ্টিতে খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এই মতের প্রবক্তা বেন্থাম ধর্মকে সমালোচনা করে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৩] কিন্তু আসলে খ্রীস্টীয় করুণাবৃত্তিরই একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত প্রয়োগই ছিল ইউটিলিটারিয়ানদের উদ্দেশ্য। এর কিছুদিনের মধ্যেই ফ্রান্সে অগাস্ট কোমতের আবির্ভাব। কোমতীয় দর্শনে ঐতিহাসিক ধারা নির্দেশের দ্বারা ভগ্নোন্মুখ সমাজকে রক্ষা করে দৈবাদিষ্ট খ্রীস্ট ধর্মের মানবিক দিকটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এই তিনটি প্রচেষ্টাই ভিক্টোরিয় যুগে উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করেছে সেই সময় রূঢ়তম আঘাত দিল ডারুয়িনের মতবাদ। তার ফলে ম্যাথু আর্নলড্‌ বলতে বাধ্য হলেন 'ধর্ম আর আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না'। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে যুক্তিবাদ আধুনিক চিত্তকে অধিকার করেছে তাকে অস্বীকার করা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। ইংলণ্ডের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা বুঝলেন ধর্মকেও র‍্যাশনালাইজ করার দরকার হয়ে পড়েছে। ধর্মের মূল মহিমা সম্বন্ধে তাঁদের সংশয় ছিল না, শুধু তাকে আধুনিক যুক্তির কষ্টিপাথরে উজ্জ্বল করে তোলা দরকার।

---

১ Caroline Spurgeon, *Cambridge History of English Literature,* Vol. 9, Ch. XII.

২ "The philosophy of natural law, of natural religion, of natural economy was rooted in both the intellectual and the social presumptions of the Seventeenth Century."—Sabine. *A History of Political Theory,* 1956.

৩ *Church of England Catechism Explained.*

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ধর্মকে গড়বার চেষ্টা হয়েছে। কোলরিজ, টমাস আর্নলড, কার্ডিনাল নিউম্যান এ বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। এঁদের মধ্যে টমাস আর্নলডই বোধহয় সবচেয়ে উদারপন্থী ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিকেরা ভেবেছিলেন অতীতের উত্তরাধিকারকে অস্বীকার করেই পূর্ণতা লভ্য। জীবন ( Nature ) এবং যুক্তিকে ( Reason ) অনুসরণ করাই মানুষের কর্তব্য। মানুষের জীবনের জটিলতা কোলরিজ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছেন আত্মিক শক্তি দ্বারাই জাতি মুক্তি পেতে পারে। কার্ডিনাল নিউম্যানও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাস অবিচল রেখেছিলেন। খ্রীস্টীয় ধর্মের পূর্ব গৌরবকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাতেই তাঁর নেতৃত্বে 'Oxford Movement' আরম্ভ হয়েছিল। 'ন্যাচারাল রিলিজিয়নে'র মতবাদের যুগে নিউম্যানই আগের 'রিভিলড রিলিজিয়নে'র বিশ্বাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিউম্যান ব্যক্তিগতভাবে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারলেও তাঁর ধর্মান্দোলন ঠিক বল সঞ্চয় করতে পারল না। রাগবীর হেডমাস্টার টমাস আর্নলড যুগপ্রবণতাকে ঠিকই বুঝেছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন জাতির স্বার্থ ও ধর্মের শক্তি পরস্পরকে প্রভাবিত করে নতুন যুগের সূচনা করবে। তাঁর মতে সত্যের সন্ধানে যুগকে ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যায়। শাস্ত্রের গোঁড়ামি তিনি বর্জন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিউম্যানের কাছে এগুলিও অপরিত্যাজ্য। জাতিচেতনার এবং ধর্মচেতনার সমন্বয়ের যে কল্পনা আর্নলড করেছিলেন, তার দ্বারা ধর্মের একটা নতুন আদর্শ তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

Arnold and Newman, indeed, may be taken to symbolize the two conflicting trends in the nineteenth century religious thought : Arnold ethical and liberal aiming at the promotion of goodness by Christian gentleman ; Newman mystical and dogmatic aiming at the production of saints by an infallible church.[১]

কার্ডিনাল নিউম্যানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ডারুয়িনের *Origin of Species* প্রকাশিত হল। পর বৎসরই বেরোল *Essays and Reviews.* বইটি ছোট কিন্তু সেকালের চিন্তাজগতে আলোড়ন নিয়ে এল। বইয়ের লেখক ছিলেন সাতজন পাদ্রী। কিন্তু তাঁরা ধিকৃকৃত হলেন 'Septem Contra Christum'—the seven champions not of christiandom' বলে। এই ছোট বইটির উদ্দেশ্য ছিল খ্রীস্টধর্ম ও নতুন জিজ্ঞাসার মধ্যে সংগতি আনা, যুগের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় করা। লেকি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ইংলণ্ডের সমাজের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন,

No change in English life during the latter half of the nineteenth century is more conspicuous than the great enlargement of the range of permissible opinions on religions subjects. Opinions and arguments which not many years ago were confined to small circles and would drawn down grave social penalties, have become the commn places of the drawing-room and of the boudoir. The first very marked change in this respect followed, I think,

১ Basil Willey, *Nineteenth Century Studies* (1949), pp. 84-85.

the publication in 1860 of the "Essays and Reviews", and the effect of this book in making the religious questions which it discussed familiar to the great body of educated men was probably by far the most important of its consequences.[১]

এই বইটির সঙ্গে লেকি, রেনান বাক্‌ল কলেনাসা এবং ডারউইনের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছিলেন, এর সঙ্গে ছিল জার্মান এবং ডাচ ভাষায় বাইবেলের আলোচনার প্রভাব।

৪

বাংলাদেশের পরিবর্তমান যুগে সমাজের পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ইংলণ্ডের এই আধ্যাত্মিক সংকটের ইতিহাস থেকে অনেকখানি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তবে প্রথমেই এই কথাটা বলে দেওয়া ভালো যে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার প্রথম যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ঠিক এই ধরণের ভাবনাটা আসে নি। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি অষ্টাদশ শতাব্দীর মনন প্রণালীর সূত্রগুলি তিনি আয়ত্ত করেছেন। এই প্রণালী শেষ পর্যন্ত কখনোই তিনি ত্যাগ করেন নি সত্য কিন্তু প্রথম যুগে মানব অস্তিত্বের সমগ্র অর্থ সন্ধান করবার কথা তাঁর মনে হয় নি। নতুন যুগে পাওয়া কতকগুলি আইডিয়া পাশ্চাত্য মননসূত্রে বিচার করে আমাদের দেশে তাদের প্রয়োগের উপযুক্ততার কথাই তিনি ভেবেছিলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে চিন্তার গভীরতা এবং নিবিড়তা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আইডিয়াগুলি মানবজীবনের সমগ্র অর্থে অর্থান্বিত হয়ে উঠল।

এ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত দুটি বই তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। দুটিরই গ্রন্থাকার ছিলেন সার জন রবার্ট সীলি (১৮৩৪-১৮৯৫)। সীলির প্রথম বই *Ecce Homo* বেনামীতে বেরিয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় বই *Natural Religion* বেরিয়েছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল সীলি তাঁর বইতে তার একটা মীমাংসা করতে চাইলেন। সীলি যে ভাবে সমাধান চেয়েছিলেন সেটা সে যুগের সংস্কৃতি-ভাবনা থেকে এসেছিল। এই সময় ম্যাথ্যু আর্নলড অন্য আশ্রয় যথোপযুক্ত না ভেবে সংস্কৃতির মার্জিত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে গিয়েছিলেন। সীলি বলছেন,

The age calls not merely for a revival of the essential spirit of christianity, though this too is needed but for new elements of religion which though not opposed to Christianity are yet scarcely to be discovered in it.··· In it his opposition [spirit of opposition to secularity] there is much which does not seem to have been inspired by Christianity nor even of religion at all: it prefers to call itself culture.

It is concerned more with art and science than with self-sacrifice or charity..

On the same principle Religion has been revived under the artificial name of culture.

---

১ Lecky, *Democracy and Liberty*, Vol. I (1908), pp. 510-511.

Thus instead of saying that the substance of religions is morality and the effect of it moral goodness we lay it down that the substance of religion is culture and the fruit of it higher life.[১]

উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক অংশটির মধ্যে প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে এই কয়টি ১. এ যুগে এমন কতকগুলি নতুন উপাদানকে স্বীকার করতে হবে, যা হয়তো প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে নেই। ২. এ যুগে যে নতুন মূল্য বোধ ধর্মের প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে সংস্কৃতি বা Culture. ৩. কালচার হচ্ছে কলা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত ৪. সংস্কৃতিই ধর্মের স্থান নিচ্ছে ৫. ধর্মের সার নীতি এ কথা না বলে বলা উচিত ধর্মের সার হচ্ছে সংস্কৃতি। যে সমস্যা থেকে সীলি কালচারের তত্ত্বে পৌছেছিলেন বঙ্কিমের মনীষাও সেখানেই সমাধান খুঁজেছে। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত যে পংক্তিটি বঙ্কিমের প্রয়োগের ফলে বিখ্যাত হয়েছে, তার সঙ্গে কিন্তু বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বের সাদৃশ্য দূরান্তরিত। ইংরেজি শব্দটির সহজ বাংলা করলে যে শব্দটি পাওয়া যায়, তাকেই অবলম্বন করে বঙ্কিম অনুশীলন তত্ত্বের সৌধ গড়েছেন। সীলি যে অর্থে 'কালচার' কথাটি ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে একে প্রায় ধর্মীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করেন গ্যেটে। সত্য ও সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাসী কার্লাইল এর উচ্ছ্বাস বহন করে আনেন ইংলণ্ডে। কালচার নিয়ে cult সৃষ্টি গ্যেটে এবং শিলারই করেন এবং ধর্মচেতনাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেন। রঙ্গালয় এবং শিক্ষালয়গুলি কালচারের পীঠস্থানে পরিণত হয়। গ্যেটে কালচারের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন 'Life in the Whole, in the Good, in the Beautiful'. অখণ্ডতাবোধ এবং সৌন্দর্যবোধের মধ্যস্থলে নীতিবোধের স্থান। সাম্প্রদায়িক নীতিবোধ নয়, অখণ্ড সৌন্দর্যচেতনা থেকে উৎপন্ন ভিন্নতর নীতিবোধই তাঁর কাম্য ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম ঠিক এ রকম নয়। তাঁর ধর্ম কর্মাত্মক। সমাজের উপযুক্ত হবার জন্য ব্যক্তির বৃত্তির কর্ষণ। মানুষ তার স্বভাবধর্মকে কাল্পনিক আদর্শে পরিবর্তিত না করে বিকাশের জন্য সমানভাবে কর্ষণ করবে। বঙ্কিম চেয়েছেন সামাজিকরূপে মানুষের অস্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে। আত্মকেন্দ্রিক অথবা দুর্বল মস্তিষ্কসর্বস্ব কিংবা হৃদয়হীন রসবিলাসী কোনো রকম মানুষকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন নি। কেউ কেউ মনে করেছেন বৃত্তির সমঞ্জস অনুশীলনের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্রের রচনা থেকে পেয়েছিলেন।[২] কথাটা ঠিক নয়। কালীনাথ দত্ত লিখেছেন,

"বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার বর্তমান সাহিত্যের বিশেষতঃ ধর্ম সাহিত্যের কোন ধারই ধারিতেন না এবং কোন সংবাদই লইতেন না। ইহা তাঁহার ন্যায় একজন ধর্মনেতা ও বঙ্গসাহিত্যপোতের কর্ণধারের পক্ষে বড়ই শোচনীয় অভাব।"[৩]

অনুশীলনের ভাবটি বঙ্কিম কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তার ইঙ্গিত তিনি নিজেই রেখে গিয়েছেন।

Religion, in itself expresses the state of perfect unity which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society when

---

১ Seeley, *Natural Religion* (1882), pp. 142-145.

২ কাজী আবদুল ওদুদ 'বাংলার জাগরণ' ( বিশ্বভারতী ১৩৬৩ ) পৃ ১০১

৩ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃ ২৩৪

all the constituent parts of his nature, moral and physical are made habitually to converge towards one common purpose.

কোমতের এই মতটি তিনি ধর্মতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন।[১] হারবার্ট স্পেন্সারও তাঁর *Data of Ethics* গ্রন্থে মানুষের অসমঞ্জস আচরণের কুফলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।[২] ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে কৃতকর্মের জন্য দায়ী করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার আশা ও গৌরব করেছেন; তার সূত্রপাত ইউটিলিটারিয়ানদের চিন্তায়। সামঞ্জস্যের অভাবই দুঃখ— বঙ্কিমের এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের মতবাদে। মিল বলেন মানুষের সব দুঃখই দূর করা সম্ভব। সমাজের সুষ্ঠু বিধানে ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে দারিদ্র্য দুঃখকেও নিশ্চিহ্ন করা যায়। এমন-কি শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষায় মানবদেহের রোগকেও অকিঞ্চিৎকর করে তোলা যায়—

As for the vicissitude of fortune and other disappointments connected with worldly circumstances these are principally the effect either of gross imprudence of ill regulated desires or of bad or imperfect social institutions. All the grand sources in short of human suffering are in a great degree many of the almost entirely conquerable by human care and effort.[৩]

ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম যে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন মিলের এই উক্তিতে তারই সংকেত পাওয়া যায়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বঙ্কিম বলেছিলেন শেষের দিকে তাঁর উপর মিলের প্রভাব নাকি ছিল না।[৪] কথাটার অর্থ আমরা এই ধরতে পারি যে মিলের অন্ধ অনুকরণ তিনি আর করেন নি। কিন্তু তাঁর মনীষা যে এঁদের দানে পুষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মিলের প্রভাবে প্রভাবিত সাম্য প্রবন্ধটি তিনি আর ছাপেন নি— এই ঘটনাকেই অনেকেই মনে করেছেন বঙ্কিমের চিন্তাশীলতার পশ্চাদ্‌গমন। বঙ্কিম নিজেও বলেছিলেন 'সাম্যটা সব ভুল'। সাম্য প্রবন্ধে আসলে পরের মতের বিশেষত মিলের মতের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি আছে? আর যা আছে, তা তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ধর্মতত্ত্ব রচনার সময় স্বভাবতই তিনি সাম্যতত্ত্বে আস্থা রাখতে পারেন নি। ব্যক্তির বৃত্তির অনুশীলন ও সাফল্যের মতবাদের সঙ্গে সাম্যের মতবাদ খাপ খায় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস গভীর বলে অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির যোগ্যতা অর্জনের অধিকারকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না; বাইরের থেকে আরোপিত সাম্য সেখানে অস্বাভাবিক ও অসংগত। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বিরোধী বলে মনে হলেও আসলে তিনি ব্যক্তিত্ববাদী।

আসলে বঙ্কিম যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন তা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ নির্ণয়। আগেই বলেছি এই সমাজ পুরনো সমাজ নয়। এর প্রমাণ ধর্মতত্ত্বের মধ্যেই আছে। বিবর্তনবাদ আধুনিক চিন্তার একটি প্রধান বিষয়। অবশ্য বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে মতবৈষম্য আছে। কোম্‌ত সমাজের প্রগতির যে ব্যাখ্যা

১ ধর্মতত্ত্ব ক্রোড়পত্র খ

২ বঙ্কিম কর্তৃক উদ্ধৃত। ধর্মতত্ত্ব ক্রোড়পত্র গ।

৩ J. S. Mill, *Utilitarianism* (Everyman edition), p. 9.

৪ বঙ্কিমপ্রসঙ্গ পৃ ১৯৮

করেছেন ডারুয়িনের ব্যাখ্যাত বিষয় তার থেকে আলাদা। ডারুয়িনের মতের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ছিলেন।[১] ডারুয়িনের মত খ্রীষ্টান সমাজের মধ্যে আলোড়ন আনলেও বঙ্কিমকে বিশেষ উদ্বিগ্ন করে নি। কারণ বঙ্কিম অতিলৌকিককে বর্জন করেই আলোচনা করেছেন। সুতরাং বিবর্তনবাদ তাঁর কাছে বিশেষ উদ্বেগজনক নয়। বিশেষ করে সমাজনীতির ভাবনাই তাঁর প্রধান ছিল বলে নৈতিক বিবর্তনই তাঁর বিশেষ বিবেচ্য। কোম্‌তের মত তাঁকে যত সাহায্য করেছিল, যুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে আর কোনো মতই তাঁকে তত সাহায্য করে নি।

"শিক্ষা যে ধর্মের অংশ ইহা কোম্‌তের মত।

হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি?"[২]

সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমেই ধর্মসচেতন হয়ে ওঠে এটা সত্য যদিও হয় তবে এটাও সত্য যে তার সঙ্গে ধর্মের স্বরূপও পরিবর্তিত হয়। কোম্‌তের যুগে 'মানবতা' সেই ধর্মের স্থান নিয়েছে। ইতিপূর্বেই দেখা গিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র কোম্‌তকে অনুসরণ করে ধর্ম অর্থে মানবতাকেই মোটামুটি ধরেছেন। এখানে বঙ্কিমের আর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য—

"বৈজ্ঞানিক যখন 'Law'র মহিমা কীর্তন করেন আর আমি যখন হরিনাম করি দুইজন একই কথা বলি। দুইজনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি।"[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তার প্রভাব বঙ্কিমের উপর কত প্রবল এই উক্তিতেই বুঝতে পারা যাবে। অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে এমন-কি সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বঙ্কিম অনুশীলন তত্ত্বের কল্পনা করেছেন। স্পেন্সার ও মিল থেকে প্রেরণা পেলেও এই তত্ত্বকে তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায়, গীতা এবং কৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতীয় মনীষার লক্ষণ বিচার করেছি। হিন্দু শাস্ত্র পুরাণ থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিয়েছেন সত্য কিন্তু বঙ্কিমমনীষা যে dogmatic নয়, এই দীর্ঘ আলোচনায় আশা করি তার কিছুটা আভাস পাওয়া গিয়েছে। অনুশীলন তত্ত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপনে তিনি যদি কৃষ্ণচরিত্রকেই অবলম্বন করে থাকেন, তাতেও আসলে কোনো গোঁড়ামি নেই। সীলি তাঁর মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যিশুখ্রীষ্টের জীবনীকে নতুন করে আধুনিক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বইয়ের নাম 'Ecce Homo'—Behold the Man. তিনি মানুষকেই দেখতে চেয়েছেন—

They may be obliged to reconsider the hole subject from the beginning and placing themseves in imagination at the time when we call Christ bore no such name, but was simply, as St. Luke describes him, a young men of promise, popular with those who knew him and appearing to enjoy the Divine favour, to trace his biography from point to point, and accept those conclusions about him, not which church doctors or even apostles have scaled

১ দ্রষ্টব্য 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে'।

২ ধর্মতত্ত্ব পঞ্চম অধ্যায়

৩ ধর্মতত্ত্ব ষষ্ঠ অধ্যায়

with their authority, but which the facts themselves, critically weighed, appear to warrant.[১]

বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রের দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, "কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য।"

সীলির গ্রন্থ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ পেয়েছিলেন। সীলি খ্রীষ্টের যুগোপযোগী জীবনভাষ্য রচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অনুশীলনতত্ত্বের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন অলৌকিকতাবর্জিত যুক্তিসঙ্গত আলোচনায়। সীলির গ্রন্থ গোঁড়া খ্রীষ্টানদের খুশি করে নি। বঙ্কিমের আলোচনাতেও বৈষ্ণব ভক্তরা খুশি হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেও অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় বলেছিলেন—

"সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতার উপরও যে শুদ্ধতরা সাত্ত্বিকতরা ভক্তি আছে যাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং আচরণ করিয়া পরকে শিখাইয়াছিলেন বঙ্কিম সে পর্যন্ত পৌছিতে পারেন নাই। বৈষ্ণবগণের ভাষায় তিনি বড় জোর শান্ত রস পর্যন্ত পৌছিয়াছিলেন— তার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই! বঙ্কিমের প্রচারিত ভক্তির অনেকটাই যেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া।"[২]

এই মন্তব্যটি আসলে বঙ্কিমের অসামান্য মনীষার পরোক্ষ প্রশস্তি ছাড়া কিছুই নয়।

১ Seeley, *Ecce Homo*, 1866, Preface গ্রন্থটির প্রকাশের সময় লেখকের নাম ছিল না।

২ অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, 'বঙ্কিমচন্দ্র' পৃ. ৩৭৬

শিলার

১৭৫৯ - ১৮০৫

A Tischbein অঙ্কিত চিত্র হইতে

# শিল্পাচার্য শিলার

জার্মানিতে শিলারের জন্ম। সেই জন্মদিন আজ থেকে দু শো বছর আগে, ১০ই নভেম্বর। কিন্তু আজও তাঁর জন্মভূমিতে তিনি অন্যতম একজন সমকালীন কবি। এর কারণ স্পষ্ট। বিভক্ত জার্মানির ভগ্নহৃদয় শুধু বার্লিনের দিকে তাকালেই তো চোখে পড়ে। এই নগরের দুই অংশে আজ সব-কিছুই দ্বিধাদীর্ণ। মুদ্রাবিন্যাস, শাসনপ্রথা, খবরের কাগজ, নীতিমূল্য— এক অংশ থেকে আর এক অংশ সব দিক থেকেই বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন। এ ওর মুখ দেখলে চম্‌কে ওঠে, আর দুয়ের মধ্যে আরোপিত ভেদরেখা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু অনিশ্চিতভাগ্য দুটি ভগ্নাংশের অতলে একটি অভিন্ন হৃদয়ের মত ভূগর্ভস্থ জলসরবরাহ-ব্যবস্থা। পরস্পরবিশ্লিষ্ট দুই জার্মানির ভিতরে-ভিতরে আজ একই স্বপ্ন, একটিই এষণা। শিলারের রচনায় সেই স্বপ্নৈষণা যত সহজে আশ্রয় পায়, এমন বোধ হয় আর কোনো তদ্দেশীয় কবিতে নয়। বলা বাহুল্য, কোনো প্রকটিত জাতীয়তাবোধের প্রতিনিধিত্ব এই লোকপ্রিয়তার হেতু নয়। রবীন্দ্রনাথের মতই, শিলারের 'স্বদেশে'র মূলে বিশ্বজগৎ বিধৃত হয়ে আছে। আর সেই বিস্তীর্ণ স্বাদেশিকতার লক্ষ্য হল সর্বমানুষের মুক্তিকামনা। শিলারের অধিকাংশ রচনার নায়ক হল সৈনিক। এবং তাঁর যাবতীয় রচনার মূলসূত্রটি মুক্তিরস।

'ভিল্‌হেল্‌ম টেল' নাটকের শেষ পংক্তিটি লক্ষ্য করলেই উপরের কথাটি বিশদ হতে পারবে। সুইৎসারল্যাণ্ডের বিপ্লবনায়কের অপূর্ব এই আলেখ্য যখন চিত্রিত হয়ে গেছে, পাহাড় থেকে গান ভেসে আসছে, 'সুইৎসারল্যাণ্ডের মুক্ত নারীর সঙ্গে মুক্ত পুরুষের' সেই মিলনমুহূর্তে রুডেন্‌ৎস বলে উঠল—

'আজ থেকে আমার সমস্ত ভৃত্য সম্পূর্ণ স্বাধীন'

প্রসঙ্গ থেকে ছিন্ন করে নিলে এই ছত্রটি শুধু কবিত্বহীন নয়, নাটকের পক্ষেই অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু সব মিলিয়ে সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার যে ব্যঞ্জনা এই কাব্যনাট্যে ছড়িয়ে আছে, এই বিবৃতি তারই অন্তর্ভুক্ত, তারই সম্পূরক। 'পিক্কোলোমিনি' নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে কোলরিজ শিলারের বিশেষ এক ধরণের নাটকের সঙ্গে শেক্সপীয়রীয় ঐতিহাসিক নাট্যবৃত্তের তুলনা করেছিলেন। সে ক্ষেত্রে গঠনশিল্পগত মন্থরতার কথাই কোলরিজ বলতে চেয়েছিলেন। কথাটাকে যদি যৌক্তিক সিদ্ধান্তে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে বোঝা যাবে, ইতিহাসের মধ্য থেকে মুক্তিসংগ্রামী মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিষ্ঠা ফুটিয়ে তোলা শিলারের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল। ইতিহাসের ভিতর থেকে মানবাত্মার এই অবারিত উন্মোচন তিনি যে ভাবে এঁকে গিয়েছেন তার উন্নত ভাবগ্রাম রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকের সঙ্গেই তুলনীয়। 'কালান্তর' অথবা 'সভ্যতার সংকটে'র মত ঋজুবাক্ সাবধানবার্তা তিনিও শুনিয়েছেন: 'আর সমস্ত যেমন, মানুষের সত্তাও তেমনি ইচ্ছাশক্তিতে মণ্ডিত। সুতরাং, সেই কারণেই, শক্তির স্বেচ্ছাচারের মত মানুষের পক্ষে এমন অনপনেয় কলঙ্কের আর কিছুই নেই। শক্তি দিয়ে যে আমাদের হানে, সে মনুষ্যত্বব্যাপারের উপরেই অনাস্থাকুটিল। কাপুরুষের মতো যদি কেউ তার কাছে মাথা নত করে, তবে সেও তার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিয়ে ফেলে।'[১]

তাঁর এই বলিষ্ঠ ইতিহাস-প্রাণনা যে তাঁর অনুব্রতী থিয়োডোর ক্যের্ন অথবা হারওয়েম -এর মত

১ 'উদ্বোধন সম্পর্কে' 'Über das Erhabane'

শীর্ণচেতা নয়, সেটি বোঝাতে গিয়ে একজন লেখক প্রথমোক্ত জনের কাছে লেখা শিলারের চিঠি থেকে একটি অমূল্য অংশ উদ্‌ধৃত করেছেন—

'তোমরা জার্মানেরা মিথ্যেই নিজেদের নিয়ে একটা জাতি গড়তে চাইছ ; তার পরিবর্তে বরং তোমরা স্বাধীনতর মানুষ হতে চেষ্টা করো। সেটাই সহজ হবে।'[১]

যা স্বদেশজ সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন, সেই মানবীয় মুক্তিকে তিনি সবচেয়ে সহজ তত্ত্ব বললেন। বন্ধন আছে, তা থেকে মুক্ত হতে হবে, আরও মুক্ত হতে হবে, এবং তার পরে আরও। তাঁর নন্দনতত্ত্বেও এই ক্রমমুক্তির আস্পৃহা সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

শিলার স্বচ্ছ করে সব কথা বুঝে উঠতে পারেন নি, এরকম অভিযোগ করলেও ক্রোচে তাঁর প্রাসঙ্গিক চিন্তাধারণার যে সারসংকলন করেছেন, সেটি তাৎপর্যপূর্ণ: 'খেলা কথাটা বলতে গিয়ে spielএর মত একটা অসংলগ্ন শব্দ শিলার ব্যবহার করেছেন। তিনি এর সাহায্যে সাধারণ খেলাধুলো বোঝাতে চান নি, অথবা কোনো বাস্তবিক আমোদকৌতুকও নিশ্চয়ই তাঁর বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল না। শিলারের কাছে উদ্দিষ্ট খেলার পৃথিবীটা চিন্তা আর অনুভূতির মাঝখানে। শিল্পে প্রয়োজনবাদ সরে গিয়ে মুক্ত প্রাণের অবাধ বিকাশ দেখা দেয়। স্বভাব আর প্রকৃতি, বস্তু আর রূপের দ্বন্দ্ব সেখানে মীমাংসিত হয়। সুন্দর হল জীবন, কিন্তু সে জীবন জৈব জীবন নয়। একটি সুন্দর মূর্তির জীবন আছে, একটি জীবিত লোকের তা নাও থাকতে পারে। শিল্প প্রকৃতিকে রূপকল্প অথবা প্রকরণ দিয়ে জয় করে। মহৎ শিল্পী বস্তুকে রূপ দিয়ে মুছে দিতে পারেন। একজন শিল্পীর শিল্পকর্মের বস্তুত্ব সম্বন্ধে আমরা যত কম সচেতন থাকি ততই সেই শিল্পীর মঙ্গল বা মহত্ত্ব। রসগ্রাহীর সত্তা যেন শিল্পকর্ম থেকে সেই পবিত্রতা সেই পরিশুদ্ধি লাভ করে যা শিল্পীর রচনাসমাপনের সময়ে তার মধ্যে ছিল। তুচ্ছ বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার মত নমনীয় করে তুলতে হবে। এর বিপরীতও সত্য। মানুষ যখন নিজেকে পৃথিবীর বহির্ভূত রেখে তাকে নন্দনদৃষ্টিতে দেখতে পারবে, সেই দেখাটাই সত্যদর্শন। যখন সে ইন্দ্রিয় সংবেদনের নিষ্ক্রিয় গ্রাহক মাত্র, সে তখন পৃথিবীর সঙ্গে এক, একাকার— সে কি ক'রে তখন পৃথিবীকে উপলব্ধি করবে? শিল্প হল নিয়তিকৃত নিয়মরহিত। শিল্পের মধ্যস্থতায় মানুষ ইন্দ্রিয়পুঞ্জের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, আর সেইসঙ্গে যুক্তি ও নীতি-ঘটিত দায়িত্ব থেকে ছুটি পেয়ে সুস্থির ধ্যানের সচ্ছল অবকাশ এক মুহূর্তের জন্য যাপন করে।'[২]

ক্রোচের কণ্ঠস্বর, এই এক অনুচ্ছেদব্যাপী প্রতিবেদনের মধ্যেই, বেশ অসহিষ্ণু। আসলে কান্টের প্রতি অনুরাগবশত তাঁরই মত শিলার ভাব ও রূপের অতিশায়ী অথচ ভাবরূপান্বয়ী যে স্তরটির কথা বলেছিলেন, সেটিকে অঙ্কের মত প্রমাণ করেন নি বলে ক্রোচের বিরক্তি। সেই অতিমানসের স্বর্লোকটিকে অস্বীকার করতে পেরেছেন বলে রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে বেনেদেত্তো ক্রোচে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন, তা যে অনেকটাই অবান্তর, শিলারের রচনা থেকেই তার যথেষ্ট নজির মিলবে। শিলারের ঈপ্সিত অতি-মানসের জগৎটি কান্টের পথেই প্রস্তাবিত, কিন্তু কান্টের চেয়ে তা স্পষ্টতর। প্রকৃতি ও ব্যক্তিপ্রকৃতির মধ্যে বিভাজিকা সূত্রে তিনি নানা জায়গায় যেসব কথা বলেছেন তার দু-একটি অনুধাবন করলেই এক সঙ্গে

১ পর-পর দুটি উৎকলনই Benno Von Wiese-র *Schiller* পুস্তিকা থেকে গৃহীত।

২ হাইডেলবার্গে দার্শনিকদের সভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতাটির নাম "Pure Intuition and the Lyrical Character of Art"

ক্রোচের অভিযোগের উত্তর দেওয়া হবে আর আমাদের ধারণাও অনেকটা পরিচ্ছন্ন হয়ে আসবে। শিলার তাঁর নন্দনতত্ত্ববিষয়ক পত্রাবলীর তৃতীয় পত্রে বলেছেন: 'মানুষ তার জন্মমুহূর্তে প্রকৃতির কাছে তেমন-কিছু বিশেষরকম সদয় বিবেচনার পরিচয় পায় না· ·কিন্তু যেহেতু সে মানুষ তাই সে স্বভাবজঙ্গম, সে তো কখনোই প্রকৃতিনির্দিষ্ট অনিশ্চয়তার মধ্যে বসে থাকতে পারে না। মানুষ তার মনন দিয়ে এগিয়ে যায়, নিছক প্রয়োজনকে মুক্তির সমস্যায় পরিণত করে, দৈহিক চাহিদাকে পারে নৈতিক নিয়মে উত্তীর্ণ করতে।'[১]

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তবেই অতিপ্রাকৃতকে পাওয়া যাবে, নইলে সেই অতিপ্রাকৃতের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকতেই পারে না— তাঁর আর একটি রচনায় তিনি শরীর ও আত্মার এই দ্বৈতাদ্বৈত সমস্যা অসংখ্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। একটি অংশ—

'মানুষ যে আত্মিক, এই কথাটা বোঝার জন্য আগে তার জৈবিক হওয়া প্রয়োজন। আগে সে ধুলোয় হামাগুড়ি দেবে, তার পর তো নিউটনের মত বিশ্বপাড়ি দেবে। তাই শরীর হল গতির প্রথম শর্ত, ইন্দ্রিয় হল পূর্ণতার প্রথম সোপান।'[২]

শিলারের ঊর্ধ্বস্তরটি বস্তুর উপরে, কিন্তু নির্বস্তুক বা অস্পষ্ট কোনো অর্থেই নয়। আধুনিক সাহিত্যের প্রথম আলংকারিক ফ্রীডরিক শিলারকে তাঁর নামের উপরে নিক্ষিপ্ত 'যিশুতুল্য' 'প্রাক্-রোমান্টিক' ইত্যাদি অতিরিক্ত উপাধিব্যূহ থেকে সরিয়ে সাহিত্য-বিচারের অঙ্গনে উপনীত করলেই তাঁর মনের নিরাবৃত উপলব্ধি ধরতে পারব। 'প্রাচীনেরা প্রাকৃতিক (বা স্বাভাবিক) ভাবেই অনুভব করেছিলেন, আমরা প্রকৃতিকে (বা স্বভাবকে) অনুভব করি' কথাটি 'তন্ময় ও মন্ময়' কবিতা' (Uber naive und sentimentalische Dichtung) শীর্ষক প্রবন্ধের বীজপংক্তি। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের চরিত্র-প্রভেদ দেখাতে গিয়ে শিলার এখানে মানবমনের সেই আত্মলীন অভিমানের উপর হাত রেখেছেন, যে প্রবণতা থেকে যথাক্রমে পরবর্তী রোমান্টিকতা ও সাংকেতিক কবিতা তথা আধুনিক সাহিত্যের জন্ম।

ধ্রুপদী সাহিত্যকে যেমন তার বস্তুস্বভাবী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি সশ্রদ্ধ প্রশ্ন করতে ছাড়েন নি, শেক্সপীয়রের ক্ষেত্রেও শিলারের পরিপ্রেক্ষণী অনেকটা একই রকম। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক:

'যখন শেক্সপীয়রের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়, সেই শৈশবেও তাঁর মনের নিষ্ঠুর শীতলতা দেখে দুঃখ পেয়েছিলাম। নিশ্চেতন একটা মনোভাব, যা তাঁকে গভীরতম দুঃখকে নিয়েও কৌতুক করতে প্ররোচিত করে— হ্যামলেট, কিং লীয়ার, ম্যাকবেথ ও অন্যান্য নাটকের অরুন্তুদ দৃশ্যগুলিতেও বিদূষকের বাচালতা দিয়ে ব্যঙ্গ করতে শেখায়; এই একবার আমার হৃদয়ের ভাবনাগুলির তালে-তালে চলে, আবার

১ পড়তে-পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ পড়ছি: 'যেদিন প্রাকৃতিক নিয়মপরম্পরার হস্তে আপনাদিগকে ক্রীড়াপুত্তলীর মত ক্ষুদ্র ও জড়ভাবে অনুভব করি, সেদিন আমাদের উৎসবের দিন নহে· ·মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। · ·আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে করিয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই, আপন শক্তির দ্বারা তাহাকে আপন অস্ত্র নির্মাণ করিতে হইয়াছে— কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব। · ·যেখানটায় মানুষের সমস্ত আবশ্যক সীমার বাহিরে চলিয়া গেছে, সেইখানেই মানুষের গভীরতম সর্বোচ্চতম শক্তি সর্বদাই আপনাকে স্বাধীন আনন্দে উধাও করিয়া দিতেছে। মনুষ্যশক্তির এই প্রয়োজনাতীতে পরম গৌরব অন্তকার উৎসবে আনন্দসংগীতে ধ্বনিত হইতেছে।' — উৎসবের দিন, মাঘ ১৩১১, ধর্ম। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড।

২ মানুষের পশুপ্রকৃতি ও অধ্যাত্মশক্তি

পরক্ষণে হৃদয়হীন গতিতে এগিয়ে গিয়ে হৃদয়কে তার অভীষ্ট বিরাম থেকে বঞ্চিত করে— এইসব দেখে আমি কষ্ট পেয়েছিলাম। পরিচয় ঘনিষ্ঠ করার সঙ্গে-সঙ্গে এই লেখককে আমি তাঁর কর্মের মধ্যে খুঁজতে গিয়েছি, তাঁর হৃদয়কে বুঝতে চেয়েছি, বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা অনুভব করতে গিয়েছি। সংক্ষেপে, বিষয়কে বিষয়ীর মধ্যে অনুধাবন করতে গিয়ে বিফল হয়েছি— একজন কবি কোথাও সংস্পর্শের যন্ত্রণা পাবেন না, এটা আমার কাছে দুর্বিষহ ঠেকেছে· ·।'

আর একটু পরেই প্রকৃতিপন্থী কবিদের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রকৃতি- পন্থী কবিদের প্রভেদসূত্র বোঝাতে গিয়ে মানবসভ্যতায় বিবর্তিত মানুষের উপরে তিনি আলো ফেলেছেন: 'আগে প্রকৃতির সঙ্গে সে এক, তার পর শিল্প এসে সেই প্রকৃতি থেকে তাকে পৃথক করে, ভিন্ন করে, শেষে আদর্শ এসে তাকে লুপ্ত ঐক্যের অভিমুখে নিয়ে যায়।· · কিন্তু, আদর্শ যেহেতু পরাৎপর, মানুষ, বিশেষত অনুশীলনশীল মানুষ তাকে পায় না এবং তার পদ্ধতিও তাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হতে পারে না। সেদিক দিয়ে প্রাকৃতিক মানুষ সৌভাগ্যবান, কেননা সে অনায়াসেই তা পারে।· ·[1] তৎসত্ত্বেও, দুই পদ্ধতি তুলনা করলে বুঝি, সংস্কৃতির ভিতর দিয়ে যে মানুষ তার কাম্য পরিণতির দিকে চলেছে প্রকৃতিপন্থী মানুষের চেয়ে সে বহুগুণে মহত্তর।'

শিল্পকে তা হলে কোনো সুনীতিসঞ্চারিণী সমিতিযন্ত্র হিসেবে নয়, পূর্ণতার উপায় বলেই শিলার ভেবে নিয়েছিলেন। শিল্প হল সভ্য মানুষের সবচেয়ে বড় বাহন যার সাহায্যে সে দুরারোহ আদর্শের দিকে যাত্রা করে, নষ্টস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগী হয়। এই আদর্শ, সন্দেহ নেই যে অগম্য, কিন্তু এটাই কি সেই ধ্রুব অতিমানসের মূর্তরূপ নয়?

শিল্পীর ধর্ম নির্মোহ লীলাবাদ। তিনি খেলা করবেন, তা বলে খেলাচ্ছলে কিছু করতে চাইবেন না। 'Spiel' বা খেলা কথাটিতে কোনো অচল অথবা স্বতশ্চল তত্ত্বের ভাবানুবাদ তিনি আরোপ করেন নি। তাঁর পরিণত বয়সের কবিতা 'একটি ঘণ্টার গাথা'র শেষ দিকে এই কথাটিকে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন, সেটা দেখা যেতে পারে। একটি ঘণ্টা এই কবিতায় নিখিলমানবনিয়তির প্রতীক হয়ে উঠেছে, সৃজনী মানুষ নির্মিত ঐ ঘণ্টাটিতে নিজভাগ্যকে বিশুদ্ধভাবে ধারণ করিতে চাইছে:

'যে উদ্দেশ্যে গড়েছেন নির্মাতা
সেই ব্রত ওর হৃদয়ে রহুক গাঁথা:

---

১ শিল্প ও প্রকৃতির এই অপীড়িত আত্মীয়তার কথা শেক্সপীয়র নিজেই পলিক্সেনেস-এর মুখে বলেছেন:

Perdita. For I have heard it said
There is an art which in their piedness shares
With great creating nature.

Polixenes. Say there be;
Yet nature is made better by no mean
But nature makes the mean; so, over the art,
Which you say adds to nature, is an art
that nature makes.
(Act IV, Scene III, Winter's Tale)

ধরার জীবন হতে সে দূরোদ্দেশী
স্বর্গের নীল খিলানে লগ্ন হবে,
এই ঘণ্টা যে বজ্রের প্রতিবেশী,
তারার দেশের সীমান্তে জেগে রবে।
সমূর্ধ্ব হতে কণ্ঠ আসুক ভেসে
নক্ষত্রের যৌথ সঞ্চরণে
মঙ্গলগান স্রষ্টার উদ্দেশে
সেও যেন করে বর্ষ আবর্তনে।
যা শুধু মহান্, যা শুধু চিরন্তনী,
ধাতব আনন সেই সুরে উন্নীত,
স্রোতের পাখায় চলুক দিনরজনী
ওর বুকে যেন সবি রয় পুঞ্জিত।
নিজের জিহ্বা নিয়তিরে দিক ঋণ,
সে নিজে যদিও হৃদয়হীন, পাষাণ,
হৃৎস্পন্দনে তবু ওর রিনিরিন
পরিবর্তনপ্রবাহে মানবপ্রাণ।
ঘণ্টারে ছেড়ে চলে মন্দ্রস্বর,
স্বর ঝ'রে যায়, ম'রে যায় শ্রুতিমূলে,
এ কথা শেখায় : সমস্ত নশ্বর,
সব চলে যায় মর্তবাঁধন খুলে।

'পরিবর্তনপ্রবাহে মানবপ্রাণ' কথাটি 'Das Lebens Wechsvolles *Spiel*'এর অক্ষম অনুবাদ। তা হলেও পরিবর্তনের মুখে রূপের জন্ম, এই ইঙ্গিতটি এখানে অন্ততঃ আভাসিত হয়েছে। 'সৌভাগ্য' ( Das Gluck ) কবিতার প্রসঙ্গ এখানে অপরিহার্য। সময় সেখানে সব-কিছুকে 'এক রূপ থেকে রূপান্তরে' (Von Gestalt Zu Gestalt) উপনীত করছে। তা হলে রূপের উপাসনা, উদাসীন সময়ের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধিত্বের পবিত্র সাহস থেকেই জন্ম নিয়েছে : এটি শিলারের মূল কথা। এর পাশে এই পংক্তিগুলি রাখলেই তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য ও পার্থক্য ধরা পড়বে :

'হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয়হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।'[১]

---

১ শাজাহান, বলাকা

সাদৃশ্যের আড়ালে পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। প্রকৃতি বা জীবন অথবা মৃত্যুর কাছে শিলারের কোনো প্রত্যাশা নেই। তিনি তার অন্তর্বিস্মৃত শক্তিতে বিশ্বাসী, কিন্তু নিজের সৃষ্টিকে সেই শক্তির সম্মোহনকর্মে নিযুক্ত করার ইচ্ছা তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসত্যকে চিরসুন্দরের সঙ্গে সুশ্লিষ্ট দেখতে চেয়েছেন, দেখেছেন। পক্ষান্তরে, শিলার সত্য ও সুন্দরের বিচ্ছেদবেদনা জেনে আপাতত স্বরচিত স্বর্গের জন্য চেষ্টিত। সেই স্বর্গে তারাই যেতে পারে যারা মানবজীবনের অপস্রিয়মাণ রঙের নকশা দেখেছে, বুঝেছে। খেলা করতে করতে সেই স্বর্গে যেতে হবে, কেননা খেলার মধ্যে স্বার্থের সংকীর্ণতা নেই। এ কথা রবীন্দ্রনাথও অজস্রবার বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর স্বর্গে শুধুমাত্র ক্রীড়াকুশল শিল্পকেই স্থান দেন নি, আরও অনেক পর্যায়ের মানুষকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। শিলারের স্বর্গের ছাড়পত্র শুধু শিল্পীরাই পায়, তার কারণ তারাই সঠিক মানুষ— মুমুক্ষু মানুষ। পাশে একটি শিল্পীর কাজ খেলা করতে করতে বস্তুবিশ্বের পাশে একটি মায়াবিশ্ব রচনা করা; যেখানে তিনি বন্দী অথচ বিমুক্ত। এই মুক্ত বন্দিদশার মধ্যেই স্রষ্টার বাসনা আকার পরিগ্রহ করে। নীচের দুটি শ্লোক থেকে এই কথাই মনে আসে, শিলারের 'Spiel', শেষ বিশ্লেষণে এবং অন্ত্য সংশ্লেষে, ভারতীয় 'মায়া' বা সৃষ্টিশক্তির কাছে দাঁড়ায়:

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি।
অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতং
অস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ॥[১]

'বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং (বর্তমান) অপর যাহা কিছু বেদের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম মায়াশক্তি-অবলম্বনে এই জগৎকে সৃজন করেন এবং সেই সৃষ্টজগতে অবিদ্যা দ্বারা জীবরূপে বদ্ধ হন। ৪।৯
প্রকৃতিকে মায়া বলিয়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলিয়া জানিবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহে এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ। ৪।১০'[২]

'তন্ময় ও মন্ময় কবিতা' প্রবন্ধে যে-ভাবনা প্রথম উচ্চারণের উদ্দীপনায় চঞ্চল, 'ট্র্যাজেডিতে কোরাসের ব্যবহার' (Uber der Gebrauch des chors in den Tragodie) প্রবন্ধে তা আরও অনেক আয়ত বা আত্মস্থ। প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির (১৭৯৫) সাত বছর পরে শেষের প্রবন্ধটি (১৮০৩) লেখা। এই সাত বছরের ব্যবধানে তাঁর চেতোদর্পণ অনেক মার্জিত হয়েছে। তা ছাড়া আরও একটি যোগাযোগ

১ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৪।৯-১০
২ স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত উপনিষৎ গ্রন্থাবলী। প্রথম খণ্ড।

এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। এই বছরেই তাঁর Braut Von Messina নাটকটি সম্পূর্ণ হয়। ভাইমারে ১৭ই মার্চে এটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর জুন মাসে যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই ভূমিকায় এই অপ্রতিম প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট হয়। ধ্যানধারণার প্রত্যক্ষতা এই আলোচনাটিকে চিরদিনের সাহিত্যবিচারের একটি নিকষপাথর করে তুলেছে। এর দু-একটি অনুচ্ছেদ স্মৃতিধার্য: 'কবির কাজ শব্দচয়ন, বাক্যযোজনা। লিরিকধর্মী ট্রাজেডিতে এই শব্দসমষ্টির সঙ্গে সংগীত এবং ছন্দঃস্পন্দ সহগামী। ফলে একটি কথা সহজবোধ্য, কোরাস যদি ইন্দ্রিয়ের প্রতি আবেদনক্ষম এই সমাবেশ থেকে বঞ্চিত হয়, তা হলে তা নাটকের একান্ত মিতব্যয়ী সংহতির পক্ষে নিতান্তই আবর্জনার মত ঠেকবে। কাহিনীর বেড়ে-ওঠার পথে তবে তা প্রতিবন্ধক, দৃশ্যমায়া রচনার পক্ষে ক্ষতিকর, দর্শকের কাছে ক্লান্তিকর।· ·শিল্প তো শুধু ক্ষণদা আমোদ বিতরণ করে না, ক্ষণমুহূর্তের নিষ্ক্রান্তির স্বপ্নকেই শুধু চরিতার্থ করে না। শিল্পের যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে তা হল এই যে, সে আমাদের একেবারে মুক্ত করে দেবে। ইন্দ্রিয়লব্ধ জগৎকে বাস্তবিক একটি দূরত্বে স্থাপন করার প্রতিভা আমাদের মধ্যে জাগ্রত সংস্কৃত ও পরিস্রুত করে সে সার্থকতা অর্জন করে। নইলে তো ঐ রুক্ষ বস্তু মলিন জগৎটা বোঝার মত দুঃসহ ঠেকে, আমাদের উপরে জান্তব সংসর্গ বিস্তার করে আমাদের অধঃপাতে নিয়ে যেতে চায়। আমাদের শুদ্ধচিত্তের স্বচ্ছন্দ ব্রতে ও বিহারে তাকে দ্রবীভূত করে দিয়ে সে বস্তুপুঞ্জের উপরে ভাবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। আবার ঠিক এই কারণেই যথার্থ শিল্পের জন্য কিছুটা বস্তুভিত্তি ও বস্তুভূমি দরকার হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র সত্যের প্রতিভাসে তার তৃষ্ণা মেটে না। সত্যের জমিতেই শিল্প তার আদর্শের সৌধ তুলে ধরে, প্রকৃতির শক্তসবল ও গভীর ভিত্তির 'পরেই তার ভরসা।· · ট্র্যাজেডিতে এই হল কোরাসের ভূমিকা। স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থে কোরাস একটি ব্যক্তি নয়, একটি সার্বভৌম ধারণা। ধারণা হলেও মূর্ত, স্পৃশ্য শরীর আছে তার যা ইন্দ্রিয়বেদ্য এবং মহিমান্বিত। ঘটনাবলীর সংকুচিত পরিসরকে সে ভুলে গিয়ে অতীত আর ভবিষ্যতের মধ্যে, সুদূর মহাকালে মহাদেশে আর বৃহৎ মানবতার দিগ্‌বলয়ে বিস্তারিত হয়ে যায়। জীবনের মহতী ফলাফল নিষ্কাষণ করবার জন্য, প্রজ্ঞাবাণী উচ্চারণ করবার জন্য তার এই বিস্তৃতি। কিন্তু এই সবই সে কল্পশক্তির অমিত প্রাণবেগে লিরিকমুক্তির দুঃসাহসে করে, ঈশ্বরের নিশ্চিত চরণপাতে এইভাবেই সে মর্তবিষয়গুলির শিখরদেশে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এবং এই উত্তরণের জন্য চাই গীতি ও ছন্দের সংযোগ, সুর ও স্পন্দনের মিলন।' এই উক্তিপরম্পরার মধ্যে শিলারের সারা জীবনের সমস্ত ভাবনা গ্রথিত হয়েছে।[১] Braut Von Messina নাটকের জন্য তাঁর লেখা একটি কোরাস আপাতত স্মরণীয়। ডন কাইজার বিয়াত্রিচের কাছে প্রেমের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করল। পরক্ষণে সে তাকে বিমূঢ় দোলাচলে রেখে চ'লে যেতেই কোরাস গাইলো:

'সুখী সে মানুষ, আমারও সে বরণীয়,
পালায় মুখর ব্যসন দম্ভ থেকে
শিশুসম, যার প্রকৃতি শয়নগৃহ,
সমতল-ঘেরা শান্তিতে আছে জেগে।

১ শিল্প প্রকৃতিকে অনুকরণ করে না, প্রকৃতির যুক্তিসিদ্ধ উৎসকে অনুসরণ করে এবং প্রকৃতির উপরে আপন ধ্যানলব্ধ রূপারোপ করাই তার কাজ—প্লটিনাসও এই কথা আর এক ভাবে বলে গেছেন। Bernard Bosanquet এর *History of Aesthetic* (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১১৩-১১৪) বইখানিতে সন্ধানী পাঠক তার খোঁজ পাবেন।

রাজার ভবনে হৃদয় আমার কাঁপে,
যবে হেরি ঐ দর্পশিখর হতে
স্খলিত সকলি পরিণামী সন্তাপে,
মাঝারি ও বড়, সব ভেসে যায় স্রোতে।'

এই কোরাস যে সোফোক্লেসেরই ম্লান বিবর্ণ প্রতিরূপ মাত্র সে কথা বুঝতে অসুবিধে হয় না :

'সুখী যে মানুষ, নিষ্পাপ রহে জীবনপাত্র যার ;
যদি বা দৈব দুর্বহ নামে কারো ভবনের মাঝে
তবে সেই নয়, ডুবে যায় তার সমস্ত সংসার,
থ্রেসের বাতাস অভিসম্পাতে কালভৈরবী নাচে,
কীর্তিনাশিনী সমুদ্র করে সহাস্য হাহাকার,
কলঙ্করেখা তীরের নয়ানে, কালো তরঙ্গ যাচে
পাতকের ফল কূলে কূলে অনিবার,
পঙ্কিল স্রোত থামে না যে থামে না যে,
পারাবার জুড়ে ঘুরে চলে পাপ, নাশ করে পরিবার।' —আন্তিগোনে

সুতরাং 'Braut Von Messina' নাটকটিকে শিলারের শ্রেষ্ঠ বলার উপায় নেই। তাঁর অনুরাগী কার্লাইল বা ভক্ত টমাস মান্‌ও তা বলেন নি। টমাস মান্ এখানে তাঁর নিরীক্ষার মূল্য স্বীকার করে যে এই নাটকের কোরাসগুলিকে শিলারের 'ধী-মতী দীপ্তির সর্বোত্তম উদাহরণ' বলেছেন, তাতেও আপত্তি উত্থাপন করার সুযোগ আছে। কিন্তু এই নাটকে শিলারের শ্রদ্ধার্হ ব্যর্থতা তাঁর শিল্পবীক্ষার অসারতা নিশ্চয়ই প্রমাণ করছে না। তাঁর এই নাটক চিরায়ত হ'তে চেয়ে ধ্রুপদী নাটকের কাঠামোর মধ্যে ধরা দিয়েছিল। এর অব্যবহিত পরেই তিনি 'ভিল্‌হেলম টেল' লিখলেন। এই নাটকের একটি কোরাস শোনা যেতে পারে :

'তীর ধনুক সঙ্গে তার,
পাহাড়চুড়ে, ঝর্নাতে,
শিকারী ঐ, আলোর দ্বার
খোলে যখন ভোররাতে।
ঈগল যেমন সর্বময়
নভোনৃপ, দিগন্তে ;
পাহাড় বন করল জয়
শিকারী ঐ, কী মন্ত্রে।
দিগ্বিজয়ী মনপবন,
হাওয়ায় চলে পথ কেটে,
মিলিছে ওর আকিঞ্চন
পশুপাখির সঙ্কেতে।'[১]

---

১ দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

'ভিল্‌হেল্‌ম টেল' নাটক হিসেবে গতিময় এবং স্রোতগ, সুতরাং সফল। কোরাস সম্পর্কে শিলারের অভিব্যক্তি কি 'গীতি ও ছন্দের সংযোগে, সুর ও স্পন্দনের মিলনে' নিষ্পন্ন এই কোরাসেই সাধিত হয় নি! অবশ্য মূলের চারিত্র এই তর্জমায় যে কিছুমাত্র সংরক্ষিত হয় নি, এ কথা মেনে নিয়েই এ রকম প্রশ্ন করছি। গ্যেটের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের হৃদয়ী ও নৈর্ব্যক্তিক ফলশ্রুতি, তাঁর 'গানের মায়া' ( Die Macht des Gesanges ) কবিতায় যে নম্র গীতিগুণ আর 'দস্তানা' ( Des Handschuch ) প্রভৃতি কবিতায় যে অমোঘ নাটকীয়তা— সবই সেই পরিণতিতে চলেছিল যেখানে কোরাস হৃদয় এবং যুক্তির মিলনের মধ্য দিয়ে জীবনের সমস্যা বিবেকী যৌবনে নিরসন করে। 'সূক্তি কণা' ( Tabulae Votivae ) পর্যায়ে পরিণত যৌবনের জয়ধ্বনি করে তাই তিনি যে দ্বিপদী লিখলেন তার মধ্যে কোনো সন্দেহবাষ্প নেই :

> 'বিশ্বাস করো, উপকথা নয়, যৌবনধারা নিত্য চলে,
> কোথায়, আমাকে জিজ্ঞাসা করো ? কবির শিল্পে সে যে উথলে।'

মৃত্যুকে নিয়ে নানা বিদ্রূপ করেছেন শিলার। যেমন, 'ঢ্যাখো ঐ প্রতিভাবান শিল্পীটি নিভন্ত মশাল নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। ওকে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু তা বলে তোমরা যেন মৃত্যুকে নন্দনতত্ত্ববিৎ ভেবো না।' মৃত্যু নন্দনতাত্ত্বিক না হোক শিলারের মৃত্যু তাঁর নন্দনতত্ত্বেরই মত। ১৮০৫ এর ৯ই মে তারিখে তাঁর মৃত্যু। এর তিন মাস আগে তিনি তাঁর অনূদিত রাসীনের 'Phedre' নাটকের অভিনয় দেখেছেন। এই অনুবাদকর্মই তাঁর জীবনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কাজ। 'ডিমিট্রিউস' বলে যে নাট্য রচনায় তিনি হাত দিয়েছিলেন, সেটি অসমাপ্তই রয়ে গেছে। কিন্তু রাসীনের ঐ নাটকের নায়ক-চরিত্রের মধ্যেই তাঁর জীবনের রূপক রয়ে গেছে। এর নায়ক হিপ্পলিটাসও তাঁর জন্মলব্ধ স্বভাব বা প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু, শিল্পীর মৃত্যু, বীরের মৃত্যু। রথের মধ্যে স্তব্ধ বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন, এমন সময় সমুদ্রে ঢেউ বাড়ল, একটা দৈত্য এল, তার সামনে একটা ষাঁড়, পিছনে ড্র্যাগন। সবাই পালাল, হিপ্পলিটাস ছাড়া। তিনি বীরের মতই যুঝলেন, শেষে রথের ঘোড়াগুলো খেপে উঠতেই তাদের বল্গায় তাঁর দেহ জড়িয়ে গেল। এইভাবে নিয়তির সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হল, মুক্তি হল।

শ্রীআলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

স্বীকৃতি । জন্মাষ্টমী চিত্রের ব্লক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

স্মরণ

# জ্যাকব এপ্‌স্টাইন

জন্ম ১৮৮০ ॥ মৃত্যু ১৯৫৯

## শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

এপস্টাইনের গুণগ্রাহী সমালোচকেরা সকল সময়েই স্বীকার করেছেন যে নিন্দাস্তুতির আতিশয্যের মধ্যে দিয়ে এপস্টাইনের সত্য পরিচয় সন্ধান করা দুরূহ। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এপস্টাইনের কাজের ভালোমন্দের বিচার অপেক্ষা তাঁর প্রতিভার পরিচয় দেওয়াই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য।

আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একদিন ফরাসী শিল্পী রোদ্যাঁর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। রোদ্যাঁর প্রভাবের সমতুল্য না হলেও, এপস্টাইনের প্রভাব এমন-কি আজকের দিনে ভারতীয় ভাস্কর্যেও স্থানে স্থানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও জহরলালের মূর্তি তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কিনা সে সম্বন্ধে তর্ক না তুলে এইটুকু বলা চলে যে, এই দুই প্রতিকৃতির সূত্রে এপস্টাইনকে ভারতবাসী দীর্ঘকাল মনে রাখবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে পাশ্চাত্য শিল্পীরা প্রাচ্যশিল্পের গুণাবলীর অনুসন্ধানে যত্ন করেন। ভাস্কর্য ও চিত্রকলা উভয়ক্ষেত্রেই প্রাচ্য প্রভাব স্বেচ্ছায় গ্রহণের চেষ্টা সহজেই লক্ষ্য করতে পারি। ভাস্করদের মধ্যে যাঁরা প্রাচ্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুশীলন করেছেন এপস্টাইন তাঁদেরই অন্যতম। তাঁর রচনায় প্রাচ্যশিল্পের লক্ষণ তাঁর দেশবাসীর কাছে সকল সময় প্রশংসনীয় হয় নি, বরং অনেক সময় এই প্রাচ্যপ্রভাবের কারণেই তাঁর সম্বন্ধে বিরোধিতা দেখা দিয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে যেখানেই প্রাচ্যপ্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেখানেই দেখা যায় জনমতের তীব্র বিরোধিতা। নানা বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এপস্টাইন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার দ্বারা প্রাচ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যকে পাশ্চাত্য শিল্পের অঙ্গীভূত করে তোলার সার্থক চেষ্টা করেছেন। বিশেষভাবে এই কারণেই তাঁর শিল্পসৃষ্টি ভারতবাসীর কাছে বিশেষ আলোচনার যোগ্য।

এপস্টাইনের জন্ম ও ভাস্কর্যশিক্ষার প্রথম পাঠ -গ্রহণ আমেরিকায়। ১৯০২ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি যখন প্যারিস শহরে এলেন তখন তাঁকে ঠিক অর্বাচীন শিল্পী বলা চলে না। এক দিকে যেমন তিনি প্যারিস অ্যাকাডেমিতে বাঁধা রীতির শিক্ষা শুরু করলেন, অপর দিকে তাঁর শিল্পদৃষ্টি অবাধ প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পেল প্যারিসের জাদুঘরগুলিতে।

এপস্টাইন যখন প্যারিসে পৌঁছেছিলেন তখন আধুনিক ভাস্কর্যের নবজন্মদাতা রোদ্যাঁ জীবিত, তাঁর শিল্পের প্রভাব সারা ইউরোপে বিস্তৃত। অপর দিকে প্যারিসের শিল্পী-মহলে তখন আধুনিকতার হাওয়া প্রবল। এপস্টাইনের শিল্পজীবনের বিবর্তন বুঝতে হলে পূর্বোক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা মনে রাখা দরকার। কারণ, এই দুই প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। এপস্টাইনের জীবনে রোদ্যাঁর প্রভাব যেমন স্থায়ী, তেমনি শিল্পের আধুনিক গতিপ্রকৃতি বুঝবার ও আয়ত্ত করবার চেষ্টাও করেছেন তিনি প্রচুরভাবে। এপস্টাইনের জীবনীকারদের মতে প্যারিসের মিউজিয়ামগুলিতে মিশরীয়

রবীন্দ্রনাথ ॥ শিল্পী জ্যাকব এপস্টাইন -কৃত প্রতিমূর্তি

বার্মিংহাম সিটি করপোরেশনে রক্ষিত

জওহরলাল নেহরু ॥ শিল্পী জ্যাকব এপ্‌স্টাইন -কৃত প্রতিমূর্তি

আসিরীয় নিগ্রো এবং আরও বহু প্রাচীন ও আদিম শিল্পসংস্কৃতি তিনি গভীরভাবে 'ধ্যান' করেছিলেন। অপর দিকে 'হিন্দু আর্ট' সম্বন্ধেও কতদূর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, সে কথা তিনি নিজমুখে স্বীকার করে গেছেন। তাঁর শিল্পীজীবন ভালোভাবে অনুসরণ করলে মনে হয় যে, রোঁদ্যার প্রভাব তাঁর প্রতিভার সঙ্গে যত সহজে মিলেমিশে গিয়েছিল প্রাচ্যশিল্পের গতি-প্রকৃতি তাঁর প্রতিভার আধারে তেমন পুরোপুরি অঙ্গীভূত হয় নি। অর্থাৎ প্রাচ্য শিল্পকে তিনি বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পপ্রতিভার সঙ্গে এই শ্রেণীর শিল্পের কোথায় যেন একটা বিরোধ ছিল। তাঁর স্মরণীয় কীর্তিরাজির মধ্যে এই দ্বন্দ্বের লক্ষণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

লণ্ডন শহরেই এপস্টাইনের শিল্পীজীবনের বিকাশ ও পরিণতি। প্রতিভাবলে তিনি যেমন লণ্ডন-বাসীকে সহজেই মুগ্ধ করেছিলেন তেমনি পৃষ্ঠপোষক সমালোচক ও জনমতকে শত্রু করে তুলতেও তাঁর বেশি সময় লাগে নি। সমালোচক ও পৃষ্ঠপোষকদের বিরূপ করে তোলার অসাধারণ দক্ষতা, একদিন প্রাচ্যভাবাপন্ন চিত্রকর হুইস্‌লারেও দেখা গিয়েছিল। হুইস্‌লারের সময় আর্টের আদর্শ নিয়ে যে প্রবল তর্ক উঠেছিল তারই সঙ্গে তুলনা করা চলে এপস্টাইনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। দর্শক ও শিল্পীর মধ্যে দৃষ্টিভেদ পৃথিবীতে বারংবার ঘটেছে। এপস্টাইনকে কেন্দ্র করে এই বিরোধিতা কী প্রচণ্ড আকার নিয়েছিল তার ইতিহাস Arnold L. Haskell -লিখিত *The Sculptor Speaks* গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এপস্টাইনের শিল্পে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রতিকৃতিকার রূপে তিনি চিরকালই জনপ্রিয়, এ দিক দিয়ে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো সমালোচকের মনে সন্দেহ জাগে নি। স্থাপত্যধর্মী ও স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত মূর্তিগুলিকে নিয়েই যত মতবিরোধ। এইগুলি সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করি।

পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের আধুনিক গতি-প্রকৃতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। রেনেসাঁ যুগের সঙ্গে আধুনিকের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তাই আধুনিক কালের মূর্তি-বিচারে, ধারাবাহী পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের গতি-প্রকৃতি ও কার্য-কারণ নিয়ে কিঞ্চিৎ ভূমিকার প্রয়োজন।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বাস্তবতা উগ্র হয়ে দেখা দেয় মাইকেল এঞ্জেলোর পরবর্তী যুগে। বারুক (Baroque) ভাস্কর্য যে ক্ষীণপ্রাণ এবং ভাস্কর্যের একান্ত-প্রয়োজনীয় আদর্শ থেকে এই সময়ের ভাস্কর্য যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, এ কথা ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের উক্তিতেই জানা যাবে।

Excellency of technical skill is growing together with the neglect for the indigenous laws of material, as typical of any illusionistic style. Wood is treated like marble, marble transcends the laws of gravity and stands for draperies or painted canvas. The new tasks such as large monuments and fountains create an awreness of distant optical effects but also a neglect for the subtle treatment of details.

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসী ভাস্কর রোঁদ্যা ভাস্কর্যকে স্বকীয় মর্যাদায় ফিরিয়ে আনেন। এই কারণেই আধুনিক ভাস্কর্যের নবজন্মদাতা রূপে ইতিহাসে তিনি স্মরণীয়। ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য রোদ্যাঁ ফিরিয়ে এনেছিলেন, কিন্তু ভাস্কর্যের আরও কতকগুলি সমস্যার তখনও মীমাংসা হয় নি। স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের সম্বন্ধ প্রাচীন পরম্পরাতে যেমন সার্থক, পরবর্তী কালে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে সেই সম্বন্ধ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন

হতে থাকে। আধুনিক কালের শিল্পসৃষ্টিতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকে যুক্তভাবে নির্মাণ করবার আন্তরিক চেষ্টা দেখা দিয়েছে। রোদ্যাঁ ভাস্কর্যের প্রাণ অনুসন্ধান করেছিলেন। অথচ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় অনুসন্ধানে তাঁর চেষ্টা যথেষ্ট ছিল কিনা বলতে না পারলেও, এ দিক দিয়ে তিনি কোনো উল্লেখযোগ্য কৃতি রেখে যান নি এ কথা বলা চলে। ফরাসী ভাস্কর বুর্দেল এ দিক দিয়ে অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছিলেন বলতে পারি। এই সঙ্গে Franz Metzner, Ivan Mestrovic, Eric Gill —এঁদেরও নাম উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের একটি আদর্শ-অনুসন্ধানের জন্য এপস্টাইন যেভাবে চেষ্টা করেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এই দুইয়ের সম্বন্ধ -স্থাপনের পথে যে বিপুল সমস্যা সে সম্বন্ধে যাঁরা কিঞ্চিৎ সচেতন তাঁরাই জানেন যে, ব্যক্তিগত প্রতিভার দ্বারা বা অল্পকালের চেষ্টায় এর সমাধান হবার নয়। বিশেষভাবে যে সমাজে স্থাপত্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনই সর্বপ্রধান সে ক্ষেত্রে ভাস্কর্যকে স্থাপত্যের অঙ্গীভূত করা আরও দুরূহ। কারণ, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সহযোগিতা অতীতে একটা কোনো বিশেষ আদর্শ বা প্রতীককে কেন্দ্র করেই সম্ভবপর হয়েছিল। আজকের দিনে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মিলনক্ষেত্র যার-পর-নেই সংকীর্ণ তাতে আর ভুল নেই। এই প্রতিকূল পরিবেশে এপস্টাইন যদি তাঁর আদর্শের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে না থাকেন তা হলেও তাঁর কৃতিত্বকে কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না।

এপস্টাইনের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, তাঁর রচিত স্থাপত্যধর্মী মূর্তি মাত্রই অল্পবিস্তর প্রাচ্য আদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মেডিকাল অ্যাসোসিয়শনের মূর্তি, অস্কার ওয়াইল্ড্ মেমোরিয়াল, হাডসন মেমোরিয়াল, Night, Day, সর্বত্রই দেখা যাবে অল্পবিস্তর প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব। স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত নয়, অথচ স্থাপত্যের গুণ-সম্পন্ন মূর্তি যেমন, Genesis, ম্যাডোনা এবং খৃষ্ট-বিষয়ক মূর্তি, এগুলিতে প্রাচ্য শিল্পের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট। এপস্টাইন সম্বন্ধে যত বিরোধিতা তার লক্ষ্য পূর্বোক্ত প্রাচ্য ভাবাপন্ন মূর্তিগুলি এ কথা পূর্বেই বলেছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধান করা দরকার এই বিরুদ্ধতার কার্যকারণ। কুৎসিত রূপগঠনের জন্য তীব্র নিন্দা তিনি পেয়েছেন। এ বিষয়ে এপস্টাইনের উক্তি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সারগর্ভ। তিনি বলেন, কোনো শিল্পীই ইচ্ছা করে কুৎসিত রচনা করে না, এমন-কি সচেতনভাবে সুন্দর করাও কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর উদ্দেশ্য হয় না।

ইংরাজ ঐতিহাসিক ও শিল্প-সমালোচকগণ এতকাল প্রাচ্য শিল্পকে বর্বর কুৎসিত কিম্ভূত (Grotesque) আখ্যা দিয়ে এসেছেন। প্রাচ্য শিল্পের প্রকাশ মাত্রেই বর্বর বলে ধরে নেওয়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের ইংলণ্ডে সংস্কারে পরিণত হয়েছিল এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই বোধ হয় নিগ্রো মাতৃমূর্তি ঠিক ভেনাসের মত নয় বলে যে নিন্দা লণ্ডনবাসীর কাছে এপস্টাইন পেয়েছিলেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

এপস্টাইনের মূর্তির আকার প্রকার বা মুখের চেহারা নিয়ে যে নিন্দা তার মূল্য অত্যন্ত সাময়িক। আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় হল— পূর্বোক্ত মূর্তিগুলির ঠিক ঠিক সার্থকতা কোন্ দিক দিয়ে। Night মূর্তির ভঙ্গী এবং মুখাকৃতি সহজেই বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। রেখানির্ভর মূর্তি পাশ্চাত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য নয়। Night মূর্তিতে শিল্পী রেখার যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছেন তা প্রাচ্যবাসীর

কাছে ভাস্কর্যের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই মনে হবে ; কিন্তু পাশ্চাত্যদেশবাসীর কাছে এই-জাতীয় সৃষ্টি অত্যন্ত বিজাতীয়। তাই লণ্ডনবাসীর কাছে এই মূর্তি নিরর্থক প্রস্তরপিণ্ড বলে মনে হয়েছে। অপর দিকে Day মূর্তিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সম্বন্ধ বহুগুণে সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। পাশ্চাত্য শিল্পী প্রাচ্য শিল্পাদর্শকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন বিচার-বিশ্লেষণের পথে। এই বিচার-বিশ্লেষণের অসাধারণ দক্ষতা আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। এর ফলে ইউরোপীয় শিল্পী প্রাচ্য শিল্পের গঠন-কৌশল ( structure ) বহু পরিমাণে আয়ত্ত করেছেন। তাই দেখা যায়, ইজিপ্টের ভাস্কর্যের যে নিরাভরণ গঠন তা পাশ্চাত্য শিল্পীরা সহজেই বুঝেছেন এবং গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। নিগ্রো বা অন্যান্য আদিম শিল্পেও যেগুলির গঠন ( structure ) সমান নিরাভরণ, সেগুলিই ইউরোপীয় শিল্পীসমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে একই কারণে।

ভারত, চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ইত্যাদির ভাস্কর্যে গঠনকে এভাবে নিরাভরণ করে প্রকাশ করা হয় নি। কোথাও যৎকিঞ্চিৎ কোথাও অতিজটিল অলংকরণের দ্বারা এই গঠনকে মণ্ডিত করা উল্লিখিত শিল্প পরম্পরার চিরায়ত ধর্ম। মমল্লাপুরমের উৎকীর্ণ মূর্তি বা কোনারকের বিরাট আকারের মূর্তি, এগুলির অসাধারণত্ব ·পাশ্চাত্য শিল্পীরা শেষ পর্যন্ত অনুভব করতে পেরেছেন সত্য। কিন্তু এই সব মূর্তিতে গঠনের আসল সরলতা যেভাবে খুঁটিনাটি বিষয়ের সমারোহে ও বিবিধের ঘাত প্রতিঘাতে বৈচিত্র্যময় ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তা পাশ্চাত্য শিল্পীর পক্ষে অনুভবের বিষয়ীভূত হয়েও আয়ত্তের বিষয় হয় নি। এপস্টাইনের মূর্তি আকার, গঠন, দৃঢ়তা, সকল দিক দিয়েই প্রশংসনীয় এবং সমসাময়িক ইউরোপীয় ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনায় তার স্বকীয়তাও সুস্পষ্ট। ইতিপূর্বে যে মূর্তিগুলির উল্লেখ আমরা করেছি তার প্রত্যেকটিতেই আকারনিষ্ঠা সুস্পষ্ট। এই মূর্তিগুলিতে গঠনের যে সরলতা তা প্রাচ্য শিল্পের প্রভাব ব্যতিরিকে সম্ভবপর হত না। কিন্তু প্রাচ্য শিল্পে, বিশেষতঃ ভাস্কর্যে, সরলতার সঙ্গে জটিলতারও সম্মিশ্রণ দেখা যায়— যেমন কোনারকের হাতি। এই বিরাট আকারের হাতির গঠন অতি সরল। মিশরীয় ভাস্কর্য বা আধুনিক শিল্পী Gustav Vigeland অথবা এপস্টাইন এইভাবের গঠন হয়তো কল্পনা করতেও পারতেন। কিন্তু হাতির গলায় ঝোলানো ঘণ্টায় যে রূপবৈষম্য ( contrast ) দেখানো হয়েছে এবং তারই ফলে বিরাট প্রস্তরপিণ্ড যেভাবে সজীব হয়ে উঠেছে, সেরকম রচনা এপস্টাইন বা সমসাময়িক কোনো ভাস্করের রচনাতেই আমরা পাই না। রূপায়ণে বৈষম্য বা বৈচিত্র্য দেখাবার প্রয়োজন হলেই ইউরোপীয় শিল্পী আলোছায়ার আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন এপস্টাইন-রচিত Day বা মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশনের মূর্তিতে আমরা দেখি। কিন্তু রূপের সঙ্গে রূপের সংঘাত বা বৈষম্য দেখানোর চেষ্টা দৈবাৎ ইউরোপীয় ভাস্করের পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। এপস্টাইনের রচনায় এই চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সার্থক। দৃষ্টান্তস্বরূপ Rima র উল্লেখ করা যায়। এপস্টাইনের স্থাপত্যলগ্ন মূর্তিরাজি সরল ও নিরাভরণ ; তাই আশ্রয়ভূত স্থাপত্যের সঙ্গে এগুলির সম্বন্ধ, গঠনের বা construction-এর দৃষ্টিতে অভ্রান্ত বলে গণ্য হবে, তবু স্থাপত্যেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ এগুলি বা মূলগত গঠনেরই পুনরাবৃত্তি বলা চলে। এই বৈষম্যবর্জিত পুনরাবৃত্তি যদি দর্শকের কাছে কিঞ্চিৎ পীড়াদায়ক হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার নেই। প্রাচ্য শিল্পী প্রায় একশত বৎসরের চেষ্টাতেও পাশ্চাত্য শিল্পীদের আলোছায়ার রহস্য ( light and shade ) -আবিষ্কারের দৃষ্টি এবং তারই সঙ্গে সংগত প্রকাশভঙ্গী সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি। ঠিক সেইভাবেই পাশ্চাত্য শিল্পীরা

প্রাচ্য শিল্পের মণ্ডনধর্ম ( decorative quality ) আয়ত্ত করতে সক্ষম হন নি ব'লেই আকারনিষ্ঠ রূপকে প্রাচ্য-আদর্শের-অনুযায়ী বিচিত্র ও বৈষম্যময় করে তোলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এপস্টাইনের গড়া প্রতিকৃতিগুলি সকল সময় যে উচ্চপ্রশংসা পেয়ে এসেছে এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রোদ্যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করেই যে তাঁর শিল্পের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। এ দিক দিয়ে যে সব সমালোচক এপস্টাইনকে রোদ্যাঁর উত্তরসাধকরূপে দেখেছেন তাঁদের মত মেনে নিতে বাধা নেই। এপস্টাইন যে স্থাপত্যসুলভ আকার-গঠনে দক্ষ তারও প্রমাণ বারংবার তিনি দিয়েছেন। প্রতিকৃতিমূলক মূর্তিগুলিতে তাঁর সহজাত প্রতিভা যেমন আমরা লক্ষ্য করি তেমনি প্রায়শঃ দেখি আশ্চর্য একটি রূপের বুনোট ( formal texture ), গঠনকে যা আবৃত করে রয়েছে। এই আশ্চর্য বুনোটের ইঙ্গিত প্রথম তিনি পেয়েছিলেন রোদ্যাঁর ভাস্কর্যে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় সহজাত প্রতিভার চেয়ে চেষ্টার দ্বারা অর্জিত আঙ্গিকের বা আদর্শের প্রতি শিল্পীর মমতা বেশি। বোধ হয় এই মনোভাব-বশতঃই এপস্টাইন নিজের গড়া প্রতিকৃতিগুলি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসাকে যথেষ্ট মূল্য দেন নি। তাঁর মতে প্রতিকৃতিতে আকারগত সাদৃশ্য দেখেই দর্শক মুগ্ধ, কিন্তু তাঁর ভাস্কর্যের আসল গুণ সাধারণ দর্শক উপভোগ করে না। এপস্টাইনের মতে তাঁর রচিত স্থাপত্যধর্মী মূর্তিতেই ঐ গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকট ব'লেই দর্শকসাধারণ সেগুলি থেকে রস গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি।

এপস্টাইনের শিল্পীজীবন শুরু হয়েছিল রোদ্যাঁর প্রভাবের মধ্যে। জীবনের শেষ দিকে আদর্শের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিনি পেয়েছিলেন হেনরী মূরকে। ইতিমধ্যে Cubistic, Abstract, Non-objective ইত্যাদি বহু প্রকারের শিল্প-আদর্শ পাশ্চাত্য ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এসেছে ও লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এপস্টাইন তাঁর পারিপার্শ্বিক শিল্প আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এগুলির আদর্শ বা উদ্দেশ্য তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তাঁর প্রথম জীবনের সৃষ্টি Mother and Child, Venus, Cursed be the day wherein I was born, Rock Drill ইত্যাদি কয়েকটি মূর্তি ছাড়া চরমপন্থী মূর্তি করবার চেষ্টা অন্যত্র করেন নি। 'চরমপন্থী' সম্পর্কে তাঁর মনোভাব অতিশয় স্পষ্ট। তিনি মনে করতেন, কেবল অনুকরণ-দ্বারা যেমন ভাস্কর্য হয় না, তেমনি জ্যামিতিসর্বস্ব ভাস্কর্যেরও বিশেষ কোনো সার্থকতা বোঝা যায় না। এই উক্তি যদিও প্রতিকৃতি সম্বন্ধেই, তবু এর দ্বারা তাঁর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

এপস্টাইনের শিল্পপ্রতিভার দুই ভিন্ন কোটির যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল তা থেকে দেখা যাবে যে, প্রতিকৃতি-গঠনের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। অপর দিকে আদর্শমূলক স্থাপত্যধর্মী মূর্তিগুলিতে তিনি প্রাচ্যভাবাপন্ন। প্রতিভার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব রোদ্যাঁর জীবনে পাওয়া যায় না। রোদ্যাঁ প্রাচ্য শিল্পের অনুরাগী ছিলেন এবং সমঝদার হিসাবে প্রাচ্য শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করবার অসাধারণ ক্ষমতাও তাঁর ছিল, কিন্তু ভাস্কর হিসাবে রোদ্যাঁ কোনোদিনই গ্রীক আদর্শের বাইরে যাবার চেষ্টা করেন নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই রোদ্যাঁর শিল্পের প্রভাব সহজেই এ যুগে পাশ্চাত্য শিল্পবিবর্তনের সহায় হতে পেরেছে। এপস্টাইনের জীবনে প্রাচ্য প্রভাব তাঁকে পাশ্চাত্য পরম্পরা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে নিয়ে এসেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁর প্রভাব সমসাময়িক ইউরোপীয় শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয় নয়। স্বরচিত প্রতিকৃতিমূলক মূর্তির সাহায্যেই তিনি ইউরোপীয় পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত

থাকবেন। অপর দিকে মৌলিক রূপস্রষ্টারূপে তিনি একক এবং গতানুগতিক পরম্পরা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন। তাঁর রচিত খৃষ্টবিষয়ক মূর্তিতে কল্পনার মৌলিকতা রসিকসমাজে যতই প্রশংসিত হোক, খৃষ্টধর্মাবলম্বী ইউরোপবাসীর পক্ষে সে মূর্তিকে খৃষ্টধর্মের প্রতীকরূপে গ্রহণ করা হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হবে না।

প্রাচ্য শিল্প সংস্কৃতিকে ভাবীকালের ইউরোপীয় শিল্পীরা কিভাবে গ্রহণ করবেন এবং আত্মীকরণ করবার পথ সুগম হবে কিনা তারই উপর এপস্টাইন-রচিত সকল মৌলিক রচনার স্থায়ী মূল্য ও মর্যাদা অনেকখানি নির্ভর করছে। যদি পাশ্চাত্য শিল্পীরা প্রাচ্য শিল্পকে আপন করতে সক্ষম হন তবে এপস্টাইন এ দিক দিয়ে অন্যতম সমর্থ পথিকৃৎরূপে অবশ্যই স্বীকৃত হবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী। ভবতোষ দত্ত। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা ১২। বারো টাকা।
প্রাচীন কবিওয়ালার গান। প্রফুল্লচন্দ্র পাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। পনেরো টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকে স্থূলতঃ দু ভাগে বিভক্ত করা চলে। এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজি শিক্ষা ফলপ্রসূ হতে শুরু করল এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে যুগ-পরিবর্তন সূচিত হল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। তার আগের বছর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু ঘটে। মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হওয়ার পর আর ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়োজন ছিল না।

ভারতচন্দ্রের মৃত্যুও হয়েছিল এই রকম তারিখ মিলিয়ে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভারতচন্দ্রের তিরোভাব। উভয় কবিই অপরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করলে দুজনেরই কাল পূর্ণ হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে ঈশ্বর গুপ্তের মত 'খাঁটি বাঙ্গালী' কবি আর 'জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই।' ভারতচন্দ্র মহাশক্তিশালী হলেও তাঁর সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য করা যেত। উভয় কবিই সমসাময়িক যুগমানসকে যথার্থরূপে প্রতিফলিত করেছিলেন, যথাসময়ে এঁদের আবির্ভাব না হলে সাহিত্যের এক-একটি জরুরি প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে যেত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যরচনার পুরাতন ঐতিহ্য ও আদর্শ লুপ্ত হয়েছিল ; কিন্তু গঠনে শিল্পরূপে ও ভাবাদর্শে নবযুগের সূচনা হবার সময় তখনো আসে নি। এ সময়ের কবিতা তখন তিন রূপে দেখা দিয়েছিল : নিধুবাবু-প্রবর্তিত বাংলা টপ্পা গান, পুরাতন পাঁচালীর আধুনিক বিকৃত অনুকরণ, এবং কবিওয়ালাদের গান। গঠনের দিক থেকে বিচার করলে টপ্পা গানে কবিতার পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই। দাশু রায় প্রমুখ নূতন ধরণের পাঁচালী-রচয়িতারাও পুরাতন পাঁচালী গানের ঐতিহ্যগত নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেন নি—সে নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কেননা, তাঁরা অনেক সময় মুখে মুখে পদ্য রচনা করে বা গান বেঁধে আসর জমাতেন। কবিওয়ালারাও অনেক গানই যখন-তখন মুখে মুখে তৈরি করে নিতেন। কাজেই তাঁরাও পদ্যরচনার কোনো গতানুগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেন না ; এঁদের পদ্য বা গানের পংক্তিগুলি অসমান, ছন্দেরও খুব সযত্ন ব্যবহার এঁরা করেন নি। এককথায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা কবিতায় ভাবাদর্শের অভাব তো ছিলই, পদ্যের পুরাতন গঠনরীতি ও শিল্পরূপ, কবিতার form ও technique, সম্পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল অনিয়মিতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনায় ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খল অনিয়মিত শিথিলগঠন শ্রাব্য কবিতার প্রয়োজন শেষ হল, এবং তখনো পর্যন্ত অনাগত, কিন্তু আশু-প্রত্যাশিত নবীন পাঠ্য কবিতার নির্দিষ্ট এবং শিল্পোপযোগী বাহনরূপে পদ্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুগঠিত আকার দেবার প্রয়োজন দেখা দিল। সে প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তিনি পুরাতন পয়ার-ত্রিপদী-ছড়ার ছন্দই ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু তাকে সুশৃঙ্খল, সুগঠিত ও নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট আকারে বিধিবদ্ধ করলেন। ভাবের দিক থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশের কবিতার সগোত্র, কিন্তু গঠনের দিক থেকে

সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত এবং সে হিসাবে নবীন যুগের বার্তাবহ। এককথায়, তিনি তাঁর পূর্ববর্তী অগঠিত অপূর্ণাঙ্গ বিকৃতাকার কাব্যযুগকে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ও আকারে উপস্থিত করলেন। নিখুঁত পদ্যরচয়িতা ঈশ্বর গুপ্তের রচনাই তাঁর পূর্ববর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যে পূর্ণাঙ্গ সুগঠিত আকারে আমরা তাঁর পূর্ববর্তী যুগের অগঠিত পদ্যকেই ভালো করে দেখতে পাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশের অপূর্ণাঙ্গ পদ্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধের নবযুগ-অনুপ্রাণিত কাব্য, ঈশ্বর গুপ্তের রচনা এদের মধ্যবর্তী। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী পদ্যকে সুগঠিত সুসম্বদ্ধ করে নূতন যুগের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিলেন। নূতন যুগের উচ্চ ভাব অথবা নবীন আদর্শকে তিনি হৃদয়ঙ্গম কিংবা গ্রহণ করতে পারেন নি বটে কিন্তু তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং যে কবিসম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন, সেই অপস্রিয়মান কবিগোষ্ঠীর জীবনী ও তাঁদের লুপ্তপ্রায় রচনা সংগ্রহ ও রক্ষা করার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁদের সঙ্গে নিজের আত্মিক সংযোগও তিনি কিছুটা উপলব্ধি করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের মনের একাংশে যে আধুনিকতা ছিল, এই ইতিহাস-চেতনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু আয়াসে তিনি ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য কবি ও কবিওয়ালার জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করেছিলেন। এই কবিদের— বিশেষ করে কবিওয়ালাদের, জীবনীর উপাদান ঈশ্বর গুপ্তের সময়েই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সময়ে তা সংগ্রহ করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু অধুনা এসব কবির জীবনী-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার তথ্য এবং তাঁদের রচনাবলীর জন্য 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত তথ্য ও উদ্ধৃতিগুলির উপর নির্ভর করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তাই সে সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে জিজ্ঞাসুকে 'সংবাদ-প্রভাকরে'র পুরাতন ফাইলগুলির শরণাপন্ন হতেই হয়।

আধুনিক কালে বহু প্রখ্যাত সমালোচক ও গবেষক কবিওয়ালাদের জীবন ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সম্মান অবশ্য ডক্টর সুশীলকুমার দে মহাশয়েরই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি কিংবা পরবর্তী কোনো গবেষকই ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত সকল তথ্য ও উদ্ধৃতি একস্থানে উপস্থিত করতে পারেন নি। তৎকালীন কবিদের সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত গদ্যপ্রবন্ধগুলির উদ্ধারের চেষ্টামাত্রও কেউ করেন নি, বিভিন্ন সমালোচকের রচনায় এগুলির থেকে কিছুকিছু তথ্য বা উদ্ধৃতি উৎকলিত হয়েছে মাত্র। 'সংবাদ প্রভাকরে'র ফাইল এখন দুষ্প্রাপ্য, এবং যত দিন যাচ্ছে ততই এগুলি দুষ্প্রাপ্য থেকে অপ্রাপ্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। এক্ষেত্রে শ্রীভবতোষ দত্ত 'সংবাদ প্রভাকরে'র পুরোনো ফাইল থেকে ঈশ্বর গুপ্তের সমগ্র রচনাবলী এবং তাঁর সংগৃহীত তৎপূর্ববর্তী কবিদের সকল কবিতা উদ্ধার এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের এক অতি-প্রয়োজনীয় কাজ সুসম্পন্ন করেছেন, এবং সেজন্য তিনি সাহিত্য-জিজ্ঞাসু মাত্রেরই একান্ত কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ কাজে আর অধিক বিলম্ব হলে এইসকল অমূল্য তথ্যের কতকাংশ চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

সমালোচ্য গ্রন্থে ভবতোষবাবু, 'সংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত সকল কবির জীবনী ও তৎসম্পর্কিত তথ্য সংকলন-মাত্র করেই ক্ষান্ত হন নি, উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদন করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত তৎপূর্ববর্তী অপস্রিয়মান কবিসম্প্রদায়ের সঙ্গে আত্মিক সংযোগ বোধ করছিলেন বলেই হোক, অথবা নবীন যুগপ্রভাবেই হোক, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান কবিদের জীবনী ও রচনাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করছিলেন

বটে, কিন্তু সাহিত্য-ইতিহাসের পারম্পর্য ও ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। ফলে, 'সংবাদ প্রভাকরে' এগুলি এলোমেলো ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ; গুপ্ত-কবি যখন যে জীবনী ও তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তখনই সেটি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভবতোষবাবু এই কবিদের জীবৎকালের তারিখ অনুযায়ী এগুলিকে সাজিয়ে সন্ধানী পাঠকের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যেতিহাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্য দিয়েই উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

এ ভিন্ন একটি দীর্ঘ অবতারণায় অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্য সাহিত্যের পশ্চাদ্বর্তী রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, সে-যুগের প্রধান প্রধান কবিদের বৈশিষ্ট্য, বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশে তাঁদের আপেক্ষিক মূল্য এবং এতৎসংক্রান্ত নানা তথ্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে ভবতোষবাবু বইটিকে মহামূল্যবান করে তুলেছেন। তা ছাড়া 'পরিশিষ্ট' অংশে ঈশ্বর গুপ্তের নিজস্ব সংযোজন ভিন্ন সম্পাদকের নিকট প্রেরিত কবিগান-সম্পর্কিত দু'টি তথ্যবহুল পত্র উদ্ধৃত করে সংগ্রহটিকে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু ভবতোষবাবুর গভীরতর অধ্যবসায় ও গবেষণা পরিস্ফুট হয়েছে এই গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠাব্যাপী 'আনুষঙ্গিক তথ্য' নামক শেষাংশে। এই অংশে সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের রচনার অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক কবির সম্বন্ধে পৃথক-ভাবে আলোচনা করে তথ্যাদি সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের অসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন করেছেন। ফলে, সাহিত্যের ছাত্র 'আনুষঙ্গিক তথ্য' সহ বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের পশ্চাৎপট, বিচিত্র গতি এবং লেখকবৃন্দ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ও নির্ভরযোগ্য ধারণা লাভ করতে পারবেন।

ভবতোষবাবুর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় তাঁর সংগ্রহ এবং আনুষঙ্গিক তথ্য পরিবেশনে, এবং সমালোচক হিসাবে তাঁর চিন্তা ও বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় তাঁর অতি সুলিখিত ভূমিকা ও অবতারণায় প্রকাশ পেয়েছে। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কালের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমি এবং তার পর ক্রমশঃ দ্রুত পটপরিবর্তনের যে চিত্রটি ভবতোষবাবু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেন, সে যুগের কাব্যসাহিত্যের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সেটির প্রয়োজন অপরিহার্য। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের রচনা-বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্য এ আলোচনা আরও একটু বিস্তারিত হলে ভালো হত। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভূমিব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ও ক্ষীয়মাণ জমিদার সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে ভবতোষবাবু সেই আলোকে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন সত্য, কিন্তু ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে, আমার বিশ্বাস, সে সময়ের বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক সামাজিক অর্থনৈতিক ও লৌকিক পরিবেশ সবই পরিপূর্ণতররূপে আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কাল বাংলাদেশের চরম দুর্গতির দিন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ধনী ভূস্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা অক্ষুণ্ণ ছিল বটে, কিন্তু মুর্শিদকুলী খাঁর নূতন ভূমিব্যবস্থার ফলে রাজা-জমিদারদের নিশ্চিন্ত আরামের দিন ঘুচে গেল। অর্থসংগ্রহের চিন্তা এবং চেষ্টা তাঁদের মন অস্থির ও অব্যবস্থিত করে তুলল। আবার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা এর আগে থেকেই নবাব-দরবারের শূন্যগর্ভ বিলাসিতার প্রভাব ও তদনুকরণের চেষ্টা তাঁদের সভাগুলিকে অগভীর চাকচিক্য এবং রুচিহীন রসিকতার দিকে ক্রমাগতই বেশি করে আকর্ষণ করছিল। এই ছিল তখন অভিজাত সম্প্রদায়ের -অবস্থা। ভারতচন্দ্র

এই সম্প্রদায়ের কবি এবং এই শ্রেণীর মনস্তুষ্টিবিধানই ছিল তাঁর জীবিকা। ভবতোষবাবু এ সম্প্রদায়ের ইতিহাস সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তাৎকালিক সাধারণ জনসমাজের দিকেও একবার দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন ছিল। ভবতোষবাবু প্রশ্ন করেছেন, "ভারতচন্দ্রের জীবনী থেকে ইতিহাসের যে নির্দেশ পাই, রামপ্রসাদের জীবনে সেটা কতদূর প্রযোজ্য ? দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রামপ্রসাদের গানের দুঃখবাদের মূল নির্ণয় করেছিলেন যুগের পরিমণ্ডলে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের পরিবার সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভ্রান্ত, সেইজন্য রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ঝড় তাঁকে যত প্রত্যক্ষভাবে সহ্য করতে হয়েছিল, দরিদ্র রামপ্রসাদ ঠিক সেভাবে ঝড়ের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ান নি।" ভবতোষবাবু তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর সে যুগের ইতিহাসেই পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মুর্শিদকুলী খাঁ দেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য যথাসম্ভব বেশি রাজস্ব আদায়ের চেষ্টায় সর্বদাই তাঁকে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। নূতন ভূমিব্যবস্থা তার মধ্যে একটি। পরবর্তী নবাবেরাও এ ধারা বজায় রেখেছিলেন। বেআইনী খাজনার অন্ত ছিল না। সার্ জন শোর তাঁর Minutesএ এইসব করের একটি তালিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, "It is necessary to remark that these imposts were founded upon principles unknown to the Moghul Constitution"। নবাবেরা প্রত্যক্ষভাবে জমিদারদের উপর যে চাপ দিতেন, তা আসলে এবং পরোক্ষভাবে প্রজাদের উপরই এসে পড়ত। তা ছাড়া নবাবের কর্মচারীদের চাপানো অসংখ্য আবওয়াবের তো অন্তই ছিল না। নবাবের চাপ সত্ত্বেও দরিদ্র চাষী-প্রজাকে দোহন করে বড় বড় জমিদারদের দরবারী বিলাসিতা অব্যাহতই চলত। এ বিষয়ে স্বর্গীয় যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে বলা হয়েছে, "The increasing drain of silver from Bengal amounting on an average to one crore of rupees every year, kept the volume of true money in circulation here extremely small and the price of local produce very low·· The land revenue was forced up so high by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman torture of the contractor-collectors. The pressure applied by the Nawab at the top naturally passed through the intermediate grades finally on to the actual cultivators, who were left with the bare means of existence, but every portion of the annual increase of their fields and looms above that minimum were taken away by the State. Thus, while the luxury of Delhi and Murshidabad was pampered and Murshid Quli every year buried a new hoard in his treasure vaults, the mass of the people browsed and died like human sheep."

কিন্তু এই নিদারুণ দারিদ্র্য-দুর্দশায় প্রজাদের দুঃখ শেষ হয় নি। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই "Bengal, particularly the eastern part of it, had become a land of adventure·· the Afghans, the Maghs and the Portuguese, all sought here the field for their

enterprise and energy." *Ibid.* পর্তুগীজদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা সর্বজনবিদিত। রেভারেণ্ড লঙ্‌ সাহেব বলেছেন, "We find in 1748 a river near Diamond Harbour called Rogues' River, probably because it was resorted to by the Portuguse pirates and Mugs. In Major Rennels' Map an extensive tract of the Sundarbunds south east of Calna is marked off as land depopulated by the Mugs." দক্ষিণ-বাংলায় আস্তানা হলেও নদী বেয়ে বাংলার সর্বত্র গিয়ে পর্তুগীজ দস্যুরা অত্যাচার চালাত। এদের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার শক্তি নবাবের ছিল না। এর উপর বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণ শুরু হয় আলিবর্দির সময়ে, ১৭৪২ সালে। এরা নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদে ঢুকে বাজার পুড়িয়ে জগৎ শেঠের বাড়ি লুঠ করতেও ইতস্তত করে নি। জনসাধারণের উপর এরা যে ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছিল, প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারাম তার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন। দেশের নবাব ভক্ষক ছিলেন, কিন্তু রক্ষক হবার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। বাঙালি জনসাধারণের আর্থিক অবস্থাই শুধু সেদিন শোচনীয় হয়ে ওঠে নি, তার পারিবারিক এবং সামাজিক অস্তিত্বও সেদিন কলঙ্কিত, গ্লানিময় ও আপন্ন হয়েছিল। এর উপর জমিদাররা প্রকাশ্যে ছিলেন অত্যাচারী শোষক, গোপনে ডাকাতি তখন অনেকেরই দ্বিতীয় পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন সাধারণ নিম্নশ্রেণীর লোকের ধনপ্রাণ মানসম্মান অর্থসম্পদ বাড়িঘর স্ত্রীপুত্র কিছুই নিরাপদ ছিল না। সেদিনকার অসহায়, ইহলোকে সকল আশ্রয়চ্যুত জনসাধারণের কথা মনে রাখলে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝা সহজ হয়।

মনে রাখতে হবে, দেশে তখনো মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় নি। দেশের অবস্থা তখন উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীকে দুভাবে প্রভাবিত করেছিল। উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অর্থের অভাব ছিল না, ছিল খাজনা মেটাবার দায়িত্ব পালনের সামর্থ্য সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা, ছিল আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার মধ্যে থেকেও আর্থিক নিশ্চিন্ততার অভাব। নবাবের বিরক্তি বা রোষে অথবা নবাবাশ্রিত কোনো প্রবল শত্রুর সঙ্গে দ্বন্দ্বে যে-কোনো মুহূর্তেই ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে যাওয়া সম্ভব ছিল। ভারতচন্দ্রের নিজের জীবনেও তাই ঘটেছিল। অপর দিকে উচ্চশ্রেণীর সমাজে সকল প্রকার নৈতিক আদর্শ তখন লুপ্তপ্রায়। বাংলাদেশে নবাবী আমল নীতিহীন বিলাসিতার স্বর্ণযুগ। তবু মুর্শিদকুলী খাঁ ও আলিবর্দি খাঁ ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলেছিলেন, সিরাজদ্দৌলা তাও করেন নি। ফলে অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সকল প্রকার দুর্নীতি ও রুচিহীনতা প্রবেশ করেছিল, অথচ উপরে-উপরে নবাবী দরবারের অনুকরণে চাকচিক্য পুরোমাত্রায় বজায় ছিল। এই অন্তঃসারশূন্য অব্যবস্থিত-চিত্ত রাজা-জমিদারদের কোনো গভীর চিন্তা কিংবা কোনো গভীর রসগ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না। ভারতচন্দ্র এই সমাজ থেকে উদ্ভূত, এই সমাজের মনস্তুষ্টি-কারক কবি; তাঁর কাছ থেকেও আমরা এর বেশি কিছু আশা করতে পারি না, এবং বিশেষ কিছু পাইও না। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, লোকচরিত্রজ্ঞান ও নিয়তিচেতনা ভারতচন্দ্রের রচনায় গভীরতা এনে দেয় নি বলে ভবতোষবাবু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভারতচন্দ্র একদিক থেকে যুগের প্রতিনিধি এ কথা ভোলা শক্ত। কোনো গভীর রসে মনোনিবেশ করতে পারলে তিনি যুগ প্রভাবের ঊর্ধ্বে চলে যেতেন, যুগপ্রতিনিধি থাকতেন না। দুঃখকষ্ট ভারতচন্দ্রকে এই বিষয়ে সচেতন করেছিল যে, নিয়তি মানুষকে 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ' এনে দেয়। ফলে ভারতচন্দ্র হয়েছিলেন অবিশ্বাসী, cynic। দেবদেবীর

প্রতি তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না, তাই তাঁর রচনায় তাঁরা মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছিল। তবু, মানুষের দুঃখকষ্ট দেখেছিলেন বলে ঈশ্বরী পাটনীর মুখে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' লেখা এবং 'নাগাষ্টক' রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

দেশের দুর্দশা উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীকে কি আশ্চর্য বিপরীতভাবে প্রভাবিত করেছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়। সেদিন অশান্তিপীড়িত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ধনীসমাজের তবু এক সান্ত্বনা, এক আশ্রয় ছিল বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকা, কিন্তু অসহায় নিম্নশ্রেণী ও দরিদ্র সমাজের কোনো আশ্রয়, কোনো সান্ত্বনাই আর অবশিষ্ট ছিল না। তাই সেই দুর্দিনে উচ্চশ্রেণী আরো বেশি করে চটুল বিলাসিতা ও নৈতিক অধঃপতনে ডুবে যেতে চেয়েছিল, তারই দৃষ্টান্ত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা, তারই সাক্ষাৎ ফল ভারতচন্দ্র। দেশের যে দুর্দশা ভারতচন্দ্রকে দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন করেছে, সেই চরম দুর্দশাই দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি রামপ্রসাদকে সকল ঐহিক শক্তির উর্ধ্বে মহাশক্তির প্রতি আত্মনিবেদনে আকর্ষণ করেছে। কেননা, মানুষের যখন সকল আশ্রয় হারিয়ে যায়, তখন মানুষ সেই চরমশক্তির আশ্রয়ই খোঁজে।

আসলে, ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুজনেই সে যুগের সার্থক প্রতিনিধি। দীনেশচন্দ্র সেন যে যুগের পরিমণ্ডলে রামপ্রসাদের দুঃখবাদের মূল নিরূপণ করেছেন, তা এদিক থেকে বিচার করলে যথার্থ বলে মনে না করে পারা যায় না। এদিক থেকে দেখলে রামপ্রসাদের গভীর আন্তরিকতাময় ভগবৎ নির্ভরতা বিস্ময়কর মনে হতে পারে না। ভবতোষবাবু লক্ষ্য করবেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বের শেষের দিক থেকে রাজা-জমিদার-শ্রেণী যতই তাঁদের ক্রমক্ষীয়মান অস্তিত্ব এবং অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন, ততই তাঁরা ভারতচন্দ্রের পথ ত্যাগ করে রামপ্রসাদের মত দেবতার চরণে করুণ বিলাপে আত্মনিবেদন করতে অগ্রসর হয়েছেন। এইজন্যই রাজা-জমিদারদের পরিবার থেকে এত অধিক সংখ্যক শাক্ত পদকর্তার উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ, রামপ্রসাদের গানে সেদিনের সকল আশ্রয়চ্যুত, সর্বপ্রকার ঐহিক আশায় বঞ্চিত দরিদ্র জনমানসের হাহাকার, এবং মানবজীবনের চরম আশ্রয় ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরতাই যেন ফুটে উঠেছে।

সর্বাংশে সুলিখিত অবতারণাটির মধ্যে যে অংশে ভবতোষবাবু আখড়াই ও কবিগান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, সেটি বিশেষভাবে তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় বহন করে। আখড়াই ও কবিগান আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, "বৈষ্ণব পদাবলী একে কিছুটা প্রভাবিত করলেও এর উদ্ভব নিম্নতম লোকজীবনের ক্ষেত্রে।" ভবতোষবাবুর এ সিদ্ধান্ত তাঁর নিজস্ব গবেষণার ফল, এবং সেইজন্যই এর কৃতিত্ব সমধিক। অবশ্য গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য আখড়াই সংগীতের উদ্ভবের যে বিবরণ দিয়েছেন, তথ্যপ্রমাণাদির অভাব সত্ত্বেও তার মূলে কিছু সত্য থাকা সম্ভব বলেই আমার মনে হয়। স্পষ্টতঃই বৈষ্ণব সমাজে এ কাহিনী প্রচলিত ছিল, নতুবা গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্যের পক্ষে তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হত না। কিন্তু আখড়াই গানের উদ্ভব যেখানেই হোক, ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের আমলে তা যে সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন নিম্নস্তরে প্রচলিত ছিল, একথা খুবই সংগত মনে হয়। সকল দেশে সকল কালেই শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন উচ্চসমাজে প্রচলিত সাহিত্যের পাশাপাশি নিম্নস্তরে এক সাহিত্যাশ্রিত আমোদ-প্রমোদের ধারা প্রচলিত থাকে। শিক্ষিত সমাজে অনেক সময় তার অস্তিত্বও অনুভূত হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, পলাশীর যুদ্ধের পর, বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে যে বিপ্লব

ঘটেছিল, সাহিত্যেও অনুরূপ বিপ্লব ঘটে থাকাটাই স্বাভাবিক। অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত শহুরে ব্যবসায়ীর দল যখন বিত্ত ও প্রতিপত্তি অধিকার করে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন অভিজাত সম্প্রদায়কে অপসারিত করে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করল, তখন সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্নস্তরের সাহিত্য ও আমোদ অবসন্ন উচ্চ সাহিত্যকে সরিয়ে তার স্থান দখল করে নেবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক ও সম্ভব। রুচিহীন কিন্তু বিত্তশালী লোকের মনোরঞ্জনই ছিল কবিওয়ালাদের উদ্দেশ্য। তাই জনপ্রিয় সকল বিষয়ই তাঁরা তাঁদের গানের বিষয়ীভূত করে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে অবশ্য 'কানু বিনে গীত নাই', তাই বৈষ্ণব প্রেমকাহিনী স্বভাবতঃই এঁদের গানে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু আগমনী ও বিজয়া, যার আনন্দ ও দুঃখ বাঙালী সমাজে মেয়ের বাপের বাড়ি আসা ও শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত, তাও কবিওয়ালারা বহুলভাবে তাঁদের গানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বস্তুতঃ ভবতোষবাবুর সিদ্ধান্ত একান্ত যুক্তিযুক্ত এবং আমার বিশ্বাস, পরবর্তী গবেষকদের দ্বারা বিনা দ্বিধায় গৃহীত হবে।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে ভবতোষবাবু যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে অনেক কথাই নূতন। ঈশ্বর গুপ্ত *Age of Reason* অনুবাদ করেছিলেন, এ তথ্যটি তার অন্যতম। যদিও ঈশ্বর গুপ্তের মিশনারীদের উপর আক্রোশ, এবং তাঁর রক্ষণশীল হিন্দু-মনোভাব সর্বজনবিদিত, তবু Tom Paine -এর বইটি যে তিনি স্বয়ংই অনুবাদ করেছিলেন, এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব নয়। 'প্রভাকর'-সম্পাদক এটি প্রকাশ করেছিলেন এবং ডাফ্‌ সাহেবের কাছে পাঠিয়েও দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু অনুবাদটি তাঁর কোনো ভালো ইংরেজি জানা বন্ধুবান্ধবের দ্বারা অথবা তাঁদের সহায়তায় রচিত হওয়াও অসম্ভব মনে হয় না। হয়তো এ বিষয়ে সঠিক কোনো তথ্য এখনো খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

অবতারণা ও পরিশিষ্ট সহ পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনায় ভবতোষবাবু যে পরিশ্রম, অধ্যবসায়, সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ ও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলায় দুর্লভ ও অসাধারণ, এ কথা বলতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানী পাঠককে এ বইয়ের সাহায্য পদে পদেই নিতে হবে। এ গ্রন্থ সম্পাদনে ভবতোষবাবু যে সাহিত্যবোধ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তারও তুলনা বিরল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি লুপ্তপ্রায় অধ্যায়কে ভবতোষবাবু কেবল উদ্ধার করেন নি, তাকে স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্নরূপে উপস্থিত করতে পেরেছেন বলে, তিনি আমাদের মত সাহিত্যের ছাত্রের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের গানের একটি সংকলন। অবশ্য, কবিওয়ালাদের গানকে কোনোমতে প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, বরং প্রাচীন ঐতিহ্যগত কাব্যের অবসানেই কবিগানের উদ্ভব, সে হিসাবে এ গান অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তবে, প্রফুল্লচন্দ্র পাল বোধহয় যা সাম্প্রতিক নয় তাই প্রাচীন, এই অর্থেই 'প্রাচীন' শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থকার বইটির নামকরণে আরও কিছু বিতর্কের অবকাশ রেখেছেন। তাঁর মতে "বলা বাহুল্য যে 'কবিয়াল' শব্দ শুদ্ধ, যেহেতু তাহা সংস্কৃত 'কবিপাল' বা 'কবিপালক' হইতে উদ্ভূত। কিন্তু কবিওয়ালা এইরূপ কোনও শব্দ সৃষ্ট হইতে পারে না।" স্পষ্টতঃই প্রফুল্লবাবু মনে করেন যে, যে

বাংলা শব্দ সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয়, তাই অশুদ্ধ। দুঃখের বিষয়, কবিওয়ালারা কোন অর্থে 'কবিপাল' বা 'কবিপালক' ছিলেন প্রফুল্লবাবু তা ব্যাখ্যা করে বলেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' দশ জনের বেশি কবিওয়ালার রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করতে সমর্থ হন নি। সে ক্ষেত্রে প্রফুল্লবাবু অজ্ঞাত লেখকের রচনা ভিন্ন ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ববর্তী সমসাময়িক ও পরবর্তী ৮১ জন কবিওয়ালার নাম ও রচনা এই সুবিশাল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেবল তাই নয়, ঈশ্বর গুপ্ত যে ক্ষেত্রে লালু-নন্দলালের একটিমাত্র পদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং রঘুনাথ দাস ও রামজী দাসের কোনো গানই খুঁজে পান নি, সে ক্ষেত্রে প্রফুল্লবাবু রঘুনাথ দাসের ২৪টি, লালু নন্দলালের ২৮টি এবং রামজীর ৮টি পদ তাঁর সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের চমৎকৃত করেছেন। যেসকল পরিচিত-অপরিচিত কবিওয়ালার অজ্ঞাতপূর্ব রচনা তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন, সেগুলির প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করবার কোনো চেষ্টা প্রফুল্লবাবু করেন নি—"মৎ কর্তৃক পুঁথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে", এইটুকু বলাই যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। সেই পুঁথি কবে কোথায় কার দ্বারা সংগৃহীত হয়েছে, তা কতদিনের পুরাতন, তাদের প্রামাণিকতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না, এসব বিষয়ে কোনো তথ্যপ্রমাণাদি উপস্থিত করা, অথবা যুক্তি ও আলোচনার দ্বারা এদের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করা তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। তাঁর সংগৃহীত পদগুলি সবই কবিগান কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ তিনি রেখেছেন। কারণ, বাইরে থেকে যতদূর বোঝা যায়, এ-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অনেক পদই কীর্তন বা অন্য গান বলে মনে হয়।

বইটির ১০৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি গ্রন্থকার অনেক চমকপ্রদ মৌলিক উক্তিতে পরিপূর্ণ করলেও, তৎসমর্থক তথ্য প্রমাণ বা যুক্তির অবতারণা অল্পই করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠার এই উক্তিটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "দাঁড়া-কবিগানের রচয়িতাদের কৃতিত্বের পরিমাণ পাঁচালী গান -রচয়িতাদের অপেক্ষা অধিক ও বহুমুখী বলিয়া 'কবি' আখ্যা তাঁহাদের সর্বাংশে উপযোগী। এইসকল কবির একাধারে সুর-লয়-তান-জ্ঞান, ছন্দ ও অলংকারের জ্ঞান, রসজ্ঞান ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য প্রমাণ করিতে হইত বলিয়া আমরা তাঁহাদের মধ্যে কবিত্বের সম্পূর্ণ রূপ খুঁজিয়া পাই।"

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বহু মনীষী সাহিত্যিক ও সমালোচক কবিগান নিয়ে আলোচনা করেছেন; রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। কিন্তু কবিগানের এরূপ উচ্চপ্রশংসাপত্র কেউই দিতে পারেন নি, বরং এর বিপরীত কথাই এতকাল আমরা শুনে ও জেনে এসেছি। কাজেই এ মতপ্রকাশে প্রফুল্ল-বাবু অভূতপূর্ব মৌলিকতার দাবি করতে পারেন।

প্রফুল্লবাবু আরো যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন, তার কয়েকটি উদ্ধৃত করছি। আশা করি এর থেকেই কৌতূহলী পাঠক গ্রন্থটি সম্বন্ধে ধারণা করে নিতে পারবেন।

"লোকসাহিত্য হইলেও ইহা কোনো লঘু সাহিত্যের নিদর্শন নহে, বরং ইহার মধ্যে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারানুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি ইহার ভাব ও বিষয়ের বিস্তার ও রসের গূঢ়তাও পরিলক্ষিত হয়।" "দাঁড়া-কবিগানে সংস্কৃত পদাবলীর দূতীসংবাদ ও ব্রজবুলী তথা বাংলা পদাবলীর সখীসংবাদ, উদ্ধবসংবাদ ও অক্রূরসংবাদ এক সখীসংবাদ পর্যায়ে পড়িয়া দীর্ঘায়তন লাভ করিল।" **"পাঁচালী ও পালাগান প্রকৃতপক্ষে কবিগানের প্রাচীন পর্যায়।"** (বড় অক্ষর গ্রন্থকারের)। অর্থাৎ প্রফুল্লবাবু কবিগানকে একাধারে গভীর রসাত্মক লোকসাহিত্য, বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাবাহী কাব্য

এবং পাঁচালী বা মঙ্গলকাব্য জাতীয় বাংলার ঐতিহ্যগত কাব্যধারার আধুনিক রূপ, এই তিন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রফুল্লবাবু কবিগানে উচ্চস্তরের প্রেমবৈচিত্ত্য বিষয়ক পদও আবিষ্কার করেছেন। (তুলনীয়— One particular section of Baisnab poetry, remarkable for its passion and its poetic quality, which is generally grouped under the heading প্রেমবৈচিত্ত্য is practically non-existent in Kabi literature."— *History of Bengali Literature in the 19th Century*, Dr. S. K. De)। প্রফুল্লবাবুর অন্যান্য উক্তির থেকেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যায় না। যথা "অন্তরার পরিবর্তে বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ অঞ্চলে 'লহর' শব্দ ব্যবহৃত হইত এবং ধুয়ার পরিবর্তে 'ঝুমুর' শব্দ প্রযুক্ত হইত। লক্ষ্য করা উচিত, পরবর্তী কালে এই দুটি শব্দ— লহর ও ঝুমুর— অর্থের প্রসার লাভ করিয়া কবিগানের এক দিক বা এক শাখার উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল। লহর হইতে পরবর্তী কালে কবির লড়াই (∠লহরাই) বা তরজায়, ও ঝুমুর হইতে টপ্পা ও ঢপ সঙ্গীতের প্রবর্তন বাঙ্গলার সর্বত্র ঘটিয়াছিল।" অর্থাৎ প্রফুল্লবাবুর মতে কবিগান ও টপ্পা গানের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গের "বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ অঞ্চলে" এবং লড়াই কথাটি "লহরা" শব্দের অপভ্রংশ!

পরিশেষে বক্তব্য এই যে কাগজের মলাটে মোড়া এই বইটির দাম— কেবলমাত্র বহিরঙ্গ বিবেচনাতেও — অত্যধিক বলে মনে হয়।

অজিত দত্ত

চিত্রদর্শন। কানাই সামন্ত। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। পঁচিশ টাকা।

শিল্পকলা সম্বন্ধে বাংলাভাষায় বই লেখা হয়েছে খুবই কম। অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিল্প-আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ সম্বন্ধে লেখবার ইচ্ছা ও চেষ্টা জাগে। এ দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথকেই অন্যতম পথপ্রদর্শক বলা চলে। ক্রমে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অসিতকুমার হালদার, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনন্দলাল বসু প্রমুখ পণ্ডিত ও মনীষীদের বাংলায় লেখা শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রধানতঃ ভারতীয় শিল্পের আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শ সম্বন্ধেই আলোচনা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ-লিখিত 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' শিল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে সর্বপ্রথম রচনা বলা চলে। (বলা প্রয়োজন যে, ইংরেজী বা অন্যান্য বিদেশী ভাষায় ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে যা আলোচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ আমি করলাম না।) আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ভারতীয় শিল্পের তত্ত্ব ও তার আনুষঙ্গিক আঙ্গিক ইত্যাদির নানা তথ্য সাহিত্যরসে সিক্ত করে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। ঠিক এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা কোনো বই ভারতের আর কোনো প্রদেশে এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।

বইখানির ভালোমন্দ বিচার করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। কারণ, পুস্তকখানি সম্বন্ধে শিল্পরসিকের ঔৎসুক্য জাগানোই আমার উদ্দেশ্য। লেখক যে ভাবে বিষয়গুলিকে সাজিয়েছেন আমার আলোচনার সুবিধার জন্য তার কিছু অদলবদল করা

প্রয়োজন মনে করি। চিত্রদর্শনের প্রথম প্রবন্ধ 'শিল্পের স্বরূপ'। এই প্রবন্ধে লেখক শিল্পের আদর্শ এবং নীতি ও দুর্নীতি নিয়ে যে ভাবে আলোচনা করেছেন এবং যে মীমাংসায় উপনীত হয়েছেন তাকে চূড়ান্ত মীমাংসা বলে ধরে নিতে পারা যায় কিনা এ বিষয়ে তর্ক তোলা যেতে পারে। শ্রীশুভেন্দু ঘোষ গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত তাঁর পত্রে এই তর্কই তুলেছেন। মনে হয় 'শিল্পের স্বরূপ' প্রবন্ধটির সঙ্গে 'কারুশিল্প' প্রবন্ধটি পাঠ করলে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'কারুশিল্প' প্রবন্ধটিতে লেখক শিল্প ও শিল্পপ্রেরণার ব্যবহারিক রূপ ও সামাজিক প্রয়োজনের কথা আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মধ্যে এমন কোনো কোনো উক্তি পাওয়া যাবে যা 'শিল্পের স্বরূপ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের ব্যাখ্যা বলে ধরা যেতে পারে। 'কারুশিল্প' প্রবন্ধটিতে চীন ও ভারতের কারুশিল্প সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা আছে। এই আলোচনার সঙ্গে পাঠক পরিশিষ্টে সংকলিত আচার্য নন্দলালের লিখিত পত্রখানি দেখে নিলে উপকৃত হবেন। 'চিত্র' প্রবন্ধে লেখক ভারতীয় ষড়ঙ্গতত্ত্বের একটি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। ইতিপূর্বে অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক চীন ও ইউরোপীয় শিল্পশাস্ত্রের নানা প্রমাণ উদ্ধৃত করে ভারতীয় ষড়ঙ্গের সর্বাঙ্গীণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাদৃশ্য বা বর্ণিকাভঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের মীমাংসা চূড়ান্ত বলে পণ্ডিতসমাজ মেনে নেবেন কিনা সে হল স্বতন্ত্র কথা। আপাততঃ তাঁর আলোচনা একটি নির্ভরযোগ্য মীমাংসায় আমাদের পৌঁছে দিতে পেরেছে বলে মনে করি। বিষ্ণুধর্মোত্তরম্[১] গ্রন্থের অংশবিশেষ নিয়ে লেখক একটি সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাটি হল গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'চিত্রসূত্রাবলী'। 'চিত্র' প্রবন্ধ পড়বার পর জিজ্ঞাসু পাঠক যদি 'চিত্রসূত্রাবলী' প্রবন্ধটি পাঠ করেন তবে উভয় প্রবন্ধই বুঝতে সহজ হবে এবং ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আঙ্গিক, আদর্শ, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণতর ধারণা করে নিতে পারবেন সহজে। 'চিত্রসূত্রাবলী' প্রবন্ধে লেখক অনেকগুলি দুর্জ্ঞেয় বিষয় আমাদের কাছে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার প্রয়াস করেছেন। চিত্রের শ্রেণীবিভাগ এবং পরিভাষা সম্বন্ধে তাঁর মীমাংসা রসিকসমাজে স্বীকৃত হবার বাধা আছে বলে মনে হয় না।

দক্ষিণভারত ভ্রমণ করতে গিয়ে লেখকের কবিচিত্ত এবং তাঁর শিল্পদৃষ্টি ভারতীয় শিল্পপরম্পরা সম্বন্ধে যা ভেবেছে বা যা দেখেছে তারই একটি আশ্চর্য কাহিনী 'ভারত তীর্থদর্শন : ভারতীয় চিত্রকলা' প্রবন্ধের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতির একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা লেখক ভাষার আশ্চর্য শক্তিতে আমাদের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন। ভাষা, ভাব ও ভাবনা এই তিনের সংযোগে এই প্রবন্ধটি গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে চিহ্নিত করতে ইচ্ছা হয়। কবিহৃদয়ের স্পর্শে কালীঘাটের অল্প মূল্যের পটও আমাদের কাছে মহার্ঘ্য বলে মনে হয়। নূতন করে দেখবার ইচ্ছা হয়। তবে কবিত্ব আছে ব'লেই প্রবন্ধটির যে তথ্যগত মূল্য নেই এমন যেন কেউ মনে না করেন। 'কালীঘাটের পট' আলোচনা করতে গিয়ে যে দু-চারটি তথ্য সম্বন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন তা সহজে উপেক্ষা করা চলে না।

এ পর্যন্ত যে প্রবন্ধগুলি উল্লেখ করলাম সেগুলি ধারাবাহী ও পরম্পরাশ্রিত ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে লেখা। এর পরের প্রবন্ধগুলিতে লেখক আমাদের নিয়ে এসেছেন নব্য কালের শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে। 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', 'গগনেন্দ্রনাথ', 'শিল্পী রবীন্দ্রনাথ', 'অবনীন্দ্রনাথ' ও 'নন্দলাল' এই প্রবন্ধগুলিতে উল্লিখিত

১ ইতিপূর্বে শ্রীমতী স্টেলা ক্রামরিশ এর ইংরেজি অনুবাদ ভূমিকা ও প্রয়োজনীয় মন্তব্যাদি সহ প্রকাশ করেন।

শিল্পীদের প্রত্যেকের শিল্পপ্রতিভা রচনাকৌশল ও শিল্পীজীবনের বিচিত্র পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে লেখক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। একাধারে তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহারে সার্থক সাহিত্য-সৃজনের অসাধারণ দক্ষতা লেখকের এই শিল্পজীবনীগুলির মধ্যে আমরা আর একবার প্রত্যক্ষ করি। একত্রে দেখলে বলা যায়, পূর্বোক্ত শিল্পীদের জীবনের কাহিনীকে উপলক্ষ্য করে লেখক আধুনিক বাংলা শিল্পসংস্কৃতির একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। 'শিল্পিত নেপাল' বা 'বাংলার পল্লীচিত্র' এক-একটি রম্যরচনা; তবে তথ্য-বর্জিত বা ভাবালুতা-আচ্ছন্ন নয়।

পুস্তকের পরিশিষ্টে শ্রীশুভেন্দু ঘোষ, শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী ও আচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর পত্র, গ্রন্থে উপস্থাপিত নানা মূল বিষয়ের টীকা-টিপ্পনী রূপে গণ্য হবে। অজন্তা সম্বন্ধে শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগীর সংক্ষিপ্ত পত্র, তেমনি অবনীন্দ্রপ্রতিভা সম্পর্কে শিল্পাচার্যের সারগর্ভ উক্তি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

পরিশিষ্টে ক্যালিগ্রাফি বা 'লেখাঙ্কন' সম্পর্কে গ্রন্থকারের নিজস্ব টীকা 'চিত্র' প্রবন্ধটির মধ্যে আলোচিত চীনা ষড়ঙ্গের বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের অংশরূপে পাঠক গ্রহণ করবেন।

গ্রন্থের মলাটে প্রাচীন ভারতের একটি প্রতীক হিসাবে 'পদ্ম-শঙ্খ' ছাপা হয়েছে। গ্রন্থকার এই প্রতীকেরও একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই গ্রন্থের শুরুতে। মনে হয় গ্রন্থকার ভাষাকে এই প্রতীকের আদর্শে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ধ্বনি ও রূপ দুইয়ের সমাবেশ বহু ক্ষেত্রেই বিশেষ সার্থকতা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্চর্য পরিণতি লাভ করেছে।

বইখানিতে ৫৮ খানি ছবি আছে। প্রাচীন ও নবীন উভয় শিল্পেরই নিদর্শন রূপে এই ছবিগুলি সাজানো হয়েছে। আলোচনার বিষয় বোঝবার পক্ষে ছবিগুলি বিশেষ উপযোগী। বইয়ের ছাপা বাঁধাই উত্তম। বাংলা ভাষায় লেখা শিল্পদর্শন বইয়ের দাম ২৫ টাকা কিঞ্চিৎ বেশি বলে অনেকেরই মনে হতে পারে; তবে এই দুর্মূল্যের দিনে এমন ভালো আর্ট্‌পেপারে এতগুলি রঙিন আর হাফটোন ছবি দিতে হলে, আর অন্যান্য দিকেও কৃপণতা না করতে হলে, প্রকাশকের হয়তো উপায়ান্তর ছিল না। এ কথা ঠিক, যাঁদের ভারতীয় শিল্প, বিশেষতঃ চিত্রকলা সম্বন্ধে, জানবার ও বোঝবার ইচ্ছা আছে তাঁদের অবশ্যই এই বইখানি পড়ে দেখা উচিত।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি, পেয়েছি আঁধার রাতে ॥
না দেখিবে তারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো—
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুসুমে ফুটিবে প্রাতে ॥
তারি লাগি যত ফেলেছি অশ্রুজল
বীণাবাদিনীর শতদলদলে করিছে সে টলোমল ।
মোর গানে গানে পলকে পলকে ঝলসি উঠিছে ঝলকে ঝলকে,
শান্ত হাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II মা পা পা । পা ধা নধপা I পা -া -া । ধনা -[র্স]না -ধনা I
না চা হি লে যা রে০০ পা ০ ও য়া০ ০০ ০০

I ধপা -া -া । -া -া -মা I মা পা পা । পা পদা পা I
যা০ ০ ০ ০ ০ য়্ না চা হি লে যা০ রে

I মা -া -া । পধপা -মপা -া I [ম]গা -া -া । -া -া -মা I
পা ০ ও য়া০০ ০০ ০ যা ০ ০ ০ ০ য়্

I মা পা পা । পা [প]ধা পমা I পা পধা -না । -া -া -ধপা I
তে য়া গি লে আ সে০ হা তে০ ০ ০ ০ ০০

I পা ধা র্সা । র্সা [র্স]না -ধপা I পা পা -ধা । না -ধা -না I
দি ব সে সে ধ ০ন্ হা রা ০ য়ে ০ ০

I [ধ]পা -া -া । [প]ধা পা -া I মা পা পা । পা ধা পা I
ছি ০ ০ আ মি ০ পে য়ে ছি আঁ ধা র

I মপা মগা -া । -া -া -মা II
রাং তেং ০ ০ ০ ০

-া II { পা ধা র্সা । র্সা নর্সা -র্রর্গা I র্রর্সা -া -া । -া -া -পা
য়্ না দে খি বে তাং ০০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I নর্সা র্সা র্সা । না পধা -নর্সা I না -া -া । -া -া -ধপা }
পং র শি বে নাং ০০ গো ০ ০ ০ ০ ০০

I পা না না । ধনা পা -ধা I মা পা -া । ধা পা -ধা
তা রি পা নে প্রা ণ্ মে লে ০ দি য়ে ০

I মপা মগা -া । মা পধা -নর্সা I ধনা ধপা -া । -া -া -া
জাং গোং ০ জা গোং ০০ জা গো ০ ০ ০ ০

I না না -র্সা । র্সা র্সা -া I নর্সা র্সা র্সা । র্সা নর্সা -র্রা
তা রা য়্ তা রা য়্ রং বে তা রি বাং ০

I র্সর্রা -র্সা -া । -না -া -া I না র্সা র্সা । র্সা র্সা না
ণীং ০ ০ ০ ০ ০ কু সু মে ফু টি বে

I ধনা ধপা -া । -পা -গা -মা II
প্রা তে ০ ০ ০ ০

II { সা সা সা । রা রা রা I রা রা গা । রা -পা মপা
তা রি লা গি য ত ফে লে ছি অ ০ শ্রু

I মগা -া -া । -া -া -া I গা গমা মা । মা মা -া
জ ০ ০ ০ ০ ল্ বী ণাং বা দি নী র্

I মা পা পা । [ম]পা [প]মা [ম]গা I গা মা মা । গা রা গমা I
শ ত দ ল দ লে ক রি ছে সে ট লো০

I [ম]গা -া -া । -া -া -া } I পধা -র্সা র্সা । র্সা [ন]র্সা -র্রা I
ম ০ ০ ০ ০ ল্ মো০ র্ গা নে গা ০

I র্সা -া -া । -া -া -া I না র্সা র্সা । না র্সা না I
নে ০ ০ ০ ০ ০ প ল কে প প কে

I ধা না ধা । পা ধা পা I মা পা পধা । [ম]পা গা মা I
ঝ ল সি উ ঠি ছে ঝ ল কে০ ঝ ল কে

I মপা -া পা । পা পা -া I সা সা সা । রা রা গা I
শা০ ন্ ত হা সি র্ ক রু ণ আ লো কে

I রা রা গা । রা রপা [ম]পা I মা গা -া । -া -মা -পা II II
ভা তি ছে ন য়০ ন পা তে ০ ০ ০ ০

## প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী

শ্রীকালিদাস রায় ॥ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় : প্রথম খণ্ড ॥ পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। আট টাকা।

গদ্যরচনার সূত্রপাত থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত সাহিত্যিকবৃন্দের সাহিত্যসাধনার পরিচয়। ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের আনুকূল্যের দিকে দৃষ্টি রেখে রচিত।

সূচী : গদ্যরচনার সূত্রপাত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, আলালের ঘরের দুলাল, লোকশিক্ষক ভূদেব, মধুসূদন, মধুসূদনের কাব্যবিচার, বীরাঙ্গনা কাব্য, মেঘনাদবধ, বিদ্রোহী মধুসূদন, অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি, মধুসূদনের রাজসিকতা, মধুকাব্যের নবাদর্শ, মাইকেলের রচনার মৌলিকতা, মাইকেলের ভাষা, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, কবিগুরু বিহারীলাল, স্বর্ণলতা, গোপাল উড়ে, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমের উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, বঙ্কিমসাহিত্যে প্রণয়, বঙ্কিমের ধর্মমত।

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ॥ সাহিত্য-দীপিকা ॥ জে. এন. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১২। সাত টাকা।

উচ্চমানের ছাত্রদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, কাব্যের ছন্দ, সাহিত্যের অলংকার, ধ্বনিবাদ ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ কবিগুরুর রক্তকরবী ॥ সূর্যভারতী, কলিকাতা ১৪। সওয়া তিন টাকা।

শ্রীতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ বঙ্কিম-জিজ্ঞাসা ॥ সূর্যভারতী, কলিকাতা ১৪। সওয়া তিন টাকা।

শ্রীতমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত ॥ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বারো টাকা।

শ্রীনির্মলকুমার বসু ॥ নবীন ও প্রাচীন ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। চার টাকা।

শিক্ষা সমাজ সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে ৩৬টি প্রবন্ধের সংগ্রহ। 'সংস্কৃতি' বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি প্রবন্ধ আছে : 'রবীন্দ্রনাথের সাধনা' 'তৃষ্ণা' ও 'রবীন্দ্রনাথের ছবি'। 'বাঙালীর সমাজ' বিভাগে "বাঙালীর চরিত্র" প্রবন্ধেও রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ আছে।

রঞ্জন ॥ বইয়ের বদলে ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। আড়াই টাকা।

সূচী : ভূমিকা, বাঙ্‌লা ও ইংরেজি, সাংবাদিকতায় সাহিত্য, অনিদ্রা, ব্যক্তি ও শিল্পী, বাঙ্‌লা সমালোচনা, উপন্যাসে স্টাইল, নীরদ চৌধুরী, নব চাণক্য, মানচিত্র ও ব্র্যাড্‌শ, একা, পুনশ্চ।

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র ॥ বাংলার সঙ্গীত : প্রথম যুগ ॥ টি. কে. ব্যানার্জি অ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১২। তিন টাকা।

"ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাচীন সঙ্গীতের রূপ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি।"

শ্রীরাধানাথ দাস ॥ কবির স্বপ্ন ॥ নরনারায়ণ আশ্রম, কলিকাতা ২৬। দশ আনা।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র দাশ ॥ সাহিত্য-সন্দর্শন ॥ চক্রবর্তী চাটার্জি অ্যাণ্ড কোং লি., কলিকাতা ১২। ছয় টাকা।

সূচী : আর্ট, সাহিত্য, কবিতা, সাহিত্যে রসতত্ত্ব, গীতি-কবিতা, বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় কবিতা, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধসাহিত্য, সমালোচনা, গদ্যসাহিত্য, রোমান্টিসিজ্‌ম্ ও ক্লাসিসিজ্‌ম্, সাহিত্যে বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র, সাহিত্যে রসসর্বস্বতানীতি, বাণীভঙ্গি, হাস্যরস, সাহিত্যে সাবলিমিটি, সাহিত্যে মিস্টিসিজ্‌ম্, বাংলা কবিতার ছন্দ।

# বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

পঞ্চদশ বর্ষ। শ্রাবণ ১৮৮০ - আষাঢ় ১৮৮১ শক

## বিষয়সূচী

## চিত্রসূচী

ষোড়শ বর্ষ

দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা



সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

# পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা

সম্পাদনা করেছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব। জীবনের একটি পরমমূল্য প্রেমের উপলব্ধি। ইতিহাসের আদিকাল থেকে মানবমনের এই উপলব্ধি শিল্পের সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে। ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেন—'শিল্পবস্তু কেবল শিল্পীমনেরই প্রতিচ্ছায়া নয়— সমগ্র বিশ্বভুবনের একটি সত্যরূপ আমরা দেখতে পাই তাতে।' প্রেমও তেমনি 'সব দোষ ত্রুটি অভাব ও বিকারের অন্তরালে প্রিয়ার রূপ ও ব্যক্তিস্বরূপের গভীর তলে এমন এক পূর্ণতার আবিষ্কার যা অনন্যভাবে' প্রেমিকেরই নিজস্ব, 'তারই প্রেমপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টির কাছে উদ্‌ঘাটিতব্য।' যুগে-যুগেই প্রেমের কবিতার মধ্যে রূপ আর রসের আবেদন আশ্চর্য রকমের ভিন্ন হয়ে এসেছে। কিন্তু প্রেম চিরন্তন। শিল্পী আর প্রেমিক সগোত্র। 'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা' সেই রকম একটি উৎকৃষ্ট আয়নার মতো, যাতে প্রতিচ্ছায়ার বিকার ঘটে না, সাম্প্রতিক কবিমনে চিরন্তন প্রেমের প্রসঙ্গ যে-যে ভাবনা এবং উপলব্ধির সঞ্চার করেছে তার নির্ভরযোগ্য প্রতিবিম্ব দেখা যায় সে-আয়নাতে। সংকলিত ৬০ জন কবির আদিতে আছেন রবীন্দ্রনাথ, বয়োঃকনিষ্ঠ কবির রচনা দিয়ে শেষ হয়েছে। দাম ৫·৫০

# নাম রেখেছি কোমল গান্ধার। বিষ্ণু দে

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা '২২শে শ্রাবণ', শেষ কবিতা '২৫শে বৈশাখ'। 'কবিতা' পত্রিকায় অরুণকুমার সরকার বলেছেন, 'এই সন্নিবেশ তাৎপর্যসূচক। কবিতাগুলি মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে, স্থবিরতা থেকে জঙ্গমে, নিরাশা থেকে উদ্দীপনায়, অসুন্দর থেকে সৌন্দর্যের জ্যোতির্লোকে, বিশ্বাসে শান্তিতে ধাবমান হবার আহ্বান। বিষ্ণু দে বরাবরই দেশকাল সম্পর্কে সামাজিক অর্থে চিন্তিত। গত দশ বছরের বাংলাদেশ···এই বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার বেদনাভূমি।' বিষ্ণু দে সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছন্দোবিচারে 'তাঁর অবদান অলোকসামান্য, এবং কাব্যরসিকদের নিরপেক্ষ সাধুবাদই বিষ্ণু দে-র অবশ্যলভ্য।' দাম ৩৲

# এলিঅটের কবিতা। বিষ্ণু দে অনূদিত

বিবেকী সৎ কবির কাছে সাহিত্যের দুরূহতম ক্রিয়া কাব্যের অনুবাদ। অগ্রগণ্য বিদেশী কবির মহৎ কাব্যের সুনিপুণ সাবলীল ভাষান্তরণ এই 'এলিঅটের কবিতা' বাংলা ভাষায় বিষ্ণু দে-র স্মরণীয় দান। দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি আরো কয়েকটি অনূদিত কবিতা সংযোজন করেছেন। দাম ২·২৫

# নীলনির্জন। নীরেন্দ্র চক্রবর্তী

ছন্দোরূপময় বেদনালব্ধ কাব্যের একটি বিশিষ্ট পরিমণ্ডল নিয়ে নীরেন্দ্র চক্রবর্তী শক্তিশালী কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তিনি আধুনিক হয়েও দুর্বোধ্য নন। তাঁর কবিতার লাবণ্য মনকে স্নিগ্ধ করে। সুর অনুরণন জাগায়। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন, 'নীরেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রযুগের কবি হইলেও তাঁহার গায়ে কখন মাইকেলের উড়ুনীর আশীর্বাদ-স্পর্শ লাগিয়াছে।···নীরেন্দ্রবাবুর কবিজীবনে অভিজ্ঞতার ঢেউ সংযমের তর্জনীসংকেত আনিয়াছে।···কবি স্বল্পবাক, সংযত-ভাষ, ধীর স্থির পরিমিত তাঁর পদক্ষেপ। তৎসত্ত্বেও বুঝিতে পারা যায় তাঁহার অন্তরে তীব্র আবেগের অভাব নাই। স্বগতোক্তির মতো তাহা মৃদু।···পাঠক নীলনির্জন পড়িলে সার্থক কাব্যপাঠের আনন্দ পাইবেন।' দাম ২৲

কলেজ স্কোয়ারে : ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
বালিগঞ্জে : ১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

সিগনেট বুকশপ

বেঙ্গলের বই মানেই সেরা লেখকের সার্থক সৃষ্টি

॥ **সদ্য প্রকাশিত** ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নবতম সাহিত্যকীর্তি

**মহাশ্বেতা ৫৷৹**

( উপন্যাস )

—

A Homage to the Spirit & Culture of the people of Black Africa

**AFRICANISM**

The African Personality

By **Dr. Suniti Kumar Chatterji**

Foreword by Dr. S. Radhakrishnan

Rupees Sixteen only

ভবানী মুখোপাধ্যায়ের **জর্জ বার্নাড শ** ৮৷৹

নীলকণ্ঠের **এলেবেলে** ২·৫০

রমাপদ চৌধুরীর **মুক্ত বন্ধ** ৩·০০

বুদ্ধদেব বসুর **নীলাঞ্জনের খাতা** ৪·০০

সতীনাথ ভাদুড়ীর **পত্রলেখার বাবা** ৪·০০

মনোজ বসুর **মানুষ গড়ার কারিগর** সাড়ে পাঁচ টাকা

**উল্লেখযোগ্য বই**

জগদীশ ভট্টাচার্যের **সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ** ৬·০০ ॥ বিনায়ক সান্যালের **রবিতীর্থে** ৪·০০ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলীর **পঞ্চতন্ত্র** ৩·৫০ ॥ নারায়ণ চৌধুরীর **বাংলার সংস্কৃতি** ৩·০০ ॥ হুমায়ুন কবিরের **শিক্ষক ও শিক্ষার্থী** ৩·৫০ ॥ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের **এরিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্ ও সাহিত্য-তত্ত্ব** ৬·৫০ ॥ সুবোধকুমার চক্রবর্তীর **মণিপদ্ম** ৪·০০ ॥ জরাসন্ধের **তামসী** ৫·৫০ ॥ সুবোধ ঘোষের **একটি নমস্কারে** ৪·০০ ॥ আনন্দকিশোর মুন্সীর **ডাক্তারের ডায়েরী** ৪·০০ ॥ সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের **প্রদক্ষিণ** ৪·০০ ॥

**বেঙ্গল পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড**

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা : ১২

॥ শুভ সন্দেশ ॥

**রামধনু**

**হাসি-খুশীর ছন্দে ভরা কিশোর মাসিক**

শিশু ও কিশোর রাজ্যের বরণীয় সাহিত্যিকদের লেখায় ভরপুর হয়ে আত্মপ্রকাশ করবে প্রতি বাংলা মাসের প্রথম দিনটিতে। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র—১৩৬৭। প্রতি সংখ্যা ৫০ ন. প.। বাৎসরিক গ্রাহক ( সডাক ) ৬·০০। নূতনদের লেখা ও রেখা সাদরে গৃহীত হবে।

* * *

**রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী স্মরণে**

পঁচিশজন সাম্প্রতিক কবির কবিতা সংকলন

৪·০০

সম্পাদনায়

**দিনেশ দাস**

**এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি**

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-বারো

ফোন : ৩৪-২৩৮৬

করতে হলে আপনার পিতল ও তামার
জিনিস পত্র
রোজ ব্রাসো দিয়ে পালিশ করুন
BRASSO
BRASSO
অ্যাটলান্টিস্ (ইষ্ট) লিমিটেড, (ইংলণ্ডে সংগঠিত)
PSAE 23

# তারপর একদিন ...

বাবার হাতের গাঁইতি খানাও ওর কাছে খেলনা। ইস্পাতের ঐ গাঁইতি খানার সাথে বাবার শক্ত হাত দুটোর সম্পর্কের কথা ওর জানা নেই। বাবার মতো বাবা সেজে ও খেলা করে। টেলিগ্রাফের ঐ টানা টানা তারগুলো ওর কাছে এক বিস্ময়, আরও বিস্ময় তারের ঐ গুণগুণানি। কিন্তু আজ ও যে শিশু···
তারপর একদিন ঐ শিশুই হয়ে উঠবে দেশের এক দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক। কর্ত্তব্য আর কর্ম্ম হবে ওর জীবনের অঙ্গ; ছেলেবেলার সব খেলাই সেদিন কর্ম্মে রূপান্তরিত হবে। জীবনে আসবে ওর বোধন আর চেষ্টা। মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেই একদিন শ্রান্তিময়, ক্লান্তিময় পৃথিবীতে আনন্দ আর সুখ উৎসারিত হবে। বৈচিত্র আর অভিনবত্ব জীবনকে করে তুলবে সুন্দরতর।

**আজ সমৃদ্ধির গৌরবে আমাদের পণ্যদ্রব্য এ দেশের সমগ্র পারিবারিক পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও সুখী করে রেখেছে। তবুও আমাদের প্রচেষ্টা এগিয়ে চলেছে আগামীর পথে—সুন্দরতর জীবন মানের প্রয়োজনে মানুষের চেষ্টার সাথে সাথে চাহিদাও বেড়ে যাবে। সে দিনের সে বিরাট চাহিদা মেটাতে আমরাও সদাই প্রস্তুত রয়েছি আমাদের নতুন মত, নতুন পথ আর নতুন পণ্য নিয়ে।**

আজও আগামীতেও দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

PR.3-X52 BG

ছন্দময় হয়ে উঠুক আপনার জীবন
জীবনের প্রতিটি অণু পরমাণু
নটরাজের নৃত্যচ্ছন্দে আবর্তিত। তাঁরই
ছন্দের লীলায় আকাশে রঙ লাগে, পৃথিবীতে জাগে
শ্যামলিমার জোয়ার, মানুষের মনে ওঠে সুরের ঝংকার।
যুগে যুগে সুরের মায়াজালে মানুষের জীবনে সামান্য
মুহূর্ত্তটী হয়ে উঠেছে অসামান্য, রয়ে গেছে চিরদিনের
জন্য ——
পত্র লিখিলে
সচিত্র মূল্য
তালিকা পাঠানো
হয়।
সুনির্ব্বাচিত বাদ্য যন্ত্রের একমাত্র পরিবেশক—
টেলিফোন : ২৩-২৯২৯
ডোয়ার্কিন এণ্ড সন প্রাইভেট লিঃ ৮/২ এসপ্লানেড ইষ্ট কলিকাতা-১

# বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২-৩ কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

## বিষয়সূচী



## চিত্রসূচী



মূল্য তিন টাকা

শ্বেতমর

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২-৩ কার্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক

# চিঠিপত্র

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনন্দলাল বসুকে লিখিত

১

26th June [ 1924 ]
Jorasanko

প্রিয় নন্দলাল

চীনের যে পোষ্টকার্ডগুলো পাঠিয়েছিলে সেগুলো দেখে ভারি খুসি হলুম এতদিন তোমরা জাপান দেখে ফিরছ—এই চিঠি তোমাদের ফেরার পথে গিয়ে আমার মনের সঙ্গে অপেক্ষা করে রইলো তোমাদের ঘরে আসার পথ চেয়ে।

এবারে এখানে ভীষণ গরম পড়েছে—কলকাতায় এমন গরম কেউ দেখেনি গ্রীষ্মে কিন্তু আমার ছবি পুরোদমে চলেছে—কিন্তু শরীর ভারি অবসন্ন বোধ হয়। বোলপুরে বৌমা এবং তোমার ছেলে মেয়ে ও ছাত্রেরা সকলে বেশ আছে খবর পাই।

আমি এখন বিরুর[১] জন্যে কতকগুলো পশুপক্ষী আঁকছি। আমাদের শিল্পশাস্ত্রকারেরা দেবমূর্ত্তিই ধ্যান করতেই বলেছেন কিন্তু তাতে করে বানর আঁকার বেলায় টিয়াপাখি ছাগল ইত্যাদি লিখতেও ভারি মুস্কিল বাধে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি।

মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে শুধু হাত বাড়ালে artist কোন ফল পাবে না, আকাশকুসুম দুচারটে পেয়ে কি হবে তার ঠিক নেই। চীন মাটির বাসনে সিদ্ধহস্ত হল তবেই না এতটা দূর থেকে তার নাম শুনে লোক ছুটলো China দেখতে। আর্টিষ্ট মাটিছাড়া হলেই বিপদে পড়ে এটা ভারি সত্যি অতএব চীনের শিল্পশাস্ত্র জল মাটি হাওয়া এই তিনের সম্বন্ধে যে উপদেশ দেয় তার মধ্যে মাটিকেই প্রথম স্থান দেওয়ার কথা আছে, মৃদঙ্গের ধ্বনি শ্রেষ্ঠ এই কথা চীনে ভাষার সঙ্গীতশাস্ত্রেও দেখেছি।

প্রথম মাটি হতে হবে তার পর জলে গলতে হবে তার পর কল্পনার ডানায় ভর ও ওড়া। আমাদের বোলপুরের ও এখানের[২] ছাত্রগুলো একেবারেই উড়তে চায় জল কাদা ছেড়ে, পড়েও ঝুপ্‌ঝাপ্‌। এত ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শিখলেই আপদ চুকে যায়। আমি দেখ না মাটি কামড়ে যেখানকার সেখানে গট্‌ হয়ে বসে আছি আর তোমরা—বিশেষ ক্ষিতিমোহনবাবু[৩] আমাদের কি দুঃখই পাচ্ছেন ভুঁইছাড়া হয়ে। জলপথে কালিদাসবাবুর[৪] কথা স্বতন্ত্র আর ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা কিম্বা অবনীবাবুর কথা স্বতন্ত্র। এই

---

১ পৌত্র শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিএন্টাল আর্ট বা 'সোসাইটি'র ছাত্রেরা ?

৩ ক্ষিতিমোহন সেন। চীনভ্রমণে তিনি, শ্রীনন্দলাল বসু ও শ্রীকালিদাস নাগ রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন।

৪ শ্রীকালিদাস নাগ

শেষের দুজনের নাম পর্য্যন্ত মাটি না হয়ে যায় না যদি না এরা ঘ'রো রকমে বসবাস করতে গৃহস্থাশ্রমে না থাকে। বেদের মহীসূক্তটা পড়ে দেখো—মাটি আর মাটির জন্যেই সেখানে সব ছন্দ সব ভাষা ভাব! একেবারে পাকা আর্টিষ্টের কথা।

রথী[৫] প্রতিমা[৬] এখানে কলকাতাতেই রয়েছে— প্রতিমা প্রায় আমার কাছে এসে এসে ছবি শিখছে।

রবিকাকাকে আমার প্রণাম জানিও—গান বাজনার সাড়াশব্দ কোথাও পাইনে। বর্ষামঙ্গলটাও বাদ পড়ে গেল। বিশ্বভারতী কেবল যদি মস্ত একটা আফিস আর লাইব্রেরী হয়ে পড়ে তো সব যে মাটি হবে তার আর কথা কি।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

শুক্রবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল!

কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছো সুতরাং নিশ্চয়ই তোমরা রূপদক্ষ এবং রসিকও বটে আমি এ সম্বন্ধে কোনো তর্ক তুলছিনে শুধু আমি কেন যেতে পারলাম না তাই বলি— আজ সকাল থেকে আলোর একটি সাদা পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালো পাখি দুজনে দুটী পালক আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে এর মধ্যে কোনটি সাদা কোনটি কালো বিচার করে বল— ভাবতে ভাবতে রেলের সময় উৎরে গেল প্রশ্নেরও মীমাংসা হল না তাই তোমাদের শরণাপন্ন হচ্চি— আমার নাম ডোবে যদি তোমরা কেউ এর সদুত্তর একটি সাদা পালক আর একটি কালো পালকের সঠিক হিসেব না লিখে পাঠাও। দিন রাত দুজনে আমাকে মহা সমস্যায় ফেলে তোমাদের ওখানে উৎসব করতে গেছে— আমি এখানে বসে মনের আসনে সাদা কালোর আলপনা টান্‌চি আর কল্পনায় দেখছি কবির সঙ্গে তোমরা সেই আসনে বসে উৎসব করছো।

রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও, বন্ধুজনকে সম্ভাষণ জানিও, তোমরা এবং ছোটরা আমার বাকি যে শুভকামনা নিয়ো। মন গেল উড়ে সেখানে, মাথা বসে বসে ভাবছে সাদা কালো পালকের তত্ত্বকথা। আর থেকে থেকে পাখার বাতাস খাচ্ছে।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

৫ শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬ শ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর

৩

রবিবার
জোড়াসাঁকো

প্রিয় নন্দলাল !

তোমার আর রমেনের[১] কাছ থেকে প্রশ্নটির পরিপাটি উত্তর পেয়ে আনন্দিত হলেম। গিরিমাটির রংটি রং এবং রূপ দুয়ের মাঝে বৈরাগীর মতো নির্লিপ্তভাবে বসে থাকে রূপের পরশ রংএর আভা তার উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে কিন্তু কাবু হয় না বৈরাগী, সাদা কাগজ সাধাসিধে মানুষটি তাকে রং রূপ দুজনেই সহজেই কাবু করে, রংএর সঙ্গে রূপের সঙ্গে সে লিপ্ত হয়ে যেতেই চায়— "রংএর ধারায় (রূপ) হৃদয় হারায়" এই দেখতে পাই বিশ্বচিত্রে— কিন্তু মানুষের চিত্র, সেখানে রূপকে সজাগ করে দিতে রইলো বৈরাগী ও রং রূপকে রংএর সমুদ্র রংএর আবর্ত্ত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে চল্‌ল বৈরাগী নয়ও বটে প্রায় সাদা কাগজ বটে আবার রং বল্লেই চলে ওকে। তার পরে আর এক কথা গিরিমাটির রং হল জাৎসাপের মতো, ওর একটা আভিজাত্য আছে, অন্য রং তারা আভা রং নয়, তারা হঠাৎ নবাবের মতো বহুরূপী ও ক্ষণিক তাদের প্রকাশ, নটনটীর মতো তারা সাজসজ্জা করে যখন আসে তখন বৈরাগী পালাই পালাই করেন বটে মনে হয় কিন্তু ঘাঁটি আগলে নিজেকে সমান বরাবর বসেই থাকে ঠিক জায়গায় রংএর খেলায় রূপের লীলায় তিনি বাধা দেন না এইটাই প্রমাণ করেন যেন তিনি কেউ নয় রূপ রং তারাই সব, রংএর বাক্সর থেকে তিনি ডেকে বলেন আমি তৃণাদপি কমজোর আমার চেয়ে রংরাই সব কার্য্যকরী, ওদের নিয়ে খেলাঘর বাঁধ, ওরা কেউ শক্তিমান কেউ রূপবান, আমার রূপও নেই শক্তিও নেই কিন্তু মাটির মতো আমি স্থির, রূপের রংএর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমাকে জেনো, আমার মধ্যে রং রূপ আছে এবং নেই।

এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছ তাই তোমাদের সকলকে আর্ট সম্বন্ধে আমার একটা বচন উপহার পাঠাই—

পুতুলী গড়তে চারদিক দেখি
পট্‌টি লিখতে একদিক লেখি

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ— চিত্র একমুখি— গড়ন চারমুখি। এখন ছবিতেও perspective ইত্যাদি দিয়ে চার মুখ দেখানো হচ্ছে, আসলে কিন্তু সেগুলো ছবি হচ্ছে না, গড়ন হচ্ছে খাঁটি পট লিখবে তো এক মুখ লিখবে। পারস্য দেশের গালিচা একমুখি পটের নমুনা— বিলাতি গালিচা চতুর্মুখ গড়নের নমুনা।

১ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

৪

রবিবার

প্রিয় নন্দলাল!

আজ গোটা কতক কথা মনে এল শিল্পের 'ক' 'খ' জানতে হলে এর চেয়ে সহজ উপায় আর নেই :—

(ক) যে ছবিকে লোকে পাথরে কাটলে কাঠে কুন্দলে স্ঁচ দিয়ে তুল্লে কিম্বা আঁচড়ে বার করে আনলে তারা এক জিনিষ আর—

(খ) যে ছবি ফুটলো পটে সে আর এক জিনিষ।

কারণ (ক) সে মানুষের শক্তির পরিচয় ছাড়িয়ে উঠতে সম্পূর্ণভাবে পারলে না। মানুষ-ছোঁয়া হয়ে রইলো অনেকখানিই, যে তাদের ফোটালে তার বাহাদুরি কতকটা মনে পড়াতে থাকলো— যে ভাবে কাগজের ফুল সেই ভাবের কাজ এরা।

(খ) কিন্তু অন্যভাবে কাজ করতে থাকলো, কেননা সে সত্যি ফুটলো পটে, কেউ যে তাকে ফুটিয়েছে যত্নে চেষ্টায় এটা লোপ পেয়ে গেল কাজ থেকে।

একমাত্র চিত্রে সুকুমার সমস্ত পরশ দিয়ে এইভাবে রস ফোটানো চললো— অন্য কিছুতে নয়।

কাযটি ফুটলো চমৎকার, কায যে ফোটালে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল পরিষ্কার— এ হল চিত্রবিদ্যার চরম সার্থকতা— সবাই এটা পারে না।

নদীজলে মাছ থাকে কিন্তু আঁস-গন্ধ পায় না জল। কুণ্ডের জলে মাছ থাকে জল পর্য্যন্ত মাছের গন্ধে দূষিত হয়!

(ক) তেমনি একরকম ফুলও আছে যা মালি মালি গন্ধ করে, কাযও আছে যা মানুষ মানুষ গন্ধ করে!

(খ) আর একরকম আজ আছে যা ফুটন্ত ফুল— ফুল ফুল গন্ধ করে।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীঅসিতকুমার হালদারকে লিখিত

৫

প্রিয় অসিত,

বোলপুরে যদি ছোটখাট একটি gallery করে তুলতে পার তো মন্দ হয় না।

আমি এখন চিত্রের ষড়ঙ্গ[১] লিখতে ব্যস্ত আছি সুতরাং আর কোনো বিষয়ে মন দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বোলপুরে শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে সব কথা খুলে তোমায় লিখতে সময় নেই, এইটুকু মনে রেখো যে নিজেকে সেখানে গুরুমশায়ের জায়গায় বসিয়ে ছেলেদের ভয় খাইয়ে দিও না। মনে রেখো যে পাখী পড়াতে হলে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হতে হয়।

---

১ ১৩২১ সালে ভারতী পত্রে প্রকাশিত প্রস্তাবলী। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ', বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী।

৬

প্রিয় অসিত,

…খবরের কাগজ হইতে সাবধান থাকিও। আমি কখনো খবরের কাগজ পড়ি না, সুতরাং সেটার certificate-এর মূল্য আমার কাছে নাই। তা ছাড়া অত দেখিবার সময় কোথা ?

মান মনীকী মুট্‌কী সির পর্
নাহক্ বোঝ মরোরি।
মুট্‌কী পটক মিলো পীতম সে
সাহেব কবীর কহোরী॥

—র মত যদি নাম ও টাকা খুঁজিয়া বেড়াও তবে তোমার দশা কিরূপ হইবে জান ?

গৃহী ত্যজিকে ভয়ে উদাসী
বনখণ্ড তপ্‌কো যায়।
চোলী থাকি মারিয়া
বেরই চুনি চুনি খায়॥

গার্হস্থ্য ছাড়িয়া হইল উদাসীন, তপস্যার জন্য গেল বনখণ্ডে, দেহকে মারিল ক্লান্ত করিয়া, এত করিয়া শেষে বাছিয়া বাছিয়া খাইতে লাগিল জঙ্গলী কুল !

৭

প্রিয় অসিত,

[১]স্বপ্নপ্রয়াণ লইয়া Society[২] ছাপাইতে তো চাহে নাই ? তুমি ভুল বুঝিয়াছ। ছবিগুলি হইলে সেগুলি society হইতে বিলাতে পাঠাইয়া যাহাতে অল্প খরচে ছাপানো হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে এইমাত্র। তুমি বড়জ্যাঠামশায়কে[৩] ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিও।

রবিকাকার গল্প সম্বন্ধে তিনি যেরূপ বলেন sketch করিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেখাইয়া আঁকিও। বীজের ভিতর যেমন গাছ real-এর আড়ালে ideal তেমনি লুকাইয়া থাকে, খুঁজিলেই পাইবে।

তোমার অজন্তার drawing গুলি পাঠাইতে ভুলিও না। সমরেণ গুপ্ত July মাসে তাহারগুলি লইয়া আসিবে।

স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি বড় শক্ত, কেননা সেটি নিজেই একটি চমৎকার ছবি। কেবল ছবি না দিয়া সেটাকে গোটাকতক decorative border দিয়া ছাপাইলে মন্দ হয় না। কিন্তু তাহাও করিয়া তোলা সময়-সাপেক্ষ, এবারের মত ছবি না দিয়া বইখানি বাহির করা ছাড়া তো উপায় দেখি না। আমার গল্প পূজার মধ্যেই বাহির হইবে।

---

১ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ ( ও রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের ) সচিত্র সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব উপলক্ষ্যে এই পত্র লিখিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে এক সময় অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো কোনো অংশ চিত্রিত করিয়াছিলেন।

২ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

৩ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮

*প্রিয় অসিত,*

তোমার চিঠি বীরেশ্বরের[১] লেখা সব পেয়েছি। সময়াভাবে জবাব দিতে পারি নি।

Tradition-এ আর fashion-এ গোল করেছেন বিরু[১]। বোঁটা ছাড়া ফল যেমন অসম্ভব, tradition ছাড়া art-ও তেমনি অসম্ভব। মৌচাক tradition-মতো গড়া হয়— মধুও তৈরী হয় traditional প্রথায়; নতুন নতুন বাগানের ফুলে নতুন নতুন মৌমাছি মধু রচনা করে, এই তো জানি। চাক্ ছাড়া মধুর মানে কেমিক্যাল মধু যা জার্মানি ও বিলাত থেকে আসে; তার স্বাদ আর আসল মধুর স্বাদ ঢের তফাৎ। Saccharine রোগীর পক্ষে, Glucose তাও মুমূর্ষুর পক্ষে, সুস্থ মানুষের পক্ষে আক না হয় মধু। তাড়ি খায় মাতালে তাও প্রস্তুতের tradition আছে। গুড় প্রস্তুতের tradition ছেড়ে গুড় কে করে? আমাদের প্রত্যেকের অস্থি মাংস মজ্জা সবই tradition মতো ধরে, তবেই হয়েছি তুমি, আমি, এ, ও, সে; ওটা বাদ দিয়ে spirit নিয়ে ভূতগত ব্যাপার সৃষ্টি হতে পারে। পুব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশই নেই, কোনো art নেই যার tradition নেই, খালি আমাদেরই থাকবে না— এ কেমন কথা? জগৎ জোড়া ফুলবাগিচা, ছেড়ে দাও সেখানে ছাত্রদের, বেছে নিক নিজের অমৃত নিজেরাই। নয় তো tradition বাদ ছবি, মূর্তি, তাদের করে দেখাও পারো তো— Example is better than precept। বরং অজন্তা জান, কিন্তু Argentine কিছুতেই নয়।

৯

প্রিয় অসিত,

তুমি তো সেখানে art school-এর কর্তা কিন্তু আজ তোমায় একটা নূতন ও চমৎকার জিনিষের খবর দিই, যা লক্ষ্ণৌ-এ তৈরী হয়ে বিক্রী হচ্ছে অথচ এতদিন তোমরা সে আর্টটার খবর নাওনি একেবারেই:

আমার কয়েক আত্মীয় এবার লক্ষ্ণৌ থেকে এক টিনের বাক্স ভর্তি মাটির পুতুল এনেছেন, তার মধ্যে দেখলুম কতগুলি এক ইঞ্চি পরিমাণ মাটির গড়া নানা রকম পাখীর মূর্তি, অতি মজাদার খেলনা। এই যেমন পাখীর তেমনি পশুর set নিশ্চয় আছে, জাপানিদের তৈরী ছোট ছোট চিনেমাটির মানুষ পশু পাখী ইত্যাদি দেখেচ তো? ঠিক্ সেই art, কেবল পোড়া মাটিতে হাতে রং করে গড়া, এই তফাৎ। খেলনাগুলো একেবারে বাজারের রকমে cheap কিন্তু art শেখার পক্ষে ভারি কাজের। তুমি যদি খেলনার খোঁজ নিয়ে দুই সেট পাখী এবং দুই সেট চতুষ্পদ ইত্যাদি complete set কিনে আমাকে ভাল করে pack করে V. P.-তে পাঠিয়ে দাও তো তোমায় শত শত আশীর্ব্বাদ করি। তুমি জিনিষগুলো দেখলে খুশী হবে, আর ছেলেমেয়েরা তোমার তো সেগুলিকে একেবারে গালে পুরে দেবে। নীচে একটা পাখীর পুরো মাফটা যথাসম্ভব দিলাম। এই artist-এর নামধামও জানা দরকার। একে তোমরা উৎসাহ দিও।[২]

---

১ শ্রীবীরেশ্বর সেন

২ উত্তরে অসিতকুমার লিখিয়াছিলেন— "আপনার পত্রখানি পেয়ে বড়ই আনন্দিত হলুম। কেননা আমি ঠিক ঐ জিনিষই (মাটির মুড়কি পাখী) তৈরী করিয়ে Emporium-এর মারফৎ বহুল প্রচার করেচি। এখন আপনার নিকট ঠিক সেই জিনিষেরই প্রশংসা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত ও গৌরবান্বিত বোধ করচি।. ."

১০

প্রিয় অসিত,

'কলার বোল' যা দু একটা হাতের কাছে ছিল তাই পাঠালাম। ইংরাজী ভাষার প্রতিধ্বনি দিয়ে আমাদের কলা সম্বন্ধে বলাবলি চালাতে যদি হয় তবে আমি বলি ইংরাজীটাই বা রাখলে মন্দ কি ? যদি সত্যি একটা অভিধান চাও তো গাঁয়ের মিস্ত্রি, সহরের কারিগর, এদের কাছ থেকে ঘুরে ঘুরে বোল্‌চাল্‌গুলো আদায় করে নেবার চেষ্টা কর। এ না হলে সবাই 'আকালিক স্থাপনা' 'উংকট-ধারা-প্রিয়তা'র মত উদ্ভট হয়ে উঠবে—বাংলাও হবে না, ইংরাজীও হবে না, হিন্দীও হবে না। তা ছাড়া বিধির-নিয়মে যেমন আগে বোল পরে আম বা আগে মোচা পরে কলা, art সম্বন্ধে তার উল্টোটা ঘটে যথা :— আগে কলা তারপর কলাভবন, শেষে সেখানে বসে বোলচাল্‌। আমি দেখছি আমরা কলাবাগান প্রস্তুত করে বসতে চাচ্চি কলাসংগ্রহের পূর্ব্বেই। একেই বলে চলিত কথায় গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। চলিত কথার মধ্যে অনেকখানি আমাদের অনাবিষ্কৃত, সেই জন্যেই বলি বসে থেকো না। চলে ফিরে কথাগুলি সংগ্রহ কর।

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তকে লিখিত

১১

পোষ্টমার্ক
কলিকাতা ৩১ মার্চ ১৯২৪
সোমবার

ওগো গুপ্তশিল্পি

জাপানি চিত্র সম্বন্ধে, তোমার প্রবন্ধটি[১] পাঠ করে গোটাকয়েক প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে সেগুলি শিল্পের প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে লিখে পাঠাচ্ছি— গুরু-শিষ্য সবাই মিলে জনে জনে নিজের নিজের নাম সই করে প্রশ্নের সদুত্তর আমার কাছে পাঠাতে যেন অন্যথা না হয়—

প্রশ্ন

১ গাছের গুঁড়ির উপরে একটা ফড়িং এবং গাছের গুঁড়ি হেলান দিয়া একটা মানুষ এ দুটোকেই চিত্র হিসেবে একই প্রাকৃতিক দৃশ্য বলা ভুল না ঠিক ?

২ প্রাকৃতিক দৃশ্য Landscape, Nature Study ইত্যাদি জীবযুক্ত হলেই কি নিছক Landscape হয় না জীবকে বাদ দিয়ে Landscape আছে— এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩ "ভারতীয় চিত্রে কোথাও দৃশ্যচিত্রের স্থান নাই" এ কথাটি ভুল না ঠিক লিখিয়া জানাও।

৪ "আমাদের (চিত্রে) মানুষ সামনে, প্রকৃতি পিছনে; আর জাপানীদের প্রকৃতি সামনে মানুষ পিছনে" এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ কর লিখিয়া— এবং প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় তাও নির্দ্দেশ কর।

৫ "পিউ বল্ল, মহারাজ অন্যেরা বীণা বাজাতে ব্যর্থ হয়েছে—" এই ছত্রটিতে ভুল কোথায় আছে সংশোধন করে লেখ এবং প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্ন লিখিবার সময় কোথায় কোথায় বানান ভুল করেছেন সেটাও ধরে দাও।

৬ Landscapeর প্রতিশব্দ দৃশ্যচিত্র না আর কিছু হবে— চিত্র মাত্রেই তো দৃশ্য !

---

১ জাপানী আর্টের যৎকিঞ্চিৎ। ভারতবর্ষ ১৩৩০ চৈত্র

বিশেষ প্রশ্ন

একটা ছবি চীনের কি জাপানীর কি ভারতবাসীর অথবা মিশরবাসী কিম্বা সাহেবের আঁকা এটা যে সহজেই ধরা পড়ে দেখবামাত্র তাহার কারণ অনুসন্ধান কর। প্রাচীনকালেই শিল্পের মধ্যে ভিন্ন জাতি হিসেবে যে রূপের ভিন্নতাও হয়ে গেল এটা মানবমনের কোন গোপনীয় রহস্য ব্যক্ত করছে তা বিচারপূর্ব্বক লিখে জানাও।

৭ আজকালের দিনে জাতীয় শিল্প বলে একটা শিল্প উদ্ভব হতে পারে কিনা এ বিষয়ে তোমার মতামত জানাও—

ইতি

প্রশ্নকর্ত্তা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১২

পোষ্টমার্ক

শান্তিনিকেতন ৮ এপ্রিল ১৯২৪

সোমবার

[ কলিকাতা ]

প্রিয় মণীন্দ্র

আমার প্রশ্নের জবাব তুমি সহজে বেশ পরিষ্কার করেই দিয়েছ দেখে আনন্দ হল—তোমাকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা গেল। প্রশ্নের উত্তরে যদি তোমার হারও হতো তাতেও আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতেন এবং কবির ভাষায় যে হার স্বীকারের কথা বলা হয়েছে সেই কথাই স্মরণ করতে বলতাম

তোমার সাথে বারে বারে

হার মেনেছি এই খেলাতে

যে artist হারতে ভয় পায় সে কোন দিন কিছু জিতে নিতে পারে না এটা তোমার সহপাঠীদের জানিয়ে দিও।

প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো ছাপাতে চাও তো আমার আপত্তি নেই তবে আমার বানান ভুলগুলো শুধরে ছাপিও।

Landscape-র ঠিক প্রতিশব্দ হল "স্থানচিত্র" আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রে কয় রকম চিত্রের কথা বলা হয়েছে যথা— ১ চিত্র ২ বদ্ধচিত্র ৩ আকারচিত্র ৪ গতিচিত্র ৫ স্থানচিত্র ৬ বর্ণচিত্র ৭ স্বরচিত্র

তোমাদের ওখানে যিনি পণ্ডিত আছেন তাঁর কাছে এই কটা রকম চিত্রের হিসেব জেনে নিও নয়তো এখানে যখন আসবে তখন আমি বুঝিয়ে দেবো।

গরমে তোমাকে ভাবিয়েছি বলে মনে করো না, চিন্তামণি যাতে পাও তারি চেষ্টায় আছি জেনো।

সবাইকে আমার আশীর্ব্বাদ দিও

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পী শ্রীচারুচন্দ্র রায়কে লিখিত ১৩

প্রিয় চারু

তোমার বয়সের হিসেব নিয়ে যদি তোমাকে ছেড়ে দিই কিম্বা তোমার জাতের খবরটা নিয়ে চুপ করে বসে থাকি তবে তোমাকে জানা একেবারেই হল না, তেমনি এই চীনদেশের ছবি মূর্ত্তি ইত্যাদির বেলায় শুধু এগুলো কত দিনের এবং কোন দেশের ইত্যাদি জেনে আর্টিষ্ট রস পায় না।

এরা কি সংবাদ নিয়ে এল, কোন রসের উদ্রেক করলে এই সব দেশ দেশান্তরের দূত এবং অভ্যাগত এইটের খবর নেওয়া যখন হল তখনই এদের সঙ্গে ঠিক উপযুক্ত ব্যবহার করলে তুমি, না হলে কাপ্তেন বাবু যেমন কুক কোম্পানীর আড়গোড়ায় গিয়ে ঘোড়ার দাঁত দেখে বয়েসের ও লক্ষণ মিলিয়ে জাতের ঠিক করে আসে সেই ভাবের ব্যবহার করলে এই সব শিল্পদেবতার দূতগণের সঙ্গে, এদের সঙ্গে আসল পরিচয় হলই না তোমার।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তরুণ পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত ১৪

ওগো তরুণ সম্পাদক,

এই বুড়োর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর, কিন্তু দূরে থেকে তাকে নমস্কার ক'রো, অন্যথা হলেই বিপদে পড়বে। বুড়োকে তরুণ বলে ভুল করা তোমাদের স্বভাব, কিন্তু বুড়ো সে জানে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে পারলে বেশ এক চোট মোড়লী করবার সুবিধা পাবে। তাই সে দূর থেকে কাছে এগোতে চায় তোমাদের নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে। সাবধান! বুড়োদের লেখা যত কম পারো ছাপিও। একটা গল্প আছে—কচিপাতায় আর একটা ছাগলে একবার ভাব হয়েছিল। কচি ডালে কচি পাতা, ছাগল তার নাগাল পায় না, কিন্তু রোজ তাকে ডেকে বলে— তোমার ফুটন্ত ভাবে আমি মজে আছি। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তোমারি নবদূর্ব্বাদলশ্যাম ছবি মনে পড়ে। ওগো তরুণ এসো বুকের কাছে! কচি পাতা খুসি হয়ে ভাবে এ-যে আমার একজন, এর প্রাণে যৌবনের জোয়ার বইছে দিনরাত! ভুল করে পাতা ফলভরে নুয়ে পড়ে, এগিয়ে আসে মাঠের দিকে। বুড়ো মালী এসে ফল পেড়ে নেয়। বুড়ো ছাগটা এসে সবুজ পাতা চিবিয়ে নিজের চোয়াল সবুজ রংএ ছুপিয়ে চুপি চুপি কচি ছেলের মতো মা মা করতে করতে অন্য ডালের কচি পাতার দিকে অগ্রসর হয়। ইতি—

অর্দ্ধবৃদ্ধ তোমাদের
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরা-সম্পাদক শ্রীসুরেশ চক্রবর্তীকে লিখিত ১৫

কলিকাতা— ১১ই মাঘ [ ১৩৩২ ]

প্রিয়বরেষু

তোমাকে বলেছিলেম যা বলবার ইচ্ছা ছিল তা বাড়ী গিয়ে লিখে পাঠাবো— কিন্তু তখন ভাবিনি সেখানকার আবহাওয়াতে যে-সব কথা ফুটি-ফুটি করলেও তারা এখানে এসে ঝরে যাবে! আবার যদি দিন পাই তো সে-সব কথা যত্নে ফুটিয়ে মালা গেঁথে পাঠাবো "উত্তরা"র জন্যে। গোমতী নদীকে আমাদের আগেকার লেখকেরা ভাল চক্ষে দেখেন নি, তা তো জান—"ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, মরণং গোমতীতীরে" কিন্তু সত্যি বলছি—ঐ গোমতীর ধারেই আমি অনেকদিন পরে একটা নতুন জীবনের স্বাদ পেয়ে এসেছি— আমি বোধ কচ্ছিলেম আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে কিন্তু এই নদীপারে আমার নতুন কর্ম্মক্ষেত্র আমি বিস্তৃত দেখে এলেম, কাজেই আমি সেই প্রাচীনা গোমতীর নতুন নাম দিচ্ছি "ঘুমতী নদী"। আমি আমার প্রেয়সী "ঘুমতী"কে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, ঘুমোতে যাবার আগে দেখেছি, সকাল সন্ধ্যা আমি তাকে শুধিয়েছি— সে কাকে খুঁজে খুঁজে ফিরছে! "ঘুমতী" আমাকে তার মনের কথা বলেছে— সে চাচ্ছে তার বাদশা বেগমকে! সাহিমহলের সুন্দরী পরিচারিকা— সে সকাল-সন্ধ্যা অপরূপ সাজে সেজে "মোতিমহলের" ধারটিতে এসে দাঁড়াতো— আমি তখন ঘাটে বসে— আমাকে সে শুধোতো, "এসেছেন তাঁরা!"

আমি বলতেম— "কই না তো?" প্রাতঃসন্ধ্যায় কোনদিন সোনার ওড়না টেনে, সায়ংসন্ধ্যায় কখনো বা নীল বোরখায় আপনাকে আড়াল করে সে চলে যেতো। একদিন তখন সন্ধ্যারাগে বারোদোয়ারীর টুকরো টুকরো পাথরগুলো হোলির দিনে আবিরে যেন রাঙা হয়ে উঠেছে, নদীর ওপার থেকে অকালে দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সেই সময় আমি আমার ঘুমতী নদীকে বলেছিলেম— "তোর বুকে আমার ছাওয়া কি পড়েনি ঘুমতী?"

নদী সে স্থির হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো— দক্ষিণের বাতাস দূরে কোনখানে ধুলোর ধ্বজা উড়িয়ে চলে গেল তার ঠিক নেই, আকাশের রং মুছে গিয়ে নদীর বুকে এক টুকরো পাণ্ডাস আলো উড়ে পড়লো, হঠাৎ সেই আলোর উপর দিয়ে আমি আমাকে ভেসে যেতে দেখেছি—

যাত্রীশূন্য একখানি শূন্য তরীর একা মাঝি!

ঘুমতী নদী বেয়ে ঘুরে ঘুরে নৌকো চলেছে, নদীতীরে কোথাও বাজছে— উৎসবের সানাই, কোথাও জ্বলছে মজ্‌লিসের বাতি আর কোথাও বা বাদশার কবর স্তব্ধ অন্ধকার জলে ফেলেছে আপনার ছায়া। এমনি করে ঘুমতীর বুক বেয়ে আমার ছায়া-মূর্ত্তিকে আমি দেখে এসেছি ভেসে বেড়াতে! ঘুমতীর জল আমার তরীকে ভিজিয়ে দিয়েছে— অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত শীতল স্পর্শে, আমি ঘুমতীকে, তার দুই কূলকে, তার আশে-পাশে যে-কেউ এবং যা-কিছু ছিল সবাইকে আপনার করে পেয়ে এসেছি, ঘুমতী নদীর বাতাস আজও আমার বুকের বাঁশিতে নতুন পুরোনো দুই সুরে বেজে চলেছে।

তোমারি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীকে লিখিত ১৬

বুধবার

ওগো সম্পাদক,

তোমার 'সাত ভাইয়ে'র পালাটা বেড়ে হয়েছে। দু-এক জায়গায় দু-একটা কথা বদল করে পাঠালুম। পালাটাতে গান দিয়ে ভর্তি করে দিতে চেষ্টা করো। আমার মাথায় একটা plot ঘুরছে— দেখো যদি এটা নাটকে ফেলতে পারো— "বড় রাজা— বড় বড় রাজ্য জয় করতে গেলেন, মস্ত হাতি ঘোড়া বড় বড় সেনাপতির সঙ্গে। ছোট রাজা গেলেন ছোট রাজত্ব জয় করে নিতে খেলার হাতি ঘোড়া নিয়ে। দিক্-বিজয়ের শেষে দুই রাজার দেখা— তর্ক উঠলো জয় কার বেশি— জয়লক্ষ্মী এসে ছোট রাজাকে মালা দিয়ে গেলেন।"

আমি এখন ছবি নিয়ে পড়েছি— লেখার দফা রফা— তাই তোমাকে plotটা উপহার দিলেম।

তোমারি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভগিনী বিনয়িনী দেবীকে লিখিত ১৭

শনিবার

প্রিয় বিনয়িনী,

আজ তোমার পত্র পাইলাম। আগ্রার শুভ্র স্বপ্ন আর হিমাচলের তুষারতরঙ্গ দুইই দেখিবার সামগ্রী। এক মানুষের সৃষ্টি অন্যটি ভগবানের খেলা— অতি অনির্ব্বচনীয়! ঘরে বসিয়া মনে করিতাম— বরফের পাহাড় বুঝি একখানা প্রকাণ্ড মেঘের মতো সাদা হইবে, কিন্তু এখন বুঝিতেছি কতই না তফাৎ— সে তীক্ষ্ণতা ও ধবলতা মেঘে সম্ভবে না। তোমার পত্র পড়িয়া বুঝিতেছি আগ্রার তুমি সকলি দেখিয়াছ কিন্তু ফতেপুর ও সেকেন্দ্রার কোন কথা লেখ নাই যে? আগ্রায় শাজাহান বাদশার সকলি পাইবে কিন্তু আকবর শাহের যা কিছু ওই দুই জায়গায় দেখিবে।

শেষেন্দ্র[১] যে কোনো কথাই বলে না। তার কি সেখানে ভাল লাগিতেছে না? বেচারা বড়ই একা পড়িয়াছে দেখিতেছি। তোমার ছেলেমেয়েরা বোধ হয় খুব আনন্দে আছে। কিন্তু তাজমহলের সৌন্দর্য্য বা মর্য্যাদা একটু অধিক বয়সে না দেখিলে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়া ওঠা কঠিন। যমুনার পরপারে শাজাহানের নিজের জন্য কালো পাথরে এক সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিতে দিলেন তাঁহার ইচ্ছা যমুনার উপর দিয়া এক সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া দুই সমাধিমন্দির একত্র যোগ করিয়া দিবেন— সে জায়গাটা দেখিয়াছ কি? মীনাবাজারের যেখানে রাজপুত মহিষী আকবরশাহের বুকে ছুরি বসাইতে গিয়াছিল সে স্থান দেখিবার উপযুক্ত। নূরজাহানের পিতার সমাধি যাহাকে বলে ইত্‌মাতউদ্দৌলা, কেল্লার ভিতরে বেগম সাহেবের গোর এই সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে ভুলিও না। আমি যদি সঙ্গে থাকিতাম তবে এ সকল স্থান নিশ্চয়ই খুঁজিয়া বাহির

১ বিনয়িনী দেবীর স্বামী শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়

করিতাম। মথুরা বৃন্দাবন আর মথুরা বৃন্দাবন নাই কিন্তু আগ্রা এখনও সেই আগ্রাই আছে। শেষেন্দ্রকে বলিও যদি পুরাতন ছবি সংগ্রহ করিতে পারে তবে যেন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করে না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮

বৃহস্পতিবার

প্রিয় বিনয়িনী,

কাশী থেকে তোমার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। সারনাথ অতি আশ্চর্য্য জায়গা আমি সেবারে এলাহাবাদ থেকে গিয়ে দেখে এসেছি। জায়গাটা প্রথম দেখেই আমার খুব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল, আমার মনে হল যে মন্দিরের কোণে কুয়োটার ধারে আমার দোকান ঘর ছিল সেখানে বসে আমি মাটির পুতুল আর পট বিক্রি করছি সহরের ছেলেমেয়েগুলো আমার দোকানের সামনে রংচং করা পুতুলগুলোর দিকে চেয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা সামনের কুয়ো থেকে জল তুলছে গল্পগুজব করছে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে লোক উঠছে নামছে। এসব যেন অনেক দিনের স্বপ্নের মতো মনে পড়ে গেল। আরও আশ্চর্য্য যে অতগুলো ঘরবাড়ির মধ্যে আমার ঘরটি আমি দেখেই চিনতে পারলুম ৫ কি ৬ হাত চৌকো একটি ছোটো ঘর দরজার উপরে দুটি হাঁস পাথরের চৌকাটে লেখা আছে। তোমরা বোধহয় সে ঘরখানি দেখনি সেটা নেহাৎ ছোটো সামান্য দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আজও সেই ঘরখানিতে পড়ে আছে। সারনাথের যাদুঘরে যেসব মাটির ঘোড়া খুরি গেলাস কুঁজো দেখেছো সে সব আমার হাতে গড়া তার কোনো ভুল নেই। তখনকার পটগুলো কোথায় গেল কে জানে।

লোকে ঘরে ফিরলে মন যেমন হয় সারনাথে গিয়ে মন আমার ঠিক তেমনি হয়েছিল।

তোমাদের শুঃ
অবনদাদা

কন্যা শ্রীসুরূপা দেবীকে লিখিত

১৯

Tagore Studio.
5, Dwarakanath Tagore Lane,
Calcutta.
রবিবার ১৯৩১

কল্যাণীয়া সুরূপা,

তোর চিঠিতে সব খবর পেয়ে নিশ্চিন্তি হলেম। যতই লোভ দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও নড়ছিনে— বেশ লাগছে কলকাতা, আহা এমন স্থান কি আর আছে! কোথায় লাগে তোদের ঘাটশীলা— আহা, এই শহরের বাড়ি-ঘেরা দৃশ্য কি চমৎকার! সকালের একটু একটু কুয়াসার মধ্যে দিয়ে বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ আর ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্ব্বতের গায়ে আলোছায়ার ঝরণা ঝরছে! মাঝে মাঝে একটা চিমনি ধুঁয়া ছাড়ে আর মনে হয় যেন বনের মধ্যে কারা চড়ুইভাতি

খেতে বসেছে— রান্নার গন্ধ পর্য্যন্ত নাকে আসে! তার উপর এখন আবার ছট্‌পুজো লেগেছে সিংঘীর বাগানে— সকাল থেকে রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত চমৎকার সুরে চারিদিকে মাদোল ঢাক ঢোলের সঙ্গে মেয়েরা ছেলেরা গান জুড়ে দিয়েছে, ওধারে কোথায় একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে— মজুররা ছাত পিটছে তালে তালে দুপ দুপ, মনে হয় ঠিক যেন কাঠঠোক্‌রা ডাকছে কুব কুব। থেকে থেকে মোটরগাড়ি ভোঁ, সেও সুরে বেজে যাচ্ছে রামশিঙে। একদল পায়রা ছাতে— নীল আকাশের গায়ে কালো দিয়ে লেখা— চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অকারণে ঝাঁক বেঁধে উড়ে পড়লো, আবার একটা পথ হারিয়ে এসে বসলো আমাদের কার্নিশে রোদ পোহাতে, কি সুন্দর! ঠিক যেন কাঁচপোকার সাড়ি পরে টুনুদিদি[১] বসে আছেন। বারান্দার উপরে রোদ পড়েছে এলিয়ে, একদল চড়াই তারি উপর চেঁচামেচি ডিগবাজি খেলা জুড়েই হঠাৎ পালালো, দেখি জলি কুকুর প্রবেশ করছেন পায়ে পায়ে। বাগানে লট্‌কান গাছে ফুল ধরেছে, তারি মধু খেতে একটা প্রজাপতি সকালে দুপুরে ঘুর ঘুর করছে। ফুলগুলো লাল জামাপরা টুনুদিদির খোকাটির মতো গুটিসুটি রোদে ঘুম যাচ্ছে। কাগডিমি আকাশে সন্ধ্যাবেলা ফানুস ওড়ে, মানুষ, কোনটা হাতি, কোনটা কিম্ভূত-কিমাকার গোলাকার! রাতে রেডিওতে দূর খবর আসে আর তার পর বাদশা[২] মশায় কাসেন, কাঁদেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন নিশ্চয়, কিন্তু সকালে সব ভুলে যান, বলতে পারেন না। ছোটুবাবু,[৩] টুনুদিদি ওরা ভালো তো? পনু[৪] তুমি আমাদের আশীর্বাদ নিও। ইটালীতে [Entally] যাবো একদিন। কোকো[৫] এখনো আসেনি চিঠি দিয়েছে ভালো আছে। আমরা সবাই ভালো আছি। ইতি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২০

বুধবার

[ সাহজাদপুর। পাবনা ]

খুকী,

এবারে এখানে বান ডেকে সব জলে ভর্ত্তি। ঘর দুয়ার গাছপালা ঘোড়া গরু সবাই হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে আছে। নৌকোয় কিন্তু ভারী আনন্দ— যাত্রী বহে ধানক্ষেতের উপর দিয়েই পাল তুলে পাখীর মত চলেছে— চমৎকার দৃশ্য। পনুবাবু[৪] আর তুই বেশ আসতে পারতিস। ভোরে বোটে চড়ে বেলা দশটার মধ্যে পৌঁছে গেছি। পথে মুষলধারে বৃষ্টি। চমৎকার শোভা দেখতে দেখতে চলে এলেম, এ যেন কবিতার রাজত্ব। সোনার বাংলার অপরূপ রং দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করে এইখেনে একটা নৌকোয় অনেক দূরে দূরে ঘুরে ফিরে খালি চলেই চলি ভেসে আর ভেসে। আজ চাঁদ উঠেছে সপ্তমীর— জলের উপর নৌকোয় ছেলের দল গান গেয়ে গেয়ে বেড়াচ্ছে— কী তাদের ফূর্ত্তি! আমার ভাঙা হাতে ছবিও হয় না বেশী লেখাও চলে না—

---

১। দৌহিত্রী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা, রেবা।

২। পৌত্র, শ্রীসুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। শ্রীপৃথ্বীনাথ মুখোপাধ্যায়, । শ্রীরেবা দেবীর স্বামী

৪। কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীপ্রণবনাথ মুখোপাধ্যায়

৫। পুত্র শ্রীতরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই মাত্র টাকার ঘড়া সিন্দুকে তুলে এসে এই চিঠি লিখছি। উৎসব[১] সাঙ্গ হলো, এবারে কিছু দিন কাজ আর একটু একটু বিশ্রাম। আসছে হপ্তায় বাড়ী যাবো। আমি বেশ আছি। কলিমুদ্দি মিয়ার[২] কারি কাট্‌লেট্[৩] আর গয়লাবাড়ির দুধ, মুদির সন্দেশ খুব চলছে।—ইতি

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের কুড়িখানি চিঠি মুদ্রিত হইল। ইহার অধিকাংশ পূর্বপ্রকাশিত, কিন্তু অনেকগুলিই পাঠক সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য। ১ সংখ্যক পত্রখানি শ্রীবিশ্বরূপ বসুর সৌজন্যে প্রাপ্ত। অন্য চিঠিগুলির পূর্বপ্রকাশ-নির্দেশ প্রভৃতি দেওয়া হইল: ২ ও ৩ সংখ্যক পত্র ১৩৩২ ফাল্‌গুন সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত। ৪ সংখ্যক পত্র ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যা শান্তিনিকেতন পত্রে মুদ্রিত। ৫-১০ সংখ্যক পত্র ১৩৫৮ পৌষ অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি-সংখ্যা উত্তরায় প্রকাশিত শ্রীঅসিতকুমার হালদারের 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্রে)' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত। ১১ ও ১২ সংখ্যক পত্র ১৩৪৭ ফাল্‌গুন সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'অবনীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে মুদ্রিত। ১৩ সংখ্যক পত্র ১৩৩১ আশ্বিন সংখ্যা বাঁশরী পত্রে ও ১৪ সংখ্যক পত্র তরুণ পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৫ সংখ্যক পত্র উত্তরার পূর্বোল্লিখিত সংখ্যা হইতে গৃহীত। ১৬ সংখ্যক পত্র শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর সৌজন্যে প্রাপ্ত; তিনি এই সময়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকার সম্পাদক। ১৭ ও ১৮ সংখ্যক পত্র শ্রীমতী প্রতিমা দেবী লিখিত 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। ১৯ সংখ্যক পত্র, অবনীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী উমা দেবীর 'বাবার কথা' পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ২০ সংখ্যক পত্র ১৩৬৪ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা সংযোগ পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। ১৩ ১৪ ও ২০ সংখ্যক পত্রের প্রতিলিপি শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

---

১ জমিদারিতে পুণ্যাহ উৎসব

২ চিরকুমার সভায় অক্ষয়ের গান 'এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা', ও তৎপর দারুকেশ্বরের প্রশ্ন 'আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি। অক্ষয়বাবু, কারি না কাটলেট।' এই প্রসঙ্গে অনেকের মনে পড়িবে।

'অবন'
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ

# বাণীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

অশোকবিজয় রাহা

রূপলোকের মানুষ অবনীন্দ্রনাথ বাণীলোকে নিয়ে এলেন এক আশ্চর্য রূপকথার জগৎ। এখানে প্রতিটি টুকরো-কথা রঙের আগুনে জ্ব'লে ওঠে, পংক্তিতে পংক্তিতে ঝিলিক দিয়ে ওঠে রেখা, চমক দিয়ে ওঠে ছবি,— পাতায় পাতায় খুলে যায় রঙবেরঙের চিত্রশালা। অথচ এক হিসেবে তাঁর প্রতিটি ছবিই জীবন থেকে নেওয়া, যদিও তাঁর রূপকথাগুলি জীবনের বাঁধা নিয়মকে সব সময় মেনে চলে না : যেমন স্বপ্ন, যেমন কল্পনা; এরা জীবনের বস্তুভারহীন সত্য।

তাঁর রূপকথার জগৎটি সত্যই বিস্ময়কর। এখানে প্রাণের একটি তাজা টাটকা ঘ্রাণ পাওয়া যায়। এ যেন শরতের সুন্দর সকাল— শিশিরে-আলোয় চারদিক ঝলমল করছে, উপরের আকাশ স্বচ্ছ নীল, কোথাও কুয়াশার লেশটুকু নেই। এখানকার মানুষগুলি আমাদের চোখের উপর পরিচিতের মতো ঘুরে বেড়ায়; হাসে, খেলা করে, নাচে, গান গায়, বাঁশি বাজায়; আবার হঠাৎ কখন এদের বুকে এসে লাগে কান্নার ঢেউ— চোখ ওঠে ছলছল ক'রে। এখানকার পশুপাখিগুলিও এখানকার গাছপালার মতো সজীব, সতেজ। এখানকার পুতুলগুলিরও যেন প্রাণ আছে, তাদের বুকে দুলছে ছোটো ছোটো সুখদুঃখের ধুকধুকি। এ এক জাদুর রাজত্ব, ইন্দ্রজালের দেশ; এখানকার সব-কিছুই শিল্পীর খেয়ালি মনের সৃষ্টি; টুকরো-কথার রঙ-চড়ানো টুকরো-দেখার 'কাটুম কুটুম'; এদের বুকেই তিনি ছুঁইয়ে দিয়েছেন তাঁর মন্ত্র-পড়া জীয়ন-কাঠি।

বিশ্বসাহিত্যের বিশাল জগৎ থেকে হঠাৎ এদিকে চোখ ফেরালে এমনটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেননা অবনীন্দ্রনাথ আসলে রূপলোকেরই সাধক, বাণীলোকে এসেও তিনি মুখ্যত চিত্রশিল্পী। এই প্রসঙ্গে একটি পরিচিত দৃষ্টান্ত মনে আসে : রবীন্দ্রনাথের তুলির মুখে একদিন ঝাঁকে ঝাঁকে আশ্চর্যরকমের ছবি বেরিয়ে এসেছিল; শেষ জীবনে হঠাৎ ছবি আঁকতে শুরু ক'রে সম্ভবত আড়াই হাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন তিনি, কিন্তু তবু আমরা তাঁকে প্রধানত কবি বলেই জানি; তিনি নিজেও বলেছেন, তাঁর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় তিনি কবি। এর ঠিক উল্টোরকমটি ঘটেছে অবনীন্দ্রনাথের বেলা। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি হয়েও বাণীর আবেগকে মুক্তি দিয়েছিলেন রেখায়, আর অবনীন্দ্রনাথ মূলত চিত্রশিল্পী হয়েও রূপসৃষ্টির আবেগকে ভাষা দিয়েছেন লেখায়। বাণীলোকে এসেও তাই ছবির জাদুকর হয়েই দেখা দিলেন তিনি।

কিন্তু তা হলেও একথা সত্য যে তাঁর রচনায় তাঁর স্বকীয় বাণীভঙ্গি একটি সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছে। তাঁর কণ্ঠে সব সময়ে একটি সাধা গলার আমেজ পাই আমরা অথচ আশ্চর্য এই যে এর জন্য কোনোদিন আলাদা ক'রে গলা সাধতে হয়নি তাঁকে। কী ক'রে এ সম্ভব হল সে এক রহস্য, তবে এটুকু বুঝতে পারি যে তাঁর মুখের ভাষাটি আসলে তাঁর ভিতরকার রূপসাধকের ভাষা, তাঁর কথা অনেকটা 'রঙরেখার'ই 'রূপকথা'। সাহিত্য রচনার শুরু থেকে তাই হয় তো রূপকথা-রীতিটিই বেছে নিয়েছিলেন তিনি। কথায় কথায় তারার মতো, ফুলের মতো ছবি ফোটানো যে-ভাষায় সবচেয়ে বেশি সম্ভব সে হল রূপকথার ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর মতো সচেতন বাণীশিল্পী তিনি কোনো কালেই ছিলেন না। তবু তাঁর প্রথম লেখাটিই ভাষার শিল্পরচনা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। 'লিখে অভ্যাস করা' বলতে যা বোঝায় তা

এর আগে কোনোদিনই তাঁর হয়ে ওঠেনি। লেখার জন্য তাঁকে প্রথম উৎসাহিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, আর সেই প্রথম উৎসাহের মুখেই তিনি লিখে বসলেন 'শকুন্তলা'র মতো একটি আশ্চর্য সুন্দর বই,— যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি নিখুঁত। শুনতে যতই বিস্ময়কর হোক, এই হচ্ছে তাঁর সাহিত্যে হাতে খড়ির ইতিহাস। তিনি নিজের মুখেই বলছেন :

একদিন আমায় উনি [ রবীন্দ্রনাথ ] বললেন, 'তুমি লেখো-না, যেমন ক'রে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি ক'রেই লেখো।' আমি ভাবলুম···সে আমার দ্বারা কস্মিন্‌কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই-না ; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস ক'রে ব'সে গেলুম লিখতে। লিখলুম একঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো ক'রেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড়ো ফুর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট লিখে যেতে লাগলুম— ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি।

—জোড়াসাঁকোর ধারে : পৃ ১২২-'২৩

এই তো সাহিত্যজগতে অবনীন্দ্রনাথের প্রথম আবির্ভাব! 'শকুন্তলা'ই হচ্ছে রূপদক্ষের প্রথম বাণীসৃষ্টি,— 'যা সৃষ্টিঃ স্রষ্টুরাদ্যা'। এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ; অবনীন্দ্রনাথের বাণীশিল্পের স্বরূপলক্ষণটি এতে আগে থেকেই সূত্রাকারে বলা হয়েছে। আমরা জানি, প্রিয়জনকে শুধু একটুখানি মৌখিক উৎসাহ দেবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখতে অনুরোধ করেন নি, তা হলে 'তুমি লেখো-না' পর্যন্তই বলতেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে 'তুমি যেমন ক'রে মুখে গল্প কর' বলার অর্থই হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের 'মুখে গল্প করা'র বিশিষ্ট ধরনটির মধ্যে একটি শিল্পসম্মত মৌলিক বাণীভঙ্গি ফুটে উঠেছে, এবং তাকে ঠিক সেইভাবেই সাহিত্যে পরিবেশন করতে পারলে বাণীশিল্পের জগতেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, সমস্ত বইটিতে তিনি একটিমাত্র কথা লিখেছিলেন 'সংস্কৃতে' অর্থাৎ তথাকথিত বিশুদ্ধ ভাষায়। তার মানে, এ ছাড়া অন্য সব জায়গায় তিনি আটপৌরে মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে অভয় পেয়ে প্রথমে বাধামুক্ত হয়েছে তাঁর মন, তারপর পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন নিজের স্বভাবের প্রেরণায়। নিজের শক্তি সম্বন্ধে যেই তাঁর আত্মবিশ্বাস এল অমনি হুহু ক'রে ছুটে চলল তাঁর কলম, লিখে চললেন বইয়ের পর বই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একেবারে শুরুতেই বাণীশিল্পে তাঁর এতখানি সিদ্ধিলাভ কী ক'রে সম্ভব হল? এর একটি প্রধান উত্তর এই যে, আসলে তাঁর অজান্তেই তাঁর মধ্যে গোড়া থেকে এর জন্য একটি প্রস্তুতি চলছিল। তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় এবং অসাধারণ শ্রুতি- ও স্মৃতি-শক্তির গুণে ভাষার একটি বিশেষ শিল্পভঙ্গি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। ছেলেবেলাকার রূপকথা-শোনা কান তাঁর পরিণত বয়সেও কতখানি সূক্ষ্ম ও সজাগ ছিল, তাঁর শেষ লেখাগুলিতে পর্যন্ত তার পরিচয় পাওয়া যায়। রূপকথারও একটা স্থায়ী শিল্পরূপ আছে, সেটা লোকসংস্কার থেকে পাওয়া। অবনীন্দ্রনাথের বালক মন এর সহজ প্রাণছন্দটি স্বভাবতই ধরতে পেরেছিল। কিন্তু কেবল এতেই প্রশ্নটির সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় না। রূপকথার লোকসংস্কারজাত শিল্পরূপটিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করলেও অবনীন্দ্রনাথের রচনা যে শিল্পের প্রাকৃতস্তরের অশিক্ষিতপটুত্ব নয় তা আমরা তাঁর যে-কোনো একটি পংক্তির একটি ভগ্নাংশ থেকেই বুঝতে

পারি। তাঁর ভাষার ঐ আটপৌরে ঢঙের মধ্যেই আমরা এমন একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পসঙ্গতির পরিচয় পাই, যা মহৎ বাণীসাধকেরও সাধনা-সাপেক্ষ।

প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক, কেননা বাণীর সিদ্ধরসমূর্তি একেবারে প্রথমেই কারো কাছে আবির্ভূত হয় না, রবীন্দ্রনাথের মতো শ্রেষ্ঠ কবির কাছেও নয়,—তাঁকেও এর জন্য দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করতে হয়েছে। 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি তাঁর 'মানসী'র আগেকার যাবতীয় কবিতার শিল্পোৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে বলেছেন, 'লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি'। তাঁর আদর্শ অনুসারে 'মানসী'র কাল থেকেই তাঁর লেখা 'প্রবেশিকা অতিক্রম ক'রে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে'। আবার রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডে 'মানসী' গ্রন্থের 'সূচনা'য় সব শেষে বলেছেন 'মানসী'তেই সর্বপ্রথম 'কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ দিল'। অথচ 'মানসী'র রচনাকাল ১৮৮৭-১৮৯০। এখন, 'কবি'র সঙ্গে 'শিল্পী'র মিলন ঘটাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতো বাণীশিল্পীরও যদি এত দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা হলে অবনীন্দ্রনাথের রচনায় একেবারে প্রথমেই 'লেখকে'র সঙ্গে 'শিল্পী'র মিলন কী ক'রে ঘটতে পারল? রূপকথার ভাষার প্রাকৃত শিল্পভঙ্গিটি তাঁকে প্রথম থেকেই সাহায্য করলেও, সেই সঙ্গে বাণীর যে-সূক্ষ্মতর শিল্পসৌন্দর্য যুক্ত হলে রূপকথার ভাষা পরিস্রুত হয়ে শকুন্তলার ভাষার পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তার জন্য তিনি ভাষাকে নিয়ে এর আগে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। নির্বাচনের নৈপুণ্য, বিন্যাসের সংগতি ও প্রকাশের যাথার্থ্য—শিল্পরূপায়ণের এই তিনটি প্রধান গুণ তিনি এর আগে কীভাবে আয়ত্ত করেছিলেন? সর্বোপরি, সার্থক সৃষ্টিক্রিয়ায় পদে পদে যে-একটি সুনিয়ন্ত্রিত শিল্পসংযমের প্রয়োজন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সাধনার মধ্যে দিয়েই তো তাকে বহু চেষ্টায় আয়ত্ত করতে হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে আসে: 'শকুন্তলা'র রচনাকাল ১৮৯৫ সাল। এর আগে অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে যে-সাধনা করে এসেছেন তা একান্তভাবে চিত্রশিল্পের। শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লির অবনীন্দ্র-সংখ্যায়[১] অবনীন্দ্রনাথের এই সময়কার শিল্পসাধনা সম্বন্ধে যে তথ্য সন্নিবেশ করেছেন তার থেকে জানতে পাই, ১৮৯০ থেকে ১৮৯৫—এই সময়টি হচ্ছে তাঁর চিত্রসাধনার প্রথম পর্ব। এ-পর্বে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির কলাকৌশলগুলি সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেন। ১৮৯০-১৮৯৩ হল এর প্রথম পর্যায়; দ্বিতীয় পর্যায় ১৮৯৩-১৮৯৫। প্রথম পর্যায়ে Gilhardi-র কাছে ছয় মাস চিত্রাঙ্কন শিক্ষার পর খসড়া ও নকশাচিত্র (sketch) আঁকবার উদ্দেশ্যে অবনীন্দ্রনাথ ছয় মাসের জন্য মুঙ্গেরে যান। সাধনার এই পর্যায়েই তিনি রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'র সচিত্র সংস্করণে অনেকগুলি রেখাচিত্র আঁকেন। 'চিত্রাঙ্গদা'র চিত্রসংখ্যা ৩২। তা ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' ও 'বধূ' কবিতার জন্যও কয়েকটি ছবি আঁকেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষক Palmer-এর কাছে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির অঙ্কনপদ্ধতি চূড়ান্তভাবে শেখেন। এ সময়ে তিনি অনেকগুলি কালি-কলমের ছবি (pen and ink), জল-রঙের ছবি (water colour), প্যাস্টেল-প্রতিকৃতি (pastel portrait) ও কয়েকখানি তৈলচিত্র (oil painting) এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, এবং দ্বারকানাথের তৈল-প্রতিকৃতির একটি অবিকল অনুলেখন (oil copy) তিনি এই পর্যায়েই এঁকেছিলেন; আর এঁকেছিলেন রবি বর্মার ধরনের কয়েকখানি ছবি: মায়ামৃগ শকুন্তলা ও সন্ধ্যা। তাঁর এই সময়কার ছবিতে ছায়াসুষমা (light and shade), বর্ণবিন্যাস (colour) ও স্পৃশ্যগুণ বা বুনন (texture)-এর উৎকর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১ Vol VIII Parts I & II, May Oct, 1942, Pp 124 125.

এইভাবেই তিনি সাধনার প্রথম পর্বে চিত্ররূপায়ণের প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তারপর দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয় ১৮৯৫ থেকে, তাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক বিখ্যাত ধারাবাহিক 'চিকন-কাজে'র ছবিগুলিকে অবলম্বন ক'রে, আর ঠিক এই বছরেই লেখা হয় তাঁর প্রথম বই 'শকুন্তলা', যা প্রথম প্রচেষ্টাতেই লাভ করে বাণীর পূর্ণ সিদ্ধি। চিত্রের জন্য এতখানি কৃচ্ছ্রসাধনের পর অর্জিত সিদ্ধির কাছে এই সহজলব্ধ বাণীসিদ্ধি যেন সত্যই বিস্ময়কর ঠেকে। তবে যদি স্বীকার করা যায় যে রূপশিল্পের অনুশীলন করতে গিয়ে ভাবরূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি যে সৃষ্টিসাধনা করেছিলেন তাই তাঁকে এমন একটি গভীর শিল্পবোধ ও শিল্পচেতনা এনে দিয়েছিল যা বাণীশিল্পের সৃষ্টিতেও প্রথম থেকেই তাঁকে সাহায্য ক'রে এসেছে, তা হলে একরকম ক'রে এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাতে অন্তত এটুকু বুঝতে পারি যে রূপশিল্পের সাধনার মধ্যে দিয়েই হয়তো তাঁর প্রাকৃতসত্তা ধীরে ধীরে শিল্পীর সিদ্ধসত্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল, তাঁর সহজ স্বাভাবিক দৃষ্টিই শিল্পের রসদৃষ্টি হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর মুখের আটপৌরে কথাগুলিও এই দৃষ্টির আভায় উজ্জ্বল ও চিত্ররূপময় হয়ে উঠেছিল।

অবশ্যি এক শিল্পের সাধনার দ্বারা অন্য শিল্পে সিদ্ধিলাভ— এমনটি সচরাচর ঘটে না, তবে ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের শিল্পিকবিদের (Painter-Poet) কথা প্রথমেই মনে আসে। চীনের বিখ্যাত শিল্পিকবি ওআঙ উই (Wang-Wei) ও স্যু তুং-পো'র (Su-Tung-p'o) কথা অনেকেই জানেন। বস্তুত সুঙ (Sung) যুগের শেষভাগ থেকে মিঙ (Ming) যুগ পর্যন্ত, এবং বিশেষ ক'রে চিঙ (Ching) যুগে— চীনদেশে বহু শিল্পিকবির আবির্ভাব হয়েছে। জাপানের শিল্পিকবিদের মধ্যে কোবো-দাইশি (Kōbō-daishi). কাজান ওআতানাবে (Kazan Watanabe) প্রমুখ কয়েকজন তো বিশেষভাবেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন। য়ুরোপে স্বয়ং মাইকেল এঞ্জেলোও কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন; তবে ব্লেক এবং প্রি-র‍্যাফেলাইট কবিদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্তদের মধ্যে রসেটির 'The Blessed Damozel' একই সঙ্গে শিল্পিকবির ছবি ও কবিতায়— রূপলোক ও বাণীলোকে— যুগ্মমঞ্জরীর মতো ফুটে উঠেছে।

কিন্তু দূর দেশে, দূর কালে গিয়ে লাভ কী? আরেক দিক দিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই তো এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শেষ জীবনে তাঁর তুলির মুখে যেদিন হঠাৎ ছবির ঝড় উঠল সেদিন আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না। এই বিচিত্র 'আকার-ফোয়ারা'র উৎসমুখটি কোথায় লুকিয়ে ছিল এতকাল? কবে তিনি শিখলেন তুলি ধরতে? তাঁর ছবি সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে শিল্পী যামিনী রায় চিত্র আর বাণীশিল্পের মধ্যেকার একটি সূক্ষ্ম যোগসূত্রের কথা বলেছেন। কথাটি অন্যদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যামিনী রায় লিখেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে···ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝবার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুকমাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়বার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রঙের কথা সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই: অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনামাত্র।
>
> —রবীন্দ্রনাথের ছবি: কবিতা: আষাঢ়, ১৩৪৮: পৃ ৪১

এর থেকে কয়েকটি কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে: 'কল্পনার' 'ছন্দোময় শক্তি' এমন একটি নিয়ন্ত্রিত বেগ যা চিত্র ও বাণীশিল্পের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় সব সময় কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং সে-শক্তি 'অসামান্য' হলে এক

শিল্পের সাধক অন্য শিল্পের ক্ষেত্রে 'নব আগন্তুকমাত্র' হয়েও সেখানে নিজের অধিকার প্রসারিত করতে পারেন, এমন-কি সে-শিল্পের উপায়-উপকরণগুলিও 'সবই তিনি আয়ত্ত' করতে পারেন,— এবং সেখানে 'অনভিজ্ঞতার' লেশতম 'ক্রটি'ও না-ঘটতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে লেখার ছন্দই যে রেখার ছন্দে রূপান্তরিত হয়েছে স্টেলা ক্রাম্‌রিশ-ও তা স্বীকার করেছেন :

The beautiful graphs are those of a poet whose vision is in the words; their strength is also in the lines. ১

এখন রবীন্দ্রনাথের মতো কবি— 'whose vision is in the words'— যে-শক্তির বলে চিত্রশিল্পীতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন, অবনীন্দ্রনাথের মতো রূপদক্ষও অন্যদিক থেকে তার অনুরূপ শক্তির বলে বাণীশিল্পীতে পরিণত হয়েছেন। এর একটা শিল্পভিত্তিক ব্যাখ্যাও সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যায়। শিল্পমাত্রেরই মূলে যে-শক্তি মুখ্যত ক্রিয়া করছে তা চিত্তের রূপায়ণীবৃত্তি। উপাদান যতই বিভিন্ন হোক, যেখানেই সত্যিকার শিল্পসৃষ্টি হয়েছে সেখানেই শিল্পীর চিত্তগত ভাবকল্পনা একটি রূপ বা বিগ্রহ ধারণ করেছে। উপাদানগত বস্তুপদার্থে আশ্রিত এমন-কি লগ্ন থেকেও বস্তুর স্থূলতাকে সে বহুদূরে ছাড়িয়ে যায়, এবং শিল্পীর চিৎ বা সম্বিতের তড়িৎস্পর্শে তার প্রাণধর্মী ঐক্যের মধ্যে দিয়ে একটি চৈতন্যময় প্রকাশ দ্যোতিত হয়। এই চেতনার দ্যুতি, এই 'transcendental glittering of the intelligible form' সকল শিল্পেরই প্রকাশব্যঞ্জনার শেষ কথা। যামিনী রায়ের ভাষায় 'কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে'ই হোক, আর Bell-এর ভাষায় 'vision of significant form'-এর জন্যই হোক, যে-কোনো উপাদানকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্টির মধ্যে এই শিল্প-আত্মার প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া চাই। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'তে সকল শিল্পের এই মূল কথাটি বার বার বলেছেন। শিল্পের আলোচনায় 'সুর সার রূপ কথা' এই শব্দ কয়টি তিনি প্রায় সব সময়ই একসঙ্গে বলতেন।

এক হিসেবে রূপশিল্প আর বাণীশিল্পের মধ্যে একটি নিগূঢ় সাদৃশ্য আছে। বাণীশিল্পের চরম উৎকর্ষ কবিতা। ছবির সঙ্গে কবিতার রূপায়ণগত কয়েকটি বিষয়ে পরোক্ষ মিল লক্ষ্য করা যায়। চিত্রশিল্পের ষড়ঙ্গবিচারে বলা হয়েছে :

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্॥

ছবির মতো কবিতারও যে শিল্প হিসেবে ছয়টি অনুরূপ অঙ্গ আছে, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছবির অঙ্গ' প্রবন্ধে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, ছবির ষড়ঙ্গের শুরুতেই যে 'রূপভেদে'র কথা বলা হয়েছে সেটা সকল শিল্পের তো বটেই, সমস্ত জগৎ-বৈচিত্র্যেরই গোড়ার কথা। সৃষ্টি-উৎসের মুখেই এই রূপ-ভেদের উৎপত্তি। রবীন্দ্রনাথ এর কথা আগেই অন্যত্র বলেছেন, ও পরে লিখছেন :

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা, তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। · ·বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে— তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য। এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে

১ "The Drawings of Rabindranath": Tagore Birth-Day Number, Visva-Bharati Quarterly: May-Oct., 1941, Page 119.

মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।…তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গম্‌, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (suggestiveness)।…কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, অনির্দিষ্ট ভঙ্গির দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

ছবির অঙ্গ : পরিচয় : রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮শ খণ্ড : পৃ ৫১৯-'২০

তা হলে দেখা যাচ্ছে, কবি তাঁর বাণীসৃষ্টিতে চিত্রশিল্পের রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ— এই ছয়টি অঙ্গকেই স্বতন্ত্র উপায়ে প্রকাশ ক'রে থাকেন, কেননা কাব্যের শিল্পকৌশলের মধ্যেও এরা অন্যভাবে জড়িয়ে আছে। অবশ্যি উপায় স্বতন্ত্র হলেও শব্দের নিপুণ নির্বাচন ও বাণীর সার্থক প্রয়োগকৌশলের দ্বারা কবিতার শিল্পদেহেও রূপশিল্পের অঙ্গগুলিকে পরোক্ষভাবে দ্যোতিত করা যায়, যদিও এদের একটিকে বাণীতে প্রতিফলিত করা সবচেয়ে কঠিন মনে হয়। বাণীশিল্পের পক্ষে শব্দরুচি, অলংকার-সুষমা, এবং বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের ভাবদ্যুতির সাহায্যে চিত্রের রূপভেদ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকা-ভঙ্গকে ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়তো ততটা শক্ত নয়, যতটা দুঃসাধ্য চিত্রের প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাণসংগতিকে বাণীর পরিমাণসংগতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার কাছে এরা একেবারে জাত আলাদা— একটিকে দেখি চোখ দিয়ে, অন্যটিকে শুনি কান দিয়ে; কাজেই এদের পরিমাণচেতনা ভিন্নপ্রকৃতির বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তা ছাড়া এদের মধ্যে আরো একটি বড়ো তফাত এই যে এদের একটিকে আমরা দেখছি স্থানের 'সহভাবে' (process of co-existence), অন্যটিকে শুনছি কালের 'অনুক্রমে' (process of succession)। স্থান ও কালের পরিমাণের মান বাহ্যত এক হতে পারে না। এই জন্যই, রেখার ছন্দে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করলেও একমাত্র সেই কারণেই ভাষার ছন্দকে আয়ত্তে আনা যাবে, এ-কথা জোর ক'রে বলা যায় না। এই দুটি ভিন্নজগতের ছন্দকে একমাত্র তিনিই মেলাতে পারেন যিনি দৃষ্টি ও শ্রুতির, স্থান ও কালের প্রকৃতিগত বাহ্য বৈষম্যকে তাঁর অন্তরের উপলব্ধিতে গভীরতর সামঞ্জস্যে এক ক'রে নিতে পেরেছেন। তিনি যে-কোনো একটি শিল্পের পথ ধ'রে এগিয়ে গিয়েও এই উভয়বিধ ছন্দের অন্তর্নিহিত সংগতিসুষমাকে আপনার ধ্যানের আলোকে প্রত্যক্ষ করেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রামের ঊর্ধ্বে চেতনার রম্যলোকে বিশ্বসৌন্দর্যের প্রাণছন্দকে আলিঙ্গন ক'রে বলতে পারেন যে, ঐ একই ছন্দ ছবির জগতে স্থানবিধৃত রূপরেখার স্থিরতরঙ্গে ও বাণীর জগতে কালপ্রবাহিত ধ্বনিকম্পনের অস্থিরতরঙ্গে অনুক্ষণ স্পন্দিত হচ্ছে। এবং তিনি এও জানেন যে রেখার ঐ স্থিরতরঙ্গই যে-কোনো মুহূর্তে চেতনার বিদ্যুৎস্পর্শে চঞ্চল হয়ে ওঠে, আবার বাণীর অস্থিরতরঙ্গও প্রবহমান অবস্থাতেই অন্তরের স্তিমিত ধ্যানলোকে এক প্রশান্ত স্তব্ধতা বিস্তার করে। এই ঊর্ধ্বতর চৈতন্যলোকের অনুভবেই এই দুই স্বতন্ত্র জগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় একাত্মতা স্থাপিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের গভীর শিল্পচেতনায় এই অনুভবটি সব সময়ে ক্রিয়া করেছে। তাই ভাষার ছন্দের স্বতন্ত্র রীতিপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি তারই মধ্যে দিয়ে রূপরেখার ছন্দের ধ্বনিময় প্রতিস্পন্দন জাগাতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকে আমরা তাঁর 'রূপকথা-শোনা কান' ও তাঁর সূক্ষ্ম শ্রুতিচেতনার কথা বলেছি। যাঁরা তাঁর এসরাজ শুনেছেন তাঁরাই জানেন শ্রুতিলোকের অতি ঊর্ধ্বস্তরেও তাঁর কী স্বচ্ছন্দ বিহার ছিল। তাঁর সুরভরা মনের স্বাভাবিক সংগীতপ্রিয়তার জন্য রূপকথার ভঙ্গি ও ছড়ার ছন্দের ভাষাগত সংস্কারটি ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চেতনায় সঞ্চারিত হয়েছিল। পরে রূপদক্ষের

গভীরতর শিল্পবোধ ও সূক্ষ্মতর ছন্দোবোধের দ্বারা পরিশোধিত ও পরিমার্জিত হয়ে এই লৌকিক শিল্প-সংস্কারটি তাঁর রচনায় এক অনবদ্য বাণীশিল্পের জন্ম দিয়েছে।

তাঁর সাহিত্য থেকে চিত্ররূপায়ণের দৃষ্টান্ত দিতে হলে তাঁর প্রায় সব লেখাই তুলে দিতে হয়, তাই আপাতত তাঁর একেবারে প্রথম রচনার গোড়ার দিক থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি। সাধারণ বাণী-প্রধান কবিতায় অথবা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে রূপশিল্পের ছয়টি অঙ্গের পরোক্ষ আভাস স্বভাবতই কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে আত্মগোপন ক'রে থাকে, কিন্তু তাঁর সাহিত্যসাধনার শুরু থেকেই তারা যেন একেবারে স্পষ্ট ও উচ্চারিত হয়ে উঠেছে। 'শকুন্তলা' বইয়ের প্রথম পাতাটিই খোলা যাক :

> এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল তমাল, পাহাড় পর্বত, আর ছিল— ছোট নদী মালিনী। মালিনীর জল বড় স্থির— আয়নার মতো। তাতে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া, রাঙা মেঘের ছায়া— সকলি দেখা যেত। আর দেখা যেত গাছের তলায় কতকগুলি কুটিরের ছায়া।

— একেবারে ছবির ভাষা,— তুলির টানে আঁকা। প্রতিটি টান অব্যর্থ, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট। আর এমন টাটকা ছবি যে মনে হয় এখনো কালি শুকোয় নি।

এবার পাতা উল্টোতেই খুলল ১৪ পৃষ্ঠা :

> অমনি হাতীশালে হাতী সাজল, ঘোড়াশালে ঘোড়া সাজল, কোমর বেঁধে পালোয়ান এল, বর্শা হাতে শিকারী এল, ধনুক হাতে ব্যাধ এল, জাল ঘাড়ে জেলে এল। তারপর সারথি রাজার সোনার রথ নিয়ে এল, সিংহদ্বারে সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল।

একেই বলে চলন্ত ছবি। ভাগ্যিস্ 'সোনার কপাট ঝন্‌ঝনা দিয়ে খুলে গেল', নইলে মনে হত অবাক্ ছায়াচিত্র দেখছি।

একটা পাতা উলটোতেই চোখ পড়ল ১৭ পৃষ্ঠায় : এবার আর মানুষের ছবি নয়, একপাল জন্তুর ছবি :

> মোষ গরমের দিনে ভিজে কাদায় পড়ে ঠাণ্ডা হচ্ছিল, তাড়া পেয়ে— শিং উঁচিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে গহন বনে পালাতে লাগল। হাতী শুঁড় তুলে জল ছিটিয়ে গা ধুচ্ছিল, শালগাছে গা ঘষছিল, গাছের ডাল ঘুরিয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, ভয় পেয়ে— শুঁড় তুলে, পদ্মবন দলে, ব্যাধের জাল ছিঁড়ে পালাতে আরম্ভ করলে। বনে বাঘ হাঁকার দিয়ে উঠল, পর্বতে সিংহ গর্জন করে উঠল, সারা বন কেঁপে উঠল।

— এক-একবার মনে হয় বনের এই জন্তুগুলো তুলির ছবিতে কি এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট, বেশি জীবন্ত হত ? এরা শুধু জীবন্ত নয়, জ্যান্ত— নড়ছে, উঠছে, ছুটছে, তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে,— প্রতি মুহূর্তে ভঙ্গির বদল হচ্ছে। এদিকে বাঘ 'হাঁকার' দিল বনে, তো সিংহ 'গর্জন ক'রে উঠল' পর্বতে, সঙ্গে সঙ্গে 'বন' 'কেঁপে উঠে' হয়ে গেল 'অরণ্য'।

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই : শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া। এ তবু তো 'শকুন্তলা' বই— সবে তাঁর হাতে খড়ি। এর পর যত দিন গেছে ততই তো হাত এসেছে, ছবি আরো উতরেছে, বৈচিত্র্য আরো বহুগুণ বেড়েছে। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা এই যে, তাঁর চিত্রধর্মী লেখাগুলি এতই সার্থক যে মনে হয় শুধু ছবিই দেখছি, কথাগুলি ভালো ক'রে শোনবার আগেই ছবি হয়ে উঠছে। ছবির ছন্দ আর কথার ছন্দ একসঙ্গে মিলে-যাওয়াতেই যেন এই জাদুর খেলাটি আরো বেশি ক'রে জ'মে উঠেছে। রূপকথার ঢং আর ছড়ার ছন্দ— এই দুয়ে মিলে গোড়াতেই যে মণিকাঞ্চন-যোগ ঘটেছে, ওস্তাদ শিল্পী পরিণত বয়সে তাকে

আরো নিপুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর ছেলেবেলার স্মৃতি মেশানো 'জোড়াসাঁকোর ধারে' থেকে এর দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। একেবারে প্রথম পাতাটিই খুলছি :

আমরা বর্ষাকালে রথের সময়ে তালপাতার ভেঁপু কিনে বাজাতুম; আর টিনের রথে মাটির জগন্নাথ চাপিয়ে টানতুম, রথের চাকা শব্দ দিত ঝন্‌ঝন্‌; যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম, থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত চাঁপাই শাড়ি— কি বাহার খুলত!

এ হল দিনের বেলার ছবি। তার পর—

সন্ধ্যে হতে ঝড়জল আরম্ভ হল, সে কি জল, কি ঝড়! হাওয়ার ঠেলায় জোড়াসাঁকোর তেতালা বাড়ি যেন কাঁপছে, পাকা ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ছে সব শোবার ঘরে। পিদিম জ্বালায় দাসীরা, নিবে নিবে যায় বাতাসের জোরে। বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে দাসীরা আমাদের কোলে করে দোতলায় নাচঘরে এনে শোয়ালে। বাবা মা, পিসি পিসে, চাকর দাসী, ছেলেপুলে সব এক ঘরে। এক কোণে আমাকে নিয়ে আমার পদ্মদাসী কটর কটর কলাই-ভাজা চিবোচ্ছে, আমাকেও দুয়েকটা দিচ্ছে আর ঘুম পাড়াচ্ছে, চুপি চুপি ছড়া কাটছে— ঘুমতা ঘুমায়; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিজের ছড়া কাটার তালে তালে।

— উনিশ শতকের কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দেখতে দেখতে নেমে আসে রূপকথার রাত, রূপকথার কঙ্কাবতী আর কাঞ্চনমালা-মধুমালারা চারদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়,— ছড়ার সুর গুন্ গুন্ করছে হাওয়ায়, চোখের পাতায় একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে স্বপ্নের মায়াপুরী। এই পদ্মদাসীর ছড়া-কাটার ছন্দ— এই 'ঘুমতা ঘুমায়' সুর— তন্দ্রার গুঞ্জনের মতো আমাদেরও কানে ভেসে আসছে।

অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল ব'লেই এই রূপকথা-শোনা শিশুর জগৎ, এই ছড়ার-সুরে-গাঁথা বর্ষাসন্ধ্যা তাঁর বালক মনের উপর সম্মোহের এমন একটি মায়াজাল বিস্তার করেছিল যা শেষ জীবন পর্যন্ত তাঁর মনকে স্বপ্নাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তাই তাঁর প্রতিটি কথায় রূপকথার ভঙ্গি এত অনায়াসে এমন অবিকল ফুটে উঠেছে। অথচ এই লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক'রেই তাঁর ভাষা তাঁর অসামান্য শিল্পদৃষ্টির আলোকে এক নূতন আভায় মণ্ডিত হয়েছে। তেমনি তাঁর ছন্দও খুব সাধারণ উপাদান নিয়েই অসাধারণ। খাঁটি ছড়া রচনার দক্ষতায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার, তাঁর বিচিত্র ছড়ায় এর অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। ছড়ার খেয়ালি কল্পনাকে তিনি খোশখেয়ালি রূপকথার মধ্যে দিয়ে খামখেয়ালি উদ্ভট পালাগান পর্যন্ত চারিয়ে নিয়েছেন। ছড়ার লৌকিক ছন্দ গদ্যছন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিল্পের জগতে যে কী অলৌকিক খেলা খেলতে পারে তাঁর রূপকথা ও আত্মকথাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব রচনায় খানিকটা গদ্যের ভাঁজ, খানিকটা ছড়ার,— সব মিলিয়ে এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। অনেকগুলি কথাই ছড়ার মতো পর্বে পর্বে ভাগ করা যায়, প্রায় প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে 'দল' (Syllable) থাকে, আর কথার চালও অনেকটা লৌকিক 'স্বরবৃত্ত' ছন্দের বা 'দলমাত্রিকে'র। উপরের 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র উদ্ধৃতি থেকেই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | তালপাতার | ভেঁপু কিনে | বাজাতুম; |
| ২. | রথের চাকা | শব্দ দিত | ঝন্‌ঝন্‌; |
| ৩. | আকাশ ভেঙে | বৃষ্টি পড়ত | দেখতে পেতুম, |
| ৪. | পাকা ছাত | ফুটো হয়ে | জল পড়ছে |
| | স—ব | শোবার ঘরে। | |

| | | |
|---|---|---|
| ৫. বাবা মা, | পিসি পিসে, | চাকর দাসী, |
| ছেলেপুলে, | স—ব | এক ঘরে। |
| ৬. পদ্ম দাসী | কটর কটর | কলাই ভাজা |
| চিবোচ্ছে, | | |
| ৭. চুপি চুপি | ছড়া কাটছে | ঘুমতা ঘুমায় ; |

আর দরকার নেই। এতেই আমার বক্তব্য বিশদ হবে। এখানে সবসুদ্ধ ২৭টি পর্বের মধ্যে ১৭টিই চার 'দলে'র পর্ব। বাকি দশটির মধ্যে ২টি পর্বই হচ্ছে 'স—ব্', এদের পুরো পর্বের ওজন দিতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় দীর্ঘায়িত করতে হয়, নয় তো 'উনপর্ব' ব'লে ছেড়ে দিতে হয়। বাকি ৮টি পর্ব হল 'তালপাতার' 'বাজাতুম' 'ঝন্ ঝন্' 'পাকা ছাত' 'জল পড়ছে' 'বাবা মা' 'এক ঘরে' আর 'চিবোচ্ছে'। এদের মধ্যে এক 'ঝন্ ঝন্' পর্বটির 'দল'সংখ্যা ২, বাকি প্রত্যেকটির 'দল'সংখ্যা ৩। কিন্তু কান পাতলেই বোঝা যায়, এদের 'দল'সংখ্যায় যতই কম্‌তি থাক, এদের 'মাত্রা'সংখ্যা বা ওজন চার 'দলে'র পর্বগুলির সমান। স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গি অনুসারেই আমরা এই কথাগুলির একটি-না-একটি স্বরধ্বনিকে একটু টেনে উচ্চারণ করি। আর ছড়ার বেলা তো কথাই নেই, স্বরধ্বনির প্রসারণ-সংকোচনের ব্যাপারে ছড়া অনেকটা নিরঙ্কুশ। তা হলে দেখতে পাচ্ছি, 'সব' কথাটিকে পুরো এক পর্বের ওজন না দিলেও উপরের ২৭টি পর্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ২৫টিকেই আমরা ছড়ার 'দলমাত্রিক' রীতির 'সমমাত্রিক' পর্ব বলতে পারি। অথচ অবনীন্দ্রনাথ তো কথাগুলি আগাগোড়া গদ্যেই বলে গিয়েছেন! গোটা বইটিই তো তাঁর মুখের কথার শ্রুতিলিখন!

এ তো গেল তাঁর আত্মকাহিনী থেকে নেওয়া অংশ, আর যেখানে তিনি খাঁটি রূপকথার আসর জমিয়েছেন সেখানে ছবির আলো আর ছন্দের কাঁপনে মিলে পংক্তিগুলি কেবলি ঝিলিক দিচ্ছে, প্রতিটি ছোটো ছোটো পর্ব তারার কণার মতো ঝিকমিক করছে। বেশি খোঁজাখুঁজি না ক'রে তাঁর প্রথম রূপকথার বই 'ক্ষীরের পুতুল'-ই খুলে দেখা যাক। পাতা উলটোতেই চোখ পড়ছে ৭৩ পৃষ্ঠায় :

| | | |
|---|---|---|
| বানর দেখলে— | ষষ্ঠীতলা | ছেলের রাজ্য, |
| সেখানে | কেবল ছেলে— | ঘরে ছেলে, |
| বাইরে ছেলে, | জলে স্থলে, | পথে ঘাটে, |
| গাছের ডালে, | সবুজ ঘাসে | যেদিকে দেখে |
| সেইদিকেই | ছেলের পাল | মেয়ের দল। |

ভাবছি, ষষ্ঠীতলার চারদিকে ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ভিড়ের ছবিটি কলমের এক আঁচড়ে যেভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে রঙ-রেখায় এর কতটুকু ফুটতে পারত? এখানে কথার ভঙ্গিটি রূপকথার, কিন্তু ছন্দটি আগের মতোই 'দলমাত্রিক'। সবসুদ্ধ ১৫টি পর্বের মধ্যে ১০টিতেই 'দল'সংখ্যা চার ক'রে পড়েছে; যে-পাঁচটিতে সংখ্যার গরমিল সেগুলি হচ্ছে 'সেখানে' 'যেদিকে দেখে' 'সেইদিকেই' 'ছেলের পাল' আর 'মেয়ের দল'। প্রথমটি 'উনপর্ব' ধ'রে নিলেই চলে, আর বাক্‌ছন্দ বাঁচিয়ে একটু টেনে পড়লেই 'শেষের তিনটিকে এক-একটি পুরো পর্বের ওজন স্বচ্ছন্দে দেওয়া যেতে পারে। বাকি থাকে 'যেদিকে দেখে' পর্বটি। এটাকে একটু দ্রুত লয়ে পড়া ছাড়া উপায় নেই, কেননা এখানে পর্বটি যেভাবে এসে বসেছে তাতে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দও তাকে গা মেলে বসতে দিচ্ছে না। তা ছাড়া শুধু এই পর্বটির মধ্যে ছবিরও এমন

কিছু ইঙ্গিত নেই যে একে রসিয়ে পড়ার প্রয়োজন আছে। ছড়ার পর্ব হিসেবে তো একে দ্রুত লয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক। 'যেদিকে দেখে' আর 'খুকুমণিকে' এ দুটি কথার প্রত্যেকটির 'দল'সংখ্যা ৫, অথচ :

খুকুমণিকে। বিয়ে দেব। হাটমালার। দেশে

ছড়ায় স্বচ্ছন্দে চলে এবং চমৎকার মানিয়ে যায়।

অবশ্যি অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় ছড়ার ছন্দের এতটা আধিপত্যের একটা প্রধান কারণ এই যে তিনি মুখ্যত মুখের ভাষার ভঙ্গিটিকেই আশ্রয় করেছেন। আমাদের মুখের ভাষায় অনেক সময়েই এই লৌকিক ছন্দের আভাস আসে। যদি কেউ বলেন, 'সকালবেলা উঠেই দেখি আটটা' কিংবা 'আমার এখন একটি মিনিট সময় নেই'—তা হলে তিনি যে সাদা গদ্যে কথা বলছেন এতে কোনো সন্দেহ থাকে না, কিন্তু কথা দুটির বাক্‌ছন্দই এমন যে তারা আপনা থেকে দলমাত্রিক পর্বে ভাগ হয়ে যায়। বাক্‌ছন্দের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায় ব'লে এই ছন্দটিকে বলতে পারি উভচর ছন্দ— পদ্যের ঢেউয়ে দোল খায়, আবার গদ্যের ডাঙায়ও চ'লে বেড়ায়। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পলাতকা'র কবিতাগুলির জন্য এই ছন্দটি বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিলেন, কেননা বইটির লৌকিক কাহিনীগুলিকে খাঁটি কবিতার আওতায় রেখেই একেবারে লৌকিক ঢঙে বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কবিতাগুলির অসমপংক্তির বিন্যাস তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে আরো খানিকটা সাহায্য করেছে।

এই লৌকিক ছন্দের বহুল ব্যবহার অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও এইটিই তার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এ-কথা ভুললে চলবে না যে আসলে তিনি রূপশিল্পী। ভাষায় ছবির পর ছবি ফোটাতে গিয়ে ছড়ার ছন্দ থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সাহায্য পেতে থাকেন ততক্ষণ একে তিনি বিশেষভাবে আশ্রয় করেন, কিন্তু যখনই ছন্দের অতিরিক্ত দোলায় কথার সংগীতধর্মটি প্রধান হয়ে ওঠে এবং ছবির রঙ-রেখা সুরের তলায় চাপা পড়বার সম্ভাবনা ঘটে, তখনই তিনি যথাসময়ে অতি নিপুণভাবে তালের ঢেউ ভেঙে তাকে কথার মধ্যে চারিয়ে দেন। তাতে ঐ ঢেউ-ভাঙার জায়গাটিতে কিছুক্ষণের জন্য ছন্দটি এলোমেলো হয়ে যায় কিংবা হঠাৎ কখনো অন্য কোনো ছন্দের আভাস ফুটে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র অংশ থেকে একটি বাক্য তুলে নিই :

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম ;

—এই পর্যন্ত প্রতি পর্বে ৪টি ক'রে 'দল' ঠিকই আছে, কিন্তু তারপর ?—

থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত<br>
চাঁপাই শাড়ি— কি বাহার খুলত !

—এখানে 'থেকে থেকে' আর 'রোদ পরাত' এই দুটি 'চতুর্দল' পর্বের মাঝখানে 'মেঘলা আলোকে' কথাটিতে 'দল' সংখ্যা ৫, অথচ উচ্চারণে অস্বাভাবিক বিকৃতি না-ঘটিয়ে একে সংকুচিত করা অসম্ভব। এতে প্রথম একটি 'দল' ছাড়া বাকি ৪টিই 'মুক্তদল', পর্বের স্বরধ্বনিগুলি যথাক্রমে এ আ আ ও এ—মাঝখানে দুটি 'আ' ( বিবৃত স্বর ) একেবারে পাশাপাশি, তা ছাড়া দুই প্রান্তে দুটি 'এ' ( অর্ধবিবৃত স্বর ) রয়েছে, ৫টি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে ৩টিই অর্ধব্যঞ্জন : একটি 'ম' ( অনুনাসিক ) আর দুটি 'ল' ( পার্শ্বিক )—এরা ব্যঞ্জনধ্বনির কোমল-তরল সুর ;—কাজেই ধ্বনিতত্ত্বের দিক বিচার করে দেখলে পর্বটিকে সঙ্কুচিত করবার অসুবিধে আছে। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো বাধা আসছে কথাটির বাণীরূপ আর চিত্রব্যঞ্জনার দিক থেকে। মাঝখানের দুটি 'আ' ধ্বনির 'সন্ধি'

করতে পারলে বৈয়াকরণ হয়তো খুশি হন, কিন্তু 'সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা' আমাদের 'মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন।' দ্রুত উচ্চারণের অসংগতি এখানে সইবে কেন? 'মেঘলা আলোকে'র কোমল আভাটুকু ভাষার তুলিতে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তো শিল্পী তাঁর কথায় বর্ণধ্বনিগুলিকে এমন নিপুণ কৌশলে আলগোছে সাজিয়েছেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে পর্বটিকে তার ছবির ইশারাটুকুর মধ্যে মনে মনে ছড়িয়ে রাখা, আর সমস্ত কথাটির ভাবের মধ্যে আলতোভাবে চারিয়ে দেওয়া। ঠিক এমনি ক'রেই বলব, বাক্যটির শেষাংশের 'কি বাহার খুলত' কথাটিকেও বেঁধে রাখার চেয়ে ছেড়ে রাখাই ভালো। 'রোদ পরাত' 'চাঁপাই শাড়ি'—এই দুটি 'চতুর্দল' পর্বের পরে একটু ফাঁক রেখে তারপর কথাটিকে বসানো হয়েছে,—শিল্পী নিজেই তাকে খানিকটা সরিয়ে এবং ছড়িয়ে রেখেছেন। এখানে 'কি বাহার' কথার শব্দ দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়ে কবিতায় হয়তো সহজেই ছন্দ বাঁচানো যায় কিন্তু বাক্-ভঙ্গির দিক থেকে, এবং বিশেষ ক'রে কথাটির ভাবব্যঞ্জনার দিক থেকে বিচার করলে এখানে তা না করাই সঙ্গত, কারণ শব্দ দুটি জুড়ে নিলে কথার আসল বাহারটিই মাটি হবে। এই 'বাহার' শব্দকে আশ্রয় করেই কথাটি এখানে কলাপ বিস্তার করেছে,—চাঁপাই শাড়ির রূপের শোভা ভাঁজে ভাঁজে খুলে দিয়েছে। ময়ূরের পেখমটি মেলে-ধরার জিনিস, তাকে গুটিয়ে নিলে ঝাঁটার মতো পিছনে প'ড়ে থাকে।

তবে, রূপসৃষ্টির প্রেরণা মুখ্য হলেও, ছন্দের ঢেউ ভেঙে-দেবার ব্যাপারে তাঁর শিল্পিমনে আরো একটি চেতনা কাজ করেছে: অতিরিক্ত নিরূপিতমাত্রার তাল দীর্ঘকাল চলতে থাকলে রচনা পদ্যের চেহারা ধরে, গদ্যের রূপ একেবারেই থাকে না, কাজেই এই কারণেও একটানা ছন্দের মাঝখানে ছেদ আনতে হয়। তখন পাঁচমিশেলি ছন্দের বিচিত্র সমাবেশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ হল গদ্যের রীতি বাঁচিয়ে চলার কথা। আবার এবড়োখেবড়ো দৃশ্যের রচনায় কিংবা একসঙ্গে উত্থিত অনেকগুলি ধ্বনিঝংকারের বর্ণনায় ছন্দকে খানিকটা এলোমেলো করে দিতে হয়। শেষোক্তটির একটি ছোটো দৃষ্টান্ত দিই। উপরে উদ্ধৃত বাক্যটির ঠিক আগেই আছে:

| | | |
|---|---|---|
| রথের চাকা | শব্দ দিত | ঝন্ ঝন্; |
| যেন | সেতার নূপুর | স—ব |
| একসঙ্গে | বাজছে। | |

এখানে 'যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে'—এই শব্দগুচ্ছের তাল ও বাণীসংগীত কান পেতে শুনলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণ হবে। উপরের পর্ববিভাগ অনুসারে পড়লেও পর্বগুলির 'দল'সংখ্যার অসমতা কেবলি অসুবিধে ঘটায়: ২, ৪, ১, ৩, ২—এই 'দল'সংখ্যাগুলির পক্ষে এই অনুক্রমে কাঁধ-মেলানো সত্যি কঠিন। তা ছাড়া সাধারণ বাক্ছন্দে 'যেন' শব্দটাকে টেনে বাড়াবার তো উপায়ই নেই। 'সব' কথাটাকে খানিকদূর পর্যন্ত টানা যায়, কিন্তু তবু একে পুরো এক পর্বের ওজন দিতে পারি নে। অবশ্যি এর স্বরধ্বনিকে সংকুচিত ক'রে 'সেতার নূপুরে'র সঙ্গে জুড়ে দিলে বাক্ছন্দের দিক থেকে হয় তো তেমন বেমানান হয় না, কিন্তু ছড়ার 'দলমাত্রিকে'র তাল তাতেও কাটবে। আবার 'এক সঙ্গে' কথাটির আগের দিকে একে জুড়তে গেলে প্রমাদ ঘটবে: 'সব একসঙ্গে' দ্রুত উচ্চারণ করলে হয়ে যাবে 'সবেক সঙ্গে', বাক্ভঙ্গিতে এই বাণীবিকৃতি অসহ্য। কাজেই এই বাক্যাংশে ছন্দের ঢেউ কিছুটা ভাঙবেই, আর লেখকও এখানে ইচ্ছে ক'রেই তাল কেটেছেন, টিনের রথের চাকার মিশ্রিত ঝন্ ঝন্ শব্দ ভাষায় শোনাতে গিয়েই তো 'সেতার নূপুর সব'

আমদানি হল, ছন্দেও আসুক খানিকটা বিশৃঙ্খলা— তাতেই এখানকার ঠিক তালটি লাগবে, ঠিক সংগতটি জমে উঠবে।

প্রশ্ন হতে পারে, ছবির খাতিরেই হোক আর গদ্যভঙ্গির খাতিরেই হোক, নিরূপিত ছন্দের ঠাটটি মাঝে মাঝে যখন ভাঙতেই হয়, তখন অবনীন্দ্রনাথ ধীর লয়ের প্রচলিত গদ্যরীতিকে আশ্রয় করলেই পারতেন। তুলির ছবিও যখন রঙ-তুলি নিয়ে ব'সে ধীরেসুস্থেই আঁকা যায় তখন আর কথা কী? এর একটি উত্তর হল, গদ্য মূলত চিন্তার ভাষা। গদ্যের অনিরূপিত ছন্দে চিন্তার বিসর্পিল ধারা মন্থর গতিতে একটু-একটু ক'রে এগিয়ে চলে। এ-রকম অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাদর্শের উপযোগী পরিমাণ-সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় উত্তর হল, রঙ-তুলির ছবি আঁকতে প্রচুর সময় ব্যয় হলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের উপর একসঙ্গে ভেসে ওঠে তার সমস্তটা, আমরা তাকে এককালেই দেখতে পাই স্থানের ব্যাপ্তিতে। এখন, কালপ্রবাহিত ভাষাকে একান্তভাবে চিত্ররূপময় ক'রে তুলতে হলে— অর্থাৎ তার প্রতিটি ছোটো ছোটো অংশে আশ্চর্য তৎপরতার সঙ্গে এক-একটি সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে হলে—তার অন্তর্নিহিত কালের অনুক্রমের মধ্যে স্থানের সহভাবের আভাস আনতে হবে। প্রচলিত প্রবহমান গদ্যের অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বাণীর বিলম্বিত প্রকাশ ঘটে বলেই তাতে কাল কেবলই দীর্ঘায়িত হতে থাকে। কাজেই ভাষার এই রীতিতে অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার ভিড়-করে-আসা ছবিগুলি অবিকল সেইভাবে ধরে রাখা অসম্ভব। ছবিগুলি হয় অস্বাভাবিকরূপে প্রলম্বিত হয়ে পরিমাণ-সঙ্গতি হারাবে, নয় তো গদ্যের দীর্ঘ প্রবহমান ধারার একটানা স্রোতে ধুয়ে-ধুয়ে গ'লে-গ'লে যাবে এবং আকারসীমা হারিয়ে অস্পষ্ট হতে থাকবে। এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন, অতিনিরূপিত পদ্যছন্দকেও সব সময় হুবহু গ্রহণ করতে চাইলেন না, অন্যদিকে তেমনি গতিমন্থর গদ্যধারার একেবারে অনিরূপিত ছন্দকেও যথাসম্ভব পরিহার করলেন। ফলে আমরা পেলাম তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় রচিত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের এক শিল্পময় গদ্যরীতি। এ গদ্য মূলত চিত্রাত্মক, তবে এর ছন্দ মোটামুটি একটি নিয়ন্ত্রিত ঠাটে বাঁধা থাকতে চায় ব'লে, এর রীতিটিকে বলতে পারি 'গীতিচিত্ররীতি'। এর ছন্দ কতকাংশে ছড়ার মতো হলেও এ ছড়া নয়, এর ছাঁদ রূপকথার হলেও এ যত-না 'রূপকথা' তার চেয়ে ঢের বেশি 'রূপের কথা'। এর ছন্দ 'অনিরূপিত'ও নয় আবার 'অতিনিরূপিত'ও নয়, একে বলতে পারি 'অনতিনিরূপিত'। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে গদ্যকবিতায় যে ছন্দটি ব্যবহার করেছেন, অবনীন্দ্রনাথ তার অনুরূপ একটি ছন্দ তাঁর গদ্যের ক্ষেত্রে যেন আগে থেকেই তাঁর নিজের ভঙ্গিতে প্রয়োগ করেছেন। তা হলেও দুজনের ছন্দে তফাৎ আছে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রীতিমতো কবিতার কোঠায় এসে পড়েছে, আর অবনীন্দ্রনাথের ছন্দ ভাষার গীতিচিত্ররীতিকে আশ্রয় ক'রে গদ্যেরই এক নূতন ভঙ্গি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আগেই বলেছি, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে লৌকিক 'দলমাত্রিক' ছন্দের বহুল প্রয়োগ ঘটলেও তাকে কোনো জায়গায় বেশিক্ষণ একটানা ব্যবহার করা হয় নি। ছন্দের ঢেউ কী ক'রে ভেঙে দেওয়া হয় তারও দু-একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে কখনো কখনো লৌকিক ছন্দের আওতার মধ্যেই পর্বের 'দল'গুলির বিশেষ এক ধরনের বিন্যাসে, কথার ঝোঁক পালটে দিয়ে নূতন নূতন রূপকল্পের ( pattern ) সৃষ্টি করা হয়েছে :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১. মাথায় | তেল দিলে, | খোঁপায় | ফুল দিলে | ( ২।৩, ২।৩ ); |
| ২. পায়ে | আলতা দিলে, | নতুন | বাকল দিলে ; | ( ২।৩, ২।৪ ); |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩. | হাতে | মৃণালের বালা, | গলায় | কেশরের মালা, | ( ২।৫, ২।৫ ) ; |
| ৪. | হীরের বালা | কোথায়, | মতির মালা | কোথায়, | ( ৪।২, ৪।২ ) ; |
| ৫. | কেউ | জালে ধরা পড়ল, | কেউ | ফাঁদে বাঁধা পড়ল, | ( ১।৬, ১।৬ ) ; |

এরকম হাজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। এখানে তো শুধু 'শকুন্তলা'র ৩৩ পৃষ্ঠার একটি অনুচ্ছেদ থেকেই বলতে গেলে প্রায় সবগুলি দৃষ্টান্ত মুঠো ক'রে এনেছি, কেবল শেষ দৃষ্টান্তটি এনেছি ১৮ পৃষ্ঠা থেকে।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি নানা ছাঁদের 'অসমদল' পর্বের বিন্যাসে ছন্দকে এবড়োখেবড়ো ক'রে দিয়েও সব মিলিয়ে মোটামুটি একটা পরিমাণসংগতি রাখা হচ্ছে। এমনটি ঘটাতে হলে যে নূতন ধরনের ঘটকালি আর জোটক-মিলের প্রয়োজন, গভীরতর ছন্দোবোধ না থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। তাঁর যে-কোনো বইয়ের যে-কোনো পাতায় এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। 'বুড়ো আংলা' খুলতেই ৬০ পৃষ্ঠায় চোখ পড়ল :

| | | |
|---|---|---|
| কানা কুকুরটা | ঘেউ ঘেউ ক'রে | থামলে |
| হাঁসেরা | হাসতে হাসতে | বললে— |
| আরে মুখ্যু, | আমরা কি তোর | রাজার কথা, |
| না রাজবাড়ির কথা, | না মাটির কেল্লার কথা | শুনেছি ? |

প্রথমে মনে হবে ছন্দটা একেবারেই এলোমেলো, কিন্তু খেয়াল ক'রে কান পেতে শুনলে বুঝতে পারি এখানে গদ্যের অসমতল ভূমিতে শিল্পীর প্রতি পদক্ষেপ সংযত, প্রতিটি বাক্যাংশ শব্দের ধ্বনিসঙ্গতির গভীরতর সূত্রে বিধৃত। কুকুরের ডাক শুনলে কানে একটা ধাক্কা লাগে, কুকুরটা কানা হলে চোখেও ধাক্কা লাগে। তাই এখানে 'কানা কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ ক'রে'— এই বাক্যাংশের বর্ণমালাতে চারটা 'ক' হুঁচট খেয়ে দুটো 'ঘ'-এর ঘাড়ে ধাক্কা মারছে, আর 'টা' শব্দটা মাঝখানে একটা কর্কশ কেঠো আওয়াজ ক'রে উঠেছে। কিন্তু শিল্পীর জাদুতে এর ঠিক পরের কথাটিতেই হাওয়া একেবারে পালটে গেল,— এবার কানা কুকুর নয়, হাঁস। 'হাঁসেরা হাসতে হাসতে'ই তো কথা বলবে, তারা তো হালকা হাসিই হাসে, তারা যে পাখি, তাদের পাখা হাওয়ায় ওড়ে। এখানে 'হাস্'-ধ্বনিটি পর পর তিনবারই শোনা যাচ্ছে, শব্দগুলির মধ্যে যেন হাওয়া শিস দিচ্ছে। এর পর 'হাঁসেরা' যা 'বললে' সে তো কৌতুকের কথাই হবে। কথার ছন্দে-সুরে একটি চাপা-হাসির কৌতুক ফুটে বেরুচ্ছে। বাক্ছন্দের দিক থেকে বিচার করলে এখানে 'থামলে' আর 'বললে' যেন তবলার দুটি অনিবার্য 'ঠেকা', আর সব শেষে তিনটি 'মুক্তদলে'র প্রশ্নাত্মক 'শুনেছি ?' কথাটিতে একদিকে যেমন উত্তরের প্রত্যাশাজনিত অসমাপ্তির আভাস আনা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তব্‌লার চাটি বলছে, 'এই তো সম।'

নানা মাপের নানা ধাঁচের হ্রস্ব-দীর্ঘ পর্ববিন্যাসে কত বিচিত্রভাবেই যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্যে তাল ভেঙে তাল রেখেছেন, আবার তাল রেখে তাল ভেঙেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে-কোনো বই থেকে খানিকটা অংশ পড়লেই পর্বের অন্তত দশ রকমের নূতন ধরণের বিন্যাস চোখে পড়ে। 'ভূতপত্‌রীর দেশে'র একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখছি :

| | | |
|---|---|---|
| হুম্পা হুমা | পাল্‌কি চলেছে | বনগাঁ পেরিয়ে ; |
| ধপড় ধাঁই | পাল্‌কি চলেছে | বনের ধার দিয়ে, |
| মাসির ঘর ছাড়িয়ে, | ভূতপত্‌রীর মাঠ পেরিয়ে। | |

এখানে 'বন্গাঁ পেরিয়ে' 'বনের ধার দিয়ে', 'মাসির ঘর ছাড়িয়ে', 'ভূতপত্রীর মাঠ পেরিয়ে',— এই বাক্‌পর্বগুলি লক্ষ্য না ক'রে উপায় নেই। শেষের তিনটি তো বাক্‌ভঙ্গির দিক থেকে যথাক্রমে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম। কিন্তু উপায় কী? 'হুম্পাহুমা'র সঙ্গে 'বন্গাঁ পেরিয়ে' যেই কাঁধ মেলাল, অম্নি 'বনের ধার দিয়ে' কথাটিও সেই সঙ্গে এসে কী ক'রে চমৎকার মিলে গেল। 'বনের ধার দিয়ে'-কে মেনে নিলে 'মাসির ঘর ছাড়িয়ে'-কেও মানতে হয়, আর তা হলে 'ভূতপত্রীর মাঠ পেরিয়ে'ই বা বাকি থাকে কেন? একেই বলে অজগর গেলা, অথচ কী সহজে লেখক আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এলেন! আমরা জানতেই পারলাম না কখন 'হুম্পাহুমা'র মতো ছোটো একটি পর্ব থেকে এত দীর্ঘ একটি পর্বে এসে পৌঁছলাম। শেষের পর্ব তিনটির বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা একটির পর একটি কেবলি বেড়ে চলেছে, টেনে টেনে কেবলি দীর্ঘ হচ্ছে,— এ ছন্দটাকে বলতে পারি 'টেনে-চলা ছন্দ'। এখানে এরকম ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলে তিনি হয় তো বলতেন, 'তা হতেই তো হবে,— কত বড়ো মাঠ, কত দূরের পথ!' এর উপরে আর কথা নেই।

এবার আমরা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দের নূতন একটি রীতির উল্লেখ করছি। এতে ছড়ার ছন্দের পৌনঃপুনিকতা কিংবা অসম ছন্দের সংঘাত-সমন্বয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। একে বলতে পারি 'দোলনার ছন্দ',— ঝোঁকের এক ঠেলায় একদিকে যতটা এগিয়ে যায়, ফিরতি টানে আরেক দিকে কমবেশি প্রায় ততটাই ফিরে আসে। দোলনায় দোল খাবার সময় সব ঝোঁকের ওজন এক হয় না, কখনো বেশি কখনো কম। ঠেলার বেগ যখন বেশি তখন সামনে-পিছে দুদিকেই দোলনের দূরত্ব যায় বেড়ে, আর বেগ যখন মৃদু তখন দোলনের দূরত্বও আসে ক'মে। ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটতে থাকে অবনীন্দ্রনাথের এই ধরনের গদ্যছন্দে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এর স্বরূপলক্ষণটি বোঝা যাবে। ধরা যাক 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একেবারে মুখবন্ধের প্রথম কথাটি:

| | |
|---|---|
| যত সুখের স্মৃতি | তত দুঃখের স্মৃতি |
| আমার মনের | এই দুই তারে |
| ঘা দিয়ে দিয়ে | এই সব কথা |
| আমার শ্রুতিধরী | শ্রীমতী রানীচন্দ |
| এই লেখায় | ধ'রে নিয়েছেন, |
| সুতরাং | এর জন্যে |
| যা কিছু পাওনা | তাঁরই প্রাপ্য। |

ঠিক দোলনার দোলনের আভাস আসছে। দুদিকে প্রায় সমান ঝোঁক, তাই পর্বগুলির ভাষা-পরিমাণও যেন ডাইনে-বাঁয়ে জোড়ে-জোড়ে মিল, প্রত্যেক জোড়ায় একটি পর্বের ওজন বাড়লে অন্যটিরও বাড়ছে, একটির কমলে অন্যটিরও কমছে।

এক ধরনের ছড়াতেও এই দোলনার চালটি কিছু-কিছু লক্ষ্য করা যায়। এদের জোড়া-পর্বগুলির 'দল'সংখ্যা অনেক সময়েই অসমান, তবু এরা 'মাত্রাসমকত্বে'র আভাস আনে স্বরধ্বনির ওজন বাড়িয়ে-কমিয়ে। কখনো কখনো এদের হ্রস্ব পর্বগুলির 'মুক্তদলে'র বিস্ময়করভাবে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে:

| | |
|---|---|
| আমার কথাটি | ফুর—ল |
| নটে গাছটি | মুড়—ল |

কেন রে নটে মুড়্—লি
গোরুতে কেন খা—য়

কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের দোলনার ছন্দটি ঠিক এই জিনিস নয়। এখানে বাঁ দিকের পর্বগুলিকে দ্রুতভাবে ও ডানদিকের পর্বগুলিকে অত্যন্ত বিলম্বিতভাবে উচ্চারণ করে দুদিকের মাত্রাসমতা আনা হয়েছে, এবং মোটামুটি ছড়ার ছন্দের আদলটিই বজায় রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নীচে সব পর্বেরই ওজন মোটামুটি সমান ব'লে ধ'রে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের লেখা থেকে উদ্ধৃত উপরের বাক্যটি লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তাতে সব পর্বের মাত্রা সমান রাখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, শুধু ডাইনে-বাঁয়ে ঝোঁকের মোটামুটি মিল থাকলেই হল, উপরে-নীচে নয়। অবশ্যি এই 'দোলনার ছন্দে'র সঙ্গে ছড়ার ছন্দকে মিশিয়ে নিয়েও নানারকম বৈচিত্র্য এনেছেন অবনীন্দ্রনাথ। এর একটি দৃষ্টান্ত তো 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই আছে :

গাল চাপড়াচ্ছে আমার পা নাচাচ্ছে নিজের
ছড়া কাটার তালে তালে।

এতে দোলনার দোলও আছে, ছড়ার আদলও আছে। কিংবা 'শকুন্তলা'র ১৮ পৃষ্ঠা খুলতেই চোখে পড়ছে :

কেউ জালে ধরা পড়ল কেউ ফাঁদে বাঁধা পড়ল
কেউ বা তলোয়ারে কাটা পড়ল।

এখানেও প্রথম দুটি পর্বে 'দোলনার ছন্দে'র আভাস এসেছে, কিন্তু তারপর 'কেউ বা' কথাটিতে দোলন থেমে গিয়ে শেষ দুটি পর্বে ছড়ার তাল এসে পড়েছে। আবার তাঁর গদ্যছন্দে লেখা 'পাহাড়িয়া' কবিতার প্রথমেই একটু অন্য ধরনের মিশ্রছন্দের একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে :

জেগে-ওঠার কিনারায় কিনারায় সুরের পাড় বোনে
পাখি,—

এখানে শেষ কথাটিতে দোলনার দোলন একেবারে থেমে গেল। তারপর :

একটি পাখি, না-দেখা পাখি, কানে-শোনা পাখি !

এ একেবারে 'টেনে-চলা ছন্দ' : প্রথম ঝোঁকে একটু টান, তারপরে আরেকটু বেশি, তারপরে সবচেয়ে বেশি। এই টানা সুরটুকু দীর্ঘ হতে-হতে চলেছে, এতে শুধু-যে না-দেখা পাখিটির একটানা সুরের আভাস ফুটে উঠেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে একটা দূরত্বের আভাস আসছে,— পাখিটি হয়তো কাছেই কোথাও ডাকছে, তবু তাকে দেখা যাচ্ছে না— সে 'মনের মধ্যে অনেক দূর।'

লৌকিক ছন্দের 'দলমাত্রিক' পর্বকে বাক্‌পর্বের সঙ্গে মিলিয়ে ও পর্বগুলিকে নিত্যনূতন ভঙ্গিতে সাজিয়ে এক অদ্ভুত ধরনের কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। তাঁর পালাগানগুলি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবু তাঁর রূপকথাগুলিও বড়ো কম যায় না। তাঁর জীবনকাহিনীর বইগুলিতেও কথা বলার এই ঢঙ অনেক জায়গাতেই ধরা পড়ে।

| | | |
|---|---|---|
| বেহালার | এক দুই তিন চার | আর |
| ঘোড়া মলার | টপ টপ ঢপ ঢপ, | |

—জোড়াসাঁকোর ধারে : পৃ ১৭

কিংবা—

| | | |
|---|---|---|
| ব্রহ্মা | ওঠেন তো | পড়েন, |
| হাঁপাতে হাঁপাতে | পবনকে এসে | বলেন |

—মারুতির পুঁথি : পৃ ২৮

কিংবা—

| | |
|---|---|
| তারপরে | বাসর জাগরণ, |
| বানরী-বীণায় | তার পরং, |
| তালি চটপটি | বানরী-নর্তন |
| | ও ডুগডুগি বাদন ; |

—মারুতির পুঁথি : পৃ ১৯

এরকম অসংখ্য কথা ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার যেখানে-সেখানে। আর দৃষ্টান্ত নয়, শুধু একটুখানি ধরিয়ে দিলাম। পাঠক নিজে বই নিয়ে বসে রসিয়ে রসিয়ে আরো নানারকম ঢঙ আবিষ্কার করে খুশি হবেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত ধ্রুপদী চালের গম্ভীর রীতির গদ্যের কথা না বললে আলোচনার একটা দিক অসম্পূর্ণ থাকবে। এই রচনাগুলি বস্তুত প্রচলিত সাধুরীতির সমগোত্র, যদিও নিপুণ বাণীশিল্পী অনেক সময়ে এতে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপটিও ব্যবহার করতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অল্প কয়েকটি রচনায় এই রীতি অনুসরণ করেছেন, এবং আশ্চর্যের বিষয় এটি তাঁর সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষাভঙ্গি না হলেও, এতেও তাঁর অসামান্য সৃষ্টিকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ এই যে তাঁর এ-রচনাগুলি মুখ্যত হয় বৃহৎ নিসর্গচিত্র-ধর্মী নয় ভাস্কর্যধর্মী, এবং এইজন্যই তাঁর শিল্পপ্রতিভা এদের এমন একটি অনবদ্য বাণীরূপ দিতে পেরেছে। শিল্পরীতির বিচারে তাঁর এ-ভাষাও গীতিচিত্রধর্মী, তবে এ-গীতি ধ্রুপদ পর্যায়ের, আর এ-চিত্র বিশাল দৃশ্যপটের। তাঁর অসামান্য রূপদৃষ্টি ও মৌলিক মনোভঙ্গি এ-ভাষাতেও এক নূতন ঐশ্বর্য এনেছে। প্রথমে ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ-বিশিষ্ট রচনার দুটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

একটুখানি আলোর আঘাত, নিশীথবীণায় সোনার তারের একটুখানি তীব্র কম্পন। উষার অচঞ্চল শিশির, তার মাঝখানে একটিবার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি নূতন দিনের দিকে মুখ ক'রে। পৃথিবীর পূর্বপার পর্যন্ত অনেকখানি অন্ধকার এখনো রাশীকৃত দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণসার চর্মের মতো একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পদক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে। সম্মুখে দেখা যাচ্ছে একটি পদ্মের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ; যেন ভূদেবী বিশ্বদেবতাকে নমস্কার দিচ্ছেন।

—পথে বিপথে : গিরিশিখরে : পৃ ১১৪

এ-রচনার সৌন্দর্য মুখে বলা যায় না। অন্ধকার রাত্রিশেষে বিশ্বব্যাপী গম্ভীর প্রশান্তির মাঝখানে পূর্বাকাশে প্রথম আলোর কম্পনটি ভাষার সূক্ষ্ম বীণাতারে আশ্চর্যভাবে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। এ হল প্রকৃতির একটি স্থির শান্ত ছবি, এর মধ্যে সর্বত্র একটি সমাহিত ধ্যানের ভাব বিরাজ করছে। কিন্তু যেখানে স্থিতির

মাঝখানে গতির ক্ষিপ্রবেগ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে সেখানে এই ভাষাতেই আরেক ছন্দ আরেক সুর ধ্বনিত হয় :

ঠিক যেখানটি থেকে সূর্যাস্তের নিচে সন্ধ্যার বেগুনি আঁধার চিরে নদী একটি রুপোর তারের মতো দেখা যায়, সেখানটিতে পৌঁছে পথ স্তূপাকার পাথরের উপর হঠাৎ লম্ফ দিয়ে পুবে মোড় নিয়ে পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেয়ে ছুটে নেমেছে।

—পথে বিপথে : বিচরণ : পৃ ১২৭

ছন্দের বেগ-পরিবর্তন ও আকস্মিক ওঠা-পড়াগুলি বন্ধুর পার্বত্যপ্রকৃতির দৃশ্যকে একেবারে জীবন্ত করে তুলেছে। এখানে আঁধার-চেরা নদীটি যেমন তরতর ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, পাহাড়ে-পথটাও তেমনি লাফ দিয়ে পাথর ডিঙিয়ে হঠাৎ মোড় নিয়ে পাহাড়ের অন্যদিক দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

এবার তাঁর লেখা থেকে ক্রিয়াপদের সাধুরূপ-যুক্ত একটি বিস্ময়কর বর্ণনা উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য শেষ করে আনছি। বর্ণনাটি কোণার্কমন্দিরের। ভাষার সুগম্ভীর শব্দসঙ্গীতে সিন্ধুতরঙ্গের মতো ছন্দের অবিরাম ওঠা-পড়ার তালে তালে, কোণার্কমন্দিরের প্রাচীন পাথরের ছন্দোময় রূপটি কী আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে! তার গম্ভীর প্রাণস্পন্দনটি মৃদঙ্গধ্বনির মতো আমাদের হৃৎপিণ্ডে এসে বাজছে :

পাথর বাজিতেছে মৃদঙ্গের মন্দ্রধ্বনে, পাথর চলিয়াছে তেজীয়ান অশ্বের মতো বেগে রথ টানিয়া, উর্বর পাথর ফুটিয়া উঠিয়াছে নিরন্তর-পুষ্পিত কুঞ্জলতার মতো শ্যাম-সুন্দর আলিঙ্গনের সহস্র বন্ধে চারিদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই শব্দায়মান, চলায়মান উর্বরতার চিত্রবিচিত্র শৃঙ্গারবেশের চূড়ায়, শোভা পাইতেছে কোণার্কের দ্বাদশ-শত শিল্পীর মানসশতদল— সকল গোপনতার সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন, নির্ভীক, সতেজ, আলোকের দিকে উন্মুখ।

—পথে বিপথে : সিন্ধুতীরে : গমনাগমন : পৃ ১০৯

এ একেবারে ক্লাসিক। অতি উচ্চাঙ্গের প্রাচীন শিল্পকলা। সমস্ত বাংলা সাহিত্যে বাণীর এই অপূর্ব ভাস্কর্যকর্মের তুলনা নেই। অবনীন্দ্রনাথ এখানে অদ্বিতীয় রূপদক্ষ,— ভারতশিল্পের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তির অমর দ্বাদশ-শত শিল্পীর যোগ্যতম প্রতিনিধি। তাঁর এ-সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা স্তম্ভিত হই।

অথচ তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মধ্যে এই একটিবার মাত্র আমরা তাঁকে প্রাচীন স্থাপত্যলোকের গৌরবময় শিল্পচূড়ায় অমর ভাস্কর-রূপে দাঁড়াতে দেখতে পাই, তারপর আবার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের পরিচিত জগতে। প্রথম জীবনে একবার তিনি গিয়েছিলেন প্রাচীন 'রাজকাহিনী'র দেশে, কিন্তু সে ইতিহাসের জগৎ, স্থাপত্য-ভাস্কর্যের নয়। তারপরে তাঁর শেষ জীবনে তাঁর সঙ্গে কতবারই তো দেখা হয়েছে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে, 'ঘরোয়া'য় : সেই পরিচিত মানুষটি; আলবোলার নলটি হাতে ধ'রে গল্প করছেন আসর জমিয়ে : মজলিশি মন, শৌখিন মেজাজ, কথা বলার সরস লৌকিক ঢঙ : বলছেন, 'নবাব ছেড়ে দাও, আমি নিজেও যে নবাবি করেছি এককালে।' তাঁর মনে ভেসে আসে কত স্মৃতির রেশ : জোড়াসাঁকোর বাড়িতে সেই দিন-বদলের পালা, কত উৎসব-আলোর রাত, কত সুখদুঃখের মেলা, চেনা-অচেনা কত মুখের ভিড়। সেই সঙ্গে মন চ'লে যায় অনেক দূরে— ছেলেবেলার সেই দিনগুলিতে, চোখে ভাসে সাবেক কালের রূপ, একটি বর্ষাসন্ধ্যা, দাসীদের 'পিদিম' জ্বালানো, কানে ভেসে আসে পদ্ম দাসীর ছড়া-কাটার সুর। কত বড়ো শিল্পীর মন : জ্বলে ওঠে কল্পনার আলো, স্মৃতি হয়ে ওঠে ছবি, ছবি হয়ে ওঠে কথা, কথা হয়ে ওঠে হাজার-বাতি-জ্বালা অপরূপ রূপকথা।

# কথক অবনীন্দ্রনাথ

অমলেন্দু বসু

কথনশিল্পের প্রবাহ কত পুরনো ইতিহাসে তার কোনো নির্ভরযোগ্য নির্দেশ পাওয়া অসাধ্য, কিন্তু কাহিনীকথনের ও কাহিনীশ্রবণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের অতি পুরাতন আকাঙ্ক্ষা, আর বিশেষতঃ যে-কালে সাধারণ্যে পুস্তকাশ্রিত বিদ্যার প্রচলন ছিল না, বস্তুতঃ মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের এবং বহুলপ্রচলনের পূর্বে যে-কালে শ্রুতির সাহায্যেই স্মৃতিধর হওয়ার রেওয়াজ ছিল, তখন যে কথকতার প্রচলন বহুব্যাপ্ত ছিল সে-অনুমানে সংশয়ী হওয়া সম্ভব নয়। হাটে গঞ্জে বন্দরে, দূর দূরান্তরের রাস্তায়, সরাইখানায় ধর্মশালায় পিপল গাছতলায়, ব্যবসায়ীদের ও পথিকদের অন্য আর কোন্ উপায় ছিল অবসর বিনোদনের, কাহিনীশ্রবণ ছাড়া ? কিন্তু যখন মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন হ'ল, অসংখ্য গল্পের বই বেরিয়ে গেল বাজারে, তখনো কাহিনী-কথনের প্রথা ক্ষীণপ্রভব হয়ে গেল বটে কিন্তু অদৃশ্য হ'ল না। হয়তো হবে ভবিষ্যতে যখন টেলিভিশন ও টেপ-রেকর্ডের প্রাধান্যে মুদ্রিত পুস্তক প্রায় বাতিল হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই অনেক দেশে— এমন কি বাঙলা দেশেও— কাহিনীকথনের আর সে প্রচলন নেই যা আমারও বাল্যবয়সে আমি দেখেছি। বর্ষামুখর রাত্রে অথবা শীতশিহরিত সন্ধ্যায়, গ্রাম্যকুটিরে, নৌকায় ( বিশেষতঃ পূর্ববঙ্গে গহনার নৌকা নামে যে সব সওয়ারী নৌকা চল্‌তি ছিল ) অথবা শহরের দরদালানেও আমরা কাহিনীকথকের কাছে গল্প শুনেছি ঘণ্টার পরে ঘণ্টা, রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে। যে-বর্ষীয়সী দাসীর মুখে আমি এসব কাহিনী বেশি শুনেছি, তিনি ছিলেন শ্রীহট্ট জেলা-নিবাসী, তিনি কাহিনীগুলিকে বলতেন পরস্তাব। পরস্তাব স্পষ্টতঃ প্রস্তাব অথবা প্রস্তাবনা শব্দের প্রাকৃত রূপ, কিন্তু কেন যে কথাটি এই বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত হ'ত তা জানি নে। কেউ কেউ বলতেন 'পড়ন কথা।' পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'র' ও 'ড়'য়ের প্রভেদ লুপ্ত সে কথা সবাই জানেন— অবনীন্দ্রনাথের 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থের ৩-৪ পৃষ্ঠায় তাড়-জাত ব্যঞ্জনধ্বনির সম্পূর্ণ অবলুপ্তির চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়— সুতরাং 'পরন কথা' না 'পড়ন কথা' তা আমি বলতে অপারগ, আর কথাটির কী মানে ( বানান ও উচ্চারণ যাই হোক-না কেন ) তাও আমার জানা নেই, কিন্তু বাল্যকালে অনেক 'পরস্তাব' অনেক "পড়ন কথা" শোনার পুলকিত সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

বাল্যকালে পেশাদারী কথকতাও শুনেছি। সচরাচর কোনো যাজক ব্রাহ্মণ ( কখনো-সখনো অব্রাহ্মণকেও এ কার্যে আহূত হতে দেখেছি ব'লে স্মরণ হয় ) মাঝারি রকমের আসরে বসে হিন্দুশাস্ত্রীয় কাহিনী ব'লে যেতেন— রামায়ণ, মহাভারত, নানা পুরাণের কাহিনী। কাহিনীকথনে নানারকম পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি। কথকঠাকুর কখনো বা ব'লে যেতেন একটানা গদ্যছন্দে, মাঝে-মধ্যে হয়তো বাক্যাংশগুলিতে মধ্যমিলের ক্ষণিক দ্যুতি প্রকাশ পেত। কখনো বা প্রচুর কথোপকথন ঢুকিয়ে দিতেন কথনপ্রবাহের মধ্যে। কখনো বলার ভঙ্গী হত অতিশয় নাটুকে ( সমসাময়িক বাঙলা দেশে যাত্রাগানের বিস্তার প্রবল ছিল ), কখনো বা কথক গান গেয়ে উঠতেন অথবা পয়ার বা লাচাড়ি ছন্দে কথনকারুতে বৈচিত্র্য আনতেন। কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনি, অঙ্গভঙ্গী ও করমুদ্রা, ঘূর্ণিত নয়ন ও মুখমণ্ডলপেশীর চালনা, এ সব কিছুর সাহায্যে কাহিনীকথনে বৈচিত্র্য ও উত্তেজনার সঞ্চারে কথকের ত্রুটি ছিল না। কিন্তু পুরাণকথকতা প্রধানতঃ ধর্মোদ্দেশ্যপরায়ণ ছিল ব'লে

তাতে গল্প বলার স্বাধীনতা ছিল কম। এ হেন কথকতা এখনো বাঙলা দেশে চলে, তবে আধুনিক কায়দায়— রেডিয়োর মাধ্যমে অথবা শৌখিন ধর্মার্থীদের জলসায় মাইক্-কণ্ঠ কথকতা। অপরপক্ষে যে-পরস্তাব অথবা পড়ন কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, যে-কথনকারু আজ প্রায় লোপ পেয়েই গেছে তা ছিল একেবারেই উদ্দেশ্যরহিত, নিছক গল্প বলার ও গল্প শোনার তাগিদেই সে-কারু জনপ্রিয় হয়েছিল সমাজে, তা ছিল খাঁটি কাহিনীকথনের ধারা। এ ধারায় কথকের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, গল্পের কোনো অবশ্য-পালনীয় বাঁধুনিতে তিনি আবদ্ধ থাকতেন না। যখন যেমন শ্রোতা তখন তেমন হ'ত গল্প বলার ঢং। এই সাবলীল কথনশৈলীর কয়েকটি দৃষ্টান্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনায় লক্ষ্য করুন—

ঢুলুলী শুধোলে— "তারপর ?"

— "পরের কথা একমাস পরে হলে শুনবা।" বলে চাঁইবুড়ো পুঁথি তুলে প্রস্থান— "ঐ সূর্পণখা এলো" বলে।

ব্যস্ আর ঢুলুলী কোথা আছে ? কাবুলীকে জাপ্‌টে ধরে কান্না আর থেম্‌চুনী !'

কাবুলীর দ্রুত পলায়ন। সভাত্যাগ 'কি হ'ল', 'কি হল' বলে আর সকলের। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ২৭

চাঁইবুড়ো কথা আরম্ভ করতে যান, ঢুলুলী বলে উঠল— "ও আমি রাঁধুনী-ঠাকুরের রামায়ণে শুনে নিয়েছি।"

কাবুলী তাকে দাবড়ি দিয়ে বল্লে— "সে হল জয়রামের রামায়ণ। এ হচ্ছে পোড়ালঙ্কার পুঁথি। বসে' শোন্ থির হয়ে।"

"হুম্" বলে বুড়ো আরম্ভ করলে কথা। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ২৭-২৮

চাঁইবুড়ো পাকা কথক ; আগের দিনের আসর দেখেই বুঝেছিলেন 'মহিষ বধ' 'বালি বধ' হবে না। শুনে ভক্তগণ কিছু পাতলা হয়েছেন, তাই হনুমানকে পিতৃলোকের পঙ্ককুণ্ডে ফেলে, শেষ কি হল শ্রোতাদের বুঝতে না দিয়েই— "হনুমান কি কল্ল, শুনিবা কল্য"— বলে পাঠ বন্ধ করেছিলেন। লোকে ভাবছে কতক্ষণে কল্য আসে ; ঘড়ি যেন পা টিপে চলে, কল্য আর আসে না ; যদি বা এলো তো লোক এসে ফিরে গেল। "শনি মঙ্গল পুঁথির শয়ন, অতএব মঙ্গল ঊর্দ্ধে বুধে পা'র ধূলো দেবেন অনুগ্রহ করে ভক্তগণ ঐ দিন— সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় পুঁথি-জাগরণ। ১৯শে চৈত্র, ১লা এপ্রিল, চৈত্র সুদি ৮।৭।১৯ গতে গো সহস্রী যোগে শ্রবণ ফল— স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি সম্ভোগ।"

বুধবারে আসরে লোক আর ধরেনা। চাঁইবুড়ো মৃদুমন্দ হাস্য করে অতি নম্রস্বরে পাঠ আরম্ভ করলেন।— মারুতির পুঁথি, পৃ ৫৭-৫৮

কথনশৈলীর এই সাবলীল শক্তিতে গড়ে উঠেছে কথক ও শ্রোতার অন্তরঙ্গতা। কোনো পূর্বনির্ধারিত কাহিনীর বাঁধা সড়কে কথক চলতে রাজি নন। রাম লক্ষ্মণ রাবণ, সুগ্রীব অঙ্গদ হনুমান, হারুনল রসিদ্ জাফর সিন্দবাদ—এ হেন কয়েকটি সুপরিচিত নামের ব্যবহারে পাঠকচিত্তে stock response মামুলি সায় অবশ্য মিলবে সেকথা চতুর কথকের অজানা নেই। ঐটুকু সায় তাঁর পুঁজি, তারপরে সুদক্ষ বণিকের মতো ঐ পুঁজিটুকুকে নানাভাবে খাটিয়ে বাড়িয়ে তোলেন অশেষ ঐশ্বর্যে। বে-লাগাম কল্পনার আবেগে ও নিঃসংকোচ প্রাকৃতভাষার প্রয়োগে তিনি ব'লে চলেন তাঁর কাহিনী, শুদ্ধ বলার আনন্দে, শুদ্ধ শোনাবার খুশিতে।

২

কথনকারু কি আজ বাঙলা দেশ থেকে লোপ পেয়েছে ? আমি মধ্যজীবনে প্রবাসী বাঙালী, খণ্ডিত বিপর্যস্ত বাঙলায় আজো কথনকারুর ধারা অব্যাহত কিনা জানি নে। 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।' কথকতা সে-রঙ্গের অন্যতম কী ? অক্টোপাসের মতো চারিদিকে ছড়ানো আর অক্টোপাসের মতোই কুদর্শন কলকাতা শহরে আর কথকতা নেই, "আষাঢ়ে গল্প" নেই বলে'ই মনে হচ্ছে। তবুও আশা করি সমগ্র দেশ থেকেই

অন্তর্হিত হয়নি কথকতার ধারা। আশা করি, কেননা কথকতার ধারায় বাঙালীর লৌকিক ঐতিহ্যের এক অনন্য গৌরব। আশা অন্য কারণেও করি কেননা আজকের আর ভবিষ্যতের বাঙালী ছেলেমেয়ের কাছে যদি কথকতার ধারা একেবারেই অপরিচিত হয়ে পড়ে তাহলে বাঙলা সাহিত্যের একটি অতি উজ্জ্বল ও আনন্দঘন অংশ তাদের কাছে নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ হয়ে' পড়বে—শ্রেষ্ঠ বাঙালী কথক অবন ঠাকুরের লেখার মস্ত একটা অংশ তাদের কাছে নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। লেখকে ও পাঠকে সে-অসাম্য হবে পাঠকেরই পক্ষে শোকাবহ।

অবনীন্দ্রনাথের মহত্ত্ব অবশ্য কথকতার একতারাতেই নয়, বহুশিল্পপারংগমতার বিচিত্রবীণায়। যদি তাঁর অধিকখ্যাত শিল্প-নিপুণতার কথা ছেড়েও দিই (অর্থাৎ চিত্রশিল্পের প্রসঙ্গ না-ও তুলি), শুধু তাঁর রচনা শিল্পের কথাই চিন্তা করি, তা হলেও দেখতে পাব লেখক অবনীন্দ্রনাথের বিষয়বস্তু কত বহুবর্ণ, তাঁর রচনাশৈলী কত অনায়াসে বিষয়বস্তুর সহধর্মিণী! ঐতিহাসিক কাহিনীর শিল্পরূপ অনুভূতিঘন যে-সমৃদ্ধি লাভ করেছে রাজকাহিনীতে তার তুলনা বাঙলা বা উত্তর ভারতীয় কোনো সাহিত্যেই নেই, ইংরেজি সাহিত্যেও দুর্লভ। 'পথে বিপথে' সমকালীন পরিবেশে খুশ্‌খেয়ালী রচনার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'নালকে' পাই জাতকের কাল; 'আলোর ফুলকি'তে নিসর্গ-দর্শনের সূক্ষ্মানুভূতিশীল গদ্যকাব্য; 'বুড়ো আংলা'তে শিশুকল্পনা ও শৈশবমর্মী বয়স্ককল্পনা সমানভাবে উদ্দীপিত, তাতে হাঁস ছেলে ও শেয়ালের কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে বিশ্বসৃষ্টির কাহিনী, পাহাড়ী উপাখ্যান, আসামী বুরুঞ্জি। 'ভূতপত্‌রীর দেশে' ফ্যান্‌টাসি বা অতি-কল্পনার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। সর্বত্রই অবন ঠাকুর উপকথাকার, গল্পবলিয়ে, অথচ তাঁর গল্পের কথাবস্তু কখনো পুনরাবৃত্ত হয় নি। অসীম ঐশ্বর্যবান কল্পনার সঙ্গে মিলেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর তার সঙ্গে আরো মিলেছে বহুবর্ণাঢ্য রচনাশৈলী যাতে আমি ইন্দ্রধনুর মত অন্ততঃ ছয় সাতটি বিভিন্ন বর্ণ লক্ষ্য করতে পারি। ইংরেজ কবি-সমালোচক ড্রাইডেন কবি চসার্‌-এর প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেছিলেন, Here's God's plenty!— অন্নপূর্ণার সে-ভাণ্ডার অবন ঠাকুরের রচনাবলীতে, সেখানে অফুরন্ত বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য। কিন্তু যেন এ-প্রাচুর্যও প্রচুর নয়! ঐশ্বর্যবান ও বিচিত্র এই কাহিনীর জগতে যেন অবনীন্দ্রনাথের সৃজন-প্রেরণা অবসন্ন ও ক্ষান্ত হল না, প্রবীণ বয়সে নিযুক্ত হল নতুনতর কথাবস্তুর আর কল্পনার আর শৈলীর সন্ধানে। অবনীন্দ্রনাথ হলেন কথক অবন ঠাকুর। 'রাজকাহিনী' ও 'বুড়ো আংলা'র লেখক শুরু করলেন 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'। শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের বিচিত্রবীণায় এ-কথকতা একটিমাত্রই তার কিন্তু সে-তার অবজ্ঞেয় নয়, সে-তারে ও অন্যান্য তারে স্বরের নিখুঁত সংগতি বিদ্যমান।

কথকতার আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন কোথা থেকে?

শিল্পকর্মের উৎসসন্ধান সমালোচনার কিছু একটা মহৎ উদ্দেশ্য নয়, সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য শিল্পের রসাস্বাদন। যে-ঔৎসুক্য যে-তথ্যসন্ধান এই প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয় বা সে-উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত ঘটায় অথবা এমন কি সে-উদ্দেশ্যের সহায়তা করে না, সে-ঔৎসুক্যের সে-তথ্যের অন্য যে-মূল্যই থাক না কেন কোনো শৈল্পিক সার্থকতা নেই, সৎ সমালোচকের দৃষ্টিগোচরে সে-তথ্য নির্মূল্য। তবে অবন ঠাকুরের কথনপরায়ণতা আলোচনা করতে গিয়ে এ-পরায়ণতার উৎসসন্ধান নিতান্ত অসার্থক নয়। 'পড়ন কথা' বা লৌকিক কথকতা বাঙলার শিশু সাহিত্যে স্থান পেয়েছে সম্ভবতঃ প্রায় একশো বছর যাবত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সুকৌশলে উপকথার ভাষা ও কথনছন্দ স্বীয় কথনকারুতে আমদানি করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর এবং সুখলতা রাওয়ের গল্পের বইগুলিতে, শান্তা ও সীতা দেবীর হিন্দুস্থানী উপকথায়, তা ছাড়া আরো

গুটিকয়েক বইয়ে ব্যবহৃত উপকথার বাক্-ভঙ্গি কৃতিত্বময়, কিন্তু অবন ঠাকুরের উপকথায় ও কথকতায় যে-গুণ তা'কে বলব কৃতিত্বেরও অধিক কেননা সে-গুণ নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির গুণ। কিন্তু 'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' কি কেবল শিশুরই জন্য? আমি অন্ততঃ একজন বাঙালী পাঠকের কথা জানি যার শৈশব আজ প্রায় অর্ধ শতাব্দীর দূরত্বে ধূসর তবুও যার প্রৌঢ় চিত্ত এই বই দুখানার দুর্জয় আহ্বানে অসংকোচে সাড়া দেয়। এমন প্রৌঢ় বাঙালী পাঠক সমাজে অবশ্যই বিরল নয়। বয়সের কোনো সীমানা নেই অবন ঠাকুরের কথকতায় আনন্দ পাবার জন্য। ছয় থেকে ষাট, আট থেকে আশী, সব বয়সেই এ-কথকতায় আনন্দ পাওয়া যেতে পারে শুধু যদি পাঠকের চিত্তে নমনীয় সংবেদনা থেকে থাকে। তা ছাড়া 'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথিতে' যে-অর্থঘনতা, যে-সূক্ষ্ম অর্থ-বৈচিত্র্য, যে-wit বিদ্যমান তাদের মাহাত্ম্যে এ-বইগুলি শিশুসাহিত্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁচেছে সার্বজনিক সাহিত্যের স্তরে, প্রাকৃত উপকথা থেকে শালীন সাহিত্যের স্তরে। অতএব অবন ঠাকুরের কথকতার উৎসসন্ধান নিরর্থক নয়। উৎসের জ্ঞানে এই কথকতা-শিল্পে আমাদের আনন্দ আরো নিবিড় হওয়া সম্ভব। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় অবনীন্দ্রনাথের কোনো তথ্যপরায়ণ জীবনী নেই, তাঁর অভিজ্ঞতার ও কর্মের কোনো বিশদ কালপঞ্জী নেই, কোন্ ধরণের বই তিনি পড়েছিলেন ও পড়তে ভালোবাসতেন, সে-সব তথ্য সম্ভবতঃ তাঁর এককালীন নিকটবর্তীরা জানেন কিন্তু সাধারণ্যে তা' অজ্ঞাত। অতএব আজকের আলোচক শুধু অনুমানেই নিরস্ত হবেন। শৈশবে যে-দাসীর হেফাজতে ছিলেন সেই পদ্মদাসীর কাছে শুনেছেন কি 'পড়ন কথা'? অথবা মনোহর সিং দরোয়ান বা সমসের সিং কোচোয়ানের কাছে? যাকে বলে teen-age, সেই দশের কোঠার সহজগ্রাহী বয়সকালে মিশেছেন কাদের সঙ্গে, গেছেন কোথায়, দেখেছেন কী? গঙ্গার ঘাটে যে-সব স্টীম্‌লঞ্চ অথবা নৌকা বাঁধা থাকত (আজো থাকে), সেগুলির খালাসি ও মাল্লার সঙ্গে মিশতেন কি, শুনেছেন কি তাদের কাছে মুসলমানী কিস্‌সা, উত্তরভারতীয় দস্তান? কোনো কোনো সময়ে তাঁর সঙ্গী ছিল কি বাবুর্চি খানশামা হুঁকোবরদার উড়ে বেহারা? অথবা কাছারির নায়েব বরকন্দাজ লাঠিয়াল? সিন্ধবাদ হারুনল রসিদকে জেনেছেন কি গল্পের আড্ডায় অথবা বইয়ের পাতায়? সে বই কি বটতলার 'দোভাষী সাহিত্যের' দু-চারখানা কহানী কিস্‌সা— আমীর হমজা, গুলেবকাওলী·আর ফসানা আজায়ব— যেসব উপকথা অর্ধশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের চিত্তে আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে দীর্ঘকাল? আর চাঁইবুড়োর নকল কি কেউ ছিলেন সত্যিকারের জীবনে, আর খাতাঞ্চি মশায়ের?

এসব কৌতূহল চরিতার্থ না হলেও অবন ঠাকুরের কথকতায় আনন্দলাভের অসুবিধা হয় না। দায়িত্বচেতন সৎ সমালোচকের শুধু এ কথা বারংবার মনে হবে যে শালীন সাহিত্যে লৌকিক কথকতার রূপায়ণ বাঙলায় (বোধ হয় যে-কোনো ভাষাতেই) নিতান্তই অভিনব, সুতরাং অবনীন্দ্রনাথের রচনার সম্পূর্ণ মূল্যায়নের পূর্বে জানা দরকার (অথচ সে কথা এখন জানা যাচ্ছে না) তাঁর কথকতা-শৈলীর পিছনে সাহিত্যিক ঐতিহ্য কোথায়, কতটুকু?

৩

কথকতার দুনিয়ায় চাঁইবুড়ো কথকপ্রবর। তাঁর স্বনামেই একখানা বই হয়েছে—'চাঁইবুড়োর পুঁথি'। অন্য বই 'মারুতির পুঁথি'রও কথক মহামতি চাঁইবুড়ো, যদিচ মাঝে মাঝে শ্রীরামচন্দ্রের নাম স্মরণান্তর তিনি

হাওয়া হয়ে যান আর তখন চাংড়া ঠাকরুনকে শুধোলে জানা যায় যে বুড়ো গেছেন রামরাজাতলায়, সেখান থেকে রামকৃষ্ণ মঠের দিকে, সেখান থেকে শ্রীরামপুরে, অতঃপর রামপুরহাটে, অবশেষে রামকেষ্টপুর ঘুরে এসে আবার ব্যাসাসনে বসেন পুঁথিপাঠ করতে। 'রং-বেরং' নামধেয় বইয়ের তিনটে গল্পে চাঁইবুড়ো হাজির—'চাঁইদাদার গল্প' 'রতনমালার বিয়ে' 'বহিত্র'। চাঁইবুড়ো ছাড়া আর যে-খাতাঞ্চিমশায় মাঝে মাঝে দেখা দেন— চাঁইদাদারই মাসতুতো ভাই অথবা পিসতুতো সম্বন্ধী কিনা জানি নে— তিনি যখন ইচ্ছাময়ী বটিকা গালে পুরে 'ইস্‌চামই তোমারই কিবৃপা' ব'লে জমিদারী সেরেস্তার ফর্দ নিয়ে বসেন তখন পড়ন কথার জগৎটা উপকথার জগৎ থেকে নেমে আসে যে-জগতে তাকে কি বলব অবকথার জগৎ? সে-জগতে কুস্‌তুনতুনিয়ার এক সদাগর আশ্চর্য শকুনবিদ্যার কৃপায় আপন জরুর হাত থেকে প্রাণরক্ষা পেয়েছিল, সে-বিদ্যার মালিক ছিল এক নাম-না-জানা ফরাসী পণ্ডিত আর ভাগ্যবান ভারতবর্ষে সে-আশ্চর্য বিদ্যা অর্শেছে (খাতাঞ্চি মশায়ের প্রমুখাৎ এসব তথ্য আমরা জানতে পেরেছি) এক অবনীবাবুতে আর খাতাঞ্চির টেম্‌পোরারি নফর শ্রীখুদিরাম বিশ্বাসে! অবনীবাবুর জুটিটি ভালো! সে-আশ্চর্য বিদ্যা না আছে রবিবাবুর না আছে এমন কি তাঁর ইস্কুলমাস্টার জগদানন্দ বাবুর, আর এ-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নামোল্লেখ মানে ধান ভানতে শিবের গীত! শকুনবিদ্যার প্রায় অনন্য মালিক খুদিরাম জেনেছে মোরগের গাওয়া গজলের ভাষাটা কী?

> শুন্। গুল্‌মুর্গা ফুল বনের বন মোরগ,
> ফজিরে উঠি, খেলাই রুটি, পালক মুঠি চুজারে রোজ্-ব-রোজ্। —রং-বেরং, পৃ ৪৯

মাত্রানির্ভর এ-ছন্দের ফার্সী শব্দগুলিতে সত্যেন দত্ত ও নজরুল ইসলামকে মনে পড়ে। শকুন বিদ্যার প্রসাদাৎ গোবেচারি খুদিরাম আবৃত্তি ক'রে দিল অনেকগুলি "উদরু" গজল, আর ইচ্ছাময়ী বটিকার কৃপায় উর্দু শায়েরী আমরা আরো জানতে পারি।

> গর্দবাদের ওর্দানশীল কোর্মা ক্ষেতের খোসবু
> জিলদে ধরা বুলবুলির গান থুঞ্চে ঢাকা বস্ত। —রং-বেরং, পৃ ৯৩

পোর্টম্যান্টো শব্দরাজির এমন নিখুঁত নন্‌সেন্‌স্ অবন ঠাকুর ছাড়া আর লিখতে পারতেন সুকুমার রায়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর অবশ্য লিউইস্ ক্যারল্। কিন্তু উর্দুবাহী গজলে নন্‌সেন্‌স্ ছাড়া অন্য সেন্‌স্‌ও আছে। সেন্‌স্ মানে যদি ইন্দ্রিয় তা হ'লে শ্রবণেন্দ্রিয় শিহরিত হয় গুণগুণানো এই গজলে আর রসনেন্দ্রিয় নিশ্চয় নিরাসক্ত থাকতে পারে না:

> নুন মরিচ গলদা চিংড়ি
> ঝোল কাবাবি দোলমা
> কোর্মাবাগের মুর্গাদারি
> পিক কাবাবি খোরমা
> মুর্মা কাজল রাতে রাতে
> গরমাগরম টুকরা
> গুল মুর্গার খুনখারাবি
> বখরেদারি বখরা। —রং-বেরং, পৃ ৯৪

এ হেন খাদ্যতালিকার জুড়ি মিলবে অন্যত্র।—

শির বিরিঞ্জি ফালুদা আর গোলাপী সরবৎ,
কালিয়া কোর্মা কোফ্‌তা কাবাব দল্লকৎ।
আখরোট মনাক্কা কিসমিস বাদাম,
খোরমা ও খেজুর কত ভাল ভাল আম।
শিরা ও মালাই ফিরনী চৌরসের দুধ,
চিনি মিছরি নিয়মিত খাইনু বহুৎ। —একে তিন তিনে এক, পৃ ১৭

গলদা চিংড়ি কোফ্‌তা কাবাব ইত্যাদি আমিষ ভোজ্য যদি কোনো বৈষ্ণবপ্রবরের রুচিসংগত না হয় তা হলেও অবন কথকের রাজ্যে অন্য ভোজ্য সামগ্রী আছে যা আজকালকার রেলস্টেশনের হিন্দী নামধারী 'শাক-উপাহার গৃহে' মিলবে না। শ্রীমান হনুমান যখন 'সুষেণ বৈদ্যপীঠে' পৌঁছলেন তখন 'ভাই ভাই' ব'লে ধন্বন্তরিপুত্র পবননন্দনে দেন শত চুম্বন আর ভৃত্যকে ডেকে বলেন—

ভাগ্য বলে আইলেন পবননন্দন, ভালোমত প্রস্তুত কর অন্ন ব্যঞ্জন।
লুচি মালপোয়া তেলে ঘৃতেতে ছাঁকিয়া, বার্তাকু ভাজহ তাহে তিল বড়ি দিয়া।
চোঁয়া চোঁয়া করে ভাজ উচ্ছে কড়কড়ি, গুড় চিনি একত্রেতে তাহে ফুলবড়ি।
অড়হড় ডাল আর মুগের সাউলী, সুপক্ক মোচাঘণ্ট কদলীর আউলি।
কুষ্মাণ্ডের অম্বল তাহে দোবরা চিনি, নারিকেল পুর ভাজো— পথ্য করবেন ইনি।
পাকশাল হৈতে আইল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, হনু সঙ্গে বৈদ্যরাজ করিল ভোজন।
ভোজন করিয়া দোঁহে কৈল আচমন, কর্পূর তাম্বুল নিল মুখের শোধন। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৩৫-৩৬

উর্দু শব্দের প্রয়োগ কেবল নন্‌সেন্স্‌ ও ভোজনবিলাসের জন্য নয়, কথকতায় একটা বিশেষ সুরসঞ্চারের জন্যও। যে-উর্দু শায়েরী উপরে উল্লেখ করেছি তার সগোত্র ( কিন্তু ঈশ্বর জানেন এ-গীতের অর্থ কি ) মিলবে সিন্ধবাদের গজল গীতে—

খার হাজরতি কররে তক দেলসে খাটকতা যায়েগা
মোরগে বেছমেল কি তারেহ লাসা তড়প্তা যায়েগা
মর্‌ গিয়া হোঁ মেয় দুনিয়াকি হাদ্দরাত দিদার মে
কররে তর্ক মেরাজ কী রাহ তাকতা যায়েগা! —রং-বেরং, পৃ ১১

এখানে কতকগুলি উর্দু ও ভুয়া-উর্দু শব্দের সমাবেশ ও উর্দু গজলের ঢং। অবন ঠাকুর আরবী ফারসী উর্দু জানতেন কিনা, জানলে কতটা জানতেন, সে তথ্য আমার অজ্ঞাত ; কিন্তু উর্দু-ঘেঁষা শব্দচয়ন ( সর্বত্র নয়, রচনা-বিশেষে ) তাঁর রচনাশৈলীর একটি প্রধান আঙ্গিক। ভারতচন্দ্রের পর থেকে বাঙলায় কবিগানের সঙ্গে যে-মুসলমানী পুঁথিসাহিত্য প্রচলিত হয়েছিল, বটতলায় ছাপা সে-সব সস্তা পুঁথি সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালী উদাসীন এবং কুঞ্চিতনাসা, অথচ সে-সব পুঁথিপাঠে ও শ্রবণে অসংখ্য মাঝি-মাল্লা-ব্যাপারী-মজুরের শ্রমহরণ হয়েছে দুই শতাব্দী যাবৎ। ইদানীং এ-সাহিত্যের নামকরণ হয়েছে 'দোভাষী সাহিত্য': 'দোভাষী পুঁথিতে বাঙলার সঙ্গে প্রচুর আরবী-পারসী শব্দ ব্যবহৃত হত বলে আমরা এই নামকরণ করেছি'

( 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ ২২ )। দোভাষী শব্দভাণ্ডারের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'ল ছহি জৈগুনের পুঁথি থেকে—

সালাম করিয়া বলে তামাম সরদার।
তক্‌ছির করহ মাফ আমা সবাকার॥
লড়িয়া তোমার সাথে না হইনু ফতে।
আখেরে হইল দায় জান বাঁচাইতে॥
এখন তোমার পানা লিয়াছি আসিয়া।
আমা সবাকার তরে রাখ নেওয়াজিয়া॥

এই দোভাষী শব্দচয়ন ও ঢিলেঢালা পয়ার অবন ঠাকুর এত সহজে আত্মসাৎ করেছেন যে মনে হয় যেন সারাজীবন তিনি এই কিস্‌সা-সাহিত্যের আবহাওয়াতেই মানুষ। নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি যদি কোনো দোভাষী পুঁথিতে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তা হলে ওগুলিকে যে কেউ প্রক্ষিপ্ত মনে করবেন এমন আশঙ্কা হয় না—

বুড়ার খাতিরে আমি ঠাহরি কম জোর।
ছওয়ার করিয়াছিনু গর্দান উপর॥
যখন এশারা করি নামিতে এহায়।
দুই পায়ে নেপটিয়া ধরিল গলায়॥
এয়ছা গলা দেবে ধরে পাও লাগাইয়া।
আমি বলি দম বুঝি গেল নেকালিয়া॥
চাম বরাবর পাঁও আছিল এহার।
তছমার মাফিক ডালে গলেতে আমার॥
জোর করি বুড়া পাঁও লাগায়ে গর্দানে।
বেহোঁস করিয়া মোরে গেরায় জমিনে॥ —রং-বেরং, পৃ ১৪

কিস্‌সা-রচনার কিছু কিছু বিশিষ্ট আঙ্গিকও আছে যথা, 'তুড়ি', 'জুড়ি', গজল গীত, গীত, জবাব গীত ইত্যাদি। সে-সমস্তই অবন ঠাকুরে হুবহু অনুকৃত হয়েছে। গ্রীক নাটকের Stichomythiaর মতো পয়ার ছন্দে কথোপকথন-আঙ্গিক অবলম্বিত হয়েছে, এক ছত্র বলছে থালাসী, পরের ছত্র কাঠুরিয়া—

১। সোনা নয় সোনা নয় মানিকের মুরতি।
২। কভু বনে পয়দা হয় মানিক আর মোতি॥
৩। শুন ভাই নির্বাস হয় বন মানুষ।
৪। দুর দুর নাই তেরা কোন হুস গুস্॥ —রং-বেরং পৃ ১২

উর্দু শব্দচয়নের সঙ্গে ছত্রগুলিতে মধ্যমিলের আমদানী হওয়ায় রচনার স্বরবৈচিত্র্য বেড়েছে—

দেখহে থালাসিগণ কইরা খুব নিরীক্ষণ
বিপদে পইরাছে জানি হবে কোন্ মোহাজন!
কিবা কোন্ ছওদাগর যেতেছিল ছপর
তুফানে পইরা ডিঙ্গা হৈল তর এইক্ষণ। —রং-বেরং, পৃ ১২

খালাসিগণ, নিরীক্ষণ, মোহাজন, ছওদাগর, ছপর, এইক্ষণ, ইত্যাদি মিল-লাগানো শব্দগুলির উচ্চারণ স্বরান্ত হবে পয়ার পাঠরীতির প্রাচীন ধারানুসারে।

অবন ঠাকুরের উর্দুশব্দবহুল শৈলী সিন্ধবাদ কাহিনীতেই প্রযুক্ত হয়েছে, আর এ-কাহিনী তাঁর লেখায় অনেক কাল থেকেই উঁকিঝুঁকি মেরেছে। পুরনো বই 'ভূতপত্‌রীর দেশ,' সেখানে সিন্ধবাদের আবির্ভাব খুবই নাটুকে পরিস্থিতিতে—

দেখি ছ'টা বেহারা আমার পাল্কিটি নিয়ে বসে আছে,— দেখতে কালো কিচ্‌কিন্দে!

"কে হে বাপু তোমরা আমার পাল্কিটি নিয়ে?"

"বাবুজি, আমরা তোমার পিসির চাকর— কিচ্‌কিন্দে, কাসুন্দে, বাগুন্দে, ঝালুন্দে, মালুন্দে, হারুন্দে।"

"আমার নাম হারুন্দে নয়;— আমি হারুণ-আল্‌-রশীদ, বোগ্দাদের নবাব খাঞ্জা খাঁ জাহান্দার শা বাদশা। এখন হয়ে হারুন্দা।

"একদিন আমি আমার বসরাই-গোলাপবাগ বলে যে বাগান সেখানে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছি, আর গোলাপজলের ফোয়ারার ধারে বসে এই মস্তুর আমার পোষা বুলবুল্ বোস্তাঁর সোনার খাঁচাটা ধুয়ে-মেজে সাফ করছে, এমন সময় সিন্ধবাদ নাবিক সাত সমুদ্দুরের জলে সাতখানা জাহাজ-ডুবি করে এসে হাজির— ভিজে কাপড়ে দু হাতে আমাকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে।

আমি সিন্ধবাদের হাত ধরে উঠিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে টুলে বসিয়ে বল্লেম— "সিন্ধবাদ, শোনো। জান আমি হারুণ আল্‌-রশীদ, আমার সামনে মিথ্যে কথা বল্লে তোমার মাথা কাটা যাবে জানো!"

সিন্ধবাদ বল্লে— "জানি হুজুর, সেই জন্যেই তো আমার দুঃখু! সব সত্যি বলতে হল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্প সাজাতে পারলুম না।

—ভূত-পত্‌রীর দেশ, পৃ ১৬-২০

ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার নিদর্শন হিসাবে 'ভূতপত্‌রীর দেশ' অনবদ্য আর উৎকলীকৃত সিন্ধবাদ, হারুন অল্ রশীদ মস্তুর সে-কল্পনার তুলনাহীন প্রতিভাস, কিন্তু তবুও এ-সিন্ধবাদে মন ভরে না। এ যেন বড়ই ভদ্রভাষী সিন্ধবাদ, সর্বক্ষণ সে জানে তার শ্রোতা কলকাতাবাসী ভব্য ছেলেমেয়েরা, তার বাক্‌ভঙ্গী চলেছে শালীন সাহিত্যের ছককাটা রাস্তায় সাবধানে। সে-ছককাটা রাস্তা থেকে ছিটকে বেরিয়েছে সে 'সিন্ধবাদ-বিবরণ পদ্যে'। একদা সে কথা বলেছিল নিষ্প্রাণ মার্জিত ভাষায়:

'শুনুন, আমি এবার কি আশ্চর্য কাণ্ড দেখে এসেছি,— এবারে আমি জাহাজ নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেম'।

"সিন্ধবাদ-বিবরণ পদ্যে" সে বলতে লাগল—

আমার নাম হিন্দবাদ নয়— ছন্দবাদ জাহাজি; বোগদাদ হৈল ডেরা আমার। আমার জাহাজগুলা সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর নোনা আর মিঠা জলে চলাচল কৈরা কিঞ্চিৎ জখম হয়েছে, সেই কারণে কিছু মন-পবন কাষ্ঠের পিয়োজনে এদেশে আগমন। হঠাৎ বনের মধ্যে মশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

—রং-বেরং, পৃ ১৪-১৫

সিন্ধবাদ এখন রূপান্তরিত হয়েছে ছন্দবাদে, রক্তমাংসের জাহাজিতে, যে-রকম জাহাজি খিদিরপুরে চাটগাঁয়ে

পাইস্-হোটেলের চ্যাটাই-শয্যায় বসে হুঁকো টানে। এই রূপান্তরের কারণ তার বচনভঙ্গী। কিস্‌সা-সাহিত্যের দোভাষী বাক্-ভঙ্গিতে সিন্ধবাদের মুক্তি, অবন ঠাকুরের কাহিনীকথন জয়যুক্ত।

৪

কত রকমের বাক্-ভঙ্গিই না অবনীন্দ্রনাথ ধরে রেখেছেন তাঁর রচনায়! শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যের স্বচ্ছন্দগামী বাক্‌ধারায় বয়ে চলেছে কতকগুলি গল্প— 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্‌রীর দেশ', 'ক্ষীরের পুতুল', 'একে তিন তিনে এক', সর্বত্রই সে-প্রবাহের কলধ্বনি। কখনো বা মোরাদাবাদী মিনা-কারুর সূক্ষ্ম মিনিয়েচার কাজের মত ছোট কথিকায় ( যথা : 'সাথী' 'খোকাখুকি' ) ফুটে উঠেছে অপরূপ রূপক যার তুলনা মিলতে পারে কেবল রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'য়। সাধারণ প্রবহমান বর্ণনাতেই কত কুশল কারিগরি অথচ কত সহজ—

সকাল থেকে সন্ধ্যে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান, একলাটি। চারিদিকে বড়ো বড়ো দেবদারু আর ঝাউ, এত পুরোনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে ডালে সব সবুজ সেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই। কোথাও ঝুর-ঝুর ক'রে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরণা ঝরছে, তারি একপাশে ব্যাঙেরা ছতরি বেঁধে হাট বসিয়েছে। —আলোর ফুলকি, পৃ ৭৪

আবার কোনো সময় এই গদ্যেই পুরোপুরি লিরিক্-এর ধর্ম এসে পড়ে আবেগ ও কল্পনার ব্যঞ্জনায় :

দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে। কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু আধটু কুয়াশা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথমে আস্তে বললেন, "সাফাই", সোনালী ভাবলে কুঁকড়ো বুঝি হাঁফিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু "আরো আলো চাই" বলে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি তাঁর বুকটা ফেটে গেল, "আলোর ফুল আলোর ফুল, ফু-উ-উ-উল-কি-ই-ই আলো-র-র-র-র"। দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটীরের উপর জ্বলন্ত আগার সাদা ধুঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চলল আস্তে আস্তে। কুঁকড়ো দেখলেন আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তার সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখিটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। —আলোর ফুলকি, পৃ ৪৬

আর একদিন দেখেন হনুমান— অযোধ্যার উপরে রাতের আকাশে উঠেছে চাঁদ, তারা, তার নীচে ঘুরছে, ফিরছে, জ্বলছে, নিভছে— রাশি রাশি জোনাক-পোকার ঝাঁক। বাতাসে লাগছে থেকে থেকে বাঁশীর সুর! দেখতে দেখতে চাঁদ অস্ত গেল। সকালে সূর্য্য উঠলো— কিন্তু যেন কালো একখানা লোহার তাওয়া। তার পর দশ দিন ধরে আর কিছু দেখা যায় না— কেবল ঝড় আর বৃষ্টি, আর তার মধ্যে মধ্যে বাতাসে হু হু কান্নার সুর! কি যেন একটা ঘটে গেল অযোধ্যার দিকে। দশ দিন পরে সূর্য্য উঠলো তেলের মত হলুদ গোলা আকাশে একটি বার— তার পরই লোহার কস্-ধরা কালো মেঘের রথ সূর্য্যের আলো অন্ধকার করে দক্ষিণ মুখে চলে গেল। তার পর আকাশ পরিষ্কার— নীল, হলুদ, আর সোনালী রং-এর পতাকা যেন দেখছি। ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, কোথাও কিছু নেই— হঠাৎ একখানা মেঘ যেন নাক কাটা রক্তমুখী কালো বোকুশী পালিয়ে গেল দক্ষিণ মুখে বাতাস নাকী সুরে ভরে দিয়ে, রক্তবৃষ্টি করতে করতে। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৪৫

গদ্য যদি স্বকীয় গদ্যধর্ম ছেড়ে কাব্যধর্ম গ্রহণ করে তা হলে সে-অবস্থা ভয়াবহ কিনা সে-বিষয়ে প্রশ্ন ওঠা সম্ভব। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে সে প্রশ্ন প্রবল, আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় এতাবৎ সে-প্রশ্নের

উত্থাপন দেখেছি বলে স্মরণ হয় না, কিন্তু উত্থাপন হওয়া উচিত। আপাততঃ এ-সম্বন্ধে আলোচনায় নিযুক্ত হওয়া সম্ভব দেখছি নে, তবুও এটুকু বলা সংগত যে শিল্প হিসাবে পদ্যের চেয়ে গদ্য অনেক বেশি জটিল এবং কঠিন, তার দায়িত্ব বৃহত্তর, তার সম্ভাবনা বিস্তৃততর কেননা গদ্যের যা সহজ ধর্ম তা তো আছেই, তা ছাড়া পদ্যের কাব্যধর্মও তার আয়ত্তে। গদ্যের এই বিস্তৃত রূপদ্যুতি অবনীন্দ্রনাথে প্রকাশ পেয়েছে আশ্চর্য রকমে। উপরে যে দুটি বাক্যস্তবক উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলি গদ্য অথচ লিরিক, অতীব উৎকৃষ্ট লিরিক। কাব্যের প্রাণ ও মেজাজ রচনা-সাজানোর প্রণালীর সঙ্গে ( যথা, গদ্য ও পদ্য ) সমাত্ম নয়। পদ্য যেমন কাব্যরসহীন হওয়া সম্ভব, অপর পক্ষে গদ্যে উদ্ভাসিত হতে পারে কাব্যের অপরূপ রূপ, যেমন হয়েছিল মোনালিসা-সংক্রান্ত পেটার-এর বিখ্যাত স্তবকটিতে। বাংলা গদ্যের ছন্দোবিচার আজো হয় নি যেভাবে ইংরেজি গদ্যের ছন্দোবিশ্লেষণ হয়েছে সেণ্টস্‌বেরির হাতে, কিন্তু অগভীর দৃষ্টিতেও অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে যে-পরিপাটি বা প্যাটার্ন, যে-তাল-ঝোঁক-মাত্রার চতুর সমাবেশ দেখতে পাই তা কাব্যধর্মী গদ্যের নিঃসংশয় লক্ষণ।

প্রগাঢ় অনুভূতি যাঁর বাক্‌ভঙ্গীতে কাব্যোজ্জ্বল তরলিত সোনার প্রবাহ বহিয়ে দিয়েছে, তাঁরই ভাষায় আবার সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ও শ্লেষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় অথচ সে শ্লেষে নেই নির্মমতা। একটা সর্বস্পর্শী অদম্য কৌতুকপ্রিয়তা, একটা twinkling sense of fun, অবনীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখায় ছড়িয়ে আছে। থাকবেই বা না কেন? অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছেন 'আমার মনের শিশুয়ালি ছবি' ( শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর: 'অবনীন্দ্র-চরিতম্‌', পৃ. ৭২ )। লিখেছেনও নিজের শিশুয়ালি কল্পনা, সে-মন সে-কল্পনায় অনুরণিত হচ্ছে শিশুবয়সী চিত্ত আর তাদের চিত্ত যাদের বয়স বাড়লেও শৈশবের সহজ অনুভূতি শুকিয়ে যায় নি। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি', সমস্ত দৃশ্যমান ও জ্ঞানসাধ্য জগতে আনন্দ পরিব্যাপ্ত, সে-আনন্দবোধ অবনীন্দ্রনাথের লেখায় নিয়ত উপচে পড়ছে সহজ কৌতুকপ্রিয়তায়। বাংলা সাহিত্যের হিউমার বা কৌতুক রসের বিশ্লেষণবিৎ অবশ্যই অবনীন্দ্রনাথের কৌতুক উপভোগ ও অধ্যয়ন করবেন।

এই নিরন্তর কৌতুকবোধের কয়েকটি লক্ষ্যণীয় দৃষ্টান্ত 'ভূতপত্‌রীর দেশে' পাওয়া যায়। আজকাল যেসব 'সমাজ-সচেতন' সাহিত্যপাঠক চারি দিকে দেখা যাচ্ছে তাঁরা ইচ্ছা করলে অবনীন্দ্রনাথের কোনো কোনো কৌতুকে সমাজব্যবস্থার মূল্যায়ন পাবেন, আমি আপাততঃ এসব দৃষ্টান্তের প্রাণচঞ্চল প্রসন্নতাতেই সন্তুষ্ট। 'ভূতপত্‌রীর দেশ' থেকে প্রায় এক পৃষ্ঠা নিচে উদ্ধৃত করছি—

কিচ্‌কিন্দে বাঁশি রেখে বলে উঠেছে—

Thank you Baboo. I earnestly hope and trust that the noble example of this most enlightened and public-spirited Kumar Krishna Kitchkinda of Orissa will be followed by all Maharajas, Rajas, Jamindars and other wealthy people—not only in India but throughout the length and breadth of Bengal, Bihar and Orissa—for the amelioration of self and friends and all the poor gentlemen at large like হাকুন্দে কামুন্দে বাহুন্দে ঝালুন্দে and মালুন্দে।

—কি বোলচো কিচ্‌কিন্দে?

—কলির কথা!—

—ধন্যবাদ তোমাকে বাবু, আমি ব্যগ্রভাবে ভরসা এবং প্রত্যয় করিতেছি যে ঐ কুলীন উদাহরণ এই অধিকতম আলোকসম্পন্ন

সাধারণ ভূতবান উড়িষ্যার কুমারকৃষ্ণ কিচ্‌কিন্দার হইবে অনুগমিত সকল রাজা মহারাজা জমীদার ও যোত্রসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারায় নিজের বন্ধুর এবং হারুন্দে ইত্যাদির মত বেচারা গরীব এবং ছাড়া-পাওয়া ভদ্রগণের অপেক্ষাকৃত ভালো করিবার নিমিত্তে।

—এ কথার তো কিছু মাথা নেই কিচ্‌কিন্দে।

—আচ্ছা শোনো দেখি, এটার কিছু মানে পাও কি না— 'বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌহবর্ম্ম সমিতি।'— এটা আরো শক্ত? আচ্ছা দেখ দেখি এটা সহজ কি না— 'পূর্ণব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবিহীন জীব বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ দেখিয়া বহির্মুখী মনোবৃত্তির দ্বারা বাসনায় আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিমুখ হয় ও মিথ্যায় আশক্তি করতঃ কলির ব্রাহ্মণ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে—"

—ভুতপত্‌রীর দেশ, পৃ ৪১

যেমন চমৎকার 'বাবু ইংলিশ', ততোধিক চমৎকার তার বঙ্গানুবাদ! 'ব্যগ্রভাবে ভরসা এবং প্রত্যয়', 'কুলীন উদাহরণ', 'সাধারণ ভূতবান', 'ছাড়া পাওয়া ভদ্রগণ'— এমন সূক্ষ্ম তর্জমার তুলনা বিরল, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেকার ইস্কুলের ছাত্র অথবা বাংলা সংবাদপত্রের সব্‌-এডিটারও এমন মেধাবী তর্জমা করতে পারতেন না। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার কোণে কি এসব তর্জমাকারী উঁকি দিয়েছিল? 'বঙ্গ-বিদর্ভনগর লৌহবর্ম্ম সমিতি'— কিন্তু এ তো অনন্য নয়! আজাদী হিন্দুস্থানে এহেন গালভরা হিন্দী বুলি প্রত্যহই শ্রুতিগোচর হচ্ছে। 'পূর্ণপরব্রহ্ম'— ইত্যাদি বাঙলা ধর্মপুস্তকের অর্থহীন বাগাড়ম্বরের সুন্দর প্যারডি! তবু খেয়াল রাখতে হবে যে এসব এবং এতৎ-তুল্য উদাহরণে কথার খেলায় অবনীন্দ্রনাথের প্রাণপ্রচুর কৌতুকপ্রিয়তাই প্রমাণিত হয়, সে-কৌতুকে হুল নেই।

কথার খেলা অকৃপণভাবে ছড়িয়ে আছে তার লেখায়—

কোটাল, রাজার দপ্তরখানায় চট্‌ করে জাল লাগাও। আমি কি জালিয়াত? —একে তিন তিনে এক, পৃ ১০২

হুকুমও আসবে না, হাকিমও আসবে না, দরজাও খুলবে না, দর্জিও পাওয়া যাবে না? —একে তিন তিনে এক, পৃ ১১২

কৌতুকে তাদের আপত্তি নেই, যৌতুকেই আপত্তি। —মারুতির পুঁথি, পৃ ১৩

অঞ্জনা, তুমি নও অনজনা; পবনের মনোরঞ্জনা হও। —মারুতির পুঁথি, পৃ ২৫

খুঁড়ে লঙ্কার ভিত্তি, তুমি রাখলে কিত্তি
বিত্তি লাভ করতে এসে পিত্তি পলো। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৮০

"বলি ক' ছিলুম হয়েছে?"
আমি বল্লুম—"ছিলুম আবার কি? এই তো রয়েছি।" —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৬২

তাঁর উপমাতেও কৌতুকপ্রিয়তা:

হাই তুললেন— যেন একটা বোড়া সাপ মুখ ব্যাদান করে একটা খাবি গেলে। —রং-বেরং, পৃ ৮৯

ফর্দটা আগাগোড়া হিজিবিজি, যেন ফার্সিতে লেখা। কেবল কলমের খোঁচ, যেন মুরগির একরাশ ছেঁড়া পালক উড়ছে।

—রং-বেরং, পৃ ৮৯

এমন সময় মহোদর যেন লোম-পোড়া হুম্বার মতো ডাকছে। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৯০

চুলোচুলিতে ঝড়ে যেন চালের খড় উড়ে নেড়া হয়ে গেল, দুই সতীনের সিঁথি ফাঁক। —চাঁইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৬৯

যেন ভিজে মাটিতে ছুঁচোবাজির মতো ফুস্ করেই নিভলো। —একে তিন তিনে এক, পৃ ২

এলেন ময়ূরপঙ্খীতে ধুতি পরে যেন টিপু সাহেব। —মারুতির পুঁথি, পৃ ১৭

কথার মারপ্যাঁচ ছাড়াও অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ক্ষমতা কত রকম মামুলি নিত্যনৈমিত্তিক ধ্বনিকে ছন্দে গেঁথে নেবার! রেলগাড়ি চলেছে, তো সে-চলার শব্দের ছন্দ হ'ল—

বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু, বড়দাড়ুলু চাড়লু নাইডু, গড়্দাড়ুলু গুড়্দাড়ুলু— গাব্ গুবাগুব্, গাবুরগুবুর, গব্ গব্ গব্, আমতা জামতা, ঘুঘু-মেতি স্বাঃ!

নিচে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত হল, প্রত্যেকটিতে ধ্বনি ও অর্থের নিখুঁত সাযুজ্য আর সর্বত্রই এই রঙ্গপ্রিয়তা—

দ্রম্ দদ্দড় দ্রম্ ধদ্ধড়
কিপ্ পোলো কিপ্ পোলো
যমজয়ন্তীর তোপ্ পোলো।
যম দণ্ড ভঙ্গ হলো
দশ গণ্ড হলো
কাল দণ্ড ফাল হলো, ফাল্লোলো। —টাইবুড়োর পুঁথি, পৃ ৬২

করিব খুন্— করিব খুন্
বায়ু কোণে ঐ শুন ভেঁপু বায় টাইফুং
হারিকান্ ঈশান কোণে
বিশাল বাজান বুম্ বুম্ বুবুং বুং
ঘুর্ণিৎবায়ু নৈঋত কোণে—
গম চূর্ণিৎ জাতা ফিরান— গুরু গুম্ ঘুরু ঘুম্। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৮৯

এস করি হিড়িকিড়ি
হাঁড়ি পেট নখে চিড়ি— করি ফাঁক!
সেই পথে প্রাণপাখি বারায়ে যাক— তিড়িবিড়ি
ঝট্ হোক কাজ সাফ্
চুকে যাক লাফালাফ— আড়ি ভাব, দন্ত কিড়িমিড়ি
আমরা এখানে পড়ে থাকি
দেশে উড়ে যাক প্রাণপাখি— যেথানে তার ইস্তিরী
বসে চিবোচ্ছে কাঁচা পাকা তিন্তিড়ী। —মারুতির পুঁথি, পৃ ৭০

আমার মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের লেখা কেবল গদ্য নয় কেবল কবিতাও নয়, বরং এ-দুয়ের এক আশ্চর্য সমন্বয়। একই লেখক গদ্যকার ও কবি— এমন দৃষ্টান্ত যে-কোনো সাহিত্যে প্রচুর, সে-অর্থে আমি সমন্বয়ের উল্লেখ করছি না। একই লেখকের গদ্যে কাব্যের আভা বহমান, সে কথাও আমি ভাবছি না। অবনীন্দ্রনাথের রচনা বহুবার পড়ে' আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে অন্য লেখকদের গদ্য-সুর ও কাব্য-সুর স্বতন্ত্র, কোনো লেখার

আত্মায় গদ্য-সুর, কোনো লেখার আত্মায় কাব্য-সুর, অথচ অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় দুই সুর অনায়াসে একই রচনায় একই প্রবহমান কথন-কারুতে মিশে যায়, একই রচনায় কাহিনীতে এমনকি পর পর বাক্যবন্ধে, গদ্য ও কাব্য পরস্পর-সম্পৃক্ত। উপরে মারুতির পুঁথি ৪৪ পৃষ্ঠা থেকে যে-স্তবকটি উদ্ধৃত করেছি তার সুকুমার কাব্য-কল্পনা ও বাক্‌ভঙ্গী নিঃসংশয়, অথচ তারই এক পৃষ্ঠা পিছনে নিরলংকার গদ্য সুর—

> দুবার 'ওয়াক্ থক্' করে একটা পটল তুলে বুড়ো দাদার দমবন্ধ— শিবনেত্র— অঙ্গ স্থির, অক্ষয় স্বর্গলাভ করলেন হক্ষিয় রায়।

একই রচনায় এমন অনায়াসে এক সুর থেকে আরেক সুরে চলে যাওয়ার ক্ষমতা আমার কাছে বিস্ময়কর ও অনন্য মনে হয়, আর এ-ক্ষমতার কারণ, আমার ধারণায়, অবনীন্দ্রনাথের অতুলন কল্পনাশক্তি, পরম ঐশ্বর্যবান বাক্‌-ভাণ্ডার, যে-শক্তি ও যে-ভাণ্ডার যুগপৎ গদ্য ও কাব্য- ধর্মী। সাহিত্য-সমালোচনার কোনো বিশেষ মার্কা মেরে লেখক অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনা সম্ভব নয়, কেননা তাঁর লেখকচিত্ত একপন্থী নয়, কতকগুলি স্বতন্ত্র গুণের সমষ্টিও নয়, একাধারে একই মুহূর্তে বহু গুণের সম্মিলনক্ষেত্র। তাঁর লেখা আবেগপরায়ণ আবার বুদ্ধিদীপ্ত, শালীন ও আটপৌরে, তিনি কল্পনাচারী আবার প্রত্যক্ষনির্ভর, কৌতুকবিলাসী ও সমবেদনশীল, সব মিলিয়ে তিনি অসামান্য ভাষাশিল্পী, তাঁর লেখায় বিচিত্রের সংগতি।

৫

চাঁইবুড়ো থেকে দূরে সরে এসেছি তবুও কথকপ্রবর সারাক্ষণই অনতিদূর নেপথ্যেই আছেন। চাঁইবুড়ো কি অবন ঠাকুর স্বয়ং, না জন কয়েক আদর্শ চরিত্রের সমষ্টি যে-সমষ্টিতে তাঁর নিজ ব্যক্তিত্বও মিলেছে, পূর্ণস্ফূর্ত হয়েছে তাঁর কথন-কারু ?

'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' দুইয়েরই ভিত্তি রামায়ণ-কাহিনী কিন্তু কথক ঠাকুর রচনা করেছেন নব রামায়ণ, যেমন মার্ক টোয়েন লিখেছিলেন রাজা আর্থারের নূতন কাহিনী। এ-কাহিনীতে উপস্থিত রামায়ণোক্ত অনেক চরিত্র— পবনদেব অঞ্জনা হনুমান অঙ্গদ জাম্বুবান রাবণ মন্দোদরী সূর্পনখা এবং আরো অনেকে, অথচ এ-কাহিনী সুপরিচিত রামায়ণ-কাহিনী নয়, এ-কাহিনী বাল্মীকি তুলসীদাস অদ্ভুতাচার্য কৃত্তিবাস জানেন নি। চাঁইবুড়োর পরিবেশনে পুরনো আখ্যান পেয়েছে তির্যক রূপ। বাল্মীকি-কৃত্তিবাসের রাজপথ তাঁদেরই থাক, উর্বরমস্তিষ্ক চাঁইবুড়ো নতুন রাস্তা তৈরি করে নিয়েছেন, সে-রাস্তা খুব চওড়া সড়ক নয়, বরং আঁকাবাঁকা গলি ; তবুও একান্তই চাঁইবুড়োর রাস্তা। এই নতুন রামায়ণে ন্যাচরল্ এবং সুপারন্যাচরল্, লৌকিক এবং অবলৌকিক দুই স্তরের ঘটনা মিশেছে। অবলৌকিক ঘটনা যে থাকবে সেটা আশ্চর্য নয় পৌরাণিক কথার শিকড় সব সাহিত্যেই অবলৌকিকে। আজকের দিনে কেউ যদি অবলৌকিককে আষাঢ়ে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চান তিনি নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথন পড়ুন :

> **সম্পাতি বল্লেন— "আমি চক্ষে দেখিনি, কই যেরূপ কয়েছেন অগস্ত্য মুনি।"**
>
> **অঙ্গদ শুধালেন— "অগস্ত্য মুনিটি কে ?"**
>
> **সম্পাতি বল্লেন— "পান করলেন যিনি এক গণ্ডূষে সমুদ্র জল।"**
>
> **জাম্বুবান বল্লেন— "তার পর ?"**
>
> **সম্পাতি বল্লেন— "তারপরে উদ্গার— তিমি তিমিঙ্গীল সুদ্ধ যেমন তেমনি লোনাজল !"**

জাম্বুবান বল্লেন— "আশ্চর্য ব্যাপার! বিশ্বাস না হয় শুনে কানে!"
সম্পাতি বল্লেন— "ব্রহ্মতেজে কি না হয়?— বিস্ময় কি এখানে? ব্রহ্মতেজে পেলো রাবণ দশটা মুণ্ড বিশটা হাত!"

—মারুতির পুঁথি, পৃ ৯১

তা তো বটেই, ব্রহ্মতেজে কী না হয়! অতিপ্রাকৃত ঘটনা বাল্মীকিতেই প্রচুর, অবন ঠাকুরও না হয় আরো দু-চারটে অমনধারা ঘটনার অবতারণা করলেন! ভগবৎ বিশ্বাসে মূক যদি বাচাল হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে, তা হলে সুরসংগত কাব্যপ্রত্যয়ে কেন অগস্ত্যের উদ্গারে তিমিঙ্গিল বেরবে না, কেন অবলৌকিক ঘটনায় ভুরু কুঁচকবো? খেয়াল রাখতে হবে যে চাঁইবুড়োকথিত জগৎ খুব মহাকাব্যোচিত বীররসের জগৎ নয় যদিচ পবন এবং গরুড় একদা তুমুল লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর মাস্টারমশাই মতং মুনির বাড়িতে যখন মত্ত হস্তীর আবির্ভাব হয়েছিল আর গুরুপত্নী ঝুলছিলেন হাতীর লেজ ধরে তখন বীর হনুমান 'মাতঙ্গের করিলেন অন্ত।" মোটের উপরে এ জগতের অনেকটাই নেহাৎ ঘরোয়া। এখানে ব্রহ্মা ঠন্‌ঠনের বিদ্যেসাগরী চটি পরেন, পবনদেব রাবণের হাওয়াগাড়িতে প্রমীলাসুন্দরীকে দু বেলা হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যান, ইন্দ্রাণী চন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী ঈশানীতে জটলা করেন তাঁদের ভর্তারা নাকি বানরীবিবাহের সংকল্পে মেতেছেন। এখানে নারদ করেন ঘটকালি (কেউ না কেউ তো এ কার্য করবেই), আর পাঁচজন শাশুড়ির মতো দেবমাতা অদিতিও বৌমাদের আচরণে ক্ষুব্ধ আর কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়ের প্রস্তাবে জিজ্ঞেস করেন, "বলি, দেওয়া-থোওয়ার কি শুনি?" এ-জগতে পবনদেবের রোমান্টিক বায়বীয় বিয়ে ছাড়াও রাক্ষসগণমুক্তা তরুণী সূর্পণখার মাংসরসালো বিয়েও আছে। কনে দেখা হবে, 'সূর্পণখা সেজেগুঁজে উঁকি দিলেন পর্দার আড়াল থেকে— বাবুইবাসা-বিবিয়ানা-খোঁপা পিঠে দুলছে'। কনে আমাদের বড়ই লজ্জাবতী, কিছুতেই চোখ তুলে চাইবে না। এ-জগতে শ্বশুররা কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ। পরলোকপ্রাপ্ত হক্ষিয় রায় নূতন রাজ্যে আস্তানা গাড়ার জন্য যে-জামাইয়ের বাড়ি যান সেখানেই দেখেন অবহেলা অথবা সরাসরি প্রবেশ-নিষেধ। সত্য বটে ওঁর জামাইয়েরা সবাই দেবতা, কিন্তু দেবগৃহেও ইদানীং ইয়োরোপীয় পন্থায় in-lawগণ অর্থাৎ শ্বশুরশাশুড়িগণ মর্যাদা হারিয়েছেন। এখানে পড়ুয়া ছাত্ররা গুরুর আবির্ভাব-সূচনায় পড়তে সুরু করে—

ক'য়ে কলা, খ'য়ে খড়্গা, গ'য়ে গুঁতা, ঘ'য়ে ঘুষা, ল্যাজ গোটা পাগুড়ি বাঁধা (ঙ) উঙা অনুস্বর, বিসর্গ হক্ষিয় তৎ-সদ্‌গুরু দণ্ডবৎ ক্ষেমা কুরু— নাকে খৎ।

— মারুতির পুঁথি, পৃ ৩৭

হনুমান এগোচ্ছেন কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে, পথ শুধোলেন জনৈক পথিক মর্কটকে (স্পষ্টতঃই সে-মর্কট উৎকলনিবাসী), উত্তর পেলেন— 'কড়কৌচী? আগবাঢ়— সহড় কিষ্কিন্ধ্যা নিন্দাড় নয়— আগবাঢ়, আগবাঢ়।' সুগ্রীবের পূর্ববঙ্গ নিবাসী জামাই "তাই তাই" (এ নাম পাওয়া যাবে না বাল্মীকিতে তুলসীদাসে কৃত্তিবাসে, এ নাম অবন কথকের নিজস্ব সৃষ্টি) স্বদেশীয় ভাষায় বলছে :

কইবো কারে দ্যাশে যাইতে প্রাণ যে কেমন করে,

. .

আপন গাঁয়ে বৈসা করতে ছেলাম বাদশাই,
খাই ফুল বড়ি তিন্তিড়ি অম্বল

শ্বশুরা ধাঙ্গড় সুখে রইতে দিল না ঘরে
খোঁজ নাই এখন জামাইডা না খায়্যা মরে। — মারুতির পুঁথি, পৃ ৭২

নতুন রামায়ণের রাজ্যের বিধবা সূর্পণখাকে একাদশী করতে হয়—যাই হোক বামুনের মেয়ে তো!—ঘোর শাক্ত রাবণ বিষ্ণুর নাম সইতে পারে না, আর রাবণের ধোবা রজকদৈত্য রাজার আলখাল্লা লুঙ্গী ধোলাই করে।

এ-জগতের সঙ্গে পরিচিত নয় কোন্ বাঙালী? বাঙালীর ঘর-গেরস্তালি আচার ব্যবহার ধ্যান ধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রামায়ণোক্ত চরিত্রগুলিকে ছেঁটে নেওয়া হয়েছে। অবন ঠাকুর রামায়ণী কথাই বলছেন বটে কিন্তু বাল্মীকির মহাকাব্যে যে-জীবনাদর্শের গাঢ় নির্যাস, কৃত্তিবাসে যা তরলীকৃত, অবন ঠাকুরে সে আদর্শ আরো তরলীকৃত। কৃত্তিবাস থেকে অবন ঠাকুর অবধি একই ধারা—প্রাচীন ভারতের বীররসসঞ্জীবিত চরিত্রাদর্শ বাঙালীর ঘরোয়া জীবনের সঙ্গে মাপসই ক'রে নেওয়া। এখানে শুনছি বটে রামায়ণীকথার গান, তবে নিচু পর্দার গান। সারাক্ষণ অবন কথক নিচু পর্দায় নিজকে আবদ্ধ রেখে রঙ্গ তামাশা করছেন, বর্ণনা করছেন, কথার ছবি আঁকছেন, সুরের ছকে বাঁধছেন কথাকে, কখনও তাঁর কণ্ঠস্বর পর্দা লঙ্ঘন করছে না। এ এক আশ্চর্য শিল্পসংযম!

'মারুতির পুঁথি' ও 'চাঁইবুড়োর পুঁথি'তে চরিত্ররা দু রাজ্যের—একটি আখ্যানের রাজ্য, আরেকটি আখ্যানকারের রাজ্য। এক রাজ্যের অধিবাসী হনুমান-রাবণ-সূর্পণখা প্রমুখ রামায়ণী চরিত্র, আরেক রাজ্যে বাস করে আখ্যানের স্রষ্টা ও শ্রোতারা। চাঁইবুড়ো স্বয়ং তো আছেনই, তা ছাড়া আছে বেঙাচির বাপ, চাংড়াবুড়ি, কাবুলী তুলুলি, আর আছে ঢেলারাম—চাঁইবুড়োর শাকরেদ—মাঝে মাঝে গরহাজির গুরুর অ্যাকটিনি করে যায়। আখ্যানকারের রাজ্যে চাঁইবুড়ো অবশ্য একমেবাদ্বিতীয়ম্, তাঁর চারিধারেই জ্যোতিশ্চক্র প্রদীপ্ততম। তাঁর সম্বন্ধে আমরা অনেক জানি। বড়ই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এই কথকঠাকুর। "আষাঢ়ারান্ত বেলায় শাস্ত্রমত তেল কালি আর লঙ্কার ধুনো দিয়ে শ্লেষ্মা শোধন ক'রে তবে চাঁইবুড়ো পোড়া লঙ্কার পুঁথি পাঠ সুরু করলেন।' আসনগ্রহণের পূর্বে বলেন, 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে', আসনত্যাগের সময় বলেন, 'মধুসূদন, মধুসূদন।' পুঁথিপাঠের পূর্বে গণ্ডূষ করতে হয় আর মন্ত্র পড়তে হয়:

হুম্ গণেশ চিৎপটাং ততঃ মারুতি চিৎপটাং
আকাশে চিৎপটাং বাতাসে চিৎপটাং
জলে জলে কাদা-মাটিতে চিৎপটাং॥ — মারুতির পুঁথি, পৃ ১

তিনবার আচমন করতে হয়, চারিদিকে শ্রোতাদের গায়ে শান্তিজল প্রক্ষেপ করে পুঁথির একখানি গরাণ-কাষ্ঠের পাটা চিং করে' রেখে পরে কথা শুরু করতে হয়। একাদশীর দিন যবের ছাতু খেয়ে বচকরণ করে' কথারম্ভ করেন, নিত্য গঙ্গাস্নান করেন। সচরাচর কথকের থালায় জমে সিকি দুয়ানি আধুলি কিন্তু একদিন মাত্র একটি হরীতকী ও একটি আমলকী দেখে 'ওল কচু মান, তিনই সমান' বলে' বুড়ো কথারম্ভ করেন কেননা মাত্র আগের দিনই তিনি মানকচুর সন্ধানে মাণিকতলার বাজারে ছুটেছিলেন। কথকতার কালে যদি কখনো পাতা উল্টে দেখেন বাকিটুকু পুড়ে গেছে, তখন উপস্থিত বুদ্ধি মতো টীকা করতে হয়। কখনো বা কথকতায় ত্রুটি হয়ে যায়: কোথায়

রামচন্দ্রের শীল আংটি নিয়ে তবে মারুতি যাবেন লঙ্কায়, না চাঁইবুড়ো আংটি ছাড়াই তাঁকে সাগরলঙ্ঘনের পথে পাঠিয়েছেন! ভুল ধরা পড়তেই ধর্মভীরু কথকঠাকুর স্বয়ং ছুটেছেন শ্রীহনুমানের পিছু পিছু তাঁকে আংটি পৌঁছে দেবার সদুদ্দেশ্যে! শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। মাঝে-মধ্যে দুয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে' যায় যেমন ঘটেছিল যখন চাঁইমশায়ের মেধাবী ভৃত্য কৃপানাথ পুঁথির কয়েক পাতা পুড়িয়ে চায়ের জল গরম করেছিল আর আরশোলা তাড়িয়েছিল বাকি পাতা পুড়িয়ে ঘরে ধোঁয়া দিয়ে। তারপরে রীতিমত শ্রাদ্ধশান্তি করতে হ'ল পুঁথির, খণ্ডিত পুঁথির শোধন করতে হ'ল "মৃগমাংসের অভাবে পাঁঠার মুড়োসমেত কচি মাংসের ঝোল এক খোরা এবং তদুপযুক্ত পলান্ন ভক্ষণ ক'রে।' মাঝে মাঝে কথকঠাকুরকে আবার একটু 'ড্রামা' করতেও হয়। মারুতির পুঁথিপাঠ যখন শুরু হবে, মারুতির নাম স্মরণান্তর—

ভাব লেগে চাঁইবুড়ো যেন মূর্ছিত হন, এমনি ভাব দেখিয়ে আকাশে চক্ষু তুলে বল্লেন— "ঐ তিনি এসে গেছেন—

'মারুতির পুঁথি পাঠ হইবে যে-স্থানে
তাঁহার উদয় হইবে সে-স্থানে ॥'

সবাই আকাশের পানে চায়— মাথার পরে চাঁদোয়া অল্প দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা যেমনি—হেলে না দোলে না। সকলে একটু বিচলিত দেখে চাঁইবুড়ো বল্লেন— "যদি বা তিনি এসে থাকেন তো সূক্ষ্ম শরীরে শ্রোতাদের মধ্যে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে তো তিনি প্রকাশ্য হতে পারেন না। অতএব বিলম্বেনালম্—" —মারুতির পুঁথি, পৃ ২

চাঁইবুড়ো যে অবনীন্দ্রাংশী আমার এ ধারণার আরেক হেতু এই নাটুকেপনা। অবন ঠাকুর ছিলেন চমৎকার showman, কুশলী মঞ্চাধ্যক্ষ। তাঁর সম্বন্ধে প্রবোধেন্দুনাথ বলেছেন, 'শুধু পোটো নয়, একেবারে নাটুকে', আর 'আপন কথা'য় অবনীন্দ্রনাথ নাটুকে ঢঙে বলছেন—

শিশু-সাহিত্যসম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্যে রইলো বাঁ হাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইলো তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো···ঐ তারা যারা আমার মনের সিংহাসনে আলো করে এসে বসে, তাদেরই আদাব দিয়ে বলি, গরীব পরবৎ সেলামৎ অব্ আগাজ্ কিস্সেকা করতা হুঁ, জেরা কান দিয়ে শুনো।

'মারুতির পুঁথি' ও 'চাইবুড়োর পুঁথি'তে তিনি full-dress dramaর বিস্তৃত নাটকীয়তা অবলম্বন না করে আশ্রয় নিয়েছেন কথকতার যেখানে কথক হিসাবে তিনি বসেছেন মঞ্চে বা বেদীতে অথবা অন্ততঃ পিঁড়েয়, শ্রোতারা বসেছে অনতিদূরে মাদুর অথবা শতরঞ্জি বিছিয়ে, আর তিনি বাক্‌চাতুরী, অঙ্গভঙ্গী আর দৃষ্টির পরিবর্তনশীল উদ্দীপনার সাহায্যে সৃষ্টি করছেন নাটকীয় আবহাওয়া। নাটুকে অবনীন্দ্রনাথেরই এক অংশ কথক অবনীন্দ্রনাথে।

এ সব তো চাঁইবুড়োর নানারকম অভ্যাস বা ধরণ। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়ো কথা তাঁর নিয়ত-স্ফূর্ত কল্পনাশক্তি। কল্পনার বাইরে নয় তাঁর গল্পজগৎ, রিয়ালিস্টিক ব্যাপার নিয়ে তিনি ব্যস্ত নন।

'এখন গল্প শুনবে তো তল্প নাও, জল্পনা রাখ, কল্পনা কর— অল্পসল্প।'

— 'কল্পনা করতে তো আমি জানিনে চাঁইদাদা।'

— 'তা ঠিক, তুমি যে আজকালকার ছেলে— হিষ্টিরি পড়ে কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে?'

— 'তবে?'

— 'তবে আবার? ছাখো অবুবাবু এই আমি সেকালের বুড়ো— হিষ্টিরি-পড়া মানুষ নয়, তাই কল্পনা করতে আমার ঠেকে না একেবারেই।'

— 'চাঁইদাদা, তোমার কথা শুনতে শুনতে আমার ঘুম পেয়ে এল।'

— 'ঘুম পায় ঘুমোবে ; কিন্তু খবরদার হাই তুলোনা— তাহলেই আমার কল্পনা আর চলবে না, রাস্তার মাঝে পা পিছলে একদম আলুর দম হয়ে যাবে।— তখন কী করবে অবুবাবু ?'

— 'মুখে ভরে দেবো ছুট মাসির ঘরে।'

— 'বটে বটে, তুমি আমারই একজন বটে— কল্পনা করার শক্তি আছে দেখছি তোমার কিছু-কিছু।' —রং-বেরং, পৃ ২৮

এই সঙ্গে মনে পড়ে সিন্ধবাদের উক্তি : 'সব সত্যি বলতে হ'ল হুজুর, একটি মিথ্যা কথা দিয়ে এবারকার গল্পটা সাজাতে পারলুম না।' সত্যি মিথ্যে এগুলো খাঁটি শিল্পীর কাছে মূল্যবান নয়, আসল কথা হ'ল গল্প সাজানো গেল কিনা। বিষয়বস্তুতে শিল্প নয়, শিল্প সাজানোতে। কথাশিল্পের সত্য সাজাবার সত্য, গল্প সাজাবার ক্ষুণ্ণতা কথাশিল্পের মিথ্যা।— এই ধ্রুব শিল্পদর্শন সিন্ধবাদের, চাঁইবুড়োর, আর তাদের স্রষ্টা অবন কথকের।

৬

শিল্প সম্বন্ধে— শুধু কথাশিল্প নয়, তাঁর মহত্তম কর্ম চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও— অবনীন্দ্রনাথের মতামত ও প্রত্যয় হয়তো অদূর ভবিষ্যতে কোনো শ্রদ্ধাবান রসবেত্তা অধ্যয়ন করবেন। আপাততঃ তাঁর অভিমত ও উক্তিগুলি ছড়িয়ে আছে বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা ছাড়াও এখানে সেখানে। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের 'অবনীন্দ্র-চরিতম্' এ হেন অনেক উক্তির মূল্যবান ভাণ্ডার। জানি না অবনীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা কতটা হুবহুরকমে ধৃত হয়েছে এ-গ্রন্থে, অন্ততঃ অভিমতগুলি যে গুরু থেকে সরাসরি শিষ্যের লেখনীতে রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-গ্রন্থোক্ত অভিমতগুলি অবশ্য চিত্রশিল্প সংক্রান্ত কিন্তু যেহেতু শিল্পের প্রাণ অভিন্ন যদিচ তার রূপ বহুধা, আর অবনীন্দ্রনাথ যেমন চিত্রশিল্পী কথাশিল্পীও তেমনি, সেজন্য এ-অভিমতগুলি সাহিত্য পাঠকেরও প্রণিধানযোগ্য।

ভারতবর্ষের চোখ…রূপ দ্যাখে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। আমরা মডেলকে পেতে চাই রসের ঘরে, ভাবের ঘরে ; আর পশ্চিমীরা মডেলকে পেতে চান চামড়ার ঘরে, মাংসের ঘরে। —অবনীন্দ্র-চরিতম্, পৃ ৫৬

র‍্যাফেলের মা-ছেলের ছবিখানাই ধর। যীশুর মাকে কি অমনি দেখতে ছিল ? না, এই ছবিটিই মেরির পোর্ট্রেট ? অনেকেই তো মাদার এণ্ড চাইল্ডের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু র‍্যাফেলই পারলেন মাতৃভাবটুকু ফোটাতে। —পৃ ৬১

ঐতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাক্তারের কারবার নিখুঁত হাড়মাসের anatomy নিয়ে, আর আর্টিস্টের কারবার অনির্বচনীয় অখণ্ড রসটি নিয়ে। আর্টিস্টের কাছে ঘটনার ছাঁচ পায় না রস, ছাঁচ পেয়ে বদলে যায় ঘটনা ; হাড় মাসের ছাঁচ পায় না শিল্পীর মানস, কিন্তু মানসের ছাঁচ অনুসারে গড়ে ওঠে সমস্ত ছবিটার হাড়-হদ্দ, ভিতর-বাহির। —পৃ ৬২

ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপকাঠি কায়ামূলক, আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-মূলক। —পৃ ৬৩

আমি নন্দনতাত্ত্বিক নই, শিল্পী তো নই-ই, আমার অনমুশীলিত বিবেচনায় উপরোক্ত মতগুলি সিন্ধবাদ ও চাঁইবুড়োর যে-মত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি তা থেকে পৃথক নয়। সর্বত্র আমি একই প্রত্যয়ের প্রকাশ পাচ্ছি যে শিল্পের সত্য আর লৌকিক সত্য প্রভিন্ন, প্রভিন্ন এই অর্থে যে দুই সত্যের দৃষ্টিভঙ্গীই আলাদা,

সুতরাং তাদের ক্ষেত্র স্তর পরিধি সবই আলাদা। 'মানুষী মূর্তির অ্যানাটমি দিয়ে মানস-মূর্তির অ্যানাটমির দোষ ধরতে যাওয়া মূর্খতা।' লৌকিক জগতের ও শিল্পসৃষ্ট জগতের সত্য এক স্তরের নয়। অবনীন্দ্রনাথের উক্তি শতবার উদ্ধৃত করলেও অত্যুক্তি হবে না: 'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক· ·আর রচয়িতা যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া-মূলক।' সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার কথাই সিন্ধবাদ বলেছে, সে মায়াই অবনীন্দ্রনাথের লেখায়। অত্যন্ত ঘরোয়া, অতিশয় পরিচিত বস্তু বা চরিত্র বা ঘটনা নিয়ে যে-কাহিনী তিনি রচনা করেছেন, সে-কাহিনীর ইশারা লোকাতীত। হারুন-আল্-রশীদ্, সিন্ধবাদ, রাবণ, হনুমান, চাঁইবুড়ো, এরা কোনো লৌকিক সত্যে স্থিত কি না, ইতিহাস বলেছে কি না এদের কথা অথবা এরা কোনো নামজাদা বইয়ের পাতা থেকে নেমে এসেছে কি না সে কথা নেহাতই অবান্তর, আসল কথা তারা মানসমূর্তির অনির্বাণ প্রাণ পেয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সামনে, তারা সাধারণ নয়, অ-সাধারণ, অদ্ভুত। প্রবোধেন্দুনাথ বলছেন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'চিত্র' শব্দটির অর্থ 'অদ্ভুত' কিন্তু অদ্ভুত মানে উদ্ভট নয়, মহৎ, পূজনীয়। নিশ্চয় বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের অথরিটিতে অদ্ভুত মানে তা-ই, কিন্তু প্রাকৃত বাঙলার সংস্কৃতি যে-গ্রাম্যখেলা খেলেছে শব্দটি নিয়ে (অর্থাৎ মহত্ত্বজ্ঞাপক অর্থকে নামিয়েছে সৃষ্টিছাড়ায়, উদ্ভটে), সে-খেলা কি নিতান্তই ভুল, নিতান্তই দূষণীয়? কোনো শব্দের অর্থই আদি ও অকৃত্রিম নয়, প্রবহমান ভাষায় শব্দের যে নব নব সংজ্ঞার্থ সূচিত হয় তা অবজ্ঞেয় নয়। আর, আমার বিনীত বিবেচনায়, অবনীন্দ্রনাথের সৃজনীশক্তি যেমন প্রাকৃত অর্থে অদ্ভুত তেমনি বৈয়াকরণের অর্থেও অদ্ভুত, যেমন সৃষ্টিছাড়া অলৌকিকতায় প্রদীপ্ত তেমনি মহনীয়, পূজনীয়। কবিকর্ম সম্বন্ধে আরিস্টট্‌ল বলেছিলেন—

The poet's function is to describe, not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen, i.e., what is possible as being probable or necessary—পোয়েটিক্স, ৯ অধ্যায়।

যে কল্পনা-সম্ভব জগৎ নিয়ে কবির কারবার সে-জগৎ মহত্ত্বেরই জগৎ, যা 'মংহনীয় বা বর্দ্ধনীয়, মহনীয় বা পূজনীয়, শ্রবণীয় ও দর্শনীয়', সে-মহত্ত্বকেই গ্রীকরা বলতেন Spoudaiotes, কবি স্পেন্‌সার্ বলেছিলেন Magnificence, আর ম্যাথিউ আর্নল্ড বলেছেন High seriousness, সে মহত্ত্ব অবনীন্দ্রনাথের শিশু-সাহিত্যে বিদ্যমান। তাঁর কল্পনায় আমি দেখতে পাই অদ্ভুতের আভা, কিছুটা সৃষ্টিছাড়া তো বটেই। অদ্ভুত শুধু এই অর্থে নয় যে তাঁর কোনো কাহিনীর অকুস্থলের নাম উদ্‌ভুট্টির চর, বরং এই অর্থে যে তাঁর লেখায় ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার পরম প্রকাশ। তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন দূরবীনের উলটো পিঠ দিয়ে জগৎটাকে দেখতে। উলটো পিঠ দিয়ে দেখলে fact হয়ে যায় fantasy, মিড্ সামার নাইট্‌স্ ড্রিম্-এর জগৎ উদ্ভাসিত হয়। বাঙলার মহত্তম ফ্যান্টাসি-লেখক অবন ঠাকুর।

# ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ

**শ্রীঅজিত দত্ত**

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দশ বৎসরের ছোট ছিলেন। এই দশ বৎসরের কনিষ্ঠতা অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভার সম্যক্ বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে এত বেশি ছোট ছিলেন না যে, পূর্ণবিকশিত রবীন্দ্রপ্রতিভার দীপ্তি তাঁর স্বকীয় প্রতিভার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পেরেছে; অথচ রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করবার মত এবং তাঁর প্রতিভার তাৎপর্য হৃদয়ংগম ক'রে তার ইঙ্গিত আত্মস্থ করবার মত সশ্রদ্ধ ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট প্রতিভা তার বিকাশের প্রধান পথটি সহজেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল চিত্রশিল্পে। অবনীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উপযোগী বাহন ছবি আঁকা— যেখানে রেখা ও বর্ণের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান জগতের রূপরসগন্ধস্পর্শের অন্তরালে স্থিত সৌন্দর্যের মর্মকথাটি শিল্পী-স্রষ্টার তুলিতে উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে ভাষারচনায় ও সাহিত্যসৃষ্টিতে প্রায় অনুরূপ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিলেন, তার কারণ, আমার মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম শিল্পদৃষ্টি সৌন্দর্যের সেই মূল তত্ত্বটি আবিষ্কার করেছিল যা সকল ললিতকলা ও শিল্পের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। আসলে, চিত্রাঙ্কনের সূক্ষ্মতম ও অন্তরতম শিল্পকৌশলটি যখন অবনীন্দ্রনাথ খুঁজে পেলেন তখন ভাষারচনার মর্মকথাটিও তাঁর সহজায়ত্ত হয়ে গেল। সাহিত্য -প্রবণতা ও -প্রীতি এবং লোকোত্তর কল্পনাশক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি জন্ম থেকেই লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি তাঁর চিত্রবিদ্যা-শিক্ষালব্ধ শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পকৌশল সাহিত্যে প্রয়োগ করবার প্রেরণা পেলেন। অবনীন্দ্রনাথ যে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পস্রষ্টা এ কথা সর্বজনবিদিত; কিন্তু তাঁর মধ্যে চিত্রশিল্প ও সাহিত্যশিল্প দ্বিবিধ সৃষ্টির প্রতিভা যে কি আশ্চর্যরূপে সমন্বয় লাভ করেছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়।

বহুমুখী প্রতিভা জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের একটি বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের কথা তো বিশ্ববিদিত। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ গদ্য ও কাব্য -রচনায় প্রতিভার যে পরিচয় দিয়েছিলেন তার উপযুক্ত আলোচনা এখনো হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদিও সাহিত্যচর্চাতেই অধিকাংশ মনোনিবেশ করেছিলেন, তবু তাঁর আঁকা ছবিগুলি দেখে বিলাতে শিল্পী-সমালোচকেরা প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রের পিতা গুণেন্দ্রনাথের শখ ছিল ছবি আঁকার, তিনি আর্ট স্কুলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গেই শিক্ষানবিশি করেছিলেন। তা ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির গান-বাজনা-অভিনয় প্রভৃতি সকল প্রকার উদ্যোগের প্রাণ ও প্রেরণা স্বরূপ ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, "গুণুদাদা বড় বড় কল্পনায় আমোদ পাইতেন"। নাট্যরচনা ও নাট্যাভিনয়ের যে উৎসাহ ও পরিবেশ জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়িতে গড়ে উঠেছিল তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথ পিতার কাছ থেকে চিত্রশিল্পপ্রতিভা সাহিত্য ও সৌন্দর্য -প্রীতি, অনন্যসাধারণ কল্পনাশক্তি, সুরজ্ঞান এবং নাট্যোৎসাহ লাভ করেছিলেন। এর প্রত্যেকটি গুণ তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়ে তাঁর রচনাকে একটি অসাধারণত্বে মণ্ডিত করেছে।

গুণেন্দ্রনাথ শৌখিন মানুষ ছিলেন। তাঁর ছিল পশুপাখির শখ, গাছ-গাছড়া-ফুলের শখ, আসবাব-পত্রের শখ। আর তাঁর শখ ছিল গানবাজনার, নাটকের, ছবি আঁকার। তিনিও শিল্পী ছিলেন, কিন্তু তিনি জীবনকে শিল্পশ্রীমণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, শিল্পরচনার কোনো বিশেষ পদ্ধতির মধ্যে নিজের প্রতিভাকে নিবদ্ধ করতে চান নি। অবনীন্দ্রনাথেরও ছিল শিল্পের কোনো বিশেষ পদ্ধতির গতানুগতিকতার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করতে অনিচ্ছা। শিল্পসৃষ্টিকে তাই তিনি বর্ণনা করেছেন শখ বলে। প্রথাগত শিল্পচর্চা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি জানতেন স্বকীয়তাই সকল সৃষ্টির প্রাণ। যা মৌলিক নয়, যা বিশেষভাবে শিল্পীমানস, শিল্পীর দৃষ্টিকে উদ্‌ঘাটিত করে না, তাকে সৃষ্টি বলা যায় কি করে? সে তো শুধু বাঁধা পথের অনুসরণ, বাঁধা বুলির অনুকরণ। তাই তিনি বলেছেন—

শিল্প জিনিসটা কী, তা বুঝিয়ে বলা বড়ো শক্ত। শিল্প হচ্ছে শখ। যার সেই শখ ভিতর থেকে এল সেই পারে শিল্প সৃষ্টি করতে, ছবি আঁকতে, বাজনা বাজাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক লিখতে— যাই বলো।· ·ইচ্ছে হল পাকা বাজিয়ে হব, যাকে বলে ওস্তাদ।· ·এসরাজ বাজাতে একেবারে পাকা হয়ে গেলুম। চমৎকার টিপ দিতে পারি এখন। শখ আমাকে এই পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল।· ·দেখি সেই মামুলি গৎ সেই মামুলী সুর বাজাতে হবে বারে-বারে।· ·নতুন সুর বাজাতে পারতুম না, তৈরি করবার ক্ষমতা ছিল না। অথচ বারে-বারে ধরা-বাঁধা একই জিনিসে মন ভরে না। সেই ফাঁকটা নেই যা দিয়ে গলে যেতে পারি, কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ পেতে পারি। হবে কী করে— আমার ভিতরে নেই, তাই ভিতর থেকে এলো না সে জিনিস। ভাবলুম কী হবে ওস্তাদ হয়ে, কালোয়াতী সুর বাজিয়ে। আমার চেয়ে আরো বড় ওস্তাদ আছেন সব— যাঁরা আমার চেয়ে ভালো কালোয়াতী সুর বাজাতে পারেন। কিন্তু ছবির বেলা আমার তা হয় নি। বড়ো ওস্তাদ হয়ে গেছি এ কথা ভাবি নি— আমিও তাদের সঙ্গে পাল্লা দেব, ছবির বেলায় হয়েছিল আমার এই শখ। ছবির বেলায় এই শখ নিয়ে আমি পিছিয়ে যাই নি কখনো। —ঘরোয়া

অবনীন্দ্রনাথের এ কথাগুলি শুধু ছবি আঁকার কথা নয়, এ কথাগুলি অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টির স্বরূপ প্রকাশ করে।— সে শিল্প তুলিতে আঁকা ছবিই হোক, কিংবা কলমে আঁকা ভাষাই হোক। অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য বিচিত্র গদ্যরচনাগুলি যখনই পড়ি তখনই মনে পড়ে তাঁর পৈতৃক ও পারিবারিক উত্তরাধিকার, তাঁর সাহিত্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা, তাঁর ভাষাশিল্প ও চিত্রশিল্পের সাদৃশ্য, এবং সর্বোপরি তাঁর সেই আশ্চর্য মুক্তপ্রাণ, যা সকল শিল্পপদ্ধতির বন্ধন খুলে, সকল শিল্পরীতির সেই দুর্লক্ষ্য 'ফাঁকটা' আবিষ্কার ক'রে তার মধ্য দিয়ে 'গলে যেতে' পারত। তাই অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনার আলোচনায় এ ভূমিকাটুকুর প্রয়োজন হল।

ভূমিকা হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকায় দিব্যদৃষ্টিলাভের কাহিনী অবনীন্দ্রনাথেরই ভাষায় আর একটু বলি—

আমারও ইচ্ছে হল ছবি আঁকা শিখতে হবে।· ·গিলার্ডি আর্ট স্কুলের ভাইসপ্রিন্সিপাল, ইটালিয়ান আর্টিস্ট—।· ·ছবি আঁকার হাতে খড়ি হল সেই ইটালিয়ান মাস্টারের কাছে। কিছুদিন যায়, দেখি, তাঁর কাছে হাতে খড়ির পর বিদ্যে আর এগোয় না।· · বাঁধা গতের মত তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে আঁকা, সে আর পোষাল না।· ·বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন।· ·সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি।· ·এখন অবশ্য সে সব ছবি দেখলে হাসি পায়।· ·প্যাস্টেলে হাত পাকল, মনও বেগড়াতে আরম্ভ করল, শুধু প্যাস্টেল আর ভালো লাগে না। ভাবলুম,· ·অয়েলপেন্টিং শিখতে হবে। ধরলুম এক ইংরেজ আর্টিস্টকে।· ·তেলরঙ তো হল। এবার জলরঙের কাজ শেখবার ইচ্ছে।· ·এখন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে, ঘাড়ে 'ইজেল' বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম।· ·কিছুদিন তো চলল এমনি করে, মন আর ভরে না। ছবি তো এঁকে যাচ্ছি, কিন্তু মন ভরছে কই? —জোড়াসাঁকোর ধারে

তখন অবনীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় ওস্তাদ হয়ে গেছেন, কিন্তু সে ছবি আঁকায় তাঁর মন ভরছে না। কারণ,

চিত্রাঙ্কনের সকল কৌশল বা টেকনিক তাঁর আয়ত্ত হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তখনও তিনি শিল্পসৃষ্টির অন্তরের কথাটি খুঁজে পান নি। সেই রহস্য-প্রকোষ্ঠের দ্বার অবনীন্দ্রনাথের কাছে মুক্ত করে দিলেন হ্যাভেল সাহেব। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

তাঁকে চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি, জ্যেষ্ঠের মত ভক্তি করেছি।

ঘটনাটি সামান্য।

সাহেব বললেন,'· ·চল, তোমাকে আর্ট গ্যালারি দেখিয়ে নিয়ে আসি।· ·দু-তিনখানা মোগল ছবি আর দু-একখানা পার্শিয়ান ছবি, এই খান চার-পাঁচ ছবি নিয়ে তখন আর্ট গ্যালারি।· ·একটি বকপাখির ছবি, ছোটই ছবিখানা, মন দিয়ে দেখছি, সাহেব পিছনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে। আমাকে বললেন, 'এই নাও এটি দিয়ে দেখ।' বলে বুকপকেট থেকে একটি আতসী কাচ বের করে দিলেন। সেই কাচটি পরে আর আমি হাতছাড়া করি নি। বহুকাল সেটি আমার জামার বুকপকেটে ঘুরেছে। আমি নন্দলালদের বলতুম, এটি আমার দিব্যচক্ষু। সেই কাচ চোখের কাছে ধরে বকের ছবিটি দেখতে লাগলুম। ওমা কি দেখি, এ তো সামান্য একটু-খানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাচের ভিতর দিয়ে দেখি তার প্রতিটি পালকে কি কাজ। পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ের ছোট্ট ছোট্ট পালক— কি দেখি— আমি অবাক হয়ে গেলুম, মুখে কথাটি নেই।· ·তার পর আর দু-চারখানা ছবি যা ছিল দেখলুম, সবই ওই এক ব্যাপার। মাথা ঘুরে গেল। তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল। পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রুপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব।· ·আমি দেখলুম এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে। —জোড়াসাঁকোর ধারে

এই যে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পৈশ্বর্যভাণ্ডারের চাবিকাঠিটি পেলেন, শিল্পকৌশলের মর্মস্থলের সন্ধান পেলেন, এই থেকেই তাঁর মহৎ সৃষ্টির সূত্রপাত হল। 'ভাব দেবার', শিল্পে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার উপায় তাঁর হাতেই ছিল। স্রষ্টার প্রতিভা নিয়েই অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। ভাব অন্তরে ছিল, রূপসৃষ্টির চরম কৌশলটি যখন আয়ত্ত হল তখন ভাব ও রূপের সমন্বয়ে অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এক লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত হল।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষাও ওই বকের ছবির মতন। শিল্পের সূক্ষ্ম কারুকার্য তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। আতসী কাচের 'দিব্যচক্ষু' দিয়ে দেখলে, তবেই সে ভাষাশিল্পের 'কাজ' চোখে পড়ে। অবনীন্দ্রনাথের ভাষার মত এমন সহজ সরল, অথচ এমন চিত্র ও ব্যঞ্জনাময় গদ্য বাংলায় আর লেখা হয় নি— এ কথা বোধ হয় নিঃসংশয়েই বলা যায়।

অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী। চিত্রশিল্পপ্রতিভা দ্বিমুখী শক্তিতে প্রকাশিত হয়— এক দেখার, আর দেখানোর। শুধু দেখবার নয়, অবনীন্দ্রনাথের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, ছোটবেলা থেকে তাঁর দেখা ছবিগুলিকে মনের খাতায় এঁকে রাখবার। সেইসব ছবি 'ঘরোয়া'য় 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে 'আপন কথা'য় একের পর এক সাজিয়ে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমার জীবনের সব বিলুপ্ত ঘটনা যে অবনের মুখ থেকে এমন করে ফুটে উঠবে, এমন স্পষ্ট রূপ নেবে তা কখনো মনে করি নি।

রবীন্দ্রনাথ যা ভুলে গেছেন, দশ বৎসরের কনিষ্ঠ অবনীন্দ্র তা ভোলেন নি। চিত্রশিল্পীর মনের মধ্যে যে ছবি একবার আঁকা হয়ে গেছে, তা আর হারাবে কী করে? অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনই যে সে সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলেম তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল; আবার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে, এমনি কত কি কাজে তার ঠিক নেই।· ·আমার সঞ্চয়ী মন। সঞ্চয়ী মনের কাজই এই— সঞ্চয় করে চলা, ভালোমন্দ টুকিটাকি কত কি। —জোড়াসাঁকোর ধারে

আর সঞ্চয় কি কম? শৈশব থেকে কত দেখা।

এই খড়খড়ি দেওয়া বাইরের জগতের খিড়কি, এদিকে সকাল বিকেল, যখন তখন, বাড়ির সাধারণ দিক দেখে চলতেম। অষ্টপ্রহর কিছু-না-কিছু হচ্ছে সেখানে— চলছে, বলছে, উঠছে, বসছে; কতো চরিত্রের, কতো ঢঙের, কতো সাজের মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া— কত কি তার ঠিক নেই। মানুষ, জন্তু, কাজ-কর্ম এখানে সবই এক-একটা চরিত্র নিয়ে অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবির মতো চোখের উপর এসে পড়তো একটার ঘাড়ে আর একটা। সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ, ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্তলীলা।· ·

এক-একদিন শাদা প্রজাপতির মতো এক ফোঁটা আলো, মাথার বালিশে ডানা বন্ধ ক'রে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোটো যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট্ করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়।· ·

এখনো পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘরে ঘরে কোথায় কি তা স্পষ্ট দেখছি আমি— জিনিসগুলোকে একটুও ভুলিনি। —আপন কথা

উপরের উদ্ধৃতিগুলির মধ্যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার চোখ আর ছবি আঁকার মনটি এমনই স্পষ্ট হয়ে ফুটেছে যে, অবনীন্দ্রনাথের এ রচনার শুধু রূপ ও ছন্দ নয়, তার চিত্রগুলিকেও আমরা ভুলতে পারি না। সেইজন্যই ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকেও জানতে হয়।

সাহিত্যরচনার প্রতিভা অবনীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে। কিন্তু তিনি সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না, কিংবা সচেতন হবার অবকাশ পান নি। চিত্রশিল্পের সাধনায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করেছিলেন। সে সাধনা যে কী তীব্র ও একাগ্র ছিল, 'জোড়াসাঁকোর ধারে' প্রভৃতি বইয়ে তিনি নিজেই তার আভাস দিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চা না ক'রে যে চিত্রশিল্পে সুদক্ষ হবার পরই সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, মনে হয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে এ পরম সৌভাগ্যের কথা। কারণ, এর ফলে ভাষারচনার গতানুগতিক শিক্ষালব্ধ পদ্ধতিকে তিনি এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। এজন্যই অবনীন্দ্রনাথের গদ্য বাংলায় সম্পূর্ণ তুলনাহীন। আর, এও সৌভাগ্যের কথা যে, চিত্রশিল্পের পথ ধরেই তিনি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। কেননা, যদিও সকল শিল্পেরই উদ্দেশ্য এক— সৌন্দর্যসৃষ্টি, তবু, বিভিন্ন শিল্পের টেক্‌নিক ভিন্ন, ধর্ম পৃথক্। অবনীন্দ্রনাথের রচনায় আমরা পাই চিত্রধর্মিতা— রেখার সূক্ষ্ম কারুকার্য, বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার চিত্রধর্ম, গীতিধর্ম নয়। অবশ্য, অবনীন্দ্রনাথের গদ্যে ছন্দ ও সুর চিত্রপ্রবাহের সঙ্গে মিলে মিশে তাকে অসাধারণ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট গদ্যমাত্রেই ছন্দ ও লয়ের প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্ন সমন্বয় অপরিহার্য। এই ছন্দ-সুর-লয়-বোধ অবনীন্দ্রনাথের কাছে সহজেই এসেছিল। এ বিষয়ে তাঁর পিতৃপ্রভাব ও পারিবারিক প্রভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়া ছবি আঁকার সাধনায় ব্রতী হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ বাজনা শেখার পাঠ নিয়েছিলেন, এবং দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। এই উত্তরাধিকার ও শিক্ষা তাঁর ছবিতে সঞ্চারিত হয়ে তাঁর প্রতিটি রেখায় ও বর্ণে সুর ও লয় হয়ে ফুটে উঠেছে, আবার তাঁর সহজলব্ধ ও শিক্ষালব্ধ ছন্দ সুর তাল লয় রেখা ও বর্ণের অধিকার সকলই তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে মিশে গিয়ে তাকে অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষার যে-বৈশিষ্ট্য সকল পাঠককে মুগ্ধ করে, তা তার রচনার ঋজুতা ও সরলতা। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা অপূর্ব সুন্দর হয়েও আশ্চর্য সহজ। আর, এই সহজ হওয়ার মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথের ভাষাসৃষ্টির সার্থকতা। কিন্তু, ছবি আঁকার মত ভাষাশিল্পকেও যে সহজ করে নেওয়া যায়, অথবা সহজ

করে নিলে তবেই তা অনায়াসে সুন্দর হয়ে ওঠে, এ কথা অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে নিজে উপলব্ধি করেন নি। সাহিত্যসৃষ্টির এই মন্ত্র তিনি লাভ করলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। শিল্পসৃষ্টির দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে চিত্রাঙ্কনকে তিনি এর আগেই সহজ করে নিয়েছিলেন, সেই সহজ পথ যে সাহিত্যেরও পথ এ কথা শেখালেন রবীন্দ্রনাথ; সাহিত্যসৃষ্টির সকল উপকরণই অবনীন্দ্রনাথের ছিল। প্রতিভা, সাহিত্যপ্রীতি, শিল্পজ্ঞান, কোনো কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর—একমাত্র আত্মপ্রত্যয় ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিলেন। জগতের একজন শ্রেষ্ঠ আত্মসচেতন শিল্পী একজন শ্রেষ্ঠ আত্মভোলা শিল্পীকে পথ দেখালেন। অবনীন্দ্রনাথ গল্পরচনায় হাত দিলেন; সে কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ নিজেই বিবৃত করেছেন।—

একদিন আমায় উনি বললেন, 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।' আমি ভাবলুম, বাপ রে লেখা— সে আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। উনি বললেন, 'তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।' সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলুম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল', ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাঃ। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। —জোড়াসাঁকোর ধারে

'পল্বলের জল' কথাটিকে যে রবীন্দ্রনাথ কাটতে গিয়েও কাটেন নি, তার কারণ, ওই কথাটির ধ্বনি-সন্নিবেশে এমন-একটি ছবি ফুটে উঠেছে যা বোধ হয় আর কোনো কথা দিয়েই ফোটানো যেত না। এই রকম ছবি ফোটানো অবনীন্দ্রনাথের কাছে সহজ ছিল। দুরূহ সাধনমার্গ পার হয়ে এর আগেই তিনি নিজের ছবি আঁকাকে সহজ করে নিতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় সেই সহজমন্ত্র তিনি সাহিত্যেও প্রয়োগ করবার উৎসাহ পেলেন। আবার এই মন্ত্রসিদ্ধির প্রেরণাতেই তিনি চিত্রশিল্পকেও সহজ করে দিতে অগ্রসর হলেন। তিনি বলেছেন—

তখন আর্ট শেখা ছিল মহা ভয়ের ব্যাপার। সেটা আমার মনে লেগেছিল। তাই ভেবেছিলুম এই ভয় ঘোচাতে হবে, ছবি আঁকা এত সহজ করে দেব। কারণ এটা আমি নিজে অনুভব করেছি আমার ভাষার বেলায়। রবিকাকা আমাকে নির্ভয় করে দিয়েছিলেন।—ঘরোয়া।

রবীন্দ্রনাথ যখন অবনীন্দ্রনাথের প্রথম বাংলা রচনা 'শকুন্তলা'র একটি কথাও কাটলেন না, তখনই অবনীন্দ্রনাথ নিজেকে আবিষ্কার করলেন; জানলেন যে, শেষ পর্যন্ত সকল শিল্পেরই লক্ষ্য এক— শুধু পথ ভিন্ন। এক শিল্পের সাধনায় যাঁর সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তাঁর পক্ষে অন্য শিল্পের পথ ধরেও সে-লক্ষ্যে পৌঁছনো সহজ। তাই জন্মগত সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী অবনীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের সাধনালব্ধ দিব্যদৃষ্টি ভাষাশিল্পে প্রয়োগ করে প্রথম থেকেই সার্থকতা লাভ করলেন। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ যখন নিজেকে আবিষ্কার করলেন, এবং যখন তাঁর প্রথম রচনা 'শকুন্তলা' রবীন্দ্রনাথের পরিপূর্ণ অনুমোদন লাভ করল, তখনই তিনি সকল শিল্পের মূল ঐক্যটি খুঁজে পেলেন। এর পর অবনীন্দ্রনাথের বাংলা রচনার ইতিহাস ক্রমান্বিত সার্থকতার ইতিহাস।—

সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফুর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে উনি বলেছিলেন 'ভয় কি আমিই তো আছি' সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল। —জোড়াসাঁকোর ধারে

'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয় ১৩০২ সনে বা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। এ বইয়ের একটু পড়লেই অবনীন্দ্রনাথের ভাষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হবে—

তারপর কি হল?

দুঃখের নিশি প্রভাত হল, মাধবীর পাতায় পাতায় ফুল ফুটল, নিকুঞ্জের গাছে গাছে পাখি ডাকল, সখীদের পোষা হরিণ কাছে এল।

আর কি হল?

বনপথে রাজা-বর কুঞ্জে এল।

আর কি হল?

পৃথিবীর রাজা আর বনের শকুন্তলা— দুজনে মালা-বদল হল। দুই সখীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

তারপর কি হল?

তার পর কতদিন পরে সোনার সাঁঝে সোনার রথ রাজাকে নিয়ে রাজ্যে গেল, আর আঁধার বনপথে দুই প্রিয়সখী শকুন্তলাকে নিয়ে ঘরে গেল।

কী আশ্চর্য সহজ ভাষা, অথচ কী অপরূপ তার চিত্রব্যঞ্জনা! মনে হয়, এক শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছবির পর ছবি এঁকে কালিদাসের কাব্যখানিকে সাজিয়ে তুলছেন। সে ছবি রেখায় বর্ণে ছন্দে লয়ে অনবদ্য, তবু সে ছবি কথার। আর, ঐ যে ফুল ফুটল, পাখি ডাকল, পোষা হরিণ কাছে এল, আর সোনার সাঁঝে সোনার রথে রাজা আর আঁধার বনপথে দুই সখী আর শকুন্তলা, তারই বা কী ব্যঞ্জনা!

রবীন্দ্রনাথের গদ্য অপূর্ব, তুলনাহীন। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের ভাষারচনার ইতিহাস বাংলা গদ্যের পুষ্টি ও প্রসারের ইতিহাসের অধিকাংশই জুড়ে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষা সাহিত্যিকের ভাষা; যেমনই তার বিস্তার ও ব্যাপ্তি, তেমনই তার অলংকরণ ও কারুকার্য। অসাহিত্যিক বা অনভিনিবিষ্ট পাঠকও সে ভাষার বৈচিত্র্যে ছন্দে শিল্পচাতুর্যে মুগ্ধ, অভিভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের গদ্য চিত্রশিল্পীর গদ্য, সাধারণ একটি বকের ছবির মত তার আটপৌরে চেহারা, প্রকৃত সহৃদয়তার আতসী কাচ চোখে দিয়ে না দেখলে তার সূক্ষ্ম কারুকার্য চোখে পড়ে না। তাই অবনীন্দ্রনাথের গদ্য এত সহজ, অথচ এর সৌন্দর্যের উপলব্ধি এত বৈদগ্ধ্যসাপেক্ষ। এই সরলতার ফলে সাধারণ পাঠক মনে করে, অবনীন্দ্রনাথের রচনা শুধু ছোটদের পড়বার, ছোটদেরই উপভোগ করবার। অধিকাংশ পাঠক উপলব্ধি করে না যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য যেমন এক দিকে অলংকৃত শব্দসমৃদ্ধ ধ্বনিব্যঞ্জিত ভাষার আদর্শ স্থাপন করেছে, অপর দিকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্য সরল নিরাভরণ অন্তর্ব্যঞ্জনাময় আর-এক জাতীয় ভাষার আদর্শ উপস্থিত করেছে। অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের কোনো অনুকারীর পক্ষেই সে চিত্রময় গদ্য লেখা সম্ভব নয়, তবু এই সহজ সরল অনাড়ম্বর ও আপাত-নিরাভরণ ভাষা যে বর্ণনাত্মক রচনায় বিশেষ উপযোগী, 'রাজকাহিনী'তে অবনীন্দ্রনাথ তা নিজেই প্রমাণ করেছেন।

গদ্যরচনায় হাত দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ একই বছরে (১৩০২) পর পর দু খানি বই লেখেন, 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুল'। এর একটি কাহিনীও অবনীন্দ্রনাথের স্বকল্পিত বা মৌলিক নয়। দুখানিতেই ছবির পর ছবি, পড়ে মনে হয় নিপুণ চিত্রশিল্পী প্রচলিত কাহিনীর রূপসজ্জায় হাত দিয়েছেন। তখন রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ভাষাশিল্পের পথ পেয়েছেন সত্য। কিন্তু তখনও তিনি মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টির সাহস কিংবা প্রেরণা

পান নি। তখনও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তা সাহিত্যিক সত্তাকে অনেকটা ঢেকে রেখেছে। তাই 'ক্ষীরের পুতুলে'ও এই বিবিধ বিচিত্র ছবিরই সমাবেশ দেখতে পাই।—

সে দেশে রাজকন্তের উপবনে নীল মাণিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্তমণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমে গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রং মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে সাড়ি বোনেন। একখানি সাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলেন— দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল, মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল; ষষ্ঠিতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল, রাজার মন্ত্রী হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে দুপুরে রাত এল।

'ক্ষীরের পুতুল' পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের রচনায় চিত্রশিল্পীই প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু এর পর ভারতীতে 'রাজকাহিনী' লিখতে আরম্ভ করার পর তিনি তাঁর ভাষায় চিত্রধর্মিতাকে কিছুটা প্রচ্ছন্ন ও ব্যবহারিক গদ্যরীতির সঙ্গে সমন্বিত ক'রে এক আশ্চর্য বর্ণনাত্মক বা narrative গদ্যের সৃষ্টি করলেন। 'শকুন্তলা' ও 'ক্ষীরের পুতুলে' যে স্পষ্ট চিত্রপ্রবাহ এবং সুরলালিত্য ছিল, 'রাজকাহিনী'র ভাষায় তা সম্পূর্ণ দুর্লক্ষ্য, অথচ অনুপস্থিত নয়। 'রাজকাহিনী'তে ভাষার এ পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। 'শকুন্তলা' কাব্য, 'ক্ষীরের পুতুল' রূপকথা। এসব বইয়ে যে চিত্র ও ছন্দোময় ভাষা উপযোগী, 'রাজকাহিনী'র ঐতিহাসিক বিবরণে সে ভাষা ঠিক মানায় না। 'রাজকাহিনী'র বর্ণনাত্মক ভাষা সৃষ্টি করা অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে এ সময়ে আর শক্ত ছিল না। কেননা, প্রথমে তিনি চিত্রশিল্পীরূপেই সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম দু খানি বই লেখার পর সাহিত্যশিল্পীরূপে তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সাহসের অভাব তখন আর অবনীন্দ্রনাথের ছিল না।

'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র কাব্য ও চিত্রময় ভাষা যে সর্বপ্রকার রচনার উপযোগী নয়, 'রাজকাহিনী' রচনায় হাত দিয়ে এ কথা অবনীন্দ্রনাথ অনুভব করে থাকাই সম্ভব। কারণ, ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধমূলক কাহিনীর উপযোগী বর্ণনাত্মক ভাষার পরীক্ষা যেমন তিনি করেছিলেন 'রাজকাহিনী'তে, তেমনি আদর্শ-মূলক গম্ভীর বিষয়ের উপযোগী ভাষা নিয়েও এ-সময়ে তিনি পরীক্ষা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাই দেখতে পাই, শ্রাবণ ১৩০৫এর রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকায় 'দেবীপ্রতিমা' নামে উচ্চাদর্শময় গল্পে অবনীন্দ্রনাথ অতি গম্ভীর, অনতিসরল, সাধু ও সংস্কৃতবহুল গদ্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধু ও সংস্কৃত-শব্দবহুল হলেও অবনীন্দ্রনাথের সহজ চিত্ররচনার প্রতিভা এ রচনাতেও ফুটে উঠেছে।—

দেবীর চরণামৃতে পবিত্র, গুরুর আশীর্বাদে সৌরভিত, ভক্তসহস্রের প্রীতিরসে প্রফুল্ল শুভ্র বিজয়মাল্য শিরে বহন করিয়া আমি নির্জন কক্ষে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দারগন্ধা সেই অমলামালা সমস্ত দেহে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া— চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায়, বন্ধুর স্নেহের ন্যায় সুখস্পর্শে আমার হৃদয়পথকে পলকে পলকে বিকশিত করিল।...

আমি সেইদিন সায়াহ্নে— ভক্তের ভক্তির ন্যায় নির্মল, নারীর স্নেহের ন্যায় কোমল, সঞ্চিত পুণ্যরাশির ন্যায়, যশস্বীর সুযশের ন্যায় অমন ধবল লঘুভার বিস্তীর্ণ উত্তরীয়যুগলে শোভিত এবং গুরুর প্রসাদচন্দনে চর্চিত পবিত্র মাল্যদামে ভূষিত হইয়া গুরুদেবের পার্শ্বে লোকেশ্বরীর প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম। পশ্চাতে লোকলোকেশ্বরীর মন্দিরের মহা বিস্তীর্ণ স্তম্ভশ্রেণীবেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, জনতার কোলাহলে ভক্তি উচ্ছ্বাসে স্ফীত তরঙ্গিত পরিপূর্ণ; আকাশ কলাপীর কণ্ঠের ন্যায় নীল মসৃণ কোটিতারকায় উজ্জ্বল এবং সেই পূর্ণসন্ধ্যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ঈষদুদ্ভাসিত, নিঃশব্দ গম্ভীর পাষাণ মন্দিরের গভীর অন্ধকারে, পাষাণময়ী লোকেশ্বরী-প্রতিমার চরণতলে স্বর্ণবিজড়িত রত্নখচিত আরতি প্রদীপের সহস্র শিখা, সহস্রভক্তের একাগ্রচিত্তের ন্যায়, নিষ্কম্প নিশ্চল নিষ্কলুষ জ্বলিতেছিল।

আত্মপ্রতিকৃতি
শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ রচনায় অবনীন্দ্রনাথ সচেতনভাবে বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র রচনারীতি অনুসরণ করেছিলেন কি না জানা নেই, কিন্তু এ ভাষা 'কাদম্বরী'কেই স্মরণ করায়। কিন্তু ভাষা নিয়ে এজাতীয় পরীক্ষায় অবনীন্দ্রনাথ আর অগ্রসর হন নি। সকলপ্রকার আভরণ ও কারুকার্যহীন বর্ণনার যে ভাষা তিনি 'রাজকাহিনী'তে উপস্থিত করলেন, তা এক দিক থেকে বাংলা গদ্যের আদর্শস্বরূপ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, 'রাজকাহিনী'তে অবনীন্দ্রনাথ যে সহজ সরল বর্ণনা-বিবরণের ভাষার আদর্শ উপস্থিত করেছেন তা পরবর্তী গদ্যলেখকদের প্রভাবিত করেছে এবং আধুনিক লেখকদের ঋজু তির্যক্ বিবরণ বা narrationএর ভাষা 'রাজকাহিনী'র ভাষার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। সরল, অনলংকৃত, অথচ ছন্দোময় গদ্যের আদর্শ হিসাবে 'রাজকাহিনী'র ভাষার কোনো তুলনা নেই। এর অতি সাধারণ বিবরণের মধ্যেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সহজ ও স্বাভাবিক চিত্রপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন—

> সেখানে যত শিষ্ট, শান্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরনার ঝর্ঝর, আশ্চর্য-আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন।—গোহ
>
> বাদশা ঘোড়া থামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন ; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিনশো গজ আকাশের উপর থেকে, এক টুকরো পাথরের মতো সেই দুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল।—পদ্মিনী
>
> একটা ঝড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘরবাড়ি জলস্থল আকাশ দুলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝরঝর করে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে চলে গেল ; তারপরে মেঘ আস্তে-আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রিশেষের সঙ্গে রুপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি ছোট পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল ; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের সকাল বেলার ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ !—চণ্ড

মহৎ প্রতিভার একটা লক্ষণ এই যে, তা কখনো নিজের সৃষ্টির অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি করে না। অবনীন্দ্রনাথও নিজের সৃষ্টির পদ্ধতিতে বাঁধা পড়লেন না। 'রাজকাহিনী'র এই আশ্চর্য ভাষাকেও তিনি অতিক্রম ক'রে গেলেন।

অবনীন্দ্রনাথের ভাষার এ পরিবর্তনের কারণ এবং প্রয়োজন ছিল। এ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ পূর্বতন সাহিত্যের ঠিক অনুবাদ না হলেও নবরূপায়ণেই তাঁর বাংলা রচনাকে নিবদ্ধ রেখেছিলেন। বোধ হয় নূতন সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়ে তিনি প্রথমে নিজের অসাধারণ কল্পনাশক্তিকে সাহিত্যে মুক্ত করতে সাহসী হন নি। কিন্তু এর পরে অবনীন্দ্রনাথ যে বইগুলি লিখেছেন, সেগুলিতে তাঁর অসাধারণ কল্পনাশক্তির সঙ্গে তাঁর শিল্পীমানসের এক অপরূপ সমন্বয় দেখতে পাই। গুণেন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণতার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন। এই কল্পনাশক্তি আরো বহুগুণে বর্ধিত হয়ে অবনীন্দ্রনাথের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার এই অলোকসামান্যতা লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "এ রকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই।" সে কল্পনা বাস্তবজগতের সীমানা ছাড়িয়ে উদ্ভট, অসম্ভব, আজগুবির রাজ্যেই বিচরণ করতে ভালোবাসত। 'রাজকাহিনী' প্রথম খণ্ড রচনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর এই অলৌকিক কল্পনাশক্তিকে অবনীন্দ্রনাথ মুক্ত করে দিলেন তাঁর প্রথম মৌলিক

রচনা 'ভূতপত্‌রীর দেশ'-এ। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি 'ভারতশিল্প' সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন। কিন্তু এটি এবং পরবর্তী শিল্পপ্রবন্ধের বইগুলিতে ব্যবহারের উপযোগী সাধারণ সহজ ও ঋজু বর্ণনা বিবরণের ভাষার আদর্শ তিনি নিজেই 'রাজকাহিনী'তে স্থাপন করেছিলেন। এ বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাতারূপে দেখা দিয়েছেন বলে, এখানে আর তাঁকে নূতন ভাষা সৃষ্টি ক'রে নিতে হয় নি। কিন্তু যখনই তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ কল্পনার পথ ধরে স্রষ্টারূপে আজগুবির রাজ্যে প্রবেশ করলেন, তখনই তাঁকে সেই 'নিয়মহারা হিসাবহীন' ভাব কল্পনার উপযোগী নূতন ভাষাও সৃষ্টি ক'রে নিতে হল। এই অদ্ভুত আশ্চর্য কল্পনা নূতন নূতন আজগুবি ছবি নিয়ে ফুটে উঠল অবনীন্দ্রনাথের তদুপযোগী ভাষায়।

ছ্যাখো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরী হয়েছে, আমাদের মত দুচারিটি গাছ-ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই— নদী নেই, পাহাড় নেই, এমন কি বাতাসে শব্দটি পর্যন্ত নেই ;— কেবল বালি ধুধু করছে— ঠিক এই জায়গাটার মত। আমার তখন সবেমাত্র কচি-কচি দুটি কাঁটা বেরিয়েছে— ছোট ছেলের কচি কচি দুটি দাঁতের মত। সেই সময় তারা গান বড় ভালোবাসে, তারা দেখতে অনেকটা মানুষের মত, কিন্তু ফড়িংগুলোর মত তাদের ডানা আছে, পাখিগুলোর মত পা, ঝাঁক বেঁধে তারা আমাদের কাছে উড়ে এসে বসল আর গান গাইতে আরম্ভ করলে। আকাশ, বাতাস তাদের গানের সুরে যেন বেজে উঠল। সে যে কি চমৎকার তা তোমাকে আর কি বলব ! আমরা তার আগে শব্দ শুনিনি, গানও শুনিনি— আনন্দে যেন শিউরে উঠলুম।

প্রথম সৃষ্টির যে আনন্দ, তাকে আজগুবি কল্পনার তুলিতে এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ। শিল্পীর সঙ্গে মিলেছে অদ্ভুতরাজ্যের কবি। কল্পনা এখানে চলেছে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে চোখের দেখার— ইন্দ্রিয় সীমানার বাইরে। তাই ভাষাও এখানে দীর্ঘায়িত বাক্যে, ক্রমান্বিত অন্তর্বাক্যে ( parenthesis ) তার বর্ণনা প্রবাহে একরূপ থেকে আরেক রূপে অসংলগ্ন ছায়াছবির মত বয়ে চলেছে। অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট আজগুবি কল্পনা-কাহিনীর ঐ বইটি থেকে আরো উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা যায় না।—

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-গাছ সে-গাছ ক'রে ঘুরে বেড়াতে লাগল ; তারপর আস্তে আস্তে মাটিতে নেমে এল। সেই সময় দেখি পূর্ণিমার চাঁদের মত প্রকাণ্ড একটা কাচের গোলা মাঠের উপর দিয়ে বোঁ বোঁ করে গড়িয়ে আসছে— যেন একটা মস্ত আলোর ফুটবল ! • •

গেছি পাল্কিসুদ্ধ গোলাটার ভিতরে ঢুকে গেছি। হাঁড়ির ভিতরে গাছের মত আর পালাবার জো নেই। একেবারে গড়িয়ে চলেছি,— বন্‌বন্ করে লাঠিমের মত ঘুরতে ঘুরতে। সে কি ঘুরুনি ! মনে হল, আকাশ ঘুরছে, তারা ঘুরছে, পৃথিবী ঘুরছে, পেটের ভিতর আমার মাসির মোয়াগুলোও যেন ঘুরতে লেগেছে। কখনো মাঠের উপর দিয়ে, কখনো গাছের মাথা ডিঙিয়ে, গোলাটা সাদা খরগোসের মত লাফিয়ে গড়িয়ে, কখন জোরে, কখন আস্তে আমাকে নিয়ে ছুটে চলেছে !

ভয়ে দুই হাতে চোখ ঢেকে চলেছি। ক্যাঁ-কোঁ চরকা কাটার শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখি এক বুড়ি সুতো কাটছে আর একটা খরগোস তার চরকা ঘুরোচ্চে। বুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি ! যে চাঁদের ভিতরে বসে থাকে, আর ওই তার চরকা, ওই খরগোস !

অসম্ভব কল্পনার রাজ্যে গোটা চাঁদটাই তার বুড়ি আর খরগোস সুদ্ধ গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষের একেবারে কাছে এসে পৌঁছয়। 'ভূতপত্‌রী'র ভাষা এই উদ্ভট কল্পনার আঁকাবাঁকা পথ-বাওয়া ভাষা ; অথচ আশ্চর্য এই যে, এখানেও অবনীন্দ্রনাথের ভাষার সেই সরলতা আর চিত্রধর্ম হারায় নি। যেমন—

আমার বাঁদিকে কেবল বালি— সাদা ধপ্‌ধপ্ করছে বালি ; আর আমার ডানদিকে রয়েছে কালি-গোলা সমুদ্দুর— কালো,— কাজলের মতো কালো, বাঁয়ে চলেছে হারুন্দে— ডাঙার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ্‌কিন্দে— জলের আদি-অন্ত কইতে কইতে ; আমি চলেছি পাল্কিতে শুয়ে মনে মনে দুজনের দুটো গল্প সাদা একটা শেলেটের উপরে কালো পেন্‌সিল্ দিয়ে লিখে নিতে নিতে।

তার পর 'হারুন্দের গল্প' আর 'কিচ্‌কিন্দের গল্প'— বাংলা সাহিত্যে নূতন এক ধরণের সাহিত্যের অবতারণা করল, যার অনুরূপ আজগুবি কল্পনার সাহিত্য বাংলায় এর আগে বড় বেশি লেখা হয় নি; ইংরেজীতে *Alice in Wonderland* প্রভৃতিতেই যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ভূতপত্‌রী' রচনাকালে *Alice in Wonderland* এর কিছুটা প্রভাব হয়তো অবনীন্দ্রনাথের উপর পড়েছিল— 'পাল্কির গান'এর বিকৃত রূপ 'Twinkle Twinkle little bat' এবং 'You are old Father William' প্রভৃতি মনে পড়ায়— কিন্তু কাহিনী-গ্রন্থনে উল্লিখিত বিশ্ববিখ্যাত বইটির কোনো প্রভাবই অবনীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পায় নি। বরং, আরব্যোপন্যাস ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সব কিছুকে তাঁর উদ্ভট কল্পনায় মিশিয়ে তিনি এমন আজগুবি রূপ দিয়েছেন যে, সে-সব রচনার কোনো অংশই মৌলিক না হলেও সবটা মিলে সম্পূর্ণ অভিনবত্ব ও অসাধারণ মৌলিকত্ব লাভ করেছে। বস্তুতঃ, এইটেই অবনীন্দ্রনাথের রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর কোনো গ্রন্থের কাহিনীকেই সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা বলা যায় না, অথচ তাঁর প্রত্যেকটি রচনাই একান্তরূপে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব সৃষ্টি। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থেই পুরাতন উপকরণ নিয়ে নূতন সৃষ্টির কৌতুকটি প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত, কিন্তু দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

নানাদিক থেকে বিচার ক'রে 'ভূতপত্‌রী দেশ' বইখানি অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও অসাধারণত্বের পরিচয়রূপে আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথের মন যে ঠিক গতানুগতিক কল্পনা ও কাহিনীর পথ বেয়ে চলত না 'ভূতপত্রী' বইটিতে এ কথা খুব স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে, এবং এর পর থেকে অবনীন্দ্রনাথ কোনো বইয়েই তাঁর এই অদ্ভুত রাজ্যের কল্পনাকে মুক্তি দিতে দ্বিধা করেন নি।

'ভূতপত্‌রী' বাংলা সাহিত্যে আবোলতাবোল জাতীয় আজগুবি কল্পনাময় কাহিনীর প্রথম রচনা, এ কথা বলা যায় না। কারণ এর আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনার পথ ধরে তাঁর সুবিখ্যাত 'কঙ্কাবতী', 'ডমরু চরিত', 'মুক্তামালা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন; কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের আজগুবি কাহিনী এবং অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রী' প্রভৃতির আজগুবি খেয়ালী রচনায় অনেক প্রভেদ। ত্রৈলোক্যনাথের অদ্ভুত কাহিনীগুলি প্রায় সবই ব্যঙ্গাত্মক বা রূপকধর্মী অথবা tall tale জাতীয়— তাদের প্রকৃত আবোল-তাবোল জাতীয় নিছক আজগুবি কল্পনাময় রচনার সঙ্গে তুলনা করা চলে না। ত্রৈলোক্যনাথেরও কল্পনাশক্তি প্রবল ছিল, কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কল্পনার প্রকৃতি ভিন্ন। সেইজন্য প্রকৃত আজগুবি কল্পনার চিত্র ও কবিত্বের আলো-আঁধারিতে মেশা phantasy হিসেবে অবনীন্দ্রনাথের 'ভূতপত্রী' সম্পূর্ণ তুলনাহীন।

আমার বিশ্বাস অবনীন্দ্রনাথের এই উদ্ভট কল্পনার বাঁকাচোরা ভঙ্গি বাংলা সাহিত্যের দু'জন প্রখ্যাত লেখককে প্রভাবিত করেছিল। একজন অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অপরজন 'হযবরল'-রচয়িতা সুকুমার রায়। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের কল্পনা যেখানে কাহিনীর পথ ত্যাগ ক'রে অসংলগ্নতার বিস্তীর্ণ আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, সে ক্ষেত্রে এঁদের আজগুবি কল্পনা মূল কাহিনীর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থেকে একটি সুসম্বদ্ধ আকারে রূপ নেয় বলে পাঠকের কাছে তা বেশি চিত্তাকর্ষী মনে হয়।

এই যে আজগুবি কল্পনাময় কবিত্বের জগৎ— অবনীন্দ্রনাথের শিল্পমানসের স্বরূপ এর মধ্যেই যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। এই হিসাবে অবনীন্দ্রনাথকে দেওয়া রবীন্দ্রনাথের 'পাগল' উপাধি সার্থক। পরবর্তী প্রায় সকল বইতে অবনীন্দ্রনাথের এ 'নিয়মহারা' কল্পনা প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং তাঁর ভাষাও তদনুযায়ী দীর্ঘায়িত হয়ে বিশেষণ-বর্ণনা অন্তর্বাক্যের প্রয়োগে তাঁর বাক্যগুলিকে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে।

'ভূতপত্‌রীর দেশ' বইটিতে অবনীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ঘরছাড়া দিকহারা উদ্ভট ও আজগুবি কল্পনার প্রতি তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতাকে মুক্তি দিলেন; এবং এর পর থেকে এ-জাতীয় অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক কল্পনায় গড়া কাহিনীতেই যেন বেশি মনোনিবেশ করলেন। ফলে তাঁর 'খাতাঞ্চির খাতা'র মত বাস্তব ও কল্পনায় মেশা বর্ণনা, কবিত্ব ও চিত্রময় কাহিনীটি শিশু বা বয়স্ক কোনো সমাজেই জনপ্রিয় হল না, এবং তাঁর ভাষাও এই উদ্ভট আজগুবির পথ ধরে এমনই আঁকাবাঁকা পথে অগ্রসর হল, যে রাজকাহিনীর ভাষার মত এ-ভাষার সৌন্দর্য আর অত সহজে পাঠক সাধারণের কাছে ধরা দিল না। 'খাতাঞ্চির খাতা'র মত এমন অপরূপ কবিত্বপূর্ণ, চিত্রধর্মী, অসাধারণ কল্পনাময় কাহিনী বাংলা সাহিত্যে আর একখানি খুঁজে পাওয়া শক্ত। এবং ভাষাও ঠিক সেই অসাধারণত্বের সঙ্গেই তাল রেখে চলেছে বলে, তার অনুকরণ বা অনুসরণও অসম্ভব। যেমন—

দিনের বেলায় সহরের এই যে হাজার-হাজার ইটের বাড়ী আর কলের চিম্‌নি দেখছ, রাত নটার তোপ যেমন পড়বে, সব অমনি বাগান আর বাজার আর মাঠ আর পুকুর হয়ে যাবে। থাকবার মধ্যে থাকবে রাজার কেল্লা, রায়-মহাশয়দের বৈঠকখানা আর এই জোড়াসাঁকো, আর এই তেতলা বাড়ী! বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আমি বাজে কথা বলছি? আচ্ছা সকালবেলা পুবদিকের আকাশে লাল রঙের একটা ফানুস দেখতে পাও— সাদা ফানুস থাকে না তো? রাত্তিরে দেখো দিকি, সেখানে সাদা একটা ফানুস ঝুলছে দেখবে— আবার সেটা কখনো দেখাবে রুপোর বাটি যেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো বা দেখবে যেন একখানি নৌকো ভাসছে। তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা দিনের বেলায় আকাশে নীলরং, পাখী আর মেঘ, এ ছাড়া কিছু তো দেখ না— রাতের বেলায় আকাশে দেখো, সব তারা ফুটেছে দেখবে! এ যদি হতে পারে, তবে আর রাত হলেই সহরটা বাগান হতে পারবে না কেন? দুপুর-রাতে ভূতের ভয়ে ছাদে উঠতে পারো না, তাই বলো! না হলে দেখতে পেতে, সব বাড়ী-ঘর-দুয়োর কোথায় মিলিয়ে গেছে; কেবল চারিদিকে সব সারি-সারি আলোর নিশেন ঝুলছে— চৌকো, লম্বা, চওড়া, সরু, তরো-বেতরো; আর কেবল রাজার বাড়ীর চুড়ো, রায়মহাশয়দের বৈঠকখানার বারাণ্ডা, আর আমাদের চিলের ছাদটা একটু একটু দেখা যাচ্ছে— আর কিছু নেই।

এখানে বাস্তব জগতের দেখা ছবি আজগুবি কল্পনায় মিশে যে বাঁকাচোরা রূপ নিয়েছে, এ-ভাষাতেও সেই উদ্ভট, অদ্ভুত বাঁকাচোরা গতি। এ-ভাষায় 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র সেই কবিত্বের প্রবাহ নেই, 'রাজকাহিনী'র ঋজু, সরল বিবরণের ভাষার সঙ্গেও এ ভাষা সম্পূর্ণ এক নয়। অবনীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ভাষা পূর্বপ্রচলিত কাহিনীর ভাব ও বক্তব্য অনুসরণ ক'রে কবিত্বমণ্ডিত বা ঋজুসরলতায় বয়ে চলেছিল, কিন্তু 'খাতাঞ্চির খাতা'য় তা অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট কল্পনার উৎকেন্দ্রিক পথে চলেছে।

'ভূতপত্‌রী দেশ' যে বইতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয় কল্পনাকে মুক্তি দিয়ে নিজ মনোমত মৌলিক রচনায় হাত দিলেন, সেখান থেকেই তাঁর পরবর্তী মৌলিক রচনাগুলির ভাষা ও ভঙ্গির সূত্রপাত হল বলা যায়। 'খাতাঞ্চির খাতা'য়ই কেবল অবনীন্দ্রনাথ অ-লৌকিক কল্পনাপ্রবণতাকে আরো বেশি ক'রে প্রকাশ করলেন না, তাঁর শেষ জীবনের যাত্রাপালাগুলিতেও এই অসাধারণ কল্পনাজগতেই কাহিনী ও ভাষাকে নিবদ্ধ রাখলেন। এ-সব রচনার হাস্যরস, কল্পনা, ভাষা ও ভঙ্গি কোনো কিছুই গতানুগতিক পরিবেশে অভ্যস্ত সাধারণ পাঠকের অধিগম্য নয় বলে, অবনীন্দ্রনাথের এ-রচনাগুলি মুষ্টিমেয় সূক্ষ্মব্যঞ্জনাবিলাসী সাহিত্যরসিকেরই মাত্র প্রিয় হয়ে রইল।

'ভূতপত্‌রী দেশ' ও 'খাতাঞ্চির খাতা' এই দু খানি সমধর্মী বইয়ের মাঝখানে অবনীন্দ্রনাথ আর দুখানি আশ্চর্য সহজ সরল সুন্দর গদ্যগ্রন্থ রচনা করলেন—'নালক' আর 'পথে বিপথে'। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের ঋজুতা,

ছন্দোমাধুর্য আর চিত্রময় অপরূপ বর্ণনাভঙ্গি দু'খানি বইয়েই বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে। 'পথে বিপথে'তে যে স্মৃতিচিত্রময় কাহিনীকে কবিত্ব, কল্পনা ও প্রাণময় বর্ণনায় অবনীন্দ্রনাথ উপস্থিত করলেন, সেই স্মৃতিকল্পনার ছবিছন্দে জড়ানো ভাষা অনেকদিন ধরে অবনীন্দ্রনাথের হাত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। 'আপন কথা' 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে— অবনীন্দ্রনাথের ভাষার এই সহজ সরল অন্তরঙ্গ রূপটি দেখতে পাই। এই ভাষারও আদর্শ মূলতঃ অবনীন্দ্রনাথেরই 'রাজকাহিনী'র ভাষা। কিন্তু এখানেই তা বৈঠকী ভঙ্গিতে ব্যক্তিগত স্মৃতির জগতে এসে সেই ইতিহাস-আখ্যানের বর্ণনা-বিবরণের ভাষা অতিক্রম ক'রে একান্ত অন্তরঙ্গ, হৃদয়ের সন্নিকটবর্তী মাধুর্যময় ভাষায় পরিণত হয়েছে।

যদিও 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র ভাষার তুলনা নেই, এবং বাংলাসাহিত্যে অনুরূপ অন্তরঙ্গতাময় অথচ খুঁটি-নাটি বর্ণনার চিত্রময় ভাষা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া অসম্ভব, তবু, যেহেতু এগুলি শ্রীযুক্তা রানী চন্দ-দ্বারা অনুলিখিত অবনীন্দ্রনাথের মুখের ভাষা, সেহেতু এগুলিকে অবনীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ নাও করা যেতে পারে। কিন্তু 'পথে বিপথে' 'আপন কথা' ও 'মাসি'তে যে কল্পনার রঙে আঁকা, সহজ সরল অথচ একান্ত অন্তরঙ্গ কবিত্বময় ভাষার সাক্ষাৎ পাই বাংলাসাহিত্যে তার তুলনা কোথায়?

এর পর আর দুখানি কাহিনী অবনীন্দ্রনাথ এই গদ্যে— কিম্বা এই ঋজু সরল গদ্যের সঙ্গে 'ক্ষীরের পুতুল'এর কবিত্ব-কল্পনাকে এবং উদ্ভট কল্পনার বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে সমন্বিত করে লিখলেন,— 'বুড়ো আংলা' ও 'আলোর ফুলকি'।

সহজ অথচ কবিত্বময়, ঋজু ও সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনাময়, বর্ণনাত্মক অথচ কল্পনাসমৃদ্ধ, চিত্রধর্মী গদ্যের আদর্শ হিসাবে আমার মনে হয়, 'নালক' 'বুড়ো আংলা' ও 'আলোর ফুলকি'র ভাষা বাংলাসাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। 'নালক' 'আলোর ফুলকি' প্রভৃতি বইগুলির ভাষা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে, এবং এ-ভাষার পরিচয় দিতে হলে বহু উদ্ধৃতি দিয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায় না। এ-ভাষা সম্বন্ধে শুধু এটুকু লক্ষ্য করবার যে, 'রাজকাহিনী'র সহজ সরল বর্ণনাত্মক ভাষার সকল গুণ এ-ভাষায় উপস্থিত, এবং তার সঙ্গে মিশেছে, আরো সংযতরূপে, 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুলে'র কবিত্ব এবং অবনীন্দ্রনাথের সহজ চিত্রব্যঞ্জনা। তাই এই ভাষার পরিণত রূপের দিকে লক্ষ্য করলে মনে হয়, কেবলমাত্র ভাষাশিল্পী হিসাবে বিচার করলে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনার যোগ্য।

অথচ আশ্চর্য এই যে, আজ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথ বাংলার প্রধান গদ্যলেখকদের মধ্যে পরিগণিত হন নি। এর কয়েকটি কারণ সহজেই মনে আসে। প্রথমতঃ, তিনি রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র; রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার দীপ্তি তাঁর পরিবারের সকলের প্রতিভা ও কৃতিত্বকেই কিছুটা প্রচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সাহিত্যক্ষেত্রে যে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সৌরদীপ্তির পাশে প'ড়ে তা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে বলেই, তদনুযায়ী খ্যাতি তাঁরা লাভ করতে পারেন নি। এঁদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম কৃতী-লেখকও রবীন্দ্রপরিবারভুক্ত না হয়ে এর চেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কৃতিত্বের সমুচিত স্বীকৃতি না হওয়ার দ্বিতীয় কারণ, চিত্রশিল্পে তাঁর অসামান্য খ্যাতি। চিত্রশিল্পের খ্যাতি অবনীন্দ্রনাথের ভাষাশিল্পের যথাযোগ্য খ্যাতিকে প্রচ্ছন্ন করেছে। তৃতীয় কারণ, যা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কারণ বলে মনে হয়, তা এই যে, অবনীন্দ্রনাথ মৌলিক গল্প-উপন্যাস বা কাহিনী-উপাখ্যান লেখেন নি বললেই হয়। তাঁর অধিকাংশ রচনাই হয় প্রাচীন

বিষয়ের নবরূপায়ণ, নতুবা স্মৃতিচিত্র, অথবা উদ্ভট আজগুবি রাজ্যের আলো-আঁধারিতে মেশা কাহিনী বা যাত্রা পালা। বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে শেষোক্তগুলিরও উপাদান প্রাচীন আখ্যান-উপন্যাস-পুরাণ-ইতিহাস থেকেই নেওয়া। আমাদের দেশে কবিতা-গল্প-উপন্যাস, বিশেষ করে শেষের দুটি না লিখলে সাহিত্যিকরূপে খ্যাতি অর্জন দূরে থাক, গণ্য হওয়াই শক্ত। কাজেই লেখক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে অধিকাংশ পাঠকই হৃদয়ংগম করেন না, এটা আশ্চর্য নয়। বিশেষতঃ, অবনীন্দ্রনাথের ভাষার প্রকৃত অসাধারণত্বের উপলব্ধি বৈদগ্ধ্যসাপেক্ষ। পূর্বেই বলেছি, সহজ সরল নিরাভরণ এ ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য সাধারণ পাঠকের চোখ এড়িয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই অবনীন্দ্রনাথ, যিনি গল্পলেখক নন, ঔপন্যাসিক নন, প্রচলিত অর্থে কবিও নন, তিনি মুষ্টিমেয় অনুরাগী পাঠকের কাছেই মাত্র একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাশিল্পীরূপে শ্রদ্ধেয় হয়ে রইলেন। বয়স্করা অতিসরল, অথবা উদ্ভট-আজগুবি ব'লে তাঁর রচনাগুলিকে ছোটদের পাঠ্য বলে ধরে নিল, আর ছোটরা 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' 'নালক' এবং কিছু পরিমাণে 'বুড়ো আংলা' ভিন্ন আর কোনো বইয়েরই ভাষা কল্পনা কবিত্ব ও চিত্রগুলির প্রকৃত রস গ্রহণ করতে সমর্থ হল না। কারণ একমাত্র 'ভূতপত্‌রী' ভিন্ন 'খাতাঞ্চির খাতা' বা যাত্রাপালা জাতীয় বাস্তবে ও আজগুবি কল্পনায় মেশা বইগুলির প্রকৃত রস সাধারণ শিশু বা কিশোরদের পক্ষে অনুভব করা অসম্ভব। এ-সব বই অধিকাংশ বালক-বালিকারই ভালো না লাগা স্বাভাবিক।

আসলে এসব বইয়ে অবনীন্দ্রনাথের যে-মনটির পরিচয় পাওয়া যায়, তা শিশুর মত সরল ও কল্পনাপ্রবণ হলেও মহৎ শিল্পীর সূক্ষ্ম কবিত্ব ও শিল্পচেতনা-সমৃদ্ধ। এ-মনটির সংস্পর্শে এলে তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না; এবং কেবলমাত্র ভাষার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করলে, সে ভাষায় মুগ্ধ বিস্মিত ও অভিভূত না হওয়াও অসম্ভব মনে হয়।

অবনীন্দ্রনাথের রচনাগুলিকে প্রধানতঃ চার ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এক, প্রাচীন সাহিত্য উপন্যাস ইতিহাস ও বিদেশী কাহিনী প্রভৃতির উপর ভিত্তি ক'রে রচিত তাঁর 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' 'বুড়ো আংলা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি। দুই, তাঁর শিল্প সম্বন্ধীয় বইগুলি। তিন, স্মৃতিচিত্র-জাতীয় বইগুলি। চতুর্থ, তাঁর আজগুবি কল্পনার মুক্তাকাশবিহারী 'ভূতপত্‌রীর দেশ' 'খাতাঞ্চির খাতা' এবং যাত্রাপালাজাতীয় গ্রন্থগুলি। প্রথম শ্রেণীর বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ যে ভাষার অবতারণা করেছেন, সহজ সরল কবিত্ব ও চিত্রব্যঞ্জনায় ভাষার দৃষ্টান্ত হিসাবে সেগুলি তুলনাহীন। বর্ণনাত্মক ব্যবহারিক ভাষার এক আশ্চর্য আদর্শ রূপ এগুলিতে দেখতে পাই। এই ঋজু তির্যক সহজ ভাষা সাহিত্যে কবিত্ব চিত্র ও ব্যঞ্জনাময় রূপ নিলেও, এই ভাষাই যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তার কবিত্ব বর্জিত হয়ে ব্যবহার হবার যোগ্য, শিল্প-প্রবন্ধের বইগুলিতে অবনীন্দ্রনাথ তা প্রমাণ করেছেন। বস্তুতঃ রাজকাহিনীর ভাষা এবং শিল্প-প্রবন্ধাবলীর ভাষা আধুনিককালে ব্যাখ্যা ও বিবরণাত্মক ভাষার এক আদর্শ স্থাপন করেছে। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিচিত্র জাতীয় 'পথে বিপথে' 'আপন কথা' 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'মাসি' প্রভৃতি বইগুলিতে কবিত্ব অপেক্ষা চিত্র বেশি, এবং তা আরো অসাধারণত্ব লাভ করেছে সেই চিত্রের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের অদ্ভুত কল্পনায় মিশ্রিত হয়ে। তাই তাঁর চোখে-দেখা ঘটনার বর্ণনাগুলিও অ-লৌকিক জগতের ছায়াছবি বলে মনে হয়। চতুর্থ শ্রেণীর বইগুলি অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভট আজগুবি লোকোত্তর কল্পনার সৃষ্ট অসম্ভব রাজ্যের কাব্য। এবং, আমার মনে হয়, এই রাজ্যে বিহার করার দিকেই অবনীন্দ্রনাথের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। শেষজীবনে যে তিনি

পুরাণ কাহিনী ইতিহাস প্রভৃতিকে আজগুবি কল্পনায় মিশিয়ে যাত্রাপালাজাতীয় রচনাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন, এতেও এই কথারই যেন সমর্থন পাওয়া যায়।

এই যাত্রাপালাগুলি অবনীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব শিল্পলোকের সৃষ্টি। শিল্পসম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমি তো বলি যে আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে— একতলা, দোতালা, তেতলা। একতলার মহলে থাকে দাসদাসী তারা সব জিনিস তৈরি করে।…তারা হচ্ছে সার্ভার, মানে ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যান— তারা একতলা থেকে সব-কিছু ক'রে দেয়। দোতলা হচ্ছে বৈঠকখানা। সেখানে থাকে ঝাড়লণ্ঠন, ভালো পর্দা, কিংখাবের গদি, চারদিকে সব-কিছু ভালো ভালো জিনিস, যা তৈরি হয়ে আসে একতলা থেকে, দোতলার বৈঠকখানায় সে-সব সাজানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, আসেন সব বড়ো বড়ো রসিক পণ্ডিত। সেখানে সব নটীর নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি— শিল্পদেবতার সেই হল খাস-দরবার। তেতলা হচ্ছে অন্দরমহল, মানে অন্তরমহল। সেখানে শিল্পী বিভোর, সেখানে সে মা হয়ে শিল্পকে পালন করছে, সেখানে সে মুক্ত, ইচ্ছে-মতো শিশু-শিল্পকে সে আদর করছে, সাজাচ্ছে।

অবনীন্দ্রনাথের যাত্রাপালাগুলি অবনীন্দ্রনাথের সেই অন্দরমহলের কাজ, যেখানে তিনি আত্মবিভোর হয়ে তাঁর স্বকীয় প্রবণতাকে মুক্তি দিতে পেরেছেন। অবনীন্দ্রনাথ যে শেষ জীবনে পুতুল তৈরি করতেন সেগুলিও এই তিন তলারই কাজ। সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলির তাৎপর্য বোঝা শক্ত। এখানে শিল্পী আত্মভোলা, আত্মবিভোর হয়ে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছেন।

অবনীন্দ্রনাথের আজগুবি কল্পনার বইগুলি, এবং বিশেষ ক'রে তাঁর যাত্রাপালাগুলি নিয়ে পৃথক্ ভাবে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে বলে মনে করি। অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে যে স্বাভাবিক অভিনয়-ক্ষমতা এবং অভিনয়-প্রবণতা ছিল, তার সঙ্গে এ বইগুলিতে যুক্ত হয়েছে তাঁর অলৌকিক কল্পনাশক্তি, অদ্ভুত কবিত্ব ও চিত্রব্যঞ্জনাময় ভাষারচনার ক্ষমতা মনের মধ্যে জমানো চোখে-দেখা অজস্র ছবিকে ফুটিয়ে তোলার শক্তি এবং আশ্চর্যমধুর একটি শিশুসুলভ সরল মন।

তবু, ভাষার আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করলে এক দিকে অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' 'ক্ষীরের পুতুল' 'রাজকাহিনী' 'আলোর ফুলকি' ও শিল্প-প্রবন্ধাবলীর ভাষা ও অপর দিকে তাঁর স্মৃতিকথা-জাতীয় 'আপন কথা' 'ঘরোয়া' 'জোড়াসাঁকোর ধারে' 'মাসি' প্রভৃতির ভাষাই সর্বাধিক প্রবলভাবে সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, এবং সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী বলে স্বীকৃত হয়েছে। মনে হয়, অবনীন্দ্রনাথকে বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। এবং একজন প্রধানতম গদ্যলেখক বলে গণনা করবার সময় এসেছে।

# যে দেখতে জানে

লীলা মজুমদার

সাহিত্যসমালোচনার খাতাগুলি থেকে মাঝেমাঝে এক-এক জনার নাম বাদ পড়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে একজন। সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ হল যে, খ্যাতির রাজ্যে অবনীন্দ্রনাথের দু জন বড় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।—এক জনের নাম রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সঙ্গে তুলনা করলে সেই সময়কার অপর সকলের প্রতিভাকেই খর্ব মনে হত; অপর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সেই অবনীন্দ্রনাথ, যিনি ছবি আঁকতেন। বিশেষ করে এই দ্বিতীয় জনের জন্যই সে সময় সাহিত্যক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের তেমন নাম হল না।

সেরকম খ্যাতি তখন পেলেন না, অথচ যেই তাঁর লেখা পড়ত সেই অবাক হয়ে যেত। কলম ধরে এক ছত্র লিখলেই সে লেখাতে আলো ঝলমল করত। কাঁচা হাতের লেখাতেও যেমন, পাকা হাতেও তেমনি। সারা জীবনেও প্রতিভা তাঁর এতটুকু ম্লান হয় নি।

'ক্ষীরের পুতুল' যখন লিখলেন, নবীন বয়স তাঁর, তবু মনে হয় মধুতে ডোবানো কলমের মুখটি। 'মাসি' লিখলেন প্রবীণকালে, তখনো লেখনী থেকে তেমনি মধু ঝরছে, তেমনি নিগূঢ় অর্থ দিয়ে ঠাসা। অথচ এই বড় আশ্চর্য যে, অনেককাল পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের বিষয় লিখতে গেলে তাঁর চিত্রকলা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা হত, কিন্তু সাহিত্যের কথা বিশেষ কিছু বলা হত না।

যে মন্দ জিনিসের আদর করে তার চেয়েও অনেক বেশি অভাজন সেই মানুষ যে ভালো জিনিসের আদর করতে জানে না। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা বাদ দিয়ে কেবল চিত্রকলার কথা বললে তাঁর পরিপূর্ণ প্রতিভার সবখানির স্বীকৃতিও হয় না, উপলব্ধিও হয় না।

রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে তাঁর ছবির কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। বরং এ কথাই বারবার মনে হয় যেসকল জিনিস সাহিত্যে তিনি পরিহার করে চলেছিলেন, হঠাৎ একটি অসতর্ক মুহূর্তে দরজা খোলা পেয়ে হুড়মুড় করে তারা-সব মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছে। লিখতেন মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন সুখদুঃখ আশা নিরাশা ব্যথা আনন্দ বিফলতা ব্যগ্রতা ভালোবাসা নিয়ে; আঁকতেন যত দুঃস্বপ্নে-দেখা কল্পনায়-গড়া সব-মূর্তি। অবনীন্দ্রনাথের বেলা তেমনটি হয় না। তাঁর সারা জীবনের সব প্রচেষ্টা— তাঁর ছোটবেলাকার আশ্চর্য জিনিস খুঁজে বেড়ানো, তাঁর অভিনয়, তাঁর এসরাজ বাজানো, তাঁর লেখা, তাঁর ছবি আঁকা, তাঁর খেলনা তৈরি,— সবটি নিয়ে হিসেব করলে তবে তাঁর জীবনজোড়া রূপের সাধনার কতকটা ধারণা করতে পারা যায়। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে, একটিকে বাদ দিলে অপরটির অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না। যারা শুধু ছবি দেখে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, তারা তাঁর সবখানিকে পেল না।

আসল কথা হল অবনীন্দ্রনাথ কানে কানে খোঁজার মন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন। দুনিয়ার সব চেয়ে বড় রহস্যই হল যে যারা খুঁজতে জানে, তারা কোথাও মূল্যবান কিছু আছে মনে ভেবে খুঁজলেও, সেই একান্ত বাঞ্ছিতকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে চায় না। পাওয়ার মধ্যে যে একটা অন্তিমভাব আছে, এ ধরণের খোঁজাতে তার ঠাঁই থাকে না। যা পাওয়ার অতীত এ তাকেই খোঁজা, তাই সবখানে না দেখা পর্যন্ত এ খোঁজার শেষও হয় না। রূপের সীমানা ছাড়িয়ে যায় যে অরূপ তাকেই খুঁজতেন নাচে গানে, রঙ্গমঞ্চে, নির্জন

একলা অন্ধকার ঘরে, কাচের মার্বেলের ভিতরে, ছবিতে, ফুলেতে, গাছের শুকনো ডালেতে, নুড়ি-পাথরের মাঝখানে। জানতেন, তাকে নয়ন ভরে দেখতে পাওয়াই বহু ভাগ্য; তাকে কখনো হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হয় না। মনের মধ্যে তাকে পেতে হয়, মুঠোর মধ্যে নয়।

রূপের সাধনা করতেন। জানতেন, ও জিনিস কেউ কাউকে দিতে পারে না, উত্তরাধিকার সূত্রেও না। ও তো থলিতে পুরে ঘরের মধ্যে পুঁজি করবার জিনিস নয়; যতদিন-না চোখ খুলে গেল, ওকে চোখে দেখাই যাবে না। প্রত্যেককে দেখতে হবে নিজের মতন করে, নিজের চোখ দিয়ে। একজনার দেখা চুরি করে অপর জন দেখতে পায় না।

বাগেশ্বরী বক্তৃতা দিতে গিয়ে শিল্পের ছাত্রদের বলছেন—

প্রত্যেক শিল্পীকে স্বপ্ন ধরার জাল নিজের মতো করে বুনে নিতে হয় প্রথমে, তার পর বসে থাকা— বিশ্বের চলাচলের পথের ধারে নিজের আসন নিজে বিছিয়ে চুপটি করে নয়— সজাগ হয়ে।

পাওয়ার কথা নিয়ে আরো বলছেন—

মনের ফুল বনের ফুলের সাথী হয়ে ফুটুক, এর বেশিও তো শিল্পর দিক থেকে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার যেখানে যত শিল্পী যত সাহিত্যিক জন্মেছেন সকলের মনের গোপন কথাটাও অবনীন্দ্রনাথ বলে দিচ্ছেন—

এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিথি হলেম, রসের পূর্ণপাত্র তো কারু সঙ্গে ছিল না; একেবারে খালি পাত্রই নিয়ে এলেম, এল কেবল সঙ্গের সাথী হয়ে একটুখানি পিপাসা।

তাই দিয়েই বিশ্বের সেরা সৃষ্টিকারদের চেনা যায়, ঐ একটুখানি পিপাসা, যা অমৃত না পেলে আর কিছুতেই মেটে না।

ছবির সঙ্গে লেখার কতই-না সাদৃশ্য। ছবিতে দেখি পটভূমি হয় সোনালি আলোতে উদ্ভাসিত, সেই আলোর আভা লেগে চিত্রিত রূপখানিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। নয় তো পটভূমি কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, চিত্রিত রূপখানিও তেমনি ছায়াময়, মায়াময়। সমস্ত ছবিটির অর্থের পরমার্থ হয়ে মাঝখানের মূর্তিটি যেন ফুটে উঠেছে।

সাত রঙের ছায়ায় মোড়া ঝিনুকের ভিতরে মুক্তো যেমন ঝিনুকের সমস্ত মর্যাদা নিয়ে অর্থময় হয়ে টলমল করে, তেমনি ছবিতে আঁকা পরিবেশটির সমস্ত মানে নিংড়ে নিয়ে ছবির মূর্তিটিও যেন কায়া ধরে। মূর্তি কোথায় শেষ হয়ে পটভূমি শুরু হল, পটভূমি কোথায় শেষ হয়ে চোখে দেখার বাইরে গেল—হঠাৎ যেন বুঝে ওঠা মুশকিল হয়ে পড়ে।

লেখার মধ্যেও এই রহস্যই দেখি, চোখে-দেখা আর মনে-গড়া একাকার হয়ে গেছে। যে ঘটনা ঘটছে তাকে ঘিরে রয়েছে যে পরিবেশ, সেও যেন ঐ ঘটনার মানুষদেরই যোগ্য হয়ে উঠেছে। গাছপালা ঘরদোর জন্তুজানোয়ার সবার সঙ্গে সবাইকে কেমন মানিয়েছে। এমন লেখা আর কেউ লেখে নি; চোখে শুধু একটু রূপের নিশানা নিয়ে, যা হয় আর যা হয় নি, তার মধ্যে এমন করে কেউ আনাগোনা করে নি।

বইগুলি যে সংখ্যায় খুব বেশি, তাও নয়। আজকালকার লোকে ঐটুকু দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কেনবার আশা বৃথা মনে করে। ভাবে, বিশখানি বই লিখলে তার মধ্যে থেকে যদি পাঁচখানি উতরে যায়, তবেই সার্থক সাহিত্যিক হওয়া গেল।

সেকালের শিশুসাহিত্যিক হতেন যাঁরা, তাঁরা খ্যাতির আশা লাভের আশা ছেড়ে দিয়ে তবে ছোটদের জন্য কলম ধরতেন। তাঁরাই ছিলেন জাতসাহিত্যিক। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রিয়ম্বদা দেবী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায় ইত্যাদি সবাই মিলে যতগুলি ছোটদের বই লিখেছেন সবকটিকে এক সঙ্গে আঙুলে গোনা যায়। সংখ্যা দিয়ে ওসবের পরিমাপ হয় না।

ছোটদের জন্য লিখতে হলে সেকালে লোকসান দিয়ে লিখতে হত, তাই নিতান্ত ভূতে-পাওয়ারা ছাড়া ছোটদের জন্য বড়-একটা কেউ লিখতেন না। আর, ঠাকুরবাড়ির কথা তো ছেড়েই দেওয়া যেতে পারে, কারণ তাঁরা ব্যাবসাক্ষেত্রে লোকশান দিয়ে দিয়ে ও-বিষয়ে পারদর্শী হয়েছিলেন। 'ঘরোয়া'তে নিজেই বলেছেন যে, শখের তাগাদা মানুষকে যতদূর তাড়িয়ে নিয়ে যায় তেমন আর কিছুতে যায় না। কর্তব্যের জন্য একজন সর্বস্বান্ত হলেই ইতিহাসের পাতায় তার নাম সোনার অক্ষরে উঠে যায়, এতই দুর্লভ। শখের জন্য কত মানুষ যে দেউলে হয়ে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। এও সেই একটুখানি পিপাসারই রূপান্তর মাত্র।

আর, শুধু শিশুসাহিত্য কেন, সেকালে ছবি এঁকে, বই লিখে, গান বেঁধে, হেঁসেলে হাঁড়ি চড়ানো যে কত কঠিন ব্যাপার ছিল সে কথা কে না জানে। ওগুলোকে মানুষ হয়ে জন্মানোর দর্শনী বলেই লোকে ধরে নিত; পয়সা দিয়ে কিনলে ওর যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয় না এ কথা জানত, এদিকে শিল্পী খাতির পেত প্রচুর, ওদিকে ট্যাঁক শূন্য থাকত।

কিন্তু অবনবাবুরা ছিলেন সুখী লোক, রসের চর্চা তাঁদেরই সাজত। তাই লাভক্ষতির কথা একবারও না ভেবে প্রাণ ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। শেষে যখন সাগরে ভাঁটা পড়ল, কিই বা তাঁর এসে গেল!

একখানি একখানি করে বইগুলির বিচার করতে গেলে কোন্‌গুলি ছোটদের বই, কোন্‌গুলি বা বড়দের জন্যে, সেই নিয়ে ধাঁধা লাগে। বহু সাহিত্যানুরাগী বলে থাকেন ছোটদের বই বড়দের বই বলে সাহিত্যে আলাদা কিছু নেই। কোনো কোনো বই ছোটদের বোঝবার বাইরে, সেগুলিকে বড়দের বই বলা চলে। ওদিকে ছোটদের বই সত্যি করে ভালো হলে বড়দেরও উপভোগ্য হবে। অবনীন্দ্রনাথের বইগুলি এসব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হয়ে যায়।

কেমন ধারা ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ নামের মানুষটি? গুটিকতক প্রিয় শিষ্য ছাড়া আর বড় কেউ যে তাঁর সবটুকুকে বুঝতে পেরেছিল এমন মনে হয় না। অবিশ্যি, তাঁর শিল্পসাধনা দেশে বিদেশে বহু সম্মান পেয়েছিল।

সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ পরিচয় থাকে তার রচনাতে। সেইখানেই তাকে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। সেগুলিকে বাদ দিলে, তার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাগুলি কৌতূহলোদ্দীপক হলেও অকিঞ্চিৎকর। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা হয়েছে তার কোনোটার মধ্যেই তাঁকে পাওয়া যায় না। তাঁকে খুঁজতে হবে তাঁর বইগুলির মধ্যে, তাঁর ছবিতে। অন্ততঃ এখনকার লোকে যে বইগুলি থেকে তাঁর জীবনকথা পড়ে— তাঁর নিজের রচিত 'ঘরোয়া' কিম্বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে'— সে বই-দুটির মধ্যেও তাঁকে ততখানি পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় 'পথে বিপথে'তে 'আলোর ফুলকি'তে 'মাসি'তে।

'জোড়াসাঁকোর ধারে' আর 'ঘরোয়া' হল সেই ঝিনুকের খোল; মুক্তোটি আলাদা জিনিস। ও দুখানি বইতে অবনীন্দ্রনাথ তাঁদের দু বাড়ির তিন পুরুষের ঘরগৃহস্থালির কথা থেকে শুরু করে তাঁদের শখ সাধ

খেয়ালের কথা লিখলেও নিজে ধরা দেন নি। তবে পারিবারিক জীবনের দিক থেকে বই-দুটিকে বিচার করতে গেলে বলতেই হবে ওদের জুড়ি নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিয়ের কথা লিখেছেন বটে, অথচ নিজের বিয়ের উল্লেখও করেন নি। তার কারণ বই-দুটি তো ওঁর নিজের বিষয় নয়।

এ কথাও অবশ্য মানতে হবে যে, শুধু একটা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা দিয়ে তার জীবনকাহিনী লেখা হয় না, সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত অনুষঙ্গ ও পরিবেশ জড়িয়ে থাকে। মনে হয় এক্ষেত্রে মুক্তোটিও নিশ্চয় ঐ ঝিনুকেরই উপযুক্ত হয়েছিল।

'ঘরোয়া'তে আর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তে অবনীন্দ্রনাথ ওঁদের ঐ বিশাল দুই বাড়িতে ঠাসা ঠাকুর-পরিবারকে তাদের তিন পুরুষের অনুচরবর্গ-সুদ্ধ আমাদের সামনে হাজির করেছেন। চার মহলের জীবনযাত্রাকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

সদরমহলের গানবাজনা, শখের থিয়েটার, সাহিত্যচর্চা, শিল্পচর্চা, পায়রা-ওড়ানো, লোক খাওয়ানো, গোটা থিয়েটার ভাড়া করে অভিনয় দেখা, স্বদেশী মেলা, স্বদেশীয়ানা— কোনো কিছুই বাদ পড়ে নি।

অন্দরমহলের বাসিন্দাদের চুলবাঁধার সরঞ্জাম, সোনারুপোর পানের ডিবে, দুপুরবেলার তাসের আসর, গুণবতীদের গানবাজনা বিদ্যাচর্চা— সব কথাই আছে।

ছোটদেরও একটা মহল ছিল, অবনীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন তার বাসিন্দা। তাঁর চোখ দিয়ে দেখা বহুদিন লুপ্ত হয়ে যাওয়া জোড়াসাঁকোর সেই পুরোনো বাড়িটা হঠাৎ যেন বেঁচে উঠে কথা কইতে শুরু করে। গোটা থিয়েটার ভাড়া করা হয়েছিল যেদিন, কাদের বাড়ির মেয়েরা ওঁকে চিমটি কেটেছিল; পার্টিতে যোগ দেবার অনুমতি আদায় করেছিলেন যেদিন, বৃষ্টি পড়ে সেদিন সব পণ্ড হয়ে গিয়েছিল; দারোয়ানজির সাদা দাড়িতে হাত দিয়ে শেষে নাস্তানাবুদের একশেষ হতে হয়েছিল; মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে মতভেদের মর্মান্তিক পরিণাম হয়েছিল— কিন্তু সেই ছোট ছেলেটি বড় হয়ে কেমন হয়েছিল?

আবার অনুচরবর্গেরও একটা আলাদা মহল ছিল। বই পড়তে পড়তে তাদের হাঁকডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। চোখের সামনে যেন মহর্ষির খাসবেহারা গোছা গোছা মলমলী থান ছিঁড়ে রুমাল বানিয়ে দেয়। সেগুলি একবার মাত্র ব্যবহারের পর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। কে একটা লোক এসে রেষারেষি করে, বাজি ধরে, এক মণ তাজা রসগোল্লা খেয়ে ঘোষালের কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে চলে যায়।

অবনীন্দ্রনাথের কলমের দুই আঁচড়ে তিন পুরুষের ঠাকুরবাড়ি গমগম করতে থাকে। শুধু অবন ঠাকুরকেই পাওয়া যায় না। তাঁর আত্মীয়স্বজনের হট্টগোল তাঁকে ছাপিয়ে যায়।

'জোড়াসাঁকোর ধারে'র ভূমিকাতে লেখক নিজেই বলছেন—

> মুখের কথা লেখার টানে ধরে রাখা সহজ নয়, প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতো কঠিন ব্যাপার।

এ তো হল মুখের কথার কথা, মনের কথার নাগাল পাওয়া আরো অনেক শক্ত ব্যাপার।

শক্ত হলেও অসম্ভব নয়; গোটা কতক বইতে অবন ঠাকুর ধরা দিয়েছেন। ঐ যে বললুম, বিশেষ করে তিনখানিতে হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতে এমন-একটি অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠেছে যে সহসা মনে হয় এবার বুঝি ধরাছোঁয়ার মধ্যে এলেন। যথা, 'পথে-বিপথে'তে 'আলোর ফুলকি'তে 'মাসি'তে।

অবনীন্দ্রনাথ রবিকাকার গভীর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোনো রচনাতেই রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণের চেষ্টা নেই। অবনবাবুর ছবি ও লেখা তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর ভাষাতেও কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি নেই। এর থেকেই তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তার বেশি বলাই বাহুল্য।

বাংলা সাহিত্যের যদি শ্রেণীবিভাগ করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের ভক্তদের বিরাট দলকে স্বীকার করে নিতে হয় যাঁরা গোটা একটা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে তাঁদের সাহিত্যসাধনার মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু সে দল থেকে তাঁর ভক্তদের এই সেরা ভক্তকেই বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবনের মনের দরজার চাবি খুলে দিয়েছিলেন নিঃসন্দেহ; তার চেয়েও বড় কাজ করেছিলেন যে, খোলা দরজা দিয়ে তাকে বেরিয়ে পড়বারও নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথও যেমন কারও অনুকরণ করেন নি, তেমনি অবনীন্দ্রনাথেরও কোনো উল্লেখযোগ্য অনুকরণ হয় নি। কেবলমাত্র তাঁর রবিকাকার 'সে' পড়লে একটা সাদৃশ্যের কথা মনে হয়। অবনীবাবুর এই অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্যকে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

মনে হয়, তাঁর দুনিয়া দেখার ঢঙটিই আলাদা রকমের। সাধারণের উপর রং না লাগিয়ে, তার ভিতরকার অসাধারণত্বটুকু প্রকাশ করে দেন। যদি তাঁর কাহিনীকে আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে তার সম্ভাবনার কথাও মনে আসে। কোথাও যেন অস্বাভাবিক কিছু নেই। যে পড়বে তারই মনের একটা সূক্ষ্ম তারে গুঞ্জন উঠবে। ঠিক সুরটি ধরলে সেতারের তারে যেমন ওঠে। প্রত্যেকের মনের ভিতরে যেসব ছোট ছোট দুর্বলতা ব্যর্থতা শখ সাধ ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে, সেগুলি যেন হঠাৎ ভাষা পায়।

'মাসি' কিছু নাম-করা বই নয়, সাধারণ পাঠক হয়তো এর নামও শোনে নি, কিন্তু এর মধ্যে বিশাল একটা মন-কেমন-করা অতীত এসে ধরা দেয়। সে অতীত আসলে ডালপালাবহুল বিরাট ঠাকুরবাড়ির অতীত নয়, সে অবন ঠাকুরের একান্ত নিজস্ব একটা অতীত, তাঁর একান্ত আপনার প্রিয় জিনিসপত্র মানুষজন নিয়ে এসে তবু পাঠকের মনকে আকুল করে।

এই হল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পরীক্ষা, অপরের হৃদয়ের তন্ত্রীতে সাড়া জাগে কি না। ছবি আঁকিয়ের চোখ দিয়ে দেখা এই অতীতকাল, টুকরো টুকরো মনে-রাখা কথা হয়ে স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে না, সমগ্র একখানি হারানো কাল হয়ে, তার রাশি রাশি অকিঞ্চিৎকর খুঁটিনাটি নিয়ে, যা আর ফিরে পাবার নয় তার জন্যে পাঠককে ব্যগ্রব্যাকুল করে তোলে। যা ছিল নিতান্ত অবনীন্দ্রনাথের মনের ব্যথা তা সবাকার অতি পরিচিত, অতি গোপনে বুকের মধ্যে পুষে রাখা বিরাট একটা দুঃখ হয়ে দেখা দেয়। অথচ হাসিঠাট্টা-মেশানো ছোট ছোট কয়েকটি কথা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নেই। একটুখানি পরিচয় দিই—

> এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়। মাসি, মাসি বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হল যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'। তার পরেই যে চুপ সেই চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি, সেই যে আমাকে সময় ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে, আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে, ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে— ছাদে গাঁথা, চাঁদ-ওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হল, তবে হয়তো মাসিও আছে। এক ছুটে দোতালায় উঠে গেলেম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি! খালি ঘর চুপচাপ সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে।

নিন্দুকরা বলেন অবনীন্দ্রনাথের লেখার মাথামুণ্ডু নেই, বড় খামখেয়ালী, দুঃখের কথা বলতে গিয়েও তার মধ্যে হাসিতামাশা, এতে সাহিত্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়। অবনীন্দ্র নাবালক।

সাদা চোখে দুনিয়াকে যেমন দেখা যায়, সে তো শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে দেখা নয়। সে দেখা হল হুবহু যেখানকার যেমনটি আছে, শুধু তাই দেখা। ফটো তোলে যে, সে যেমন দেখে। শিল্পীর চোখে অন্য দৃষ্টি থাকে; যা কেউ দেখে না, তাই সে প্রকাশ করে। তার শিল্প তো বাস্তবের হুবহু অনুকরণ নয় নিজেরাও খানিকটা সে তার সঙ্গে দেয়। সাহিত্যের বেলাতেও তাই। সত্য ঘটনার অনুবৃত্তি তার লক্ষ্য নয়, তার লক্ষ্য সত্য। সে সত্য তার চোখে যখন যেমন ভাবে দেখা দেয়।

হাসি কান্না পৃথিবীময় জড়াজড়ি করে থাকে, যে অভিভূত হয়ে পড়ে সে শুধু হাসিটুকুই দেখে, কিম্বা কান্নাটুকুই দেখে; আর শিল্পী দেখে সব একাকার। অবনীন্দ্রনাথের সব দেখাই এই শিল্পীর দেখা। নাবালক না হলেও, এও সত্যি যে যারা ছোটদের জন্য গল্প লেখে, একটা ছোট ছেলে তাদের মনের মধ্যে নিরন্তর বাস করে। বয়স্ক বিচারে তাই মাঝেমাঝে নাবালকত্বর অভিযোগ আসে। এমনকি অনেক নব্য সাবালকও অবন ঠাকুরের ছেলেমানুষি শুনে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ঐ ছেলেমানুষির একটু নমুনা দিই—

মাসির শহরতলীর নতুন আস্তানায় অবু গিয়ে দেখে সাবেক বাড়ির অনেক জিনিস সেখানে গিয়েও উঠেছে, কিন্তু কাজ করবার মানুষগুলো কেউ আসে নি। আসে তো নি-ই, বরং এদিক ওদিক থেকে জিনিসপত্র কিছু কিছু সরিয়েছে। মুন্সি নিয়েছে লাঠি-গাছা; হারুন্দে-মারুন্দে নিয়েছে লণ্ঠন আর পালকি।

অবুর রাগ দেখে কে! দিয়েছে পুলিশের কাছে এক কলম ঝেড়ে। মাসি তাই শুনে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,

'করেছিস্ কি! তারা হল পুরোনো চাকর!'

অবু বলে, 'পুরোনো চাকর তো এল না কেন তোমার সেবা করতে এখানে? তোমাকে এই বনালয়ে একা একা পাঠিয়ে, তারা কেউ গেল মামার বাড়ি, কেউ গোঁসাইপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি। আরামে থাকবেন, আর দরকার হলেই লিখবেন— পত্তর পাঠ মনিঅর্ডার করিলেই যাইব।

কেউ লিখবেন, আমি বাটি আসিয়া কালাজ্বর নুমোনিয়া ইত্যাদিতে শয্যাগত। এক বোতল সালসা পাইলে এ যাত্রা রক্ষা পাই। এই পত্র টেলিগ্রাফ বলিয়া জানিবেন।

এই ব্যাভার তোমার সঙ্গে মাসি। যা এক কলম ঝেড়েছি, পুলিশের ঠেলায় তোমার পায়ে এসে পড়বার পথ পাবে না দেখো!'

মাসি তখন মনে করিয়ে দেয় এরাই-না নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে এ বাড়ির লোক হয়ে গিয়েছিল। বাসন মাজত, কাপড় কাচত, রাঁধাবাড়া করত, সেবা করত, বাঁশের আগায় আকাশী পিদুম ঝোলাত, সব সময় মাইনেও নিত না, বাড়ির ছেলেপুলে জন্তুজানোয়ারদের দেখত, বিনি পয়সায় এটা ওটা এনে হাতে দিত, কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়া হত, চাঁদামামা চেনাত, আনন্দের ব্যাপারে ভাগ বসাত— এদের নামে কখনো হুলিয়া বের করতে আছে?

এ ধরণের ছেলেমানুষির বাসা হল বুকের নীচে। মাঝেমাঝে সেখানটা টনটন করে ওঠে।

এই অবনকে 'পথে বিপথে'ও দেখা যায়। সর্বদা কি যেন খোঁজে; চোখে কিসের ঘোর লেগে থাকে; একটা কিছুর একদিন তার সন্ধান মিলবে, এ আশা ঘোচে না। এই মানুষরা যেমন শিশুসাহিত্য লিখতে পারে তেমন আর কেউ পারে না। সদাই আশ্চর্য হবার ক্ষমতা, মুগ্ধ হবার ক্ষমতা, বিশ্বাস করবার ক্ষমতা— এ কি যেখানে সেখানে দেখবার জিনিস?

সত্যিকারের কবি না হলে এ ক্ষমতাও থাকে না, এ চোখও থাকে না। কিন্তু যে নিদারুণ অতৃপ্তি কবিদের জীবনকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেয়, অবনীন্দ্রনাথের বেলায় কেমন করে সে কোমল স্নিগ্ধ হয়ে আসে। রূপকে যে মুঠোয় করে ধরে রাখতে হয় না, অবন ঠাকুর ছবি লেখে তাই সে জানে। প্রাণে তার প্রদীপ জ্বলে, তার আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত হয়, পোড়ে না।

নিজের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখবার শক্তি ছিল ঋষিদের। 'পথে বিপথে'র প্রায় প্রত্যেকটি গল্পে দুটি চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। একজন হল অবিন। তার কাণ্ড দেখে অন্য জন, যার নাম অবু, সে কেবলই অবাক হয়। অবাক হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তেমন ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়ায় না। অবু আর অবিন দুজনাই পরস্পরকে বাইরে থেকে দেখে। দুজনাই নিজের মনের কথা জানে, আর দুজনাই অপরজনকে বাইরে থেকে দেখে।

এই তো হল শিল্পের নিগূঢ়তম সত্য, এই হল কবিদের অমরত্বের মূল। অবিন আর অবুর দেখা হয় বরানগরের জাহাজঘাটে, দেখা হবামাত্র দুনিয়াটা রহস্যের কুয়াসাজালে নিজেকে জড়িয়ে দেয়, সম্ভব-অসম্ভবের প্রভেদ ঘুচে যায়। যা হবার আর যা হবার নয়, তার মাঝখানকার গূঢ় যবনিকাখানি অমনি থরথর করে কাঁপতে থাকে।

জাহাজের ডেকে একদিন অবিন অবুকে একখানি পুরানো ছবি দেখালে। সবটা তার কালোয় কালো, শুধু একজোড়া সুন্দর চোখ দেখা যাচ্ছে, তাও নজর করে দেখতে হয়। ছবিখানি নাকি অবিনদের সাবেক বাড়ির অন্তরঙ্গ এক বৈঠকখানা-ঘরে পাওয়া গেছে। যার চোখ, অবিন তার নাম দিয়েছে মোহিনী। মোহিনীর ভুতুড়ে চাহনি বন্ধুরা সইতে না পেরে, অবিনকে ছেড়ে সবাই চলে গেছে। অবিন বললে—

> আমি একলা ঘরে; আর আমার মনের শিয়রে, অন্ধকারের পর্দার ওপারে, মোহিনী। যবনিকা তখনো সরে নি, চাঁদ তখনো ওঠে নি। নীল ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আমার শ্যামাপাখি। তার সুর আমি শুনতে পাই, তার দুখানি ডানার বাতাসে নীল আবরণ দুলছে দেখতে পাই। আমার প্রাণের কান্না সে গান দিয়ে সাজিয়ে সুর দিয়ে গেঁথে আমাকেই ফিরে দেয়। কেবল চোখে দেখা আর দুই বাহুর মধ্যে, বুকের মধ্যে এসে ধরা দেওয়া বাকি।

নানান রকম ভালোবাসার গল্পে ভরা বইখানি, ছবিকে ভালোবাসা, ছড়িকে ভালোবাসা, পাখিকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা। একজন টাকমাথা লোকের সঙ্গে দেখা হল স্টিমারে অবুর আর অবিনের, সেও বললে কিছু কিছু প্রেমের রহস্যের কথা। বললে—

> আমি প্রেমে পড়লেম। আসকের আগুন যদি মগজেই জ্বলত তবে সেটাকে টুপিচাপা দিয়ে সহজেই নেবাতে পারতেম। কিন্তু সে যে খোদার নিজের হাতে জ্বালা বাতি, টুপি দিয়ে তাকে নেবানো চলে, এমন জায়গায় তিনি তাকে রাখেন নি। দুনিয়াকে রোসনাই দিতে সে বাতি তিনি জ্বালিয়েছেন বুকের মাঝখানে, প্রাণের সঙ্গে এক শামাদানে। সেই বাতির আলোয় যাকে আমি ভালোবাসলাম, তাকে কি সুন্দরই না দেখলেম।

এমনি করে অবুর আর তার বন্ধু অবিনের কাছে দুনিয়ার সব রহস্যের কথা এসে পৌছয়। অবিন তাতে অবাক হয় না, কিন্তু অবু হকচকিয়ে যায়। অবিনকে দেখে অবু আশ্চর্য হয়, অবিনের কথার খেই পায় না। এমনি করে অবনীন্দ্রনাথই অবনীন্দ্রনাথকে দেখেন, একজন স্বপ্নধরার সেই জাল বোনেন, অন্যজন অবাক হন। মনে হয় এরা কি করে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বনেদী কায়দায় মানুষ করা ছেলে হবে! এরাই তো সারা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ায়, ছবি এঁকে, কাব্য লিখে, গান বেঁধে, যা পাবার নয় তাকে খুঁজে। ঘরবাড়ি নামধাম দিয়ে এদের পরিচয় হয় না।

'আলোর ফুলকি'র কথাও বলতে হয়। এমন প্রেমের কাহিনী কম আছে। বিদেশী প্রভাবে লেখা গল্প, ফরাসী লেখক এদমন্দ্ রস্তাঁদের গল্পের ভাব নিয়ে রচিত। এই ধার করা কাঠামোতেও অবনীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য ঝলমল করে। মুরগীদের গল্প। রূপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে ভরা অপূর্ব ভালোবাসার কাহিনী। এই বইতে প্রেমতত্ত্বের এমন-একটি মর্মান্তিক সত্য আছে যা সব পাঠক সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবেন না।

প্রেম হল যৌবনের বিলাস, কিন্তু প্রৌঢ়বয়সের একমাত্র অবলম্বন। আধাবয়সী কুঁকড়োর ঘরে চার-চারটে বউ আছে, বুড়ি মা আছে, ঘরকন্নার কোনো ত্রুটি নেই, তবু তার বুকের মাঝখানটি ফাঁকা। জীবন থেকে তার কাব্য বিদায় নিয়েছে। এমনি সময় সোনালি বনমুরগী উড়ে এসে জুড়ে বসল। কুঁকড়োর প্রবল পৌরুষের সঙ্গে প্রেমের অবুঝ আবদারের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। পাওয়া না-পাওয়ার দোলা লাগল, সুগভীর আনন্দের সঙ্গে মর্মান্তিক দুঃখ এল। অবশেষে পৌরুষের পুরস্কার প্রেম এসে কুঁকড়োর বুকে ধরা দিল।

সমস্ত পার্থিব প্রেমের প্রতীক এই গল্প। যারা স্ত্রীপুত্র-চাকরিবাকরি নিয়ে ঘরকন্না করে, অথচ মাঝেমাঝে না-পাওয়ায় স্বপ্ন দেখে দিশাহারা হয়ে যায়, তাদের কাহিনী।

এত কথা বলেও তবু মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। আর পাঁচ জন সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। মামুলি ধরণের কথা কোনোদিনও বলেন নি। ঘটা করে সাহিত্যসাধনা কখনো করেন নি। মনের মধ্যে ফুলগুলি যেমন পাপড়ি মেলেছিল, অমনি দু হাত ভরে তুলে এনে সবার জন্যে ধরে দিয়েছিলেন। কথা বলার ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা কখনো বড় একটা ব্যবহার করেন নি। কিন্তু কি গভীর অর্থে ভরা সেইসব ঘরোয়া কথাগুলি।

শুধু দূর থেকে দেখেছিলেম অবনীন্দ্রনাথকে, মানুষটির বেশি কাছে যাই নি কখনো; বইয়ের মধ্যে ধরা দিয়েছেন যতখানি, আর প্রিয় শিষ্যদের কাছে যতখানি নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তার বেশি জানতে পারি নি। তাদের মধ্যে একজনার একখানি চিঠি থেকে খানিকটা তুলে দিই—

> সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির অত ছেলেমেয়ে কেউ আসত না তাঁর কাছে, একলাই কাটাতেন— বাগান থেকে বেরিয়ে। এটা লক্ষ্য করে, তারপর সঙ্গে থাকতাম· ·সন্ধ্যার সময় একটা সিগার বরাদ্দ ছিল· ·সিগারটা ধরিয়ে তার পর আরম্ভ হত। সে যে কোন্ জগৎ সৃষ্টি হত তা মনের মধ্যেই রয়েছে· ·অদ্ভুত সে মনের কথা; সৃষ্টি করার জগতে এমন করে আর কাউকে বলতে শুনলাম না, জানলাম না, কি সহজ, কি সুন্দর আর কি বিস্ময়কর। অপূর্ব এক লোকের মধ্যে নিয়ে যেতেন, রং দিয়ে রং সাজিয়ে; যখন বলতেন কত টেকনিকেল বিষয় থাকত, কিন্তু একবারের জন্যেও জটিল বিষয় আর জটিল থাকত না। তখনি গভীরভাবে অনুভব করতাম কি পরিপূর্ণতা দিয়ে মানুষটি কি ভরে, কতখানি ভরে থাকলে, এত সহজ করে, সুন্দর করে বলা সম্ভব হয়।· ·ওদিকে মায়াজগৎ সামনে ফুটে উঠত— আলোছায়া দিয়ে সব। এমন Truth of White আর দেখলাম না কোথাও। এমন অন্ধকারও দেখলাম না কোথাও। আলোর পাশে অন্ধকার, অন্ধকারের পাশে আলো। এরই মাঝখানে কারা সব উঁকি মারছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।· ·

একটা মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে খানিকটা সঙ্গে নিয়ে যায়, আর খানিকটা রেখে যায়। যেটুকু রেখে যায় পরবর্তী কালের বংশধররা তাই দিয়েই তাকে বিচার করে। কেউ জীবনকালে বহু খ্যাতির অধিকারী হয়, কিন্তু অন্তরালে গেলেই সে খ্যাতি ম্লান হয়ে যায়। আবার যতই দিন যায় কারও খ্যাতি ততই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবনীন্দ্রনাথ সেই জাতের মানুষ। তাঁর ঐসব খামখেয়ালি লেখার মধ্যে যে গভীর অর্থ লুকিয়ে আছে এতদিনে সাধারণের চোখে সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তবে এ ধরণের লেখার সবখানি উপভোগ করতে হলে যে সূক্ষ্ম মন চাই, তাই বা কজনার আছে?

তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে 'পথে বিপথে' আর 'আলোর ফুলকি' ছাড়া বাকি সব বই পড়ে ছোটরা আনন্দ পাবে। কেবল ও-দুখানি বইয়ের রস এখনও তারা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে না।

ছোটদের জন্যে এমন বই আর কেউ কখনো লেখে নি। যে শেখাতে চেষ্টা করে না, শুধু যেখানে যায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারে, সেই হল জাতসাহিত্যিক। তাদের মধ্যে যাদের নিজের শৈশব শেষ হয়ে যায় নি, আসল শিশুসাহিত্যিক তারাই। বাংলা ভাষায় এমন দুজনারই নাম করা যায়, একজন সুকুমার রায়, অপরজন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বড়দের গুপ্তচরের জোর করে শিশুরাজ্যে শিশু সেজে ঢুকে পড়াও নয়, এ নিজের শখসাধ মিটিয়ে দাদামশায়ের দ্বিতীয় শৈশবও নয়। এ লেখা অর্থহীন ছড়াও নয়, গুরুমশায়ের প্রথম পাঠও নয়। সমস্ত শিশুজীবনের সুখদুঃখ গালিয়ে এমন লেখা তৈরি হয়; এ যার-তার কর্ম নয়।

কোথাও ন্যাকামি নেই, ভালোমানুষি ঢং নেই। কল্পনার জাদুকাঠি দিয়ে ছোঁয়া ঝরঝরে সহজে বোঝা যায় এমনি ভাষা। কিন্তু সেরকম ভাষা আর কেউ কখনো ব্যবহার করে নি। তার একটু উদাহরণ দিই—

'ক্ষীরের পুতুলে'র বাঁদরকে মা-ষষ্ঠী দিব্যদৃষ্টি দিয়েছেন, বাঁদর দেখলে—

> ষষ্টিতলা ছেলের রাজ্য— সেখানে কেবল ছেলে-ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে, যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা; কারো পায়ে নূপুর, কাঁকালে ছেলে, কারো গলায় সোনার দানা· ·সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য—সেখানে কেবল ছুটোছুটি কেবল খেলাধুলো; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই, সেখানে আছে দিঘির কালো জল, তার ধারে সর-বন, তেপান্তর মাঠ, তারপর আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গোলচোখ বোয়াল মাছ, কচুবনে মশার ঝাঁক· ·

এমনি দেশে বাস করতেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকে বলত খামখেয়ালি, মাথার ঠিক নেই; মাথা নিচু করে কিসব খুঁজে বেড়ায়; নুড়ি তোলে, গাছের শুকনো ডাল নিয়ে আসে; সেসব দিয়ে অদ্ভুত দেখতে জন্তুজানোয়ার মানুষ বানায়। সত্যি কথা বলতে কি, কবিতে আর ক্ষ্যাপাতে চুল-পরিমাণ তফাত থাকে। দুজনাই সাদা চোখে যা দেখেশোনে অন্য লোক তা পায় না। প্রভেদ এই যে, কবির ক্ষমতা থাকে অন্য লোককে দেখাবার শোনাবার, ক্ষ্যাপার রাজ্যে কারো প্রবেশ নেই।

যতই বলি ততই বুঝি কতকগুলি কথার জাল বুনে অবনীন্দ্রনাথকে ধরে দেওয়া যায় না, তাঁর রচনা না পড়লে ছবি না দেখলে, লেখা আর আঁকা একসঙ্গে না মিলালে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না।

# ‘আলোর ফুলকি’ ও অবনীন্দ্রনাথের গদ্য

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন হলেও, চসারের Parliament of Fowls ব’লে কাব্যরূপকখানি ‘আলোর ফুলকি’র প্রসঙ্গে ভাবাসঙ্গবাহী। সেখানেও পশুপাখির হাট ব’সে গেছে, হুবহু মানবিক সংরাগের উত্তাপে কখনো তিনটে ঈগল উচ্চকথনে মত্ত, কখনো-বা মানবজাগতিক বাসনা বা বৈরাগ্যের অবিকল সাদৃশ্যে জলের পাখিদের মুখপাত্রী হিসেবে রাজহংসী নির্লিপ্ত গলায় বলছে—

But she wol love him, lat him take another !

এই আখ্যায়িকার মধ্যে প্রতীকযোজনা ছাড়া চসার আর প্রায় সব-কিছুই একাধিক পূর্বসূরীর কাছ থেকে দু হাতে নিয়েছিলেন। সেই সূত্রে সিসারো, দান্তে এবং ক্লডিয়াসের কাছে তাঁর কৃতজ্ঞ হবার কারণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। আর যেখানে নিসর্গলক্ষ্মীর চারপাশে পাখিরা কাকলিরত, সেই জায়গায়, অর্থাৎ এ-বইয়ের সবচেয়ে স্মরণযোগ্য অংশটিতে, অ্যালানাস দ্য ইনসুলিসের *De Planctu Naturoe* বইটির কাছে চসার অধমর্ণ।

‘আলোর ফুলকি’র দৃশ্যপট অনেকটা Parliament of Fowls-এর মতই তির্যক্ প্রাণীদের মনুষ্যত্বে চঞ্চল। যেসব পশুপাখি অভিজাত সাহিত্যে উপেক্ষিত, এবং ঈসপের উপকথা অথবা অনুরূপ কোনো-কোনো নীতিনিরুক্তির গল্পে সান্ত্বনার তাচ্ছিল্যে সমাদৃত, এই বই দুটিতে তারা উদ্দীপন-বিভাবের অবহেলিত এলাকা ছেড়ে আলম্বন-বিভাগের উচ্চাসনে উঠে এসেছে।[১] তা ছাড়া, এবং সেইটেই এই নিবন্ধের সূচনাসূত্র, ‘আলোর ফুলকি’ও মৌল রচনা নয়। এদ্‌মঁ রস্তাঁর উপরে নির্ভর ক’রে ফ্লোরেন্স ইএট্‌স হান্ *The Story of Chanticleer* লিখেছিলেন। সে-বইটিই অবনীন্দ্রনাথের ‘আলোর ফুলকি’র ভিত্তিপট। চসার আমাদের মনে যে-জিজ্ঞাসার উদ্রেক করেন, সেটি হল, একজন ক্ষমতাবান্ লেখক কেন অনুবাদকর্মে ব্যাপৃত হবার অতিরিক্ত শ্রম স্বীকার করেন? অথবা প্রশ্নটিকে আরো একটু ঘুরিয়ে নিলে এ রকম দাঁড়ায়, একজন প্রথমশ্রেণীস্থ লেখক অনুবাদ করার সময়ে কি ভাবে রচয়িতা নির্বাচন করেন? বোধ করি দুজনের প্রবণতার সারূপ্য এর অন্যতম হেতু। উপরন্তু, কবিতার ভাষান্তরীকরণ একটি কঠিন

---

১ উপনিষদের সুবিদিত দুটি পাখি অথবা বৈষ্ণব পদাবলীতে তুলনাকল্পে গৃহীত ময়ুর প্রভৃতি পাখি আর্ষ উপলব্ধি বা মানবীয় ভাবাবেগের অন্ধ সহায়ক মাত্র। বাণভট্ট তো বৈশম্পায়ন ব’লে শুকপাখিটিকে সর্বজ্ঞ বানিয়ে তার মুখ দিয়ে আমাদের রীতিমত সংস্কৃত আর্যা-ছন্দে নিবদ্ধ শ্লোক শুনিয়েছেন (দ্রষ্টব্য কাদম্বরী, পৃ. ৮-৯ : অনুবাদ শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর)। আবার লোকশ্রুত বুঅসের Ornithogina-তে মানুষকে পাখিতে পরিণত করা বোধ হয় একই প্রবণতার রূপভেদমাত্র। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় ( Gay Neck। চিত্রগ্রীব, অনুবাদ : সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ), জ্যাক লণ্ডন ( হোয়াইট ফ্যাঙ। অনুবাদ : নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ) ও হেমিংওয়ের ( ওল্ডম্যান অ্যাণ্ড দি সী। অনুবাদ : শ্রীমতী লীলা মজুমদার ) মধ্যে একটি সাদৃশ্যসূত্র সহজেই টানা যেতে পারে। এঁদের প্রত্যেকের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা বিচিত্র ও প্রচুর, কিন্তু এঁরা তিনজনেই একদেশদর্শী। মানুষ এসব ক্ষেত্রে সক্রিয় দর্শক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ অভিভাবক ; প্রকৃতির উপরে মানুষের প্রভুত্ববিস্তার— অভিজ্ঞতা-ভারাতুর এই তথ্যটি এঁদের রোমাঞ্চ-সঞ্চারী রচনাবলী প’ড়েও কিছুতেই যেন ভোলা যাচ্ছে না।

দায়িত্ব, কেননা মূলের ধ্বনিগত আবহমণ্ডল তার পথে সবচেয়ে বড় প্রলোভন এবং প্রতিবন্ধক। কিন্তু, তবু সে-আগ্রহের যুক্তি ঐ মানসিকতার সাধর্ম্যে নিহিত। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই কথাটাকে আরো কিছু দূর প্রসারিত ক'রে নেওয়া সম্ভব। *The Story of Chanticleer* আলোর ফুলকি'র নতুন মাটিতে শুধু পুনর্জাত নয়, পুনর্নবত্বে উজ্জ্বল। তার একটি কারণ কথাশিল্পে নয়, শিল্পকথার মধ্যে খুঁজতে হবে। 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' বা 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'তে অবনীন্দ্রনাথ বহু বিদেশী শিল্প-সমালোচকের উক্তি সবিস্তারে উদ্ধৃত করেছেন। সেই তথ্যটি এই কাহিনীর আলোচনাকালে মনে রেখে এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, তাঁর রচনার একটি বিশেষ পর্বে, অন্য কোনো গল্পগ্রন্থ বর্জন ক'রে এই বইটি বাছাই করার সময় লেখকের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত, তাঁর বাক্‌-রীতিটির অন্তর্লীন শিল্পাদর্শ-ই সেই উদ্দেশ্য এবং এখানে তিনি উদ্দিষ্ট সেই আদর্শে উপনীত হয়ে গেছেন। শকুন্তলা (১৩০২) বা ক্ষীরের পুতুল (১৩০২) তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে লিখেছিলেন এবং সরল সুন্দর স্বচ্ছতা ছাড়া অপর কোনো ব্যাপ্ত বিশেষত্ব সেই বই দুটিতে অনঙ্কুরিত। রাজকাহিনী (প্রথম খণ্ড, ১৯০৯) গ্রন্থে তাঁর শব্দসমীক্ষণ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূতপত্‌রীর দেশ (১৯১৫), নালক (১৯১৬) বই দুখানিতে তারই উদ্‌বর্তন বর্ণিকাভঙ্গিতে বিচিত্রিত, বিচ্ছুরিত। পথে-বিপথে (১৯১৯) বয়স্কপাঠ্য রচনা, এর মধ্যে নানাভাবে ভাষা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ মনন কাজ ক'রে গেছে। এই মননভঙ্গিমা আলোর ফুলকিতে এসে সুসমঞ্জস একটি শীর্ষচূড় সার্থকতায় পৌঁছেছে।

'ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা'— এই কথাটি অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিজ্ঞা। 'সার্বজনীন'— এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন অবনীন্দ্রনাথ ভাষার উৎসসন্ধান এভাবে করেছেন—"ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মানুষ যে 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেছে এবং যে চোখের তারা ফিরিয়েছে বা যে হাত বাড়িয়েছে মায়ের দিকে, তার থেকে কথিত, চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সৃষ্টি হয়েছে বললে ভুল হবে না।"— শিল্প ও ভাষা, বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। বস্তুত, জন্মমুহূর্তের ঐ তিনরকম ভাষা কালক্রমে অনেকাংশে ত্রিধাবিভাজিত হয়ে গেছে এবং অবনীন্দ্রনাথ যেন তিনটিকে আবার একাধারে সমাহৃত করতে চেয়েছেন। 'চিত্র-ভাষা' শব্দটি তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে ব্যবহার করেছেন এবং তার ভাষ্য দিতে গিয়ে প্রাচীন মানুষের চিত্ররীতির প্রেরণাসূত্রটি আমাদের দেখিয়েছেন, "এ যেন মানুষের সঙ্গে চারি দিকের যারা কথা কইল তাদেরই পরিচয় আগে লিখতে বস্‌লো মানুষ: জলকে মানুষ জিজ্ঞাসা কর্‌লে জল, তুমি কেমন ক'রে চল? জল স্রোতের রেখা ও গতিভঙ্গি দিয়ে এঁকে ইঙ্গিত ক'রে শব্দ ক'রে জানিয়ে দিলে— এমন করে ঢেউ খেলিয়ে এঁকে বেঁকে চলি। হরিণ, তুমি কেমন করে দৌড়ে যাও? হরিণ সেটা স্পষ্ট দেখিয়ে গেল। কিন্তু গাছকে পাথরকে শুধিয়ে মানুষ পরিষ্কার সাড়া পেলে না। গাছ, তুমি নড় কেন? এর উত্তর গাছ মর্মরধ্বনি করে' দিলে— এই এমনই নড়ি থেকে থেকে, জানিনে কেন! গাছের কথাই বোঝা গেল না, ছবিতেও তার রূপ ধরলে না মানুষ। পাহাড়, দাঁড়িয়ে কেন? আকাশ দিয়ে মানুষের জিজ্ঞাসার প্রতিধ্বনি ফিরে এল কেন!"— ঐ, বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী। বলা বাহুল্য, চিত্রভাষার প্রবর্তনা অবনীন্দ্রনাথকে তার দূরান্বয়ী সংকেতের শক্তি নিয়ে অধিকার করেছে এবং তিনি মনে করেছেন এই ভাষার অনুসৃতির ফলে মানুষ, নিসর্গ, পশুপাখি, জড়-চেতন সর্বত্রই ছবির ভাষার মত একটি lingua franca বা সার্বজনিক ভাষার আভাস আসবে।[২] তা হলে এই ভাষায় শব্দ

২ দেবমুনি ঋভুদেবের মন্ত্রোক্তি ও F. Rylandএর রচনার মত আপাতবিষম নানান উৎস থেকে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর উপপাদ্যের

ধ্বনির নিয়ন্ত্রী নয়, বরং তা অর্থবহ ধ্বনির অনুগত। ধ্বনি এখানে মূল মাধ্যম এবং বিবৃতি দ্বিতীয় উপায় মাত্র। Echo-word বা ধন্যুক্তি চিত্রোক্তির সঙ্গে যুক্ত হলে এ-ভাষার কাঠামো পাওয়া যাবে: "পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠল, 'বোকো না, বোকো না, মোটে না, বোকো না।' ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন। পায়রা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীর-পুরুষ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল গায়ে পলকে পলকে রামধনুকের রঙ ধরে ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির। মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন, 'আ-লো। আ-লো। আ-লো।' তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠল, 'অতু-ল ফু-উ-ল। আলোর ফুল।' আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এসো ফুলের উপর দিয়ে, এসো পাতায় লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক। আলোতে ঝিক্‌মিক—দেখা দিক, সব দেখা দিক, ভিতরে যাক তোমার প্রভা, বাইরে থাক তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিকে শত ধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা।· ·বনের তলায় সোনার লিখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলকি অ-তু-উ-ল অমূল আলো"— আলোর ফুলকি। প্রাণের স্রোতের উপরে ভাষা এখানে যেন আলোর মত নেচে চলেছে, ফ্লোরেন্স ইএট্‌স হান্ থেকে প্রাসঙ্গিক প্রাক্‌রূপটি এর পাশে রাখা যাক: "Not at all!" Cried the little Pigeon indignantly; and then held himself very straight and still, and gazed at the Cock, who had now alighted on the wall. To him, Chanticleer with his trembling crest and golden collar, seemed some magnificent knight of the summer. The evening sun shone on his lovely plumage as he stood there motionless, his head raised; he seemed to notice no one, but sighed, and his throat sounded "co···co···" soft and tender. Then he spoke in a kind of ecstacy—O Sun! O Light! I love you!···You enter into each one, and enter into every cottage; dividing yourself, you yet remain whole, like a mother's love!· ·"—*The Story of Chanticleer*। ইএট্‌স হান্ যেখানে কৃতী ও দক্ষ, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর। মানুষের শব্দচয়ন আর পাখিদের ধ্বনিবিন্যাস স্বরসম্মিতির (assonance) মধ্যবর্তিতায় অভিন্ন ঐক্যে বিধৃত হয়েছে। 'An ideal language would always express the something by the same, and *similar things by similar means*'—জেস্‌পার্সনের এই কথাটা এ-উপলক্ষ্যে আবার প্রমাণিত হল। সুকুমার রায় 'আবোল তাবোলে' যেসব জোড়কলম শব্দ আর ধ্বন্যুক্তি ছড়িয়ে গিয়েছেন, সেগুলি এই প্রেক্ষাপটে ভুলবার নয়। পার্থক্য, সুকুমার রায় দেশজ শব্দের নিঃশর্ত প্রেমিক, আর অবনীন্দ্রনাথ যদিও 'বাংলাদেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষার' বিরোধী, তবু প্রয়োজনবিশেষে দেশজ ও তৎসম শব্দ একান্ত পাশাপাশি বসিয়েও তিনি তাঁর ভাষণভঙ্গির গড়নের বিশেষ ঠাট বজায় রেখেছেন। ভাষা সম্বন্ধে তাঁর এই নমনীয়তার উদাহরণ আপাতত

---

ভিত্তিটিকে সুদৃঢ় করেছেন। প্রত্নপ্রস্তর যুগের চিত্র বা গুহায় আঁকা ছবির সংকেত-পরিধি এতদূর বাড়িয়ে নেওয়ার কথা লেওনার্দোর মত অমিতপ্রতিভাও ভাবেন নি। লেওনার্দো সেখানে বিন্দু, রেখা বা বহিরায়তনিক সমস্যার মধ্যেই চোখ রেখেছেন।

আলোর ফুলকির সমীপকালীন রচনা পথে-বিপথে থেকে উপস্থাপিত হল: "ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীলের এই দুই যবনিকার ভিতর চলেছি। দক্ষিণে বামে কিছুই দেখছি না; কেবল সম্মুখ থেকে একটার পর একটা ঝন্‌ঝনার ধাক্কা আসছে, আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এক-একটা গাছের ঝাপসা মূর্তি চোখের উপরে এসে আঘাত ক'রেই সরে যাচ্ছে।"— 'নিষ্ক্রমণ', গিরিশিখরে, পথে-বিপথে।

চিত্রভাষা এবং ধ্বনিভাষা এখানে সমীকৃত। আনুরূপ্য খুঁজতে গিয়ে অসাবধান পাঠকের একবার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়তে পারে: "রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী।"— য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর সাদৃশ্য-সন্ধান ব্যর্থ হবে। আবার, বিবেকানন্দ ও 'চার-ইয়ারী কথা'র বীরবলকে মনে রেখে সচেতন পাঠক অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক অথচ স্বতন্ত্র ভূমিকা অনুভব করতে পারেন।

এই তথ্যটি মনে রাখলে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না, ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাস থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আলোর ফুলকি ধারাবাহিকভাবে ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ঠিক একই সময় তাঁর 'বাংলার ব্রত' (১৯১৯) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। এই যোগাযোগের তাৎপর্য লক্ষ্য করবার মত। বাংলার ব্রত বইটিতে আমাদের ব্রতের লোকায়ত মন্ত্রগুলি অবনীন্দ্রনাথ সযত্নে ধ'রে রেখেছেন। আল্‌পনার নকশায় যেমন বাংলা দেশের পুরবাসিনীদের জীবনধর্মী শিল্পৈষণা (art-motif), তেমনি ব্রতকথনের মধ্যেও তাঁদের প্রাণছন্দ ধরা প'ড়ে গেছে। এই ঘরোয়া মন্ত্রগুলির মধ্যে দ্রুতগ প্রবাহের কম্পন যেভাবে অন্তঃসলিল হয়ে আছে, তার প্রাণময়তা সর্বকালের কবি বা কথককেই গভীরভাবে প্রলোভিত করতে পারে। এক সময় গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাসের মত ধ্রুপদী চেতনায় সুসম্পন্ন কবিও বাংলাদেশের অঙ্গনের প্রচলিত বুলি (idiom) ব্রজবুলির ক্লাসিক ভাষাবন্ধের সঙ্গে যোগ করেছেন। তাতে নিঃসন্দেহে ভাষা স্রোতোবহা ও আবেদনসমৃদ্ধ হয়েছে। 'শঙ্খমালার গল্পে'র কথাবস্তুর আলোচনা করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন দু'শোর চেয়েও বেশি মেয়েলি ছড়ার নজির দিয়েছেন। প্রসঙ্গের প্রয়োজনে কয়েকটি অপরূপ উদাহরণ এখানে অনুস্যূত হল—

১. সেই কপালে সেই টিপ। সাধুর ভিটায় সোনার দীপ॥
২. গহিন জলে নিয়াস কাটে। কালীসাগর ফেটে উঠে॥
৩. দহের জলে ঢেউ খেলে কিনা খেলে। কমল পাতের জল হেলে কিনা হেলে॥
৪. বেলা পড়ে বেলা উজায়। গাছের পাতা মর্মরিয়া শুকায়॥[৩]

'শঙ্খমালার গল্পের গদ্যভাগে ছড়ার মিশ্রণ'— এই পর্যায়ে দীনেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছেন—"··পাঠক যাহা গদ্যের মতন পড়িয়া যাইবেন, তাহার অনেকাংশই কতকগুলি মেয়েলি ছড়ার সমষ্টি। পাঠক পড়িবার সময় সেগুলি যে কবিতার অংশ তাহা একেবারেই মনে করিবেন না। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই সকল ছড়া ধরা পড়িবে।" ছড়ার এই বাক্যবয়নরীতি অবনীন্দ্রনাথ আলোর ফুলকিতেই সর্বপ্রথম প্রচুরভাবে প্রয়োগ করেছেন: "··পেরু সেই পৈটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'শুনছ গিন্নি, তোমার

৩ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, অষ্টম সংস্করণ, পৃ ৪৯-৫২ দ্রষ্টব্য

কুঁকড়োর এখন খুব বাড়-বাড়ন্ত' বলতেই পেঁটরার ডালা খুলে বুড়ি মুরগি হেঁয়ালিতে জবাব দিলে, 'পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে গো ভাতে বাড়ে' জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁটরার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়ল।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুজনেই দেশী ঘরানার এই সম্ভাবনা চরিতার্থ করেছেন। এর ফলে গদ্যের তটে যে-ঢেউ লাগে, তারই সাহায্যে তাঁরা গদ্য ও কবিতার রূপগত দূরত্ব অতিক্রম ক'রে গেছেন। গদ্য ও ছড়ার একাঙ্গ সন্নিবেশ বা এই ধরণের চম্পূ-রীতি তাঁদের বেশির ভাগ লেখারই বৈশিষ্ট্য। এবং যেখানে বহিরঙ্গে এই সাহচর্য নেই, সেখানে ছড়ার ছন্দ অন্তর্মিলের সুযোগ নিয়ে গদ্যের ভিতরে ঢুকে গেছে :

১. 'ফুলবনের কাছে গিয়া রাজপুত্র দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটের হীরার ডাঁট, হীরার ডাঁটে ফুলের মালা দোলান রহিয়াছে, সেই মালার নীচে, হীরার নালে সোনার পদ্ম, সোনার পদ্মে এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যা বিভোরে ঘুমাইতেছেন।' —ঘুমন্ত পুরী, ঠাকুরমা'র ঝুলি।

২. 'বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী, রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে, নষ্টচন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁৎ দুপুর, অফুর রাত।' —আলোর ফুলকি।

মনে হবে, আঁটোসাঁটো ছন্দে বাঁধা রহস্যবহ দুটি কবিতা ভুল ক'রে কম্পোজিটার যেন গদ্যে সাজিয়ে ফেলেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের বেলায় যেন দুয়েকটা শব্দ হঠাৎ বাইরে থেকে এসে একটুখানি জায়গা জবরদখল করেছে, নইলে দুটিই যে ছন্দোবদ্ধ কবিতা, রীতিমত পর্ব বিভাগ ক'রে সেটা দেখানো যায়। এইভাবে গদ্যসহোদরা স্বরবৃত্ত ছন্দকে দক্ষিণারঞ্জন এবং অবনীন্দ্রনাথ আবার গদ্যের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।[৪]

অবনীন্দ্রনাথের কোনো এক পর্যায়ের গদ্যছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছিলেন, 'ভাষাবাহুল্যের জন্য পরিমাণ রক্ষা' হয়নি ব'লে গদ্যকবিতার নিরীক্ষায় অবনীন্দ্রনাথ সফল হতে পারেন নি। এই অভিযোগের লক্ষ্যস্থল অবনীন্দ্রনাথ যে কখনোই হতে পারেন না, এ কথা বলছি না। কিন্তু কথাটি সমগ্রত অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না, ভেবে দেখা দরকার। তাঁর সর্বজন-বিদিত কথকস্বভাব এই অনুযোগের দায়িত্ব বহন করছে। কথক মাত্রেই কথা বোনেন, বীজ অপেক্ষা বিস্তার, সাংবাদিক পরিমিতির চেয়ে পল্লবিত স্মৃতি-বিন্যাসেই তাঁর স্বাভাবিক ব্যগ্রতা। কিন্তু 'ঘরোয়া' বা 'জোড়াসাঁকোর ধারে', দুটি জীবনস্মৃতিবৃত্তই যখন সমাপ্তির মুখে, তখন বক্তা চুপ করেছেন, আত্মপ্লুত কবি বা স্বগত-কথক জেগে উঠেছেন। মিতবাক্ এই সব অংশে গদ্যকবিতা তার নিপুণ সংহতি প্রদর্শন করেছে বললে তথ্য-রঞ্জন করা হবে না। রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেও সমস্যাটিকে দেখা যেতে পারে। 'লিপিকা'র রচনাগুলি-সম্পর্কে কবির 'ভীরুতা'র কারণ হয়তো একদিকে গীতি-আতুরতার ( lyricism ) প্রতি আকর্ষণ এবং অন্যদিকে অনাবিষ্ট,

৪ 'বিচিত্রা' পত্রিকার ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ বলে নির্দেশিত পাহাড়িয়া পর্যায়ের যে-তিনটি কবিতা বেরিয়েছিল, সে সব স্থলেও থেকে-থেকে স্বরবৃত্তধর্মী শ্বাসাঘাত অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম কবিতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত—

রাত থাকতে পায় কি পায়ের পরশ
তার শিশিরে মাজা নিকষ পাষাণ?
বরফ-গলা নতুন নদী— উছ্‌লে পড়ে, উল্‌সে চলে—

নিছক গদ্যের দাবি। 'গদ্যকবিতা' ব'লে চিহ্নিত তাঁর কবিতাবলীর কোথাও কি সেই দোটানা দেখা যায় নি? গদ্যকবিতা একাধিকবার তাঁর হাতে গীতি-কবিতার দিকে ঝুঁকেছে[৫] এবং গদ্যগীতি বললে সেই কবিতাগুলির ভুল পরিচয় দেওয়া হবে না। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গদ্য কবিতায় এই গীতিময়তা নিয়ে ঈষৎ অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই রকম কবিতায় যেন কাঠখোদাই বা ভাস্কর্যধর্মিতার ফলশ্রুতি আনবার দিকে তাঁর আগ্রহ নিবদ্ধ হয়েছিল—

সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বার করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে। —শেষ সপ্তক, ৩৩

অথচ গদ্যকাব্যে এই দৃঢ়তা ছাড়াও আরেকটি দিক আছে. সে হল শ্রুতির দিক—

দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্মরেখায়
জলের আভাস;
দেখেছি কম্পিত অধরে নিমীলিত বাণীর
বেদনা; —শেষ সপ্তক, ৪১

সুমিতি-চেতনায় সাংকেতিক এই ভাষার নির্ভার লালিত্য অবনীন্দ্রনাথ অনেকবার স্পর্শ করেছেন:

১. 'সদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুয়াশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্ভয়ে চলেছেন, সবাইকে অভয় দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয় তাঁর পায়ের কাছে কাঁপছে একটুখানি ছায়ার মতো! মায়াজাল ছিঁড়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলায়— যেন খণ্ড-খণ্ড মেঘ!'—নালক।

২. "খুলুক খুলুক", দূরে ঝাপসা পাহাড় কুয়াশার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। দূরের কাছের সব জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে নতুন করে আলোছায়া দিয়ে গড়া একটুকরো পৃথিবী।'—আলোর ফুলকি।

৩. 'এমনি জায়গায়-জায়গায় জিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে-চলতে সন্ধ্যা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের চুড়োর দিকে আস্তে-আস্তে উঠতে আরম্ভ করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী কম্বলে ঘেরাটোপ দিয়ে একটার পর একটা পর্বত মুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হয়ে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরো ধোঁয়ার মতো দূরের পাহাড়ের চুড়ো রাত্রের রঙের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল।'—বুড়ো আংলা।

৪. 'চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামল।'—মাসি।

খাতাঞ্চির খাতা (১৯২১) আলোর ফুলকির পরবর্তী রচনা। তাঁর অধিকাংশ বইয়ের মত, ভূতপত্‌রীর দেশ বা খাতাঞ্চির খাতায় রূপকথার রাজ্য আর মানুষের জগৎ কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং তাঁর বিশেষ ভাষারীতি এ-দুয়ের যোজক। ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' অনুষঙ্গে পাঠকের কাছে আসে। কিন্তু ভাষার এই ছন্দোময় সাফল্য সম্ভবত কঙ্কাবতীতে নেই। মারুতির পুঁথি বা ওইরকম আর-কয়েকটি যাত্রার ধরণে

৫ পত্রপুট ৫, ১৩; শেষ সপ্তক ১, ২৯— অন্তত এই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ রইল।

লেখা রচনায় অবনীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর ভাষার বাঁধুনি মানতে পারেন নি। অথচ সত্তর পৃষ্ঠার খাতাঞ্চির খাতায় যে স্বাচ্ছন্দ্য, বুড়ো আংলার এক শো উননব্বই পাতা জুড়ে যে-স্বপ্নচিত্রণ, তার সার্থকতার মূলে অবনীন্দ্রনাথের স্বরচিত ঐ বাক্-রীতি। এই ভাষার পূর্বসূত্র আদি মানুষের ছবির নকশা আর বাংলা দেশের প্রাঙ্গণ। স্বভাবোক্তির সঙ্গে পরিকল্পনা, তৎসম-বিদেশীর সঙ্গে দেশী-তদ্ভবের নীরন্ধ্র মৈত্রীতেই এই রূপবন্ধের অঙ্কুর ও বিকাশ। 'পাগলামির কারুশিল্প'— বিরোধাভাসে ভাস্বর এই উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের রূপবন্ধের এই সচল শক্তির কথাই উদ্‌ঘাটন করেছেন। আজ এই কারুশিল্পের কোনো আন্তর ধারারক্ষী নেই। এর একটি কারণ হয়তো এই যে, বীরবলের মত তিনি প্রধানত বক্রোক্তিজীবিত অথচ বন্ধুজনবৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান নন, বরং তাঁর সৃষ্টির নানারঙা বৈচিত্র্য তাঁকে mythএ পরিণত করেছে। এক দিকে তাঁর স্বভাবের বহুমুখী নম্রতা, অন্য দিকে একান্ত আপন শিল্পস্বজ্ঞা— এই বৈষম্যে তিনি দীপ্যমান। বলতে বাধা নেই যে, ভাষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উদ্‌বোধিত করলেও প্রভাবিত করেন নি। নইলে হয়তো তাঁর রচনা বলেন্দ্রনাথের মত ব্যাপক অর্থে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্গত থেকেই আরেকভাবে মূল্যায়িত হত।[৬]

'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বক্তৃতাকারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমস্যা ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। দুজনের সৌন্দর্যবীক্ষা ভাব ও রূপের নিজ-নিজ সেতু বেয়ে একটি অভিন্ন সমাধানের সৈকতে এসে দাঁড়িয়েছে—

১. 'মানুষ তাই মধুর করেই বললে 'আমার হৃদয়ের তারে তোমার নিমন্ত্রণ বাজল। রূপে বাজল, ভাবনায় বাজল, কর্মে বাজল, হে চির সুন্দর, আমি স্বীকার করে নিলেম। আমিও তেমনি সুন্দর করে তোমায় চিঠি পাঠাব, যেমন করে তুমি পাঠালে।'— সৃষ্টি, ১৩৩০। সাহিত্যের পথে, রবীন্দ্রনাথ।

২. 'সৃষ্ট যা, সৃষ্টিকর্তার কাছে ঋণী হয়ে বসে রইলো না, এইখানেই সেরাশিল্পীর গুণপনা— মহাশিল্পের মহিমা প্রকাশ পেলে…পাতার ঘরে এতটুকু পাখি, সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বল্লে আলো পেলেম তোমার, সুর নাও আমার— নতুন নতুন আলোর ফুলকি দিকে-দিকে সকলে যুগ-যুগান্তর আগে থেকে এই কথা বলে চল্লো,— তার পর একদিন মানুষ এল।'— শিল্পের অধিকার, চৈত্র ১৩২৮। 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

শিল্পীসত্তার এই সাড়া দেওয়ার কথা, 'আলোর ফুলকি'র নায়কের সংলাপে এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে: "এই জগৎসুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি, আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তার পর আমার গান ফোটে, 'আ-লো-র ফুল'। আর তাই শুনে পুবের আকাশ গোলাপী কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তার পর হঠাৎ চমকে দেখি আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবা ফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।"

---

৬ বলেন্দ্রনাথের আয়ুসীমা এক্ষেত্রে বিস্মরণীয় নয়।

# ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ

শ্রীনন্দলাল বসু

শ্রুতিলিখন : শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন, আরম্ভের কারণটা অবশ্য বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষনজরে। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে আছে। সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হল, একালের ভারতকলালক্ষ্মীর।

সেই সময়ে অবনীবাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে তাঁর একটা অ্যালবাম পেলেন, তাতে ছিল খৃষ্টের জীবনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয়া দেশী ছবির একটি অ্যালবাম পাঠালেন তাঁকে— সেটা ছিল পাটনা স্কুলের নকশা-করা।

এ দুটো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দেশী পদ্ধতিতে কৃষ্ণের জীবনচিত্র আঁকতে। সেসব মূল্যবান ছবির অধিকাংশ বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর সংগ্রহে আছে। সে সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি, 'রোজই আরম্ভ করতুম ছবি ; রাত্রে স্বপনের মতো দেখে রাখতুম। আর সকালে এঁকে শেষ করতুম।' সেইসব ছবির সঙ্গে, পরিচয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাংলা হরফ লেখা হত— পার্শিয়ান কায়দায়।

অবনীবাবু বুদ্ধচরিতের উপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। বুদ্ধ-সুজাতা, বজ্রমুকুট— এসব আঁকলেন ঋতুসংহার থেকেও ছবি করলেন পাঁচ-ছ খানা। প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে অনেক ছবি।

এই সময়ে এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার লোক সব আসতে লাগলেন। হিসীদা, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুরও স্টাইল কিছু বদলে গেল। জাপানী পদ্ধতিতে মেঘদূতের ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। বকের পাঁতি, গন্ধর্বের আকাশপথে গমন— এই রকম পাঁচ-ছ খানা ছবি আঁকা হল ওঁর, নূতন স্টাইলে। তবে একটা কথা জোর দিয়ে বলি, মনে রেখো, অবনীবাবু জাপানী স্টাইলে ছবি আঁকলেন বটে, কিন্তু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারতশিল্পের ধারা খানিক প্রসারিত হয়ে গেল।

অবনীবাবুর হাতে ক্রমশঃ এই পদ্ধতিরও বদল হতে লাগল। স্বদেশী যুগে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি আঁকলেন। বঙ্গমাতার ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জাপানে। আমি তখন গেছি আর্ট স্কুলে। তখনও দেখা হয় নি আমার, অবনীবাবুর সঙ্গে। আমি যখন আর্ট স্কুলে ভর্তি হই, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করেছেন। কিন্তু সে ছবিখানা দু-টুকরো হয়ে গেছে।— মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন ওমর খৈয়মের চিত্রাবলীতেও। সে অদ্ভুত এক স্টাইল।

সব সময়েই একটা স্ট্রাগল্ দেখেছি তাঁর মনে ; এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে।

অবনীন্দ্রনাথ

শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে

একঘেয়েমি তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ ক'রে, তাঁর আগেকার আঁকা বিলেতী স্টাইল যখন এসে পড়ত, সেটা অতিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন।

অবনীবাবু আগে বিলাতী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কলার, অয়েল পেন্‌টিং— এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশল তাঁর নিজের স্টাইল। জাপানী স্টাইল, তিব্বতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল— এইসব। সব মিলেছিল— অদ্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে।

মাঝে মাঝে ওলোট-পালটও হয়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন উনি, দেশী পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম ক'রে পাঁচ-ছ খানা ছবিতে অয়েল পেন্‌টিং প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানা ভাবের মিশ্রণ।

যাই হোক, বিলিতী চীনে জাপানী মোগল— এইসব পদ্ধতি নিয়ে হল ভারতশিল্পের রেনেসাঁর চেহারা।

আমরা মুগ্ধ হলুম ; কিন্তু অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুম না।

আমাদের ঝোঁক হল, অজন্তার দিকে। কাঙ্গড়া, রাজপুত— এইসবও করতে লাগলুম।

আমাদের ছবি জাপানে গেল এগ্‌জিবিশনে। ওরা ঐসব ছবি দেখে খুব নিন্দে করলে। জার্মানীতে গেল। ওরাও আমাদের ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে, ছবি ভালো, তবে হাত বড় উইক ; আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙেরও জেল্লা নাই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুণ ম্যাজ্‌মেজে।

এসব শুনে, তখন আমাদের সোসাইটির উডরফ, ব্লান্ট্‌ প্রমুখ সদস্যরাও বললেন, দিশী পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো। দিশী ছবি সব আমাদের গ্যালারীতে টাঙিয়ে দেওয়া হল। মোগল কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙানো হল। আমরা কিছু কিছু কপিও করেছিলুম।

বিচিত্রায় কাম্পো আরাই জাপানী পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আরম্ভ করলেন— সে কালি-তুলির কাজ। দেশী পদ্ধতিতে ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্ট স্কুলে।

বিদেশে এই রকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, আমরা আমাদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম। এইভাবে আমরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলুম। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হল, বিদেশী ছবির অনুকরণ করব না ; মন থেকে ঝেড়ে ফেলব সেসব।

পুরাতন-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় না থাকায়, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হতে লাগল। তবে আমাদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। আমি আরম্ভ করলুম, আমাদের পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ সংস্কৃতকাব্য আর ইসলামি কাহিনী কেচ্ছা থেকে রাজা-বাদশাদের ছবি।— এসব উনি করতেন অতি অদ্ভুতভাবে। সেটা আমরা পারি নি।

অবনীবাবু বলতেন, 'তোমরা পারবে না এসব ছবি করতে।— এই রকম মোগলাই কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় আছে এই কায়দা।— তোমারা করো স্রেফ দেশী ছবি।'

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। আমরা তা পারি নি। কিন্তু আমরা যা পেলুম, সে হল— নিজ ধারার বৈশিষ্ট্য। আমার ধারা অবনীবাবুর মতো হল না ; সে ধারা মোগল পদ্ধতিও নয় পার্শিয়ান পদ্ধতিও নয়।— অজন্তা, রাজপুত আর দেশী পদ্ধতি মিলিয়ে এ হল আমার নিজস্ব ধারা— আমার গুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

আর রং খুঁজেছি সব সময়। মোগলদের মতো ব্রাইট্ রং করা যায় কি ক'রে, সে চিন্তা আছে বরাবর। কালি দিয়ে করেছি লাইনের ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্শিয়ান কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হল— ইণ্ডিয়ান স্কাল্‌প্‌চারের আদর্শে অলংকরণের ছবি।

যাই হোক্, গুরুর কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাও এসে যাচ্ছে। আজ আর থাক্। গুরু আমার গৌরবিত— চার কাল ধরেই ॥

# রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় সম্পাদক,

শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলা নামে যে প্রবন্ধ 'শান্তিনিকেতনে'র গত চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন সেটা পড়ে দু-চার জায়গায় আমার ঠেকলো।

ফণীবাবু বলছেন— প্রথমে কলিকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেব এ বিষয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। হ্যাভেল সাহেবকে আমি গুরুতুল্য মনে করি, কিন্তু ব্যাপারটার আন্দোলন তিনি শুরু করেন না বলতে আমি একটুও ইতস্তত করব না, কেননা আমি জানি কোথা থেকে কি হল।

হ্যাভেল সাহেব কলিকাতা আর্ট স্কুলে আসার পূর্বের কথা হচ্ছে তিনি মান্দ্রাজে আর্ট স্কুলটাকে দেশী শিল্প-শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলেছেন। কলিকাতার সে সময়ের কথা রবিকাকা মহাশয়ের 'বালক' বলে পত্র 'সাধনা' বলে পত্র এবং চিত্রাঙ্গদা বলে কাব্য তিনি চিত্র দিয়ে সাজিয়ে তোলার কল্পনা করে আমাকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের আর্ট স্কুল ও আর্ট স্টুডিও দুই স্থান থেকেই ইঙ্গ বঙ্গ ছবি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যেত না। আর্ট গ্যালারিতে বিলাতী ছবিই দেখা যায়, দেশীয় ছবি একটি নেই। সেই সময়ে স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি ঈশ্বরীপ্রসাদ বলে এক হিন্দুস্থানী কারিগরের দ্বারায় লিথোগ্রাম করে সাধনাতে দেওয়া হল। এবং রবিকাকার উপদেশ-মত বৈষ্ণব কবিতা সমস্ত পড়ে আমি দেশীয় ভাবে কৃষ্ণলীলার ছবি আঁকা শুরু করে দিলেম। সেই সময় রবি বর্মার এক সেট ছবি সবপ্রথম রবিকাকার কাছে দেখি এবং সেই সময়েই ঘটনাচক্রে আমার হাতে বিলাত থেকে ওদের সাবেক প্রথায় আঁকা একটা আলবম এবং দেশী শিল্পীদের আঁকা আর একটা ঐরূপ আলবম আমার হাতে পড়ে। এই শেষোক্ত দেশীয় চিত্রসংগ্রহ দেখে ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর দিল্লীর চিত্রশালা একটি প্রবন্ধ লেখেন ও রবিকাকা সেটি সাধনাতে প্রকাশ করেন, সাধারণের সঙ্গে আমাদের আর্টের পরিচয় বাংলায় সূত্রপাত এইভাবে হল। তোমরা শুনে অবাক হবে কৃষ্ণলীলার কুড়িখানা ছবি শেষ করতে তখন আমার পুরো এক বৎসর খাটতে হয়েছিল এবং তখন সারাদিন ছবি, সন্ধ্যার সময় রবিকাকার খামখেয়ালী মজলিশে সংগীত সাহিত্য কাব্য ও নাটক -এরই চর্চা, এই যখন চলেছে নিয়মিতভাবে বলতে পার অনিয়মিতভাবে তখন এলেন হ্যাভেল সাহেব কলিকাতায়। হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আর্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয় নয়, আমি কোনো কালেই আর্ট স্কুলে ভর্তি হই নি, আমার সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের পরিচয় আমার কৃষ্ণলীলার ছবি নিয়ে এবং সেই সূত্রে মোগলশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ করে তাঁরই সাহায্যে আমার ঘটল। সেইজন্যই আমি তাঁকে বলি আমার গুরু কিন্তু হ্যাভেল সাহেব আমাকে ডাকতেন collaborator বলেই, স্নেহ করে কখনো বা বলতেন chela। বাংলার কবি আর্টের সূত্রপাত করলেন বাংলার আর্টিস্ট সেই সূত্র ধরে একলা একলা কাজ করে চলল কতদিন— তার পর ভারতশিল্পের নন্দলাল, সুরেন্দ্র গাঙ্গুলি, অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলি, কুমারস্বামী, উডরফ সাহেব, হ্যাভেল সাহেব এবং Indian Society of Oriental Art দেখা

দিলেন পরে পরে। হ্যাভেল সাহেব অসুস্থ হয়ে চলে যাবার পরে যখন একা আমি ছাত্রদের এবং আমার জনকতক ইংরাজ বন্ধুদের নিয়ে আমাদের আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় ফিরছি এবং গভর্নমেণ্টের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আর্ট স্কুলের বাহিরে এসে পড়েছি সে সময়ে শান্তিনিকেতন এতটুকু একটি টোল বা পাঠশালা মাত্র। আমি এক দিকে চলেছি, রবীন্দ্রনাথ অন্য দিকে। Oriental Art Societyকে সম্বল করে চলতে চলতে একটা দিন এমন এল যে, দেখলেম আমি যে ভয়ে আর্ট স্কুল ছেড়ে বার হলেম সেই ভয়ই গভর্নমেণ্টের অনুগ্রহ হয়ে এককালের স্বাধীন Art Society আর্টিস্ট-পাখি পোষার একটা খাঁচারূপে পরিণত করে দিয়ে গেল।

ঠিক এই অবস্থায় পৌঁছবার পূর্বে রবিকাকার অভয় এল, আর্টিস্টদের জন্য 'বিচিত্রাভবন' সৃষ্টি হল কলিকাতায়। তার পরের কথা শান্তিনিকেতনের আলো আর বাতাসে ঘেরা আর্টিস্টদের জন্যে দেশের বুকে ছোট্টবাসা বাসা— রবীন্দ্রনাথের দান ভারতীয় শিল্পশিক্ষার্থীদের জন্য! তাঁহার পঞ্চষষ্টিতম বৎসরের উৎসব শুধু তো ছবি নিয়ে নয়— কবিতা নাটক আর্টের যে আর-তিনটে দিক সংগীত তাও নিয়ে। এটা ফণীবাবু কেমন করে ভুলে বসলেন তা তো বুঝলেম না।

শান্তিনিকেতন পত্র, জন্মোৎসব সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩।

অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক উল্লিখিত প্রবন্ধটির প্রকাশ : শান্তিনিকেতন পত্র, চৈত্র ১৩৩২
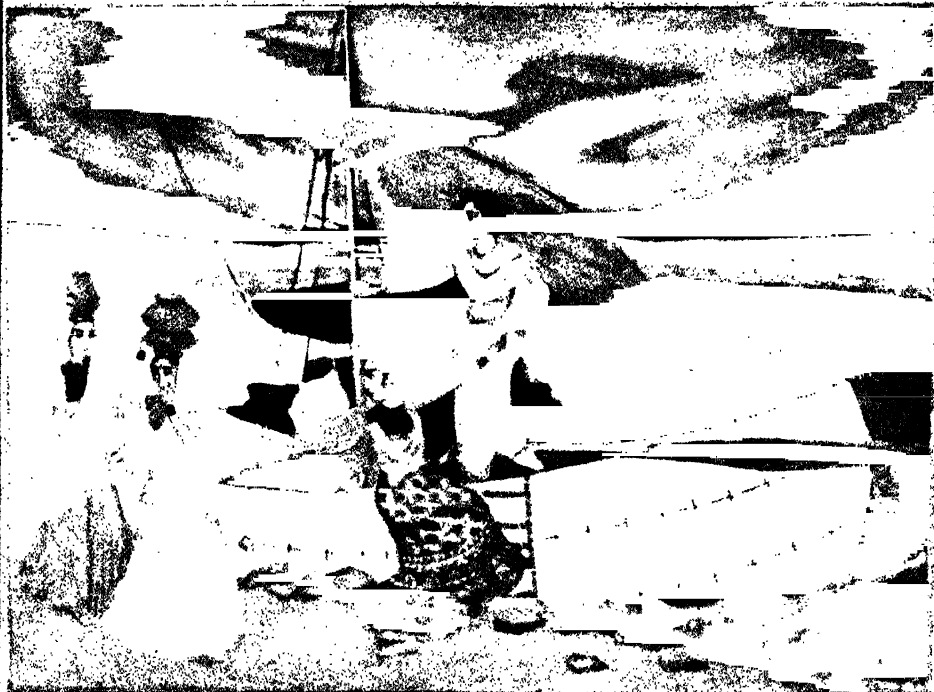
# অবনীন্দ্রনাথ

## শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তাঁর ছবি। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে, তাঁর ছবি দেখা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের আর-একটি পরিচয় নূতন আদর্শের প্রবর্তক রূপে, এ দিক দিয়ে তাঁর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের চেয়ে, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধারকারী এবং নবযুগের প্রবর্তক অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি কোনো অংশে কম নয়। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার ঐতিহাসিক মূল্য তথ্যের দ্বারা বিচার করা সম্ভব। তথ্যের সাহায্যে বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁর সৃষ্টির জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু এই আলোচনার দ্বারা তাঁর প্রতিভার একটা মূল্য বিচার করা সম্ভব হবে। এবং তাঁর ছবি একটা ঐতিহাসিক পটভূমি পাবে, এই মাত্র।

অবনীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার প্রথম পরিচয় তাঁর অঙ্কিত রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে ( ১৮৯৪-৯৬ )। তাঁর নিজের জীবনে এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি নূতন যুগের সূচনা করেছে। সে সময়ের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা এবং এই ছবিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য আমরা বুঝতে পারব।

এক দিকে দিল্লী-কলম পাটনা-কলম ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত দেশী চিত্রের যে গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল তার সংস্কারগত শিক্ষার বাঁধাবাঁধি নিয়ম, কিছুটা কারিগর-সুলভ ওস্তাদি এবং দেশীয় চিত্রের আলংকারিক কাঠামো তখনও বজায় ছিল; উত্তরে কাংড়া-কলম তথা রাজপুত ঢঙের কাজ অন্যান্য ধারার চেয়ে অপেক্ষাকৃত সতেজ ছিল সত্য, কিন্তু সবসুদ্ধ এ-সময়ে ভারতীয় চিত্র অলংকারবহুল শিল্পবস্তুতে পরিণত হয়েছে বলা অন্যায় হবে না। চিত্রের প্রাণ ও রসের দিক দিয়ে ভারতীয় চিত্র এ-সময়ে অতি দরিদ্র।

অন্য দিকে দেখি নবাগত য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ, বা য়ুরোপীয় চিত্রের আদর্শ নামে তখন আমরা যে বস্তু গ্রহণ করেছিলাম, তার সাহায্যে য়ুরোপীয় রূপকলার প্রাণের সন্ধান আমরা পাই নি, পরিবর্তে পেয়েছিলাম বিলাতি শিল্পসংস্কার (technical convention), বস্তুরূপকে অনুকরণ করবার কৌশল; ভিন্ন প্রকৃতির হলেও দেশী বিদেশী দুই ছবিতেই ছিল কৌশলের বিস্তার। আমাদের বিকৃত রুচির প্রতি লক্ষ করে হ্যাভেল সাহেব বলেছিলেন—

Nowhere does art suffer more from Charlatanism than in India....There is no respect for art in the millionaire who invests his surplus wealth in pictures and costliest furniture so that his taste may be admired or his wealth envied by his poor brethren.[1]

অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে প্রথম আমরা এমন-এক রসবস্তুর প্রকাশ দেখি যে-রস সমকালীন কোনো চিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু তখনকার নব্য শিক্ষিতসমাজ কারিগরী কাজ দেখেই অভ্যস্ত। শিল্পবস্তু ও

---

1. *The Basis for Artistic and Industrial Revival in India* by E. B. Havell.

রসবস্তুর মধ্যে পার্থক্য করবার শিক্ষাও ছিল না, এবং সে শিক্ষা পাবার সুযোগও ছিল না। এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি যখন সাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তখন বিদ্যার যাচাই করতেই একদল রসিক বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।

এতে অ্যানাটমি নেই, প্রক্ষিপ্ত ছায়া (cast shadow) নেই, পরিপ্রেক্ষিত (perspective) নেই কেন? এই প্রশ্নই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা অবনীন্দ্রনাথের ছবি ও নূতন পদ্ধতিকে কি চোখে দেখেছিলেন একটা উদাহরণ দিই—

'ভারতীয় চিত্রকলার মূলসূত্র বোধ হয় এই যে, এমন বস্তু আঁকিবে বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনো সৌসাদৃশ্য না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে, অর্থাৎ স্বভাবের বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। স্বাভাবিকতার শ্রাদ্ধই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র উদ্দেশ্য। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকায় ভারতীয় চিত্রকলার যে আদর্শ দেখা যায়, ভারতীয় চিত্রের নূতন পন্থীগণের চিত্র সৌন্দর্যকল্পনায় বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নহে। ভারতীয় চিত্রকলার অনুশাসনে আঙুল ও হাত-পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা করা হয়। অ্যানাটমির বিরুদ্ধ হইলেই যে-কোনো চিত্র ভারতীয় চিত্রশালার যোগ্য হয়। যে স্বাধীন কল্পনায় মানুষের হাত-পা যোজন বিস্তৃত আকারে পরিণত হয়, তাহা কল্পনার অভিধানের যোগ্য নয়। ভারতীয় চিত্রকলা অনুসারে চিত্রিত চিত্রগুলি স্বভাবের এত বিরুদ্ধ ও লতানে কেন হয় তাহাও আমরা বুঝিতে পারিব না।'[1]

চিত্র-সমালোচনায় যুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্রূপ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি মোহ নব্য শিক্ষিত-সমাজের প্রায় সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল।

আর্টের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজের কথাই তখন অকাট্য। শারীরস্থানের জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, প্রক্ষিপ্ত ছায়া ছাড়া ছবি হতে পারে না— এই হুবহু নকল ও কাস্ট শ্যাডোর মোহ কেবল যে আমাদের শিক্ষিত সাধারণকেই অন্ধ করেছিল তা নয়। পণ্ডিত ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক— যাঁদের দেশীয় শিল্পের সঙ্গে এবং দেশীয় মূর্তি-শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তাঁরাও এই কাস্ট শ্যাডোর মোহ কাটাতে পারেন নি; তাঁরাও বোধ হয় বিশ্বাস করতেন কাস্ট শ্যাডো -বর্জিত চিত্র হতে পারে না। এই বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ না হলে কি কোনো পণ্ডিত বলতে পারেন 'চীন দেশের দৃশ্যচিত্রে আলো ও ছায়ার সন্নিবেশের কোনো চেষ্টার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া চীনা চিত্রকরদের শিক্ষাগুরু ভারতশিল্পীও যে উদাসীন ছিলেন এরূপ অনুমান সমীচীন নহে?'[2] কেবল শিক্ষার অভাবে নয়, ভুল শিক্ষায় আমাদের চিত্ত তখন বিভ্রান্ত।

দেশীয় রূপকলা সম্বন্ধে অজ্ঞতার বশে আমরা যে নিকৃষ্ট বিলাতি চিত্রের অন্ধ অনুকরণ করছি, হ্যাভেলই প্রথম সে কথা আমাদের মনে করিয়ে দেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভাস্কর্য স্থাপত্য চিত্র নিয়ে দেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় শিল্পের নন্দনীয়তা (aesthetic quality) সম্পর্কে কেউ ঝোঁক দেন নি। সাহস করে হ্যাভেলই প্রথম বলেছিলেন—

It has been always my endeavour in the interpretation of Indian ideals to obtain a direct insight into the artists' meaning without relying on modern

---

১ সাহিত্য ১৩১৭ বৈশাখ।

২ ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা. রমাপ্রসাদ চন্দ। প্রবাসী ১৩২০ অগ্রহায়ণ।

archæological conclusions, and without searching for the clue which may be found in Indian Literature.[১]

অধ্যয়নবিমুখ দাম্ভিকের উক্তি বলে একজন বিখ্যাত পণ্ডিত হ্যাভেলকে বিদ্রূপ করেছিলেন। হ্যাভেলের এই মত অকাট্য নয় এবং ভারতীয় আদর্শ বোঝাতে তাঁকেও ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল সত্য, কিন্তু সে সময়ে এই উক্তির প্রয়োজন ছিল। হ্যাভেল ছাড়া ডাক্তার কুমারস্বামী, উড্রফ্ সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রতি ধীরে ধীরে দৃষ্টি পড়ল। যখন হ্যাভেল ভারতীয় কলাসংস্কৃতির প্রবর্তনে যত্ন করছিলেন সেই সময়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় শিল্পী বলে প্রচার করলেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্র ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত হচ্ছে, এ কথা পণ্ডিতরা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। শিল্পশাস্ত্র উদ্ধৃত করে কেবলই তাঁরা অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীদের চিত্রের অভারতীয়ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন— অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর অনুগামীদের কোনো ছবিই ভারতীয় আদর্শে তৈরি হচ্ছে না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রমত তাঁরা অনুসরণ করছেন না, প্রাচীন তাল-মান-প্রমাণাদির সঙ্গে তাঁদের ছবির বিসদৃশ-রকম প্রভেদ। তাঁদের মত যে খুব যুক্তিহীন ছিল তা নয়। কারণ, সত্যই অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীনের দলভুক্ত নন; কিন্তু আধুনিক যুগের ভারতীয় মনকে তিনি যে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এ কথা তখন পণ্ডিতরা হয়তো লক্ষ করেন নি। কিন্তু এখন আমরা তা ভালো করেই বুঝতে পারি।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত হওয়ায় যদিও পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিরুদ্ধতা এসেছিল, অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল ভারতীয় চিত্রের নবজন্মদাতা হিসাবেই। হ্যাভেল বা কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথের বা তাঁর সম্প্রদায়ের ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সবচেয়ে ঝোঁক দিয়েছিলেন তার ভারতীয়ত্বের উপর—

The work of the Modern School of Indian Painters in Calcutta is a phase of the national reawakening. The subject chosen by the Calcutta painters are taken from Indian History, romance and epic, and from the mythology and religious literature and legends, as well as from the life of the people around them. Their significance lies in their distinctive Indian-ness. They are however by no means free from European and Japanese influences. The work is full of refinement and subtlity in colour and of a deep love of all things Indian; but, contrasted wlth the Ajanta and Moghal and Rajput paintings which have in part inspired it, it is frequently lacking in strength. The work should be considered as a promise rather than a fulfilment.[২]

---

১ *The Ideals of Indian Art* by E. B. Havell.

২, E. B. Havell: quoted in *A History of Fine Art in India and Ceylon.*

ভারতীয়ত্বের উপর ঝোঁক হ্যাভেলের কথায়ও আমরা পাই—

If neither Mr. Tagore nor his pupils have yet altogether attained to the splendid technique of the old Indian painters, they have certainly revived the spirit of Indian art, and besides, as every true artist will, invested their work with a charm distinctively their own. For their work is an indication of that happy blending of Eastern and Western thought.[১]

১৯১১ পর্যন্ত নব্য বাংলার চিত্রকলার যে রূপ, তার অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচয় এই দুই উক্তিতে পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা করছেন বা করেছেন কিন্তু সেই আদর্শ অবনীন্দ্রনাথ ইত্যাদির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে, এ কথা দুইজনের কারো উক্তিতেই পাই না। এই সময়ে দেশের মধ্যে যে জাতীয়তার আন্দোলন চলেছিল তারই অংশ বলে অবনীন্দ্রনাথের আদর্শ জনপ্রিয় হয়েছিল। অবনীন্দ্রনাথ স্বদেশী আর্টিস্ট, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা— কিন্তু যে ভারতীয় আদর্শের প্রতীকরূপে অবনীন্দ্রনাথকে তখন দেখা হচ্ছিল তাঁর ভক্তরা তখনও তার রূপকলার ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন নি। ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও তাঁদের অস্পষ্ট। ধর্ম দর্শন সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান যথেষ্ট ছিল ; এইজন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যখনই তাঁরা আলোচনা করেছেন। দার্শনিক চিন্তা, সাহিত্যের রূপক, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ছবি বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা কি চোখে অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখতেন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই—

'ভারতশিল্পে নবীন উদ্যমের নেতাগণ যে কেবলমাত্র শিল্পের জন্য শিল্পকার্য করিয়াই ক্ষান্ত তা নয়, হিন্দু জাতির প্রকৃতিগত যে আধ্যাত্মিকতা তাহারও বিকাশে ইঁহারা সকলে সচেষ্ট। সুতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক চিন্তাপ্রবাহ, মহতী আশা ও দেশহিতৈষীতার সহিত ভারতশিল্পের এই নববিকাশের ঘনিষ্ঠ যোগ সুসংগত। ঠাকুরমশায়ের [ অবনীন্দ্রনাথের ] এই ছবিখানিতে [ পুরীতে ঝড়, ১৯১১ ] আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, রুদ্র সমুদ্রের সুদূর আভাস। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীষণতা এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। ফলতঃ, যিনি এই প্রদর্শনীতে সূর্যালোক- উদ্ভাসিত দৃশ্যপট খুঁজিতে আসিবেন তিনি নিরাশ মনে ফিরিবেন। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীগণ ভারতবর্ষের যে বাহ্যিক রূপ দেখিতে পান, প্রাচ্যসৌন্দর্য-লিপ্সু ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষ আঁকিতে চেষ্টা করেন, এ স্থানে সে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয় নাই। ইহা অন্তরঙ্গ ও বিষাদাচ্ছন্ন একটি অতিপ্রাকৃত ভারতবর্ষ। রূপকাত্মক আধ্যাত্মিক ধর্মপ্রাণ ও চিন্ময়।[২]

ছবিকে দার্শনিক বা কাব্যিক চিন্তা দিয়ে দেখবার এই চেষ্টা, এ দেশে বা বিদেশে, অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষীয়রা সকলেই করেছিলেন। ভারতীয় ছবি ভাবাত্মক কাজেই আধ্যাত্মিক, এই বিশ্বাসে আধ্যাত্মিক ভাব ও দার্শনিক চিন্তা ছবিতে খোঁজবার চেষ্টা হয়েছিল। এই চেষ্টারই ফলে আজ অধিকাংশের কাছে আধুনিক ভারতীয় ছবি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, এখনও এই মোহ সম্পূর্ণ কাটে নি। যাঁরা এই জাতীয় ব্যাখ্যা সে-

১. Dr. A. K. Coomaraswamy: quoted by V. Smith in *A History of Sine Art ni India and Ceylon.*

২ ফরাসী পত্রিকা থেকে সংকলিত প্রবন্ধ: দ্র. ভারত-চিত্রশিল্পের পুনর্বিকাশ। প্রবাসী ১৩২০ শ্রাবণ।

সময় দিয়েছিলেন তাঁদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভাবের আধিক্য এমনই হয়েছিল যে, ছবি যে দেখবার জিনিস সে কথা আমরা প্রায় ভুলেছিলাম। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনরুদ্ধারকার্য চলেছে অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর শিষ্যদের হাতে, এইতেই সকলে খুশি। নূতন ছবিতে খুব বড় রকমের গভীর ভাব ভারতীয় চিন্ময় রূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, এ কথা তখন বেশ ভালো রূপেই আমাদের মনে গেঁথেছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন ভাব ও ভাষার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকাতেই কবির ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, ছবির ক্ষেত্রেও যে তেমনি ভাব-প্রকাশের জন্য উপযুক্ত ভাষা দরকার— সে কথা তখন কেউ মনে করতে পারেন নি। রূপের রেখার বর্ণের ঝংকারে ভাব যুক্ত হলে তাকেই আমরা বলি ছবি। ছবির ভাষাকে চেনবার ঔৎসুক্য তখনও জাগে নি। এ দিক দিয়ে কোনো চেষ্টাও হয় নি। কেবল আদর্শকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল— কিন্তু ভারতীয় আদর্শ যেমনই হোক, রূপকলার ক্ষেত্রে সে আদর্শের প্রয়োগ ও প্রকাশ যে কি ভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা হত তাঁরা যদি জানতেন—

The evolution of Indian Art is organised by the rhythm which organises the work of art, and nothing is left to chance, and little to extraneous influences....Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, therefore, we find such minute prescriptions for proportions and movements. The relation of the limbs, every bend and every turning of the figures represented, are of the deepest significance. This dogmatism, far from being sterile, conveys regulations how to be artistically tactful, so that no overstrain, no inadequate expression, and no weakness ever will become apparent. The regulations are a code of manners.[১]

এতক্ষণ পর্যন্ত অবনীন্দ্রনাথের সপক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছিল তারই পরিচয় দিলাম। এইবার এই তর্কজাল অতিক্রম করে তাঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করলে কি আমরা পাই, দেখবার চেষ্টা করব এবং তাঁর সম্বন্ধে মতামতের বা মূল্য কতটা, তাও যাচাই করতে পারব।

২

দেশে ও বিদেশে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা, ভারতীয় চিত্রের পুনরুদ্ধার করেছেন বলে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ কোনোদিন কোনো কিছু চেষ্টা করে পুনরুদ্ধার করতে চান নি। অলংকারশাস্ত্র তিনি পড়েছিলেন, 'ষড়ঙ্গ' লিখেছিলেন এবং 'ভারতশিল্প' গ্রন্থে ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে ওকালতিও করেছিলেন, কিন্তু ছবি রচনার কালে সে মত তিনি অনুসরণ করেন নি। সংক্ষেপে, ভারতীয় নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, ভারতীয় চিত্র বা ভাস্কর্যের ভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নি।

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের ১৩১৬ সালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকে তাঁর সে সময়ের মনোভাব পরিষ্কার দেখা যায়—

---

১ Dr. Stella Kramrisch in The Modern Review for December 1922.

'আমি দেখিয়াছি তোমরা কোনো একটা সুন্দর দৃশ্য লিখিতে হইলে বাগানে কিম্বা নদীতীরে গিয়া গাছপালা ফলফুল জীবজন্তু দেখিয়া দেখিয়া লিখিতে থাক। এই সহজ ফাঁদে সৌন্দর্যকে ধরিবার চেষ্টা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। তোমরা কি জাননা সৌন্দর্য বাহিরের বস্তু নয়, কিন্তু অন্তরের ? অন্তর আগে কবি কালিদাসের মেঘদূতের রস-বরষায় সিক্ত কর তবে আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিও, নব মেঘদূতের নূতন ছন্দ উপভোগ করিবে ; আগে মহাকবি বাল্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমুদ্রের চিত্রলিখন।'[১]

অবনীন্দ্রনাথের এই উপদেশের উদ্দেশ্য কি ? তিনি চেয়েছিলেন কল্পনার বা ভাবের জগতে ছাত্রদের মনকে নিয়ে যেতে, কিন্তু সেই ভাব কি ভাবে কোন্ উপায়ে তারা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত নেই। বস্তুর বাইরের রূপটাই সব, তার অনুকরণই আর্ট, এই ধারণার বিপরীত মত দেখা দিল। বস্তুরূপটা কিছুই নয়, ভাবপ্রকাশের জন্য অনুকরণের কোনোই প্রয়োজন নেই— এই মতকে চরম নন্দনাদর্শ ( aesthetic ideal ) বলা যেতে পারে। এই মত ব্যক্তিগত ; জাতিগত আদর্শ একে বলা চলে না। কাজেই নিঃসন্দেহে বলা চলে, অবনীন্দ্রনাথ কোনো দেশ বা কালের আদর্শ অনুসরণ করেন নি, নিজের রুচির দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল, বুদ্ধি দ্বারা সে আদর্শকে তিনি জেনেছিলেন, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি সে আদর্শ গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয়—

'ভারতশিল্পের বায়ু দেবতার মূর্তি— তাও আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের মতোই ছেলেমানুষি পুতুলমাত্র। একই মূর্তি, একই হাবভাব, ভাবনার তারতম্য নেই। দেবমূর্তিগুলো তেত্রিশকোটি হলেও একই ছাঁচে একই ভঙ্গিতে প্রায়শঃ গড়া, তারতম্য হচ্ছে শুধু বাহন মুদ্রা ইত্যাদির। একই বিষ্ণু যখন গরুড়ের উপরে তখন হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া জুড়ে দিয়ে হলেন সূর্য। একই দেবীমূর্তি, মকরে চড়া হলেই হলেন গঙ্গা, কচ্ছপে বসে হলেন যমুনা ! বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের রূপকল্পনার মধ্যে যে রকম-রকম ভাবনার ও মহিমার পার্থক্য, গ্রীকমূর্তি আপোলো ভিনাস জুপিটার জুনো ইত্যাদির মূর্তির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম্য তা ভারতের লক্ষণাক্রান্ত মূর্তিসমূহে অল্পই দেখা যায়। একই মূর্তিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন বদলে রকম-রকম দেবতার রূপ দেওয়া হয়ে থাকে। বায়ু আর বরুণ, জল আর বাতাস দুটো এক নয়, দুয়ের ভাষা ও ভাবনা এক হতে পারে না। এ পর্যন্ত একজন গ্রীক ভাস্কর ছাড়া আর কেউ বায়ুকে সুন্দর করে পাথরের রেখায় ধরেছে বলে আমার জানা নেই। এ মূর্তির একটা ছাঁচ আচার্য জগদীশচন্দ্রের ওখানে দেখেছি— গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে ভূমধ্যসাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ করছে— ছবি দেখে বুঝবে না, মূর্তিটা স্বচক্ষে দেখে এসো।'[২]

অবনীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের এই মত, কাজেই এই মতের মূল্য অস্বীকার করা চলে না। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিণতিতেও এই মতের কার্যকারিতা লক্ষ করা যায়।

একদিন অবনীন্দ্রনাথ দেশী ও বিদেশী চিত্রের আলংকারিক রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪) তারই প্রকাশ আমরা দেখি। কিন্তু দেশী ছবির আলংকারিক কাঠামো বিশুদ্ধ রইল না। তার বিলাতী অঙ্কনবিদ্যার প্রভাবে ক্রমে এমন-একটা রূপ পেল তাঁর ছবি যা হুবহু বিলাতী মিনিয়েচার ( miniature ) নয়, দেশী আলংকারিক পটও নয়— কিন্তু নতুন কালের নতুন ছবি, যে ছবি সে সময় ছিল

---

১ প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক।

২ বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী।

না কোথাও। দেশী বা বিদেশী ছবির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থায় ছিল, অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে দুই কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয় হয়ে উঠল। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার সর্বপ্রধান দান এই। আধুনিক যুগের উপযোগী রূপকলার ভাষা আমাদের দিলেন ; সে ভাষা যতই অর্বাচীন হোক, তবু সেই ভাষার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করবার সুযোগ পেলাম আমরা।

১৮৯৪-৯৬ সালে যখন অবনীন্দ্রনাথ রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী রচনা করছিলেন তখন তিনি অখ্যাত। ১৮৯৭ সালে ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অবনীন্দ্রনাথ সাধারণের সামনে এলেন। ভারতীয় আদর্শের নবজন্মদাতা বলে হ্যাভেল তাঁকে পরিচিত করলেন। দেশের লোক তাঁর ছবিতে 'অস্বাভাবিকত্ব', প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, লম্বা হাত-পা দেখে কি রকম মর্মাহত হয়েছিলেন সে পরিচয় পূর্বেই দিয়েছি। হ্যাভেলের সাহায্যে অবনীন্দ্রনাথ মোগল-চিত্র বিচারবিশ্লেষণ করে দেখলেন। মোগল চিত্রকরদের আশ্চর্য অঙ্কনকৌশল ও সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর নিজের কথায়— 'ছবিতে ভাব দিতে হবে'। এই 'ভাব' কথাটির অর্থ তখন তিনি কি বুঝেছিলেন তা কোথাও লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন নি। কিন্তু ছবিতে একটি পরিবর্তন দেখতে পাই যার প্রকাশ 'ভারতমাতা' (১৯০২) চিত্রে এবং যার পরিণতি 'ওমর-খৈয়াম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। প্রথমেই দেখি, তাঁর প্রথম দিকের ছবির আলংকারিক বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে। ছবিতে পটভূমির সমতলতা নষ্ট হয়ে দূরত্ব (space depth) দেখা দিয়েছে। ছবিতে এই পরিবর্তন মোগল ও জাপানী চিত্রের সংস্পর্শে হয়েছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে বিলাতী (academic school) অঙ্কনপদ্ধতির প্রভাবও যে ছিল আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা স্মরণ রাখি না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর টেকনিকের উপকরণ পেয়েছিলেন মোগল জাপানী এবং য়ুরোপীয় শিল্পসংস্কৃতি থেকে। য়ুরোপীয় ও জাপানী শিল্প-সংস্কৃতির প্রধান গুণ ছিল বাস্তবিক (naturalistic) প্রকাশভঙ্গীর দিক দিয়ে, সেই পদ্ধতির ছবিতে রূপের চটকদারিটাই সব। মোগল দরবারী পদ্ধতিকে আমরা বলতে পারি স্বাভাবিক (realistic), যাতে রূপের বাহার খোলে গুণের যোগ-বিয়োগে। অবনীন্দ্রনাথের টেকনিক যে স্বাভাবিক এ কথা এখন স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর ছবির স্বাভাবিকতা বিলাতী অ্যাকাডেমির মত নয়, জাপানীর মত নয়, মোগলের মতও নয়। এ স্বাভাবিকতা তাঁর নিজের। আরও বিচার করলে এই বলা চলে যে মোগলচিত্রের আলংকারিক রূপ, তার সূক্ষ্ম কারুকার্য, আরও একটু real করে স্বাভাবিক করে তিনি দেখালেন। কিন্তু যে উপায়ে তিনি দেখালেন সেটা কোনো বিশেষ রীতি নয়— একান্তভাবে তাঁর নিজের তৈরি, নিজস্ব ভাব প্রকাশের জন্য। অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কনরীতির প্রবর্তক নন, তিনি স্টাইলের স্রষ্টা। অবনীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ, তাঁর স্টাইল, উপেক্ষিত রয়ে গেছে দুই কারণে। প্রথম ও প্রধান কারণ, কেবলই তাঁকে ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক কোঠায় ঠেলে দেবার চেষ্টা ; দ্বিতীয় কারণ, অবনীন্দ্রনাথের খ্যাতি এবং তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে যে সময়ে তখন তাঁর কাছ থেকে সব চেয়ে বেশি আশা ছিল ভারতীয় শিল্পী হিসাবেই— এইজন্য তাঁর স্টাইলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে নি ; প্রাচীনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি কতটা মোগলের কাছে পৌঁছেছেন সেইটাই দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এইজন্যই তাঁর স্টাইল উপেক্ষা করে তাঁর ভাবের কথাই সকলে বলেছেন।

কোনো দিক দিয়েই অবনীন্দ্রনাথকে ভারতীয় চিত্রকরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাঁর নিজস্ব অঙ্কনভঙ্গী স্টাইলের আলোচনায় আরও পরিষ্কার হল। তাঁর আত্মতন্ত্র ও একান্ত নন্দনাদর্শ, তাঁর রূপ-উপাসক

( রূপানুকারী নয়, ) দৃষ্টিভঙ্গী, তাঁর আঁকবার স্টাইল, সব নিয়ে তাঁকে প্রাচীনের সগোত্র বলা চলে না। তিনি আধুনিক কালের অসামান্য প্রতিভাবান চিত্রকর— এ রকম প্রতিভা দীর্ঘকাল ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নি। তবে কি ভারতীয় শিল্পাদর্শ আজও পুনরুজ্জীবিত হয় নি? অবনীন্দ্রনাথ কি ভারতীয় চিত্রের নূতন যুগের প্রবর্তক নন? এই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষাৎভাবে দেবার দরকার নেই, তাঁর সম্বন্ধে একটু আলোচনা করলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাব।

বিশুদ্ধ প্রাচীন দেশী আর্ট অবনীন্দ্রনাথ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতায় চিত্রকলায় আধুনিক রূপ দিলেন বিভিন্ন পদ্ধতির মিশ্রণের দ্বারা। বিদেশী সংস্কৃতিকে যেভাবে তিনি নিজের করতে পেরেছেন সমগ্র এশিয়ায় তার তুলনা কম। যাঁরা এইভাবে চেষ্টা করেছেন, তাঁদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অন্যতম এবং কোনো-কোনো দিক দিয়ে তিনি অদ্বিতীয়। জাপানে চীনে প্রাচীন পদ্ধতির বড় বড় ওস্তাদ আছেন, বিলাতীর অনুকারক আছেন, কিন্তু গ্রহণ করে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা দৈবাৎ চোখে পড়ে। স্বদেশীযুগের গোঁড়া মনোভাবের কাছে অবনীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণ হয়তো রুচিকর হত না, কিন্তু আজকের আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তিনি অপরের থেকে গ্রহণ করবার সাহস দিয়েছেন। তার পর, ভারতীয় পুরাতন কলাসংস্কৃতির প্রতি যে দৃষ্টি ফিরেছে সেজন্য হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর কাছে আমরা ঋণী, এবং স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবও অনেকখানি।

কিন্তু উড়িষ্যার পূর্বপ্রথাগত খোদাইকরা মূর্তি বা পাটনা-কলমের ছবি নিয়ে আধুনিক মনকে সরস রাখা সম্ভব ছিল না। ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিয়েও দূর করা যেত না যদি অবনীন্দ্রনাথের সাধনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের পথ না হত। অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমরা প্রাচীনকে দেখেছি, প্রাচীনকে অনুসরণ করে আধুনিক হই নি। তার পর, যখন ইংলণ্ড এবং য়ুরোপের প্রায় সর্বত্র ছবির নামে কেবল বিদ্যার বাহাদুরি এবং ধূপছায়ার ( shade and light-এর ) ছড়াছড়ি চলেছে সেই সময় এই অনুকৃতির ( naturalism-এর ) মোহ কাটিয়ে রসসৃষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে হয়, অবনীন্দ্রনাথের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার আন্দোলন নয়, তাঁর সাধনার দ্বারা শিল্পবোধের রসবোধের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি।

৩

এইবার ভাবের দিক দিয়ে বা রসের দিক দিয়ে কতটুকু বলে প্রকাশ করা যেতে পারে দেখা যাক। অবনীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী প্রভাব রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের রসবোধের উন্মেষ এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা সাহিত্য এবং চিত্র এই দুই ধারায় একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রতিভা এমনভাবে এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছে যে কোন্‌টি তাঁর প্রধান ক্ষেত্র বলা শক্ত। সাহিত্যের অনুভূতি এবং চিত্রকরের দৃষ্টি এই দুইয়ের মিশ্রণে এবং দুইয়ের দ্বন্দ্বে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা রূপ পেয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় আমাদের গল্প শুনিয়েছেন। ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; শুধু কথা শোনার সুখ; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ফুটে ওঠে ছবি— ভালো করে দেখতে যাও কি ছবি ফুটে উঠল, ভাষার দমকে আর উপমার ঝংকারে সবকিছু মিলিয়ে যায়, আবার হঠাৎ আসে আর-একটা ছবি। ভাষা, অলংকার, ক্রমে ছবি, তাও মিলিয়ে আসে— মনের মধ্যে বাজতে থাকে শব্দের ঝংকার; আবার মনে

পড়ে যায় ভাষা, অলংকার, চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবির টুকরো। তাঁর রাজকাহিনী, ভূতপত্‌রীর দেশ, বুড়ো আংলা— ধ্বনির তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথের ছবি কিরকম তার উত্তরে বলতে পারি— বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ। সাহিত্যে যেমন তাঁর শব্দের ঝংকার, ছবিতে তেমনি তাঁর বর্ণের ঝংকার আমাদের আকৃষ্ট করে। ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি রূপের আভাস আমরা পাই, কিন্তু বর্ণের আবরণের অন্তরাল থেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। একেবারে সামনে এসে দৈবাৎ অবনীন্দ্রনাথের রূপের জগৎ আমাদের দেখা দেয়। তাঁর আরব্য উপন্যাসের চিত্রাবলীতে এই রূপের জগৎ যত কাছে আমাদের আসে, অন্য কোথাও দৈবাৎ এমন করে তার সাক্ষাৎ পেয়েছি। অধিকাংশ স্থলেই একটু সুর একটু ইঙ্গিত দিয়েই তাঁর রূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায়। এত মৃদু সেই ইঙ্গিত, এত ক্ষণিকের যে চিত্রকরের নিজেরই সন্দেহ জাগে, সব সুর কানে পৌঁছবে কি না, সব ইঙ্গিতের অর্থ আমরা বুঝব কি না। তাই আগে থেকে বলে রাখার চেষ্টা। এই চেষ্টা থেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে নামের প্রবর্তন এবং এইজন্যই অবনীন্দ্রনাথ ছবিতে নামের এত মূল্য দিয়েছেন।

অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যরচনা আর তাঁর ছবিরচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভঙ্গী— দেখাবার জন্য দেখানো, বলবার জন্যই বলা। বলবার জিনিসটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চান নি। দেখিয়ে তিনি কিছু চেনাতে চান নি। তিনি তাঁর সাহিত্যে ছবিতে যা করতে চেয়েছেন তা তাঁরই কাছ থেকে আমরা শুনে নিতে পারি—

'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হোলো উচ্চারিত ছবি, তার ছবি হোলো রূপের রেখায় রঙের সঙ্গে কথাকে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা।'

অবনীন্দ্রনাথের ছবি সত্যই রূপকথা— রঙের সুরে, রূপের ইঙ্গিতে তা ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

ABANINDRANATH TAGORE : HIS EARLY WORKS. Art Section, Indian Museum, Calcutta ; Price Paper Cover Rs. 13/- Cloth and Board Edition Rs. 15/-

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের উদ্যোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থে যে-ছবিগুলি সংকলিত হয়েছে, আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসে সেগুলি অমূল্য সম্পদ। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈগুণ্যে অবনীন্দ্রনাথের যৌবনকালে রচিত এই ছবিগুলি কখনোই উপযুক্ত সমাদর পায় নি। অবনীন্দ্রনাথ যখন এই ছবিগুলি এঁকেছিলেন তখনকার বিলেতি নন্দনরুচির দ্বারা প্রভাবান্বিত শিক্ষিতসমাজে ছবিগুলির যথার্থ মূল্য স্বীকৃত হয় নি। তেমনি, আজও আছেল বিলেতি নন্দন-আদর্শের প্রভাবে নবীন শিল্পী ও শিল্পরসিকের কাছে এই ছবিগুলির মূল্য স্বীকৃত হবে কি না সন্দেহ হয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা এবং তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপন্ন শিল্পরসিকের মনে সে আলোচনা কতটা স্থান পাবে তাও বলা যায় না।

অবশ্য সকল দেশেই মহৎশিল্পীদের সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকে, কোনো প্রতিভাকে একবাক্যে স্বীকার করে নিতে সময় লাগে। কাজেই অবনীন্দ্রনাথের অসাধারণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু আমাদের দেশে বর্তমানে যাঁরা অবনীন্দ্রনাথের নিন্দা করে থাকেন, সন্দেহ হয়, তাঁদের অনেকেই অবনীন্দ্রনাথের ছবি দেখেন নি। অবনীন্দ্রনাথের অঙ্কিত চিত্র বাংলাদেশের বাইরে কমই প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর পরিণত প্রতিভার রচনা বাংলাদেশের মধ্যেও সুপরিচিত বলা চলে না। এ অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথের চিত্র 'book illustrationএর বেশি কিছু নয়' এ রকম একটা ধারণা হবার কারণ কী, এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে— অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই 'সহজিয়া' উপেক্ষার বাণী আমাদের রসিকসমাজ আয়ত্ত করেছেন ইংরেজ সমালোচক রজার ফ্রাই এর কাছ থেকে। রজার ফ্রাই ঠিক এইরকম মতই দিয়েছিলেন যে, অবনীন্দ্রনাথের ছবি magazine illustration। অবশ্য, রজার ফ্রাইও যে অবনীন্দ্রনাথের ছবি ভালোভাবে দেখে এ মত দিয়েছিলেন তা নয়। রজার ফ্রাই -এর শিল্পবিষয়ক বহু মতামত তাঁর নিজের দেশে পুরোনো এবং বাতিল হয়ে এসেছে। কিন্তু আমাদের দেশের নব্যরসিক-সমাজে অনেকের কাছে তাঁর মতামত আজও অভ্রান্ত। পৃথিবীতে এমন কোনো মহাপুরুষ বা কৃতী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নি যাঁকে কথার প্যাঁচে ক্ষণকালের জন্যে নস্যাৎ করে দেওয়া না যায়। কিন্তু আবার তাঁদের নাম সমাজে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং আবার তাঁরা মানুষের পূজা পান। এমনিভাবেই ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে স্মরণীয় নাম চিরস্মরণীয় হয়ে ওঠে।

একসময়ে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা সম্বন্ধেও কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করেছিলেন— যথেষ্ট আধুনিক তিনি নন বলে তাঁকে জাতে ঠেলে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির নব নব দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই বিরুদ্ধ মত স্থায়ী হতে পারে নি।

চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ যে বিস্ময়কর নূতন সৃষ্টি করেন নি তা নয়। কিন্তু তাঁর সেই নূতন সৃষ্টি

রসিক দর্শকের সামনে আসবার সুযোগ পায় নি। কাজেই অবনীন্দ্রনাথের,শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ আলোচনা নাও স্বীকৃত হতে পারে।

অবশ্য কেউ যদি পাশ্চাত্য শিল্পের আধুনিক পরিভাষায় অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন— অবনীন্দ্রনাথের চিত্রের textural quality, তাঁর রচনায় outer structure ও inner function, তাঁর ছবিতে visual aspect ও tactile aspect -এর মূল্য ইত্যাদি ইত্যাদি, তা হলে এইসব অর্ধজীর্ণ বাক্যসমাবেশে হয়তো নব্যমনকে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নূতন করে সচেতন করে তুলতেও পারে। এবং সেই অবস্থায় হয়তো অবনীন্দ্রনাথের ছবি না দেখেও তাঁর প্রতিভার অসাধারণত্ব মেনে নিতে আপত্তি হবে না।

পুস্তকসমালোচনার ক্ষেত্রে সাময়িক মতামত সম্বন্ধে উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক এবং অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সাময়িক মতামতের মূল্য চিরন্তন না হলেও অল্প মুহূর্তের জন্য সাময়িক মতামতের আচ্ছন্নতা অত্যন্ত গাঢ়। সাময়িক মতের মোহ এত গাঢ় বলেই এর বাইরের কিছু লক্ষের মধ্যে নিয়ে আসা প্রায় দুঃসাধ্য। এইজন্যই মূল বক্তব্যে পৌছবার পূর্বে সাময়িক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা দরকার।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনার দীর্ঘ ইতিহাস আজ আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁর শিল্পের বিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে কী আমরা পেতে পারি, কী পেতে পারি না, সে সিদ্ধান্তে পৌছনো আজ কঠিন নয়।

যে যুগে অবনীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সে সময়ে সমগ্র প্রাচ্যশিল্পের অবস্থা প্রায় একই রকম।

চীন জাপান বা ভারতবর্ষে শিল্পসংস্কৃতির সামনে প্রধান সমস্যা পাশ্চাত্য প্রভাবকে গ্রহণ বা বর্জন। এই দুই চরম মনোভাবের পক্ষে, অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার আলো শিল্পীদের আত্মীকরণের পথ দেখিয়েছিল। এদিক দিয়ে অবনীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব কেবল ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাসেই স্মরণীয় যে তা নয়, এক্ষেত্রে সমগ্র প্রাচ্য ভূভাগের ইতিহাসেও আজ অবনীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিভা বিরল।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্ররচনা, আঙ্গিকে দুর্বল বা করণকৌশলের দিক দিয়ে বৈচিত্র্যহীন কি না সে আলোচনার শেষ মীমাংসা না করেও কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্যেই সহজে প্রমাণ করা যাবে যে, ভারতীয় সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাসে অবনীন্দ্রনাথের দান অতুলনীয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পভাষা যে একদিন নবজাগ্রত ভারতবাসীকে আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য ও সুযোগ এনে দিয়েছিল, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করেন নি বলে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের নাম জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা চলে না, তেমনি অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার দান আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা চলে না। এ কথা বলা চলে না যে, তিনি সাময়িকতার নিদর্শন মাত্র।

অবশ্য পূর্বেই বলেছি, শুধু ইতিহাসের খাতিরেই যে অবনীন্দ্রনাথ স্মরণীয় এমন নয়। তবে ইতিহাসের সাক্ষ্যকে ব্যক্তিগত খেয়াল ব'লে উপেক্ষা করা সহজ নয়, এজন্যই ইতিহাসের কথা উল্লেখ করলাম। প্রতিভার আভিজাত্যে অবনীন্দ্রনাথ চিত্রকলার ইতিহাসে অমর। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার অসাধরণত্ব বা তার বৈশিষ্ট্য জানতে হলে যে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাঁর শিল্পজীবনের যোগ সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় নেওয়া দরকার। ইউরোপের রেনেসাঁ-যুগের প্রবর্তিত realismএর আদর্শ উনবিংশ শতকের গণ্ডির

মধ্যে এসে যখন চরম বাস্তবতার সংস্কারে পরিণত হল, যখন নগ্নদেহ ছাড়া শিল্পীদের সামনে আর কিছু রইল না, তখনই ইউরোপীয় শিল্পীদের চমক ভাঙল, তাঁরা বুঝলেন— আসল শিল্পদৃষ্টি তাঁরা হারিয়েছেন।

তার পর দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও প্রাণপণ চেষ্টার সঙ্গে অনুসন্ধান চলল শিল্পদৃষ্টিকে ফিরে পাবার।

আধুনিকতার নামে ইউরোপে যে শিল্পসংস্কৃতি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে তার মূল উদ্দেশ্য শিল্পদৃষ্টিকে ফিরে পাওয়া। cubism থেকে শুরু করে constructionism পর্যন্ত যে চেষ্টা তাকে খেয়াল বলা চলে না; কিন্তু সে চেষ্টায় ইউরোপীয়রা যা পেয়েছেন তা শিল্পদৃষ্টি নয়— শিল্পভাষার বহু ঐশ্বর্য, শিল্পকৌশলের বহু নূতন নূতন ভাব ও ভঙ্গী। ইউরোপে এই ভাবে যাঁরা শিল্পের ব্যাকরণ, শিল্পের ভাষা ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছেন তাঁরাই নিজেদের সেই কৃতিত্বে কতটা মুগ্ধ তাও বলা কঠিন।

কিন্তু আধুনিক দর্শক যে আধুনিক শিল্পের এই নূতন নূতন সিদ্ধাই দেখে-শুনে বহুশঃ বিভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এক দিকে চরম বাস্তবতা, অপর দিকে জ্যামিতিক বা মনস্তাত্ত্বিক দুর্বোধ্য মার-প্যাঁচ, এই দুই চরম অবস্থার মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প রচিত হয়েছে। তাঁর প্রথমজীবনে অবনীন্দ্রনাথ যাঁদের দর্শক রূপে পেয়েছিলেন তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বাস্তবতার ক্ষেত্রে। তাই, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরচনাকে চিনতে পারা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আর আজ যাঁরা নূতন দর্শক, তাঁদের দৃষ্টিও বিজ্ঞান-ঘেঁষা, ব্যাকরণ-ঘেঁষা। এঁরা অনুসন্ধান করছেন শিল্প-বিজ্ঞানের কতটা সম্পদে এই চিত্রকলা সম্পংশালী। বলা বাহুল্য, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পসৃষ্টি থেকে কোনো 'চরম' আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, অবনীন্দ্রনাথ বাস্তবতাকে যেমন একমাত্র লক্ষ্যবস্তু বলে দেখেন নি, তেমনি শিল্পের বিজ্ঞানকে বা ব্যাকরণকেও কোনোদিন শিল্পের প্রাণ বলে মেনে নেন নি। অবনীন্দ্রনাথের সহজাত শিল্পদৃষ্টির সামনে যা প্রকাশিত হয়েছিল, রঙে রেখায় তারই রূপ আমাদের সামনে তিনি প্রকাশিত করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রে চেষ্টার আধিক্য নেই বলেই সে ছবি সহসা দুর্বল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যা সহজ তাই যে অসার, অতি সাধারণ অথবা দুঃসাধ্য সাধনারই সিদ্ধি নয় এ কথা স্বতঃসিদ্ধ মনে করি নে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার মহত্ত্ব উপলব্ধি করার পথে বড় বাধা এই দিক দিয়ে। যথার্থ সহজ হওয়া কত কঠিন, কত অসাধারণ— আধুনিক দর্শকের মনে তার কোনো ধারণা আছে কিনা সন্দেহ হয়, বর্তমান যুগটা কারসাজির যুগ, সিদ্ধাইয়ের কেরামতি দেখব বলেই আমরা উৎসুক। এই অবস্থায় শিল্পসৃষ্টির অনায়াসলব্ধ রূপ আমাদের অনেকেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তবে এই সহজ সৃষ্টির আদর্শ যে সংসার থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে তাও বলা চলে না। ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্পজ্ঞ রসিকেরা কেউ কেউ তাঁদের আধুনিকতার আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন।

বিচার-বিশ্লেষণের পথে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা যা পেয়েছেন সাক্ষাৎভাবে ঠিক-ঠিক শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই —এ সন্দেহ যখন একবার দেখা দিয়েছে, তখন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত বহু মতামতের অদল-বদল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশেষে, হয়তো এই নূতন মত-পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার অসাধারণত্ব রসিকসমাজে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প-সমালোচক ও নব্য মেজাজের রসিক ইউরোপের চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলেন না। চলা সহজও নয়। তাই আজও তাঁরা cubism প্রভৃতি মাপকাঠি নিয়ে সন্তুষ্ট, তারই সঙ্গে কিছু folk tradition -এর কথা এবং ইতস্তত সমাজসচেতন হওয়ার

অনভ্যস্ত বুলি। এই অবস্থায় অবনীন্দ্রনাথকে নাকচ করে দেওয়া সহজ। কিন্তু এই বিচারকে চরম সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়ারও হেতু নেই। ব্যাপকভাবে দেখলে দেখা যাবে, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে মতামত, আদর্শ, উদ্দেশ্য সব-কিছুই বাষ্পভাবাপন্ন— কারণ, কাল যে মনোভাব যে আদর্শ স্থির ছিল, আজ সে সম্বন্ধে সন্দেহ এসেছে। এই বিবর্তনের কালে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভায় যাঁরা আস্থাবান তাঁদেরও ধৈর্য ধরা ছাড়া উপায় নেই।

এইবার সাক্ষাৎভাবে পুস্তকখানি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। বইখানিতে যে ছবিগুলির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে সে ছবিগুলি তাঁর শিল্পপ্রতিভার উন্মেষের পরিচায়ক এবং তাঁর আঙ্গিকের পূর্ণপরিণতির ইঙ্গিত।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, অবনীন্দ্রনাথের এই প্রথম দিকের চেষ্টার মধ্যে কোথাও revivalএর ন্যূনতম ইচ্ছাও নেই। গ্রহণ আছে, যেমন ২ ও ৩ সংখ্যক চিত্রে। তার পর আমরা পাই জাপানি শিল্পের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয়ের নিদর্শন ৪, ৭, ৮ সংখ্যক ছবিতে।

নিজের আঙ্গিককে গড়ে তোলার জন্য অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টার নিদর্শন উক্ত ছবিগুলি। কিন্তু তাঁর সহজাত শিল্পদৃষ্টিকে অনুসরণ করে তাঁর আঙ্গিক কী রূপ পেয়েছে তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ৬, ১২, ১৩ সংখ্যক চিত্র। আর, অবনীন্দ্রনাথের পরিণত স্টাইলের নিদর্শন ৯, ১০ সংখ্যক চিত্র। পুস্তকের নাম 'Early Works' হলেও অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার অবশ্যস্মরণীয় কতকগুলি ছবি এই পুস্তকে পাওয়া যাবে।

স্বর্গত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে নিপুণতার সঙ্গে এটি সম্পাদন করে গেছেন সেজন্য রসিকসমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। আশা করা যায়, অবনীন্দ্রনাথের শিল্পরসিক দেশবাসী, অন্তত শিল্পীরা, বইখানি সংগ্রহ করবেন। অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বহুব্যাপ্ত অবহেলা ও ঔদাসীন্য সত্ত্বেও, অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার দ্বারা প্রভাবান্বিত ও উপকৃত নন এমন শিল্পী ভারতবর্ষে কম। এজন্য তাঁর প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে পরিচয়-সাধন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন শিল্পী-মাত্রের অবশ্য কর্তব্য।

অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলী এখনও অপ্রকাশিত। আশা করা যাক, শীঘ্রই সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা হবে ; ফলে দেশে ও দেশের বাইরে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা কিছু পরিমাণে দূরীভূত হবে।

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

**মাসি।** বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। মূল্য আড়াই টাকা

**একে তিন তিনে এক।** এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা

**মারুতির পুঁথি।** ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭। মূল্য সওয়া তিন টাকা

**রং-বেরং।** অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলিকাতা ১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা

**চাঁইবুড়োর পুঁথি।** ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭। মূল্য তিন টাকা

**অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন।** অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা

সাহিত্যের আসরে স্বীকৃতি অবনীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন, কিন্তু সত্যকার প্রতিষ্ঠালাভ করলেন শেষজীবনে। তাঁর প্রথমযুগের রচনাগুলি লোককে আকৃষ্ট করে নি তা নয়, কিন্তু বিভ্রান্তও করেছিল। সেগুলির যে একটা বিশিষ্টতা ছিল তা নজর এড়ায় নি। কিন্তু সেই বিশিষ্টতা ছিল একটু উগ্র রকমের। তার মধ্যে খেয়ালখুশির, ব্যক্তিগত মেজাজ, অভিরুচি ও কণ্ঠস্বরের এমন একটা অকুণ্ঠ প্রকাশ ছিল যা তখনকার দিনের সাহিত্যরীতিতে অভ্যস্ত বাঙালী পাঠকের পক্ষে পরিপাক করা সহজ ছিল না। কাহিনী খুঁজতে এসে পেল তারা ছবির পর ছবি যার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ উপভোগ করার মত মন তখনও তৈরি হয় নি ; অর্থসংগতি খুঁজতে পেল ভঙ্গিমার বৈচিত্র্য যা কথার সূত্রটিকে কেবলি প্রসঙ্গ থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায় ; ভাষার বুননে দেখল এক অদ্ভুত খামখেয়ালি— তার মধ্যে মিশেছে ঘরোয়া কথা, হাটবাজারের কথা, উড়ে বামুন খোট্টা দরোয়ান দাস দাসী নায়েব খাজাঞ্চির বুলি, বটতলার পাঁচালি, আর তা ছাড়া লেখকের মেজাজের মোচড়ে তৈরি অদ্ভুত সব ইডিয়ম বা শব্দঝংকার। একটা বিরোধিতার পালা যে শুরু হয় নি তার কারণ অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্মের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়া রচনাগুলি এসেছিল প্রতিভার বাড়তি দান হিসাবে, শিল্পীর নিভৃত ব্যক্তিগত জীবনের, কিংবা তাঁর অবসরযাপনপদ্ধতির সাক্ষ্য হিসাবে। শিল্পীর কোনো নূতন সৃষ্টির রাজ্যে পদক্ষেপকে লোকে একটু প্রশ্রয়ের চোখেই দেখে। সে যেন প্রতিভার কাজ নয়, খেলা। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের খেলা ক্রমশই একটা মনোহর ব্যতিক্রমের ভূমিকা থেকে সুসম্বদ্ধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উঠেছে। সমসাময়িক সাহিত্যে এই সৃষ্টিকে তার মর্যাদার আসনটি না দিয়ে আর উপায় নেই।

এর থেকে বোঝা যায়, এমন কোনো তাগিদ অবনীন্দ্রনাথের স্বভাবে ছিল যা তাঁকে অনিবার্যভাবে ঠেলে দিয়েছে সাহিত্যের দিকে। শুধু চিত্রশিল্পে ভিতরকার সে দাবি মেটবার নয়। শিল্পীর ভিতরে ছিল একটি মানুষ যে তার দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। চেনা ঘরদোর বাগানবাগিচা আসবাব-সরঞ্জাম আনাচকানাচ, চেনা লোকজন কথাবার্তা আদবকায়দা, মায়ামমতা ও অন্তরঙ্গতার রসে ভরা ঘরোয়া জীবনের অনুভূতির বিচিত্র সূক্ষ্ম হার্মনি, এবং এই চেনা জীবনের স্নেহ-পরিবেশের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে মনোহর কিম্বা উদ্ভট খেয়ালের স্বপ্নযাত্রা· ·এই সমস্ত অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষাপীড়ামুক্ত ( unsophisticated ) মনের কাছে এতই সত্য, এতই মূল্যবান, এতই সৃষ্টিবেগময় ছিল যে তার একটা নিষ্ক্রমণ-ব্যবস্থা না করে তাঁর উপায় ছিল না। প্রথমটায় এর সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন না হয়েও নিজের ঝোঁককে পথ করে দিয়েছেন, কিন্তু পরের দিকে তিনি সাহিত্যের

ক্ষেত্রেও হয়ে উঠেছেন সচেতন শিল্পী। দৈনিক জীবনযাত্রার মধ্যে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের যে অপর্যাপ্ত ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে তার শিল্পমূল্য আবিষ্কার করেছেন শিল্পগুরু, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করেছি আমরা।

জীবনভোগের এক মহলে তাঁর এমন অবাধ অধিকার থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি শিশুসাহিত্যের গণ্ডীতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। জেম্স্ জয়েসের 'ইউলিসিস' ধরণের কোনো এক বৃহত্তর সাহিত্যপ্রচেষ্টা তাঁর কাছে আশা করা যেতে পারত। কিন্তু তাঁর মনটি ছিল কিশোরের, একদিকে সরল, নমনীয়, স্নেহকোমল, অন্যদিকে আবার কৌতুকক্রীড়াচঞ্চল, শাণিত চতুর দুষ্টামির হাসিতে উজ্জ্বল। এই রকমের মনে যদি প্রতিভার স্পর্শ লাগে, তবে তা সহজেই লাভ করে একটি সুন্দর যথেচ্ছাচারের অধিকার, কিছু একটা সম্পূর্ণ ভেবে দেখা বা গড়ে তোলার দায়িত্ব এড়িয়ে বিষয় থেকে বিষয়ে, আনন্দ থেকে আনন্দে পলায়নের অধিকার। তাই মণিমুক্তা যতই থাক সেইগুলিকে গাঁথবার সূত্র খুঁজে নেওয়াই অবনীন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত ছিল। কাহিনীটা কোথাও থেকে পেলে— তা সে রাজস্থান থেকেই হোক, বা প্রচলিত কোনো উপকথা রূপকথা হিতোপদেশের গল্প বা মেয়েলি ব্রত কথা থেকেই হোক— তাতে রং ফলাতে, সূক্ষ্ম সুন্দর কারুকাজে তাকে ভরে তুলতে, শিল্পীর ভেল্কি লাগিয়ে তাকে একেবারে নূতন ক'রে ফেলতে তাঁর আনন্দ। মোট কাঠামোটা প্রকৃতির ভাঁড়ার থেকে নিয়ে তিনি করেন 'কুটুম-কাটমে'র কারিগরি। যেখানে তাঁকে সত্যিই কাহিনীটা বানিয়ে নিতে হয় সেখানে সব চেয়ে স্বাভাবিক, সব চেয়ে সুপরিচিত এবং তাঁর সৃষ্টির পক্ষে সব চেয়ে অনায়াস সম্ভবনাময় কাহিনীসূত্রই তিনি বেছে নেন। সে আর কিছু নয় ভ্রমণ। দেশ থেকে দেশে, এবং সেই উপলক্ষ্যে অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় ভ্রমণ। যেমন বুড়ো আংলায়। দীর্ঘ নিরবিচ্ছিন্ন ভ্রমণ না হয় অন্তত ফেরি ষ্টীমারে ডেলি পেসেঞ্জারি যেমন দেখি তাঁর 'মাসি' বাদে একমাত্র বয়স্ক কাহিনী 'পথে বিপথে' গ্রন্থে।

তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর গ্রন্থগুলি শিশু বা কিশোর সাহিত্যের শ্রেণীভুক্তই করতে হয়। কিন্তু এই সাহিত্যের স্রষ্টাকে স্থান দিতে হবে বাংলা সাহিত্যের খোলা দরবারে। সেখানে তাঁর দান কোনো বই নয়, ঐ সমস্ত বইয়ের উৎস একটি সম্পূর্ণ জগৎ; কাহিনী নয়, একটি নূতন সাহিত্যিক মেজাজ, একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক কণ্ঠস্বর।

'পথে বিপথে' বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করা উচিত ছিল। যদি তা না পেয়ে থাকে তার কারণ এর সূত্রবয়নের অনিশ্চয়তা। কিছুকাল হল অবনীন্দ্রনাথের যে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে, তারা সৌভাগ্যক্রমে সে দোষে দুষ্ট নয়। সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথের কাছে আমাদের যা প্রত্যাশা তা এই দুটি গ্রন্থ অপূর্ণ রাখে নি। বিশেষ ক'রে এদের মধ্যে দেখা যায় পরিকল্পনার সামঞ্জস্য; শুধু উজ্জ্বল বিচিত্র উপাদান বা অংশগুলির প্রতি মনোযোগ নয়, সম্পূর্ণ কাহিনীটার সুমিতি ও সুষমার দিকে দৃষ্টি।

'মাসি' বইখানির বিশেষত্ব তার স্নিগ্ধ অন্তর্লীন গল্পসূত্রটি। মাসি বাড়ি বদলেছেন, বোনপো অবু খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির। ব্যস্, এইটুকুই গল্প। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃত্রিমতামুক্ত এই সরল সূত্রটিকে অদ্ভুত কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে যার ফলে দুটি বিভিন্ন পরিবেশের জীবনধারা তাদের পরস্পর তুলনীয় দৃশ্য চরিত্র ও সূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে অতি স্বাভাবিক ভাবে ধরা দিয়েছে। আর তার ফলে 'ঘরোয়া'র কবিশিল্পী ঘরকে ঘিরে তাঁর প্রীতি ও ইন্দ্রিয়বোধের সংবেদনগুলিকে স্মৃতির মধ্য থেকে টেনে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে

সামনে ধরে দিতে পেরেছেন। সমস্ত কাহিনীটির আবহাওয়া একটি স্নিগ্ধমৃদু অনুভবের অনুচ্চগ্রামে স্থাপিত। তার মধ্যে পুরানো কথা ভাবার, কথার পিঠে কথা বানিয়ে চলার, যৎসামান্যকেও দৃষ্টির প্রসাদ দেবার মত যথেষ্ট অবসর আছে। চলন-বলনের খুঁটিনাটি নিয়ে রঙ্গরস সেখানে বেমানান নয়। একেবারে সাধারণ আটপৌরে জীবনের সুরটিকে স্থায়ী ক'রে তার উপর তোলা হয়েছে মিড়, দৈনন্দিনের অনুগ্র জমিতে ফুটে উঠেছে ভালোবাসার, ভালো-লাগার, খেয়ালের রঙতামাশার কারুকার্যগুলি। এইটুকু গল্পের আসরে কত সহজে বিনা আড়ম্বরে যাচ্ছে আসছে হরেকধরণের চরিত্র। হয়তো কেউ নেপথ্যে থেকেই মনোযোগ দাবি করছে, সামনে আসছে না। যেমন ফেলা, আর ফেলার মা ও আরো অনেকে। ঐ ঝঙ্কারী ছিঙ্কারী চাংড়াদাদা চাংড়াদিদি, বাস্তুস্তে ইত্যাদির এ গল্পের মধ্যে কাজ কি ? কাজ এই যে ওরা ওরাই, বিশিষ্টভাবে ওরা ওদের নিজস্বতাটুকু জাগিয়ে রেখেছে, গৃহের পরিবেশটুকে তার দ্বারাই করেছে ঐশ্বর্যময়। ঝি-চাকরের কথা বলতে হঠাৎ কবিতার আবির্ভাব বইএর মধ্যে। "ওরা আমারও কেউ ছিল, তোমারও কেউ ছিল।" এ কবিতা নেহাত খেয়ালের ব্যাপার নয়। ল্যাম্‌-এর মধ্যে চেনার প্রতি, সাবেকি জিনিসের প্রতি, অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীর প্রতি, Quaint বা বেখাপ্পা ব্যাপার ও জিনিষের প্রতি যে মমতা কাব্যরসাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, অবনীন্দ্রনাথের মধ্যেও সেই পর্যায়ের একটি অতি সূক্ষ্ম গভীর রসবোধ সারাজীবন তাঁর মনকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁর শিল্প ও সাহিত্যেও অকৃপণধারায় নেমে এসেছে। মাসি গ্রন্থে এই ঘরোয়া রসের অনেকগুলি দিক্‌ ফুটেছে। তার মধ্যে মিলেছে লঘুর সঙ্গে গম্ভীর, পরিহাসের সঙ্গে একটি স্নিগ্ধশ্রী, একটি অন্তরঙ্গ মাধুর্যের ধ্যান। সহজ সরল কথোপকথনের আশ্চর্য কলাকৌশলের সুরের যে হার্মনি মাসিতে ধরা দিয়েছে, উপাদানগৌরব চাপিয়ে কাহিনীর মূল ঐক্যের যে স্নিগ্ধ হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করেছে তা মাসিকে শ্রেষ্ঠসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্‌ প্রমুখ সাহিত্যিকরা শান্ত অনুত্তেজিত পরিবেশে সূক্ষ্ম হৃৎস্পন্দন রেখাঙ্কিত করার যে চেষ্টা করেছেন, মাসি সেই ধরণের সৃষ্টি। সেই হিসাবে এর শ্রেষ্ঠতা সংশয়াতীত। একেবারে হালকা হাসি থেকে গভীরতম উপলব্ধি পর্যন্ত অনুভবের যে range এই কাহিনীর মধ্যে অবলীলাক্রমে গ্রথিত হয়েছে তা অবনীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব।

ঘরোয়া কথাবার্তার বিভ্রমে যে ধ্যানটি একবারও বিক্ষিপ্ত হয়নি চকিতে এখানে ওখানে তার দেখা মেলে। যথা—

"চাঁদের আলো পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। যেন শ্বেতপাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামল।"

'মাসি' শিশুদের জন্যই নয়, সকলের। কিন্তু 'একে তিন তিনে এক' ছেলেমেয়েদের জন্য। এর মধ্যেও এমন একটি সুসামঞ্জস্য, একটি শিল্পের সর্বাঙ্গীণতা দেখি যা অবনীন্দ্রনাথের আগেকার লেখাগুলিতে ছিল না। যাত্রাপালার অনিয়ন্ত্রিত কৌতুকপ্রবণতা এখন দেখি শিল্পসংগতির মধ্যে ধরা দিয়েছে, তাই এর দুটি নাটিকা— ধরা পড়া ও রাসধারী— অতি উপাদেয় হয়ে উঠেছে। গল্পগুলি নিপুণভাবে সীমিত ; উপাদানগুলি বিশৃঙ্খল নয়, আধারকে তারা বিড়ম্বিত করেনি। দুএকটি পুরাণো উপকথা বা fableএর নূতন রূপ দেওয়া হয়েছে,

এবং তার মধ্যে যেটুকু নূতন দান তা নিখুঁতভাবে উৎকীর্ণ। পরিশ্রমী পিঁপড়ে পুরানো উপকথার জিনিস, কিন্তু 'গঙ্গা গঙ্গা' বলে গঙ্গাফড়িংএর সংকীর্তন এক নূতন সরস সৃষ্টি। কোনো-কোনো গল্পে প্রচলিত উপকথার ছড়া প্রভৃতির চরিত্র, যথা ভোম্বলদাস, রতা শেয়াল ইত্যাদি নিয়ে নূতন চমৎকার কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। কোনো-কোনো গল্পের আসর একেবারে লৌকিক জীবনের দৈনন্দিন আনাগোনা দেখা-শোনার মধ্যে পাতা হয়েছে। 'একে তিন তিনে এক' তিন পাড়াগেঁয়ে বন্ধুর কলকাতা-ভ্রমণ। এই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার সমস্ত বিচিত্র রস কি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ সমন্বিত করেছেন, তা এই গল্পটি না পড়লে বোঝা যাবে না। এই বইএর গল্পে, নাটিকায় বিভিন্ন চরিত্রকে, এমন কি তাদের গৌণতমটিকে তিনি এমন নিপুণ আলেখ্যে ফুটিয়েছেন যার তুলনা শুধু তাঁর নিজেরই অঙ্কনশিল্প। 'মন-বুলবুল' গাইতে গাইতে যে নেড়ানেড়ী ঢুকল, আমি তাদের বাউল-সুলভ চোখ-ঝাপটি ( যাঁরা রসিক বাউল গাইয়ে দেখেছেন তাঁরা কথাটা বুঝবেন ) দেখতে পেলুম।

মোটকথা একে তিন তিনে এক সাহিত্যক্ষেত্রে শিল্পোৎকর্ষের নূতন মান নিয়ে প্রবেশ ক'রেছে।

শেষজীবনে এক ধরণের স্বগত কৌতুকে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন বহু যাত্রার পালা। বিষয়চয়নে বাধা মানেন নি কিছু। পুরাণ, ঈশপের গল্প, সংস্কৃত উপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি আধুনিক লেখকের লেখা কোনো গল্প— যা পেয়েছেন হাতের সামনে তাই নিয়েই শুরু করেছেন পালাগান। গল্পগুলো কখনো-কখনো হয়ে উঠেছে একেবারে উদ্ভট কল্পনা— যেমন গ্রীসের আফ্‌লাতুন (প্লেটো)কে এনে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের সঙ্গে তাঁর মুলাকাত করিয়ে দেওয়া। কিন্তু একটি বিচিত্র উচ্চ কৌতুক-রসায়ন কোথাও ফুরিয়ে যায় নি। এই ভোগরসই এই লেখাগুলির প্রাণ। যাত্রাপালার টেকনিকেই এর অনেক পরিমাণে মুক্তি সম্ভব, কিন্তু সবটা নয়। যাত্রার রচনাকার নিজের টীকা-টিপ্পনি, রঙ চড়িয়ে বর্ণনা, দর্শক-পাঠকের সঙ্গে রসিকতা ইত্যাদির যথেচ্ছ সুযোগ পান না। এই শিষ্টতার বা শিল্পের বাঁধনটুকুও অবনীন্দ্রনাথের দুরন্ত যা-খুশি মেজাজের কাছে অসহ্য। তাই তাঁর সন্ধান: কোথায় সেই স্থিতিস্থাপক শিল্পপাত্রটি যার মধ্যে তাঁর বাঁধনছেঁড়া আনন্দ-খেয়ালটিকে পুরো ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে? এই সন্ধানের ফল পাওয়া গেল তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'মারুতির পুঁথি'তে। যাত্রা-পাঁচালির সঙ্গে, কথকতার সমস্ত আত্মবিস্তার মিশিয়ে এটি তৈরি। বর্তমান লেখকের 'কালোর বই' প্রকাশের আগে তার কয়েক অধ্যায়ের নাটকের ছাঁচে ঢালা ছড়াগুলিকে তিনি কাহিনীর বহমানতার মধ্যে মুক্তি দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এটি তাঁর নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। মারুতির পুঁথিতে তাঁর এই দিকের শিল্প-অভিজ্ঞতাটি পূর্ণফল প্রসব করেছে। 'মাসি'র সেই চাংড়াদাদা এই মারুতির পুঁথির পাঠক। তাঁর রকম-সকম ক্রিয়াকর্ম বোলচাল সবই এতে ধরা হয়েছে। পুঁথির গল্প আছে, সেই গল্পের পাঠকের গল্পটিও আছে। আমরা চাংড়াদাদার চোখে দেখি দেবতাদের বানরবিবাহ আর হনুমানের রাজকাজের পালা আর অবনীন্দ্রনাথের চোখে দেখি চাংড়াদাদা ও চাংড়াদিদির লীলা। এইভাবে মঞ্চ থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে অবনীন্দ্রনাথ শুধু সাবেকি ধাঁচের একটি পাঁচালি পুঁথিই উপহার দেন নি, একটি পুরানো দিনের রুচি ও সামাজিক সম্ভোগের আসরের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন।

শুধু অতীতকেই পুনরাবিষ্কার নয়, এরই মধ্য দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ কিছু কিছু শিল্পপ্রকরণ আবিষ্কার করেছেন যা নূতন দিনেও সম্ভাবনাময়। সেটি হচ্ছে কাহিনী বা প্লটের সূত্র রচনায় আধুনিক সমস্ত

নিয়মকানুন, বুদ্ধির ব্যায়াম, মনস্তত্ত্বের চতুর প্রয়োগ— এক কথায় সমস্ত মাথাব্যথাকে সম্পূর্ণ পরিহার। সুতো ছিঁড়ে মালার মুক্তোগুলোকে টলটল ঝলমল ক'রে গড়াতে দেওয়া। সুপ্রসর থালা একটা থাকতে পারে, কিন্তু সূত্র নয়। এর ফলে প্রতিটি ঘটনা, situation, ভাবকে দায়িত্বমুক্তভাবে আলাদা আলাদা ক'রে পাওয়া যায়, পূর্ণ অকুণ্ঠ সম্ভোগ করা যায়। ঘরপালানো কিশোর ছেলের দল যেমন যা কিছু সামনে পায় তারই উপর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খাটিয়ে দেখে, বাইরের জগৎটাকে Kaledoscope-এর মত পরিবর্তিত হতে দিয়ে গাম্ভীর্যে-চাপল্যে হাসি-কান্নায় অম্ল-মধুরে নিজেদের ভিতরটাকে বিচিত্ররসে সিক্ত করে তোলে, দায়িত্ব মানে না, পরম্পরার সংযোগ রক্ষা করে না, যখন যা পায় নেয়, নিজেদের যা দেবার পুরো শোধ করে দেয়, ঠিক তেমন করেই কেন সাহিত্য হাজির হবে না জীবনের দরবারে? মারুতির পুঁথির বানরগুলো সেই হিসাবে চমৎকার জীবন রসিক। এই হাসি, এই কান্না। এই অনাহারে মৃত্যুপণ, সঙ্গে সঙ্গে মরণের সবরকম লক্ষণের অতি চটুল, অতি বিজ্ঞ বিচার। পূর্বাপর জ্ঞান নেই, ধাপ থেকে ধাপে যাবার আরোহ অবরোহের সূক্ষ্ম পরিমিতি বিচার নেই, ঝম্পকছন্দে এক অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আর এক অভিজ্ঞতায় ঝাঁপ। যখন সামনে যা তার মধ্যেই পূর্ণ আত্মনিয়োগ, আত্মপ্রকাশ। মনে রাখতে হবে প্রস্তুতবিষয়ে এই সর্বাঙ্গীন আত্মাহুতি শেকৃস্পীয়রের একটা মূল্যবান্ বৈশিষ্ট্য। জীবনের এক দৈনন্দিন স্তরে অবনীন্দ্রনাথ সেই ক্ষমতার সাধনা করেছেন।

আর এই বিচিত্র শক্তিসাধনার বাহন হিসাবে পয়ার ছন্দকে ইচ্ছামত দীর্ঘ-হ্রস্ব ক'রে শেষকালে কোনোক্রমে মিলটা জুগিয়ে রীতিমত একধরণের ছন্দের স্বাধীনতা-আন্দোলন চালিয়ে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ। জনজীবনের কাব্য, পালাগানের এই পথ। এতে ছন্দটাও একরকম উদার সর্বংসহ রকমে টিকে থাকে এবং মেজাজের, মজার কোথাও হানি হয় না। জানি না এই সাধনের উত্তরসাধক কেউ হবেন কি না।

'মারুতির পুঁথি'কেও আমাদের সাহিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আসন দিতে হবে।

অবনীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সর্বশেষ প্রকাশিত আরো তিনখানি বই হচ্ছে রং-বেরং, চাঁইবুড়োর পুঁথি, ও অবনীন্দ্রনাথের কিশোরসঞ্চয়ন। রং-বেরং একে তিন তিনে এক -এর মত একটি পাঁচমিশেলি রচনার সংকলন। ভাঙা যাত্রা গান, 'চর্ভটি'নাটক, টুকরো পাঁচালি, পশুপক্ষীর মহতী জনসভার অর্থাৎ 'জেন্ত সভা'র বিস্তৃত রিপোর্ট, বাবুই পাখির ফিল্ড রিসার্চ অর্থাৎ গবেষণা-ভ্রমণ ও তার বিবৃতি, রোমান্স কল্পনার রঙ চড়িয়ে হঠাৎ বা রাজকাহিনীর মেজাজে এক অজানা বা গৌণ ইতিহাসের ছিন্ন কাহিনী— অবনীন্দ্রনাথের ডালিতে জ'মে ওঠা এমন অনেক কিছু উপাদানসম্ভারের সংকলন। শিল্পোৎকর্ষে একে তিন তিনে এক -এর সমপর্যায়ে একে রাখা যায় না, কিন্তু এর মধ্যেও ছড়িয়ে আছে তাঁর কলাকৌশলের অনেক নূতন নিদর্শন। শিব-সদাগরকে নিয়ে তাঁর চর্ভটি নাটকটি হল রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসবের অবনীন্দ্র-version— শুধু ঐ নাটকে শরৎ আর এই নাটকে বর্ষাই উপলক্ষ্য— এই যা তফাত। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে সিকস্তি পয়স্তি কথা। এই গল্পের সামনের আসর জুড়ে আছে 'শকুন বিদ্যার ব্যাখ্যান', খুঁদিরাম ও খাজাঞ্চিমশায় মিলে মোরগ কাক গোরুর ভাষা ও ধ্বনির মর্মোদ্‌ঘাটন। কিন্তু এরই আড়ালে আবডালে এগিয়ে চলেছে একটি কঠোর বস্তুতান্ত্রিক বিরোধের প্লট— উদ্বাস্তুর চরে সংক্রান্তি ঠাকুরকে উৎখাত করে খাজাঞ্চি মশায়ের খোঁটাগাড়ি

ক'রে জবরদখল নেওয়ার বৃত্তান্ত। লঘু হাস্যরস ও গুরুতর চরিত্র ও কার্যকলাপের এই শিল্পায়ত্ত সংমিশ্রণ যে বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই।

চাঁইবুড়োর পুঁথি মারুতির পুঁথিরই সগোত্র। সেই চাঁইবুড়োই বক্তা, আর বিষয় হনুমানের নয়, রাবণের কীর্তিকলাপ। সে তার মামা কালনেমি, মা নিকষা, বোন সুর্পণখা, বোন মহোদরী ও তার স্বামী মহোদর— এরাই সব হল এই পাঁচালির প্রধান চরিত্র। পরিহাসের মেজাজের দমকা হাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ এই কাহিনীতে যথেচ্ছ ঘটনা ও উদ্ভাবনার দ্বার একেবারে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। রাগের সময়ে প্রথমে হিন্দি এবং তার পর 'রাবণকে তখন ইন্‌জিরীতে পাওয়ার যোগাড় হচ্ছে দেখে সকলের পলায়ন'; মধু দৈত্য রাবণ ভগ্নী কুম্ভীনসীকে হরণ ক'রে তার পর ধরা পড়ে নিজেকে একটা ছারপোকা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছে— 'মধু আকর্ণ বিস্তৃত ঠোঁট মেলে ছার খিলাও, ছার খিলাও ব'লে রাবণের দিকে এগোতে লাগল, রাবণও ভুত্তোর ব'লে দুদ্দাড় প্রস্থান।' এখন এইসব চটুলতা যতই আপত্তিজনক মনে হোক, একবার একটু প্রশ্রয় দিলে আর এর মারাত্মক সংক্রামকতা থেকে রক্ষার উপায় নেই। তখন ধূর্ত মহোদরের সমস্ত ভাঁওতা, সুর্পণখার পতিভোজন, লঙ্কার মেয়েদের 'উলুঙ্গু' হয়ে হনুমানের ল্যাজে বাঁধবার কাপড় দেওয়া— এ সমস্তই নির্বিবাদে সুবোধ ছেলের মত গলাধঃকরণ করা ছাড়া উপায় নেই। মারুতির পুঁথির চেয়ে এই বইয়ের শিল্পমর্যাদা অবশ্যই কম, কিন্তু এর উচক্কা উনপঞ্চাশ পবনের আবহাওয়া যাকে সুড়সুড়ি দেবে সেই -এর যথার্থ আনন্দটি ভোগ করতে পারবে।

অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়নের প্রধান আকর্ষণ এর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত শিশু-উপন্যাস 'খাতাঞ্চির খাতা'র পুনর্মুদ্রণ। তা' ছাড়া এর মধ্যে আছে তাঁর নানাধরণের লেখার বিচিত্র নমুনা। স্মৃতিকথা, চট্‌-জল্‌দি কবিতা, 'রাজকাহিনী'র গল্প, যাত্রাপালা, খেয়াল খুসীর গল্প— কিছুই বাদ যায় নি। কিশোরদের প্রতি তাঁর স্নেহোপহারের এই সংগ্রহ কিশোর ও বয়স্ক পাঠক সকলেরই ভালো লাগবে।

ছয়খানি বইই শক্ত বাঁধাই, সুনির্মিত ও সুচিত্রিত। সমস্ত লাইব্রেরি ও বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে বইগুলি থাকবে আশা করি।

সুনীলচন্দ্র সরকার

**স্মৃতিচিত্র**। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। সিগ্‌নেট প্রেস, কলিকাতা ২০। মূল্য সওয়া দুই টাকা।

**বাবার কথা**। শ্রীমতী উমা দেবী। মিত্রালয়, কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

**অবনীন্দ্র-চরিতম্‌**। শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি., কলিকাতা-৭। মূল্য পাঁচ টাকা।

'যে যুগের কথা শুরু করলুম সেদিন বাঙলার নবযুগ, বর্তমান সাহিত্য শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই দিন। যুগান্তরের সন্ধিক্ষণে তখন বহুকালের সনাতন প্রথাগুলি নাড়া খেয়ে উঠেছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন এখনকার মতো গভীরভাবে ঘটেনি, দেউল ছিল খাড়া প্রাচীন বটের মতো, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধরেছিল ঘুণ।...

'…সামনের বৃহৎ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা উতলা হয়— ঐ অন্ধকার নির্জন বাড়িটা একদিন প্রাণের আলোড়নে পূর্ণ ছিল, আজও সেই পুরনো কালের দু-একজন স্মৃতির অবশিষ্ট খুঁটি আগলে বসে আছেন। চক-মেলানো ঠাকুর-দালানটির দিকে চেয়ে মনটা তখন ভরে উঠেছে, হঠাৎ অন্ধকার আকাশ চিরে পেঁচার ডাকে বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। চিলছাদের এক কোণে একটা আকাশপ্রদীপ মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। আমার চোখের সামনে ঐ ভাঙা বাড়ির আত্মা তার কবর থেকে বেরিয়ে এল, তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জীবনের তান শুনতে পাচ্ছি, আবার জ্বলল আলো, চোখের সামনে যেন পরীস্থানের ইমারত।'

পরিচ্ছন্ন একটি ভাষার পটভূমে এইভাবে প্রতিমাদেবী তাঁর স্মৃতিচিত্রের প্রথম রেখাপাত করেছেন। ক্রমে তা বিবিধ রূপের লিখনে, বহু কুশীলবের চলচ্চিত্রপ্রতিম প্রবেশে ও প্রস্থানে, বিচিত্র বর্ণের রঞ্জনে, একটি বিশেষ দেশকালের আবহ-সৃজনে এবং সর্বব্যাপী একটি ভাবলাবণ্যে ও রসের ব্যঞ্জনায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পদবীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'স্মৃতিচিত্র' নামটি বিশেষভাবেই সার্থক। ভাষা ভাব, দুঃখ সুখের স্মৃতি, বিস্ময় প্রীতি ও অনির্বচনীয় বিষাদ বা ঔদাস্য— স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে অপরূপ 'ধ্বনি' জেগে উঠেছে সে তো সত্যই, তা ছাড়া ফুটে উঠেছে যেন কাংড়া কলমের একখানি ছবি। অতীতের সাচীকৃত সেই আননে অবয়বে কী সৌন্দর্য, কী সৌকুমার্য, কী শালীনতা, ভাষা-হার-মানে এমন কী যেন ভাষা— কটাক্ষ-ইঙ্গিতে বলে না কি ? 'আমি বর্তমান নই, সোজাসুজি চোখ তুলে চাইতে পারি নে তোমার চোখে, অথচ একেবারে মুখ ফেরাই নি বিস্মৃতি ও বিলুপ্তি পানে— আছি তোমার অন্তরদৃষ্টিপথে শাশ্বত অন্তরলোকে।' রামধনু-রঙে বিশ্লিষ্ট হয়ে আলো যেখানে ঠিকরে পড়ে দিকে দিকে, দিবস রাত্রির সন্ধিক্ষণে, সুন্দর কোমল আভায়, তেমনি কাংড়া কলমের ছবি কি ? হয়তো তুলনাটি নিখুঁত হল না। মাতুল অবনীন্দ্রনাথের রঙ-লেপা ( লিপ্ত ) আর রঙ-ধোওয়া ( ওয়াশ ) অভিনব চিত্রশৈলীর সঙ্গেই এ রচনার সাদৃশ্য সমধিক। অর্থাৎ, পরিস্ফুট রূপের ও ঘটনার বিলিখন এবং কোমল করুণ মনোরম বর্ণের দ্যুতি শুধু নয় ; তারও পরে সমস্ত চিত্রক্ষেত্রটি ( মানুষের চিত্তক্ষেত্রই বাহিরে মেলে ধরা— তা বৈ অন্য কিছু নয় ) ব্যাপ্ত ক'রে আছে বহু বিমিশ্র রঙের অনির্দিষ্ট মায়াছায়ার একটি আবরণ— সে যেন জীবনের শীতসন্ধ্যায় দীর্ঘশ্বাসের একটি কুয়াশা বিছানো, সে যেন সেই কুয়াশা ভেদ ক'রে বারে বারে অস্তাচলের শিখর থেকে অরুণাচল পর্যন্ত বিসর্পিত করুণ অরুণ আভা— মনে পড়ে ৫ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর -ভবনের অধুনাবিলুপ্ত দক্ষিণের বারান্দায় সৃষ্ট ওমার-খৈয়াম কাব্য অথবা আরব্য উপাখ্যানের অতুল ছবি। ঐ পাঁচ নম্বর আর ছ নম্বর বাড়ির সাত-মহলা সুপরিসর রঙ্গমঞ্চে যে জীবননাট্যের সত্য অভিনয় হয়েছিল একদিন, প্রধানতঃ তারই ঝলক দিয়ে গেছে এই রচনায়, অদৃশ্যই দৃশ্য হয়েছে আর্টের মায়ামন্ত্রে।

ফলতঃ, রসোত্তীর্ণ হয়েছে, work of art হয়ে উঠেছে, মনস্বিনী লেখিকার ক্ষীণতনু এই স্মৃতিচিত্র। বিশেষ একটি পরিবারের কথা, ঘরের কথা, নিশ্চিহ্ন কতকগুলি উষাসন্ধ্যা দিবানিশার ঘটনা, আপন বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখেও পেয়েছে সব দেশের আর সব কালের ধ্রুবপদবী, হয়েছে আজকের আর আগামীকালের সব জনের অন্তরঙ্গ অনুভব ও অভিজ্ঞতার বিষয়। শব্দ কিছুই নয়, মানুষের রসনায় রসনায় তার সচকিত জন্ম মৃত্যু, নাহয় বৃহদায়তন কোষগ্রন্থের যাদুঘরে তার জড় ও অনড় স্থিতি। অথচ সেই শব্দই ছন্দঃস্পন্দিত ও রসধ্বনিত হয়ে প্রায় অক্ষয় অমর জীবন অধিকার করে। নিজের অন্তর্জীবনটি নিঙড়ে নিঙড়ে আর্টের আধারে এই অমর্ত জীবনের যিনি স্রষ্টা, আপন সৃষ্টিতে তিনি মিলে মিশে থাকেন, একীভূত হয়ে থাকেন
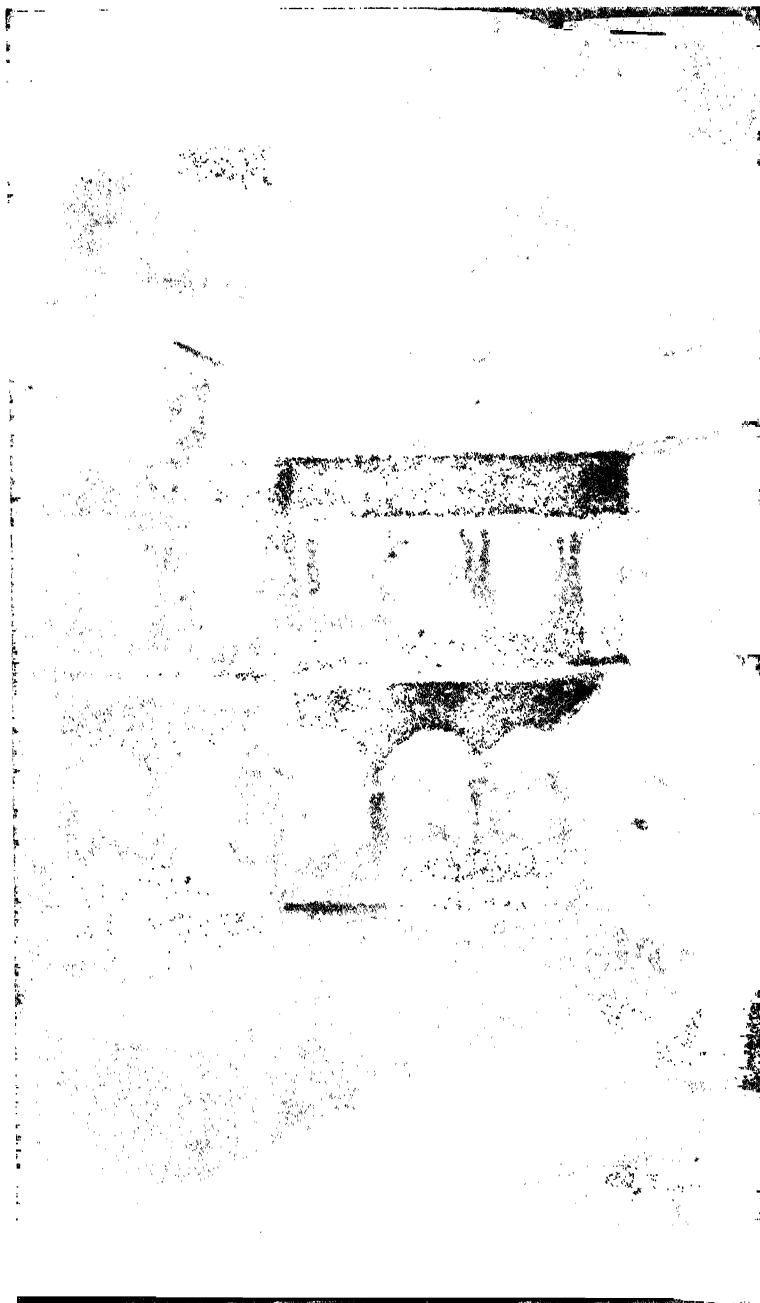
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাশ্বতকালের জন্য— আর্টিস্টের সেই হল বিশেষ সার্থকতা। 'স্মৃতিচিত্র' লিখে শ্রদ্ধেয়া প্রতিমাদেবী নিজেকে ফুরিয়ে-ফেলা হারিয়ে-ফেলা সেই সার্থকতা লাভ করেছেন ব'লেই পাঠক হিসাবে আমরা খুশী হয়েছি আর বাঙলা সাহিত্যও নূতন সম্পদ লাভ করেছে। ভাব-ভাষার উপর অতুল অধিকারে, আলেখ্যলিখনের নিখুঁত নৈপুণ্যে, উনিশ-বিশ অবশ্যই আছে, তবু অবনীন্দ্রনাথের 'আপন কথা' বইটির জুড়ি এটিকে বলা চলে ; বহুস্থলে অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাই সংকলিত হয়েছে স্মৃতি থেকে। এ বইয়ে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট আলোকচিত্র ছাপা হয়েছে ; মুদ্রণ-পারিপাট্য আর দৃষ্টিতর্পণ বেশভূষা সেও বিশেষ প্রশংসারই যোগ্য।

'বাবার কথা লিখতে বসেছি, বাবার জীবনী নয়। নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনী। এতে হয়তো থাকবে না ধারাবাহিকতা, থাকবে না সম্পূর্ণতা। তা না থাকলেও তাঁর অন্তরের অন্দর মহলের স্নিগ্ধ ছবিগুলোরই কয়েকটা টুক্‌রো এতে পাওয়া যাবে। যাঁরা তাঁর জীবনচরিত রচনা করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের কাজে লাগলেও লাগতে পারে। তবে কারও অনুরোধে বা কারও দরকারে··· আমি কিছু লিখছি না। বাবার কথা লিখতে ভালো লাগছে, ভাবতে ভালো লাগছে— তাই মনে ক'রে লেখবার চেষ্টা করছি।' এই উদ্‌ধৃতি থেকেই অবনীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রদ্ধেয়া উমাদেবীর লেখা 'বাবার কথা' বইখানির বিষয়বস্তু বা প্রকৃতি চমৎকার বোঝা যায়। লেখিকা জানাতে ভোলেন নি, যেমন 'এতে ইতিহাস নেই' তেমনি 'মিথ্যের অবকাশ একবিন্দুও নেই।'

পাইকা অক্ষরে ছাপা এই পুস্তিকাখানি একপঞ্চাশত্তম পৃষ্ঠাতেই সমাপ্ত, এই অল্প পরিসরে লোকোত্তর চিত্ররূপ -স্রষ্টার অলৌকিক প্রতিভার পূর্ণপরিচয়-দান সম্ভবপর নয় আর লেখিকার লক্ষ্যও ছিল না কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ পুত্র-রূপে, স্নেহশীল পিতা-রূপে অবনীন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্য— চিরশিশু স্বভাবের যে বিষাদ সুখ কৌতুকপ্রিয়তা ও স্বত-উৎসারিত আনন্দ উৎসাহ এবং বিমল প্রীতি— তার অনেকটাই অনুভূত বা অনুমিত হয় নানা ঘটনাধারার অনায়াস অনাড়ম্বর বিবরণ-যোগে। অবনীন্দ্রনাথের কোণারক-ভ্রমণ, সিঙ্কলে সূর্যোদয়-দর্শন, আর্ট্ ইস্কুলে চাকরি নেওয়া আর চাকরি ছাড়া, 'বাগেশ্বরী'-ব্যাখ্যান, পাখি পোষা, কুটুমকাটুম বানানো— সেইসঙ্গে শিল্পীর জননী জায়া ও কন্যার অপরূপ পার্শ্বচিত্র— অবনীন্দ্র-চরিত্রের অনাবিল প্রকৃতি-প্রীতি, মানব-প্রীতি, বিশুদ্ধ অনুরাগ, অনাসক্তি ও সত্য-সুন্দরের সন্ধান, এ-সবই ছোটো ছোটো আখ্যানের ভিতর দিয়ে বিনা ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে আমাদের জ্ঞানগোচর হয়ে আনন্দ দান করে। বহু প্রসঙ্গ 'জোড়াসাঁকোর ধারে' অথবা 'ঘরোয়া'য় পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমাদের জানা ছিল না আর শোনা হয় নি এমন প্রসঙ্গও অল্প নয়। আর প্রত্যেক প্রসঙ্গই নানা চিত্তবৃত্তির আলোকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বথা নূতন রূপ না পেলেও, নূতন অপরূপতা পায় ও নূতন রঙে রঙিয়ে উঠে আদরণীয় হয় এ কথাও মিথ্যা নয়। তিনখানি আলোকচিত্রে আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা একখানি চিত্রে ( 'শেখ'— আসলে এটি শিল্পীর কল্পরূপ নয় কি ? ) গ্রন্থখানির মূল্য এবং মান বর্ধিত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ সম্পর্কে এরূপ স্মৃতিকথা আরও লেখা হয়, বিস্তারিতভাবে লেখা হয়, তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। না হলে নবযুগে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির নবজাগরণের ইতিহাস নিখুঁতভাবে লেখা যাবে না।

পূর্বোক্ত দুখানি গ্রন্থের তুলনায় 'অবনীন্দ্র-চরিতম্' বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে সত্য এবং নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে নূতন 'রঙিলা' ( 'রঙ্গিলা' ) আলোর উদ্ভাসে উদ্ভাসিত হওয়াতে অবনীন্দ্ররূপ-লিখন অপরূপ

লিখন হয়ে ওঠে নি তাই বা বলা যায় কেমন ক'রে? অথচ লেখাটি বড়ো বেশি ব্যক্তিগত। বিষয়বস্তুর অপ্রতুলতা নেই— সাধারণ পাঠকের পক্ষে অসুবিধা এই যে, বক্তব্যকে বহুগুণে অতিক্রম ক'রে গেছে বলার ভঙ্গী। অবনীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ চিত্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা আছে এই রচনায়; ভাবে-ভোলা গুণীর বিচিত্র আচার-আচরণের সঙ্গে নিপুণভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর মুখের কথা বা মুদ্রিত ভাষণ। ঠাকুরমশায়ের এই উদ্যমের বিশেষ এক-প্রকার মূল্য বা মর্যাদা আছে। তাঁর ভাব ও ভাষার ব্যুৎপত্তি-জ্ঞান অল্প নয়। তিনি একাধারে রসিক ও পণ্ডিত। তাঁর বলবার কথা আছে অনেক, এই গ্রন্থের দুখানি মলাটের মধ্যেই সব যে ধরেছে এমনও নয়, আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ এই যে, এ রচনাকে তিনি অসংগত আগ্রহে 'রম্যরচনা'র পর্যায়ে 'উন্নীত' করতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়েছে উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। লেখকের কাছে আমাদের এ নিবেদন সবিনয়ে এবং সসম্ভ্রমে। যা তিনি দিয়েছেন তার অনেক বেশি আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাশা করি। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির নয়খানি একবর্ণ ও একখানি বহুবর্ণ প্রতিচিত্রে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ হয়েছে। দুঃখের বিষয়, সচরাচর একবর্ণ প্রতিচিত্র থেকে অবনীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট রূপের মাধুরী ও রঙের জাদু, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারিগরি, কিছু বোঝা যায় না— রঙিন প্রতিচিত্রও যে একেবারে আশানুরূপ হয় তা অবশ্য নয়— এ স্থলে অনেকগুলি একবর্ণ প্রতিচিত্রের বদলে অল্প কয়েকখানি রঙিন প্রতিচিত্র দেওয়াই কি ভালো ছিল? এটি বিবেচনার বিষয়। অপরূপ প্রচ্ছদশোভা হয়েছে শিল্পীগণের অগ্রণী নন্দলালের আঁকা তূলিধর অবনীন্দ্ররূপে। অবনীন্দ্র- চরিতে ও চিত্রে আকৃষ্ট যাঁরা, ঠাকুরমশায়ের এ গ্রন্থ তাঁদের পড়তেই হবে। বিশেষপ্রকার বাগ্‌ভঙ্গীটিকে বিশেষ বাধা ব'লে মনে না করলে অবশ্যই তাঁরা লাভবান হবেন।[১]

সুদর্শন চক্রবর্তী

---

১ গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'দাসখৎ' ছবিটি কোনো প্রদর্শনীতে দেখানো হয় নি। অথচ আমাদের যতদূর মনে পড়ে, কলিকাতায় যাদুঘরের দ্বিতলে রবীন্দ্রভারতীর উদ্যোগে যে অবনীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনী হয় তাতে এ ছবিটি দেখানো হয়েছিল। যথাকালে পাওয়া যায় নি ব'লে চিত্রতালিকায় উল্লেখ ছিল না— এমন হতেও পারে।

'শ্যামলী'

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সূচী

## পুলিনবিহারী সেন ও পার্থ বসু

বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় ( মাঘ-চৈত্র ১৩৫১ ) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবনীন্দ্রনাথ-রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; উহাতে 'জোড়াসাঁকোর ধারে' পর্যন্ত যাবতীয় গ্রন্থ সূচীভুক্ত হয়। তাহার পর অবনীন্দ্রনাথের আরও অনেক রচনা সাময়িক পত্রাদি হইতে সংকলিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান সূচীতে এযাবৎ-মুদ্রিত সকল গ্রন্থের বিবরণ, পূর্বাপেক্ষা কিছু বিস্তারিত আকারে, নিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম-প্রকাশিত গ্রন্থ, যতদুর জানা যায়, 'শকুন্তলা'। 'আমার বই লিখতে শেখা' বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন, বহু-উদ্ধৃত হইলেও তাহা এই প্রসঙ্গে পুনরুল্লেখযোগ্য :

'একদিন আমায় উনি [ রবীন্দ্রনাথ ] বললেন, "তুমি লেখ-না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখ।" আমি ভাবলুম, বাপরে, লেখা— সে আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। তা আবার আমি লিখব কি করে ? উনি বললেন, "তুমি লেখই-না ; ভাষার কিছু দোষ হয়— আমিই তো আছি।" সেই কথাতেই মনে বড় জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন ; শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে 'না থাক্' বলে রেখে দিলেন।··সেই প্রথম জানলুম আমার বাংলা বই লিখবার ক্ষমতা আছে।··মনে বড় স্ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন "ভয় কি, আমি তো আছি"— সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।'[১]

এই প্রসঙ্গে 'বাল্যগ্রন্থাবলী'র উল্লেখ করা যাইতে পারে। "শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া গণ্য" না করিয়া তাহাদের জন্য সাহিত্য রচনায় ও প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ আযৌবন উৎসাহী ছিলেন— 'বালক' ( ১২৯২ ) পত্রিকা প্রকাশের পর এ বিষয়ে ঠাকুর-পরিবারে অপর উদ্যোগ বাল্যগ্রন্থাবলী প্রকাশ। যতদুর জানা যায় এই গ্রন্থমালায় তিনখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল— প্রথম গ্রন্থ অবনীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' ( শ্রাবণ ১৩০২ ), দ্বিতীয় গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'নদী' ( মাঘ ১৩০২ ), তৃতীয় গ্রন্থও অবনীন্দ্রনাথের রচিত, 'ক্ষীরের পুতুল' ( ফাল্গুন ১৩০২ ) ; তিনটি রচনাই বাংলা সাহিত্যে চিরায়ু হইয়া আছে।

১

বাল্যগ্রন্থাবলী ১ ।/শকুন্তলা ।/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।/মূল্য ছয় আনা।

অপর পৃষ্ঠায়

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক/চিত্রাঙ্কিত ।/৩৩নং জেলেটোলাস্থ/"ইণ্ডিয়ান আর্ট কটেজে"/শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ধর

১ "আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা···", প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৮। পরে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র অন্তর্গত।

কর্তৃক প্রস্তর-ফলকে মুদ্রিত।/কলিকাতা।/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।/শ্রাবণ ১৩০২।[১]

পৃ [ ৵০ ], ২৯

২

বাল্যগ্রন্থাবলী ৩।/ক্ষীরের পুতুল।/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।/মূল্য ছয় আনা।

আখ্যাপত্রের পিছনে

কলিকাতা/আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে/শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও/প্রকাশিত।/ফাল্গুন ১৩০২।/৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।[২]

পৃ [ ৵০ ], ৪৫

ছয়খানি রঙিন চিত্র সম্বলিত, দুইখানি পূর্ণপৃষ্ঠ।

৩

রাজকাহিনী/( মেবার )/প্রথম খণ্ড /শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য ৸০ আনা।

পৃ [ ।০ ], ৮১। প্রকাশ [ ২৮ জুন ১৯০৯ ][৩]। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

মলাটের নামচিত্র অবনীন্দ্রনাথ-কর্তৃক লিখিত, ফার্সী অক্ষরের ছাঁদে। শ্রীনন্দলাল বসু প্রভৃতি শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্র আছে।

সূচী ॥ শিলাদিত্য ; গোহ ; বাপ্পাদিত্য ; পদ্মিনী।

৪

ভারত শিল্প/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য আট আনা

পৃ [ ।০ ], ৮৮, ।০। প্রকাশ [ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ ]। প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

সূচী ॥ স্পষ্ট কথা ; কি ও কেন ? ; পরিচয় ; মানস চর্চ্চা ; শিল্পে ত্রিমূর্ত্তি ; শিল্পের ত্রিধারা ; আর্ট ও আর্টিষ্ট।

৫

ভূতপত্রীর দেশ/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য বারো আনা

পৃ [ ৵০ ], ৫৫। প্রকাশ [ ১৯১৫ ]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত চিত্র।

৬

নালক/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য আট আনা

পৃ [ ।০ ], ৮৮, [ ৵০ ]। প্রকাশ [ ১৯১৬ ]। প্রকাশ ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

৭

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার ষট্‌ত্রিংশ গ্রন্থ/পথে-বিপথে/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/চৈত্র ১৩২৫

পৃ [ ।০ ], ১৪৪, [ ৪ ]। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

---

১ এই পুস্তকের এক কপি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে আছে। দুঃখের বিষয় এই কপিতে ছবিগুলি নাই।

২ ক্ষীরের পুতুল প্রথম সংস্করণ শ্রীঅমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিতে দিয়াছেন।

৩ বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজি তারিখ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত তালিকা হইতে গৃহীত। তিনি ঐ-সকল তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ হইতে লইয়াছিলেন।

সূচী॥ নদী-নীরে— মোহিনী; অস্থি; গুরুজী; টুপি; দোশালা; মাতু; শেমুষী; ইন্দু; অরোরা; পর্‌-ঈ-তাউস্‌; ছাই-ভস্ম; লুকি-বিস্তে। সিন্ধু-তীরে— গমনাগমন। গিরি-শিখরে— নিষ্ক্রমণ; আরোহণ; বিচরণ; [ অবরোহণ ]।

৮

বাংলার ব্রত/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/মূল্য আড়াই টাকা

পৃ [ ৵৹ ], ২, ৬২, ৵৹। ১২০ পৃষ্ঠা একবর্ণ আলপনা চিত্র ও ২ পৃষ্ঠা বহুবর্ণ আলপনা চিত্র

প্রকাশ [ ১৯১৯ ]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা।

'নিবেদনে' অবনীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন: 'আজ দুই তিন বছর ধরে 'বিচিত্রা সভা'র জন্য আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রতের আলপনার নক্সা সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকল গুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। কি মণ্ডনচিত্র হিসাবে, কি স্বকীয়তা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতের এই লেখা শিল্পীমাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নক্সাগুলি আমি যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ কল্লেম· ·।'

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (১ শ্রাবণ ১৩৫০) মুদ্রিত হইয়াছে।

৯

খাতাঞ্চির খাতা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এক টাকা

পৃ [ ৵৹ ], ৭০। প্রকাশ [ ১৯২১ ]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্‌, কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত, কাগজ ও মাটির পুতুল অনুসরণে। সুকুমার রায় অঙ্কিত কতকগুলি চিত্র আছে।

বইখানি সম্প্রতি 'অবনীন্দ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থভুক্ত।

১০

প্রিয়দর্শিকা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/দাম চার আনা

পৃ ১৪। প্রকাশ [ ১৯২১ ]। প্রকাশক ও মুদ্রক কান্তিক প্রেস, কলিকাতা।

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর বার্ষিক প্রদর্শনীর চিত্রাবলীর পরিচয় ও ব্যাখ্যা।

১১

চিত্রাক্ষর/অবনীন্দ্র

চিত্রে বর্ণমালা ও ১-৯ সংখ্যার বর্ণন। বইখানি লিথোতে ছাপা, আখ্যাপত্র সহ মোট ২৫ পৃষ্ঠা, একপৃষ্ঠে মুদ্রিত। মোট আড়াই শত কপি বিশেষ সংস্করণ ছাপা হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞপ্তি আছে। প্রকাশ-তারিখ মুদ্রিত নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তারিখ দিয়াছেন ১৩৩৬।

এই প্রসঙ্গে শ্রীউমা দেবীর 'বাবার কথা' হইতে নিম্নমুদ্রিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য:

'আমার স্বামীর বুক বাইণ্ডিং কারখানা যখন খুললেন, বাবা প্রায়ই দেখতে আসতেন। পেষ্টবোর্ডের চৌকো ছাঁটগুলো কারখানায় পড়ে থাকতে দেখে বাবা তাঁকে বললেন, "এগুলো ফেলো না। আগে যেমন অ-আ লেখা তাস হতো, আমি ছড়া লিখে দেবো—তোমরা ছড়া অনুযায়ী উল্টো পিঠে ছাপ আঁকিয়ে

তাস কর, খুব চাহিদা হবে।" তার কথামতো ছাঁটগুলো জমা ক'রে রেখে-রেখে শেষে সেগুলি তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তিনি তাতে প্রত্যেক স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণের একটি একটি ছড়া লিখে দিলেন।'

এগুলি লেখিকার নিকট রক্ষিত আছে।

১২

রাজকাহিনী/দ্বিতীয় খণ্ড/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/প্রথম সংস্করণ/গ্রন্থবিহার/৫৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [ ৷৴০ ], ১৫০, ৵০। প্রকাশ [ ১৯৩১ ]

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রালংকৃত।

সূচী॥ হাম্বির; হাম্বির (রাজ্যলাভ); চণ্ড; রাণা কুম্ভ; সংগ্রাম সিংহ।

পরবর্তীকালে দুই খণ্ড রাজকাহিনী সিগনেট প্রেস কর্তৃক একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বিদ্যালয়-সংস্করণে (মাঘ ১৩৬৩) রাণা কুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহ গল্প দুইটি বর্জিত।

১৩

বুড়ো-আংলা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ/১৪ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পৃ [ ।০ ], ১৮৮। 'প্রকাশকের নিবেদনে'র তারিখ শ্রাবণ ১৩৪৮

'প্রকাশকের নিবেদনে' লিখিত হইয়াছে: 'সুইডিশ লেখিকা Selma Lagerlofএর Adventures of Nils নামক বইখানি পড়ে অবনীন্দ্রনাথ 'বুড়ো-আংলা' লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু বুড়ো-আংলা, তর্জমা নয়—সম্পূর্ণ বাংলা দেশের বই।'

প্রচ্ছদপট অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত, আন্দ্রে কার্পেলেস প্রেরিত সুইডেনের খড়ের পুতুল অবলম্বনে। অন্যান্য চিত্র শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত।

১৪

ঘরোয়া/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীরানী চন্দ/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

পৃ [ ৮ ], ৸০, ১৭১। প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৮

এই গ্রন্থের সূচনায় মুদ্রিত অবনীন্দ্রনাথের একখানি চিঠিতে আছে:

কল্যাণীয়া রাণী—

আমি বলেছি, তুমি লিখেছো।

আমার ঝুলিতে এতো কথা জমা আছে যা এক তুমি ছাড়া কেউ লিখে উঠতে পারতো না। আমার ভাগ্যক্রমে তোমার হাতে আমার খাপছাড়া ঘরাও কথা ভাল করে গেঁথে তোলার ভার রবিকাকা দিয়েছেন, না হলে ঘরাও কথা ঘরচাপা পড়েই থাকতো, ছাপা হয়ে বেরোতো না।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন[১]:

অবন,

কী চমৎকার—তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো। বোধ হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনো লোক নেই যার স্মৃতি-চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার

---

১ "অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' ", প্রবাসী কার্তিক ১৩৪৮

আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে—এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়, এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে। ২৭ জুন, ১৯৪১।

রবিকাকা

অবন,

এক দিন ছিল যখন জীবনের সকল বিভাগে প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল তোমাদের রবিকাকা। তোমরাই তাকে অন্তরঙ্গভাবে এবং বিচিত্র রূপে নানা অবস্থায় দেখতে পেয়েছ। তোমাদের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আজ তাকে যদি না জাগিয়ে তুলতে, তবে তার অনেকখানি দেশের মন থেকে লুপ্ত হয়ে যেত। আজকে যখন দিনান্তের শেষ আলোতে মুখ ফিরিয়ে দেশ তার ছবি একবার দেখে নিতে চায়— তখন তোমার লেখনী তাকে পথ নির্দেশ করে দিলে— এ আমার সৌভাগ্য। যে দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছি— সে দেশে পূর্ণ আসন থাকবে না— এই আশঙ্কা আমি অনুশোচনার বিষয় বলে মনে করি নি। অনেক বারই ভেবেছি আমি আজন্ম নির্বাসিত— এ আমি বারবার মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছি। আজ তুমি যে ছবি খাড়া করেছ সে অত্যন্ত সত্য, অত্যন্ত সজীব। দীর্ঘকালের অবমাননা সে দূর করে দিয়েছে— সেই নিরন্তর লাঞ্ছনা ও গ্লানির মধ্যে আজ যেন তুমি তার চার দিকে তোমার প্রতিভার মন্ত্রবলে এক দ্বীপ খাড়া করে দিয়েছ। তার মধ্যে শেষ আশ্রয় পেলুম। ২৯ জুন, ১৯৪১।

তোমাদের রবিকাকা

১৫

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী/[ ১৯২১—১৯২৯ ]/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ডি. লিট/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত/১৯৪১

পৃ. [।৵০], ৩৯৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাণী বাগেশ্বরী' অধ্যাপকরূপে বক্তৃতাবলী।

সূচী ॥ শিল্পে অনধিকার ; শিল্পে অধিকার ; দৃষ্টি ও সৃষ্টি ; শিল্প ও ভাষা ; শিল্পের সচলতা ও অচলতা ; সৌন্দর্যের সন্ধান ; শিল্প ও দেহতত্ত্ব ; অন্তর বাহির ; মত ও মন্ত্র ; সন্ধ্যার উৎসব ; শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড ; শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড ; শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালমন্দ ; শিল্পবৃত্তি ; সুন্দর ; অসুন্দর ; জাতি ও শিল্প ; অরূপ না রূপ ; রূপবিদ্যা ; রূপ দেখা ; স্মৃতি ও শক্তি ; আর্য ও অনার্য শিল্প ; আর্যশিল্পের ক্রম ; রূপ ; খেলার পুতুল ; রূপের মান ও পরিমাণ ; ভাব ; লাবণ্য ; সাদৃশ্য।

১৬

জোড়াসাঁকোর ধারে/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শ্রীরানী চন্দ/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [।০],১৫১। প্রকাশ কার্তিক ১৩৫১

সূচনায় অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :

'যত সুখের স্মৃতি তত দুঃখের স্মৃতি— আমার মনের এই দুই তারে ঘা দিয়ে দিয়ে এই সব কথা আমার শ্রুতিধরী শ্রীমতি রানী চন্দ এই লেখায় ধরে নিয়েছেন।…'

১৭

আপন কথা/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/সিগনেট প্রেস : কলিকাতা

পৃ [।৶৹], ১২৯। প্রকাশ আষাঢ় ১৩৫৩

সূচী॥ মনের কথা; পদ্মদাসী; সাইক্লোন; উত্তরের ঘর; এ-আমল সে-আমল; এ-বাড়ি ও-বাড়ি; [ বারবাড়িতে ]; অসমাপিকা; বসতবাড়ি।

ভূমিকায় ( মনের কথা ) অবনীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

'আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে— তাদেরই দিলেম এই লেখা খাতা।···যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা।'

এই শৈশবস্মৃতি, অবনীন্দ্রনাথের অপর দুখানি স্মৃতিকথা 'ঘরোয়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র বহু পূর্বে লিখিত।

১৮

সহজ চিত্রশিক্ষা/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী

পৃ [।৹], ৩৩, [ ২ ]। প্রকাশ পৌষ ১৩৫৩

'সহজ চিত্রশিক্ষা'র চিত্রাবলী আচার্য অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা-অনুসারে শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

১৯

আলোর ফুলকি/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

পৃ [৶৹], ৯৪। প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রচ্ছদ ও মুখপাতের চিত্র শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত; অনুচ্ছদ শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত।

দ্বিতীয় সংস্করণের ( বৈশাখ ১৩৬৩ ) বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত আছে :

'ফরাসী লেখক Edmond Rostand'এর রচিত গল্পের ভাবানুবাদ করেন Florence Yates Hann : The Story of Chanticleer. উহারই ভাবগ্রহণ করিয়া এই কাহিনীর রচনা ও ভারতী পত্রে প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২৬— অগ্রহায়ণ ১৩২৬'

২০

ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [।৶৹], ৫৭। প্রকাশ বৈশাখ ১৩৫৪

প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত হইয়াছে :

'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধাবলী ১৩২১ সালে ভারতীপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলি ইংরেজি ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাংলা প্রবন্ধগুলি এ যাবৎ ভারতীর পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ ছিল। চীন ও ভারত -শিল্পের ষড়ঙ্গ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা অবনীন্দ্রনাথই প্রথম করেন, এবং এই ক্ষেত্রে এই আলোচনাই এখনো অদ্বিতীয় হইয়া আছে।'

সূচী॥ পরিচয়; চিত্রে ছন্দ ও রস; ভারত-ষড়ঙ্গ; রূপভেদ; প্রমাণ; ভাব; লাবণ্যযোজনা; সাদৃশ্য; বর্ণিকাভঙ্গ; ষড়ঙ্গদর্শন।

২১

ভারতশিল্পে মূর্তি/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট/কলিকাতা

পৃ [।০], ৩১, [২], চার পৃষ্ঠা চিত্র। প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪

প্রকাশকের 'বিজ্ঞপ্তি'তে লিখিত হইয়াছে: 'এই প্রবন্ধ প্রথমে 'মূর্তি' নামে ১৩২০ পৌষ ও মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।···এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।'

২২

মাসি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

পৃ [।৵০], পৃ ৭৪। প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬১

সূচী॥ মাসি; বনলতা; হাতে খড়ি।

২৩

একে তিন তিনে এক/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড/১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট; কলিকাতা ১২

পৃ [।৵০], ১২৯। প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬১

সূচী॥ একে তিন তিনে এক; কনকলতা; বড় রাজা ছোট রাজার গল্প; কাঁচায় পাকায়; দেয়ালা; মহামাস তৈল; ভোম্বলদাসের কৈলাস যাত্রা; রতা-শেয়ালের কথা; সিংহরাজের রাজ্যাভিষেক; ধরা পড়া; সাথী; খোকাখুকি; বাতাপি রাক্ষস; রাসধারী; আষাঢ়ে গল্প; গঙ্গাফড়িং; হিন্দবাদের প্রথম সিন্দবাদের শেষ যাত্রা।

২৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/শিল্পায়ন/সিগনেট প্রেস কলকাতা ২০

পৃ ৭৮। প্রকাশ চৈত্র ১৩৬১

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশিত কতকগুলি রচনার অবনীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: 'কিছু অদল-বদল করতে হল পুরাতন লেখার মধ্যে, নতুন চিন্তাও কিছু-কিছু আমার দুর্বল অবস্থায় পরিশ্রম স্বীকার করেও যোজনা করে দিতে হয়েছে।···কাঁচি নির্ভয়ে চালিয়েছি, আসলটুকু যাতে নষ্ট না হয় এই ভাবে সংক্ষেপ করেছি বক্তব্য।'

২৫

মারুতির পুঁথি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ/ ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭

পৃ [৷৷০], ১০২, [২]। প্রকাশ ৭ আশ্বিন ১৩৬৩

২৬

চাঁইবুড়োর পুঁথি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ/ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

পৃ [।৵০], ১০৮। প্রকাশ ৭ আশ্বিন ১৮৮১ শক

২৭

রং-বেরং/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির/৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট/কলকাতা-১২

পৃ [৷৹], ১৬৪। প্রকাশ জন্মাষ্টমী ১৩৬৫, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

সূচী॥ কানকাটা রাজার দেশ; দেবীর বাহন; সিন্ধবাদ বিবরণ পত্র; মাতৃগুপ্ত; রেনি-ডে; চাঁইদাদার গল্প; শিব-সদাগর; সিকস্তি পয়স্তি কথা; রতনমালার বিয়ে; চৈতন চুটকী; কারিগর ও বাজিকর; যুগ্মতারা; আলোয় কালোয়; ইচ্ছাময়ী বটিকা; ভবের হাটে হেতি হোতি; বহিত্র; জেন্তু-সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি; বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্তান্ত।

২৮

অবনীন্দ্রনাথের/কিশোর সঞ্চয়ন/শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির/৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলকাতা ১২

পৃ [৷৹], ২২৩। প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭

নাট্য॥ ভূতপতরীর যাত্রা; রাসধারী [ একে তিন তিনে এক ]। গল্প॥ চাঁদনি; বাদশাহি গল্প; অস্থি [ পথে বিপথে ]; বাদশাহি গল্প (২); বাতাপি রাক্ষস [ একে তিন তিনে এক ]; শিলাদিত্য [ রাজকাহিনী ]; বনলতা [ মাসি ]; গজ-কচ্ছপের বৃত্তান্ত; টুকরি বুড়ি। কবিতা॥ ভুত চৌদশী; চট্‌জলদি কবিতা; চট্‌জলদি কবিতা (২); হাটবার; নিদ্রা-পরীর তন্দ্রাপরীর গান। প্রবন্ধ॥ আবহাওয়া; রবিকাকার গান [ ঘরোয়া ]; ঋতুমঙ্গল।

'খাতাঞ্চির খাতা' সম্পূর্ণ এই সঞ্চয়নগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

**অবনীন্দ্রনাথ লিখিত যাত্রা-পালা**

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি যাত্রা-পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার অনেকগুলিই সাময়িকপত্রে বা পাণ্ডুলিপিতে আবদ্ধ আছে। এগুলির কোনো-কোনোটি পাঠে প্রীত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঐগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের উৎসাহ দিয়া অবনীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন[১]:

"St. Marks"
Almora, U. P.

অবন,

রংমহলে [ রংমশালে ] তোমার লেখাটা পড়ে ভারি মজা লাগল। এ রকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম থেকে বেরোবার জো নেই। আমরা চেষ্টা করলে তার মধ্যে ঠাণ্ডা মাথার হাওয়া লেগে সমস্ত জুড়িয়ে দেয়। তুমি তো ছেলেদের জন্যে অনেকগুলো রামায়ণ মহাভারতের পালা বানিয়েছ, দোহাই তোমার এগুলো ছাপিয়ে দাও না। ছাপাখানাকে তো বাতে ধরেনি।···ইতি ২৭ মে ১৯৩৭।

রবিকাকা

এই যাত্রাগুলির মধ্যে কোনো-কোনোটি শান্তিনিকেতনে ও অন্যত্র অভিনীত হইয়াছে।

এই পালাগুলির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে:

---

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৩

লম্বকর্ণ পালা/রাজশেখর বসু রচিত গড্ডলিকা গ্রন্থের/লম্বকর্ণ শীর্ষক কাহিনী অবলম্বনে/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ …হরবোলা সম্প্রদায়ের সভ্যদের জন্য সিগনেট প্রেস কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যায় প্রকাশিত।

অপর দুইটি পালার শান্তিনিকেতনে অভিনয়-কালে মুদ্রিত নিম্নোক্ত পুস্তিকায় পালার গানগুলি আছে :

হংসনামা পালা। পৃ ১৬ [মলাট সমেত]। ৮ নভেম্বর ১৯৫১। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত।

এসপার ওসপার পালা। পৃ ৮। ৯ পৌষ ১৩৫৯। বোলপুর শ্রী প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত।

### অবনীন্দ্র-প্রসঙ্গ

অবনীন্দ্রনাথের শিল্প ও সাহিত্য -রচনা, বা তাঁহার জীবনকথা আলোচনার সহায়ক হইতে পারে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও সাময়িক পত্রের বিশেষ সংখ্যার তালিকা নিম্নে মুদ্রিত হইল। অবনীন্দ্রনাথের আত্মস্মৃতিগ্রন্থগুলি পূর্বেই উল্লিখিত।[১]

#### অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থ

শ্রীমনোজিৎ বসু। অবনীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে'র তারিখ মহালয়া ১৩৫২

শ্রীপ্রতিমা দেবী। স্মৃতিচিত্র। সিগনেট প্রেস। আশ্বিন ১৩৫৯

শ্রীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্র-চরিতম্। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং। জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৯ শকাব্দ
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত দশখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

শ্রীউমা দেবী। বাবার কথা। মিত্রালয়। [জুন ১৯৫৮]
'বাবার কথা লিখতে বসেছি, বাবার জীবনী নয়। নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনী।'
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

Abanindranath Tagore: His Early Works. Indian Museum, Calcutta. April 1951.
এই চিত্রপ্রতিলিপি-সংগ্রহে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রিশ ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনা আছে।

Rai Govind Chandra. ABANINDRANATH TAGORE, Thacker Spink & Co. December 1951.
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

Exhibition of Paintings Drawings Toys Books by Abanindranath Tagore. Rabindra-Bharati. April 1956

এই চিত্রতালিকায় শ্রীনন্দলাল বসুর একটি ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের দুইটি রচনা পুনর্মুদ্রিত।
অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

কলিকাতা অবনীন্দ্র-পরিষদ অবনীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে স্মারক-পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহার কোনো-কোনোটিতে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

---

১ শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় এই বিভাগে উল্লিখিত কোনো-কোনো গ্রন্থ সংকলয়িতাদের লক্ষ্যগোচর করিয়াছেন।

**অবনীন্দ্র-প্রসঙ্গ-সম্বলিত বাংলা গ্রন্থ**

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বাংলার লেখক, প্রথম খণ্ড। বিশ্বভারতী। জন্মাষ্টমী ১৩৫৭
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ৯০-১১৪

শ্রীবিষ্ণু দে। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। সিগনেট প্রেস। আশ্বিন ১৩৫৯
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১৬-২০

সৈয়দ মুজতবা আলী। ময়ূরকণ্ঠী। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চৈত্র ১৩৫৯
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রচনা পৃ ১০৬-১১৩

শ্রীবুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যচর্চা। সিগনেট প্রেস। বৈশাখ ১৩৬১
'বাংলা শিশুসাহিত্য' প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী। সৌন্দর্যদর্শন। বিশ্বভারতী। শ্রাবণ ১৩৬১
'অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদর্শন' পৃ ৪৯-৫৫

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। এখন যাঁদের দেখছি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং। শ্রাবণ ১৩৬২
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনটি রচনা পৃ ৭-২৫

শ্রীনন্দলাল বসু। শিল্পচর্চা। বিশ্বভারতী। বৈশাখ ১৩৬৩
জলরঙে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতি ( 'wash' ) সম্বন্ধে আলোচনা পৃ ৮৯-৯৭

শ্রীঅশোক মিত্র। ভারতের চিত্রকলা। বেঙ্গল পাবলিশার্স : স্বাক্ষর। আশ্বিন ১৩৬৩
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ২৭০-২৮০

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ। শান্তি লাইব্রেরী। শ্রাবণ ১৩৬৪
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১২১-১২৬

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ। সাহিত্য ও সংস্কৃতি। মিত্রালয়। ভাদ্র ১৩৬৪
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১৫৬-১৭৬

শ্রীসুকুমার সেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড। বর্ধমান সাহিত্য-সভা। ১৩৬৫
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা পৃ ১৩৮-১৫৩

রাজশেখর বসু। চলচ্চিন্তা। মিত্র ও ঘোষ। ১৮৮০ শক
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ২১-২৫

শ্রীকানাই সামন্ত। চিত্রদর্শন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। মহালয়া ১৮৮১ শক
অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১২৪-১৪২। শ্রীনন্দলাল বসুর 'অবনীন্দ্র-প্রতিভা' সম্পর্কে পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পাঁচটি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী। নন্দনতত্ত্ব। প্রকাশ মন্দির। ১৯৫৯
'অবনীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ধারণা' ও 'অবনীন্দ্রনাথের লীলাবাদ' এই দুইটি প্রবন্ধ পৃ ৬৫-৮৪

**সাময়িকপত্রের বিশেষ অবনীন্দ্র-সংখ্যা**

VISVABHARATI QUARTERLY. Abanindra Number, May-October 1942
এই সংখ্যায় অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীঅসিতকুমার হালদার, শ্রীবীরেশ্বর সেন, শ্রীমুকুলচন্দ্র দে,

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্টেলা ক্রাম্‌রিশ, জেমস্‌ এইচ কাজিন্‌স্‌, যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক, শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা আছে; শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্রসূচীও এই সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কুইস অব জেটল্যাণ্ড, লরেন্স বিনিয়ন, সর্‌ উইলিয়ম রদেনস্টাইন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও মোহিতলাল মজুমদার অবনীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত পঞ্চাশোর্ধ সংখ্যক চিত্র আছে।

ললিতা। ষষ্ঠ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

চতুষ্কোণ। অবনীন্দ্র-সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৮

উত্তরা। অবনীন্দ্রস্মৃতি-সংখ্যা, পৌষ ১৩৫৮

এই সংখ্যায় শ্রীঅসিতকুমার হালদার-লিখিত প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের কয়েকখানি পত্র উদ্ধৃত আছে, তাহার অধিকাংশই বর্তমান সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত।

AESTHETICS. Abanindra Nath Tagore Memorial Number

## স্বীকৃতি

১ আত্মপ্রতিকৃতি। শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে

২ অবনীন্দ্রনাথ। শ্রীমুকুলচন্দ্র দের সৌজন্যে

৩ আবদুল খালিক। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সৌজন্যে

৪ জোড়াসাঁকো-ঠাকুরবাড়ি। শ্রীমতী রানী চন্দের সৌজন্যে

৫ শ্বেতময়ূর। রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে

৬ কৃষ্ণলীলা: নৌবিহার। রবীন্দ্রভারতীর সৌজন্যে।

৭ শ্যামলী: শ্রীঅনিলকুমার চন্দের সৌজন্যে

২-সংখ্যক চিত্রের ব্লক শ্রীমুকুলচন্দ্র দে ও ৬-সংখ্যক চিত্রের ব্লক বিদ্যোদয় লাইব্রেরি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। ৩-সংখ্যক চিত্রের ব্লক ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম -প্রকাশিত Abanindranath Tagore: His Early Works গ্রন্থে প্রকাশিত ও মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

# সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

অবনীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত বই 'শকুন্তলা'। ১৩০২ সালের শ্রাবণ মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে ছাপা হয়ে বার হয় ছোট্ট বইটি। এই হল 'বাল্যগ্রন্থাবলী'র প্রথম গ্রন্থ। তার পর ঐ বছরই ফাল্গুন মাসে অবনীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বই 'ক্ষীরের পুতুল' প্রকাশিত হয় বাল্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ হিসেবে। শকুন্তলারই মত করে অনুরূপ ভাষায় দুখানি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ঠিক জানা যায় নি কোন্ তারিখে, তবে যতদূর মনে হয় শকুন্তলা লেখার দু-এক বছর আগেই। একখানি 'শ্রীকৃষ্ণকথা' অপরখানি 'নল ও দময়ন্তী উপাখ্যান'। এই বই দুটি শেষ করেন নি। যেটুকু লিখেছিলেন তা পরে 'টুকরো কথা'য় ছাপানো হয়েছিল। ১৩০৬ সালে অবনীন্দ্রনাথের দুটি গল্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'ছেলে ও ছবি' নামক বইএর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই লেখা দুটির নাম 'কানকাটা রাজার দেশ' এবং 'চাঁদনী'। এই ক'টিই হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকে ছোটদের জন্যে লেখা গল্প।

সাময়িক পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের যে প্রথম লেখা বার হয় তার নাম 'দেবীপ্রতিমা'। তারিখ শ্রাবণ ১৩০৫— শকুন্তলা প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে। পত্রিকাটি ভারতী। 'দেবীপ্রতিমা' লেখাটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন ঐ ভাষায় অবনীন্দ্রনাথ আর কখনও লেখেন নি। আগেও না, পরেও নয়। প্রথমে 'শকুন্তলা' তার পর 'দেবীপ্রতিমা' তার পর 'রাজকাহিনী'-'নালক'-এর ভাষা থেকে শেষে 'চাঁইবুড়োর পুঁথি' এবং 'লম্বকর্ণ'-পালার মজলিসি জমাট ভাষায় গিয়ে কেমন করে পৌঁছেছিলেন এ নিয়ে যাঁরা আলোচনা করতে প্রস্তুত তাঁরা হয়তো লক্ষ করবেন যে রবীন্দ্রনাথের অত কাছে থেকেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন নি। কবির ভ্রাতুষ্পুত্র হয়েও এবং কবিরই উৎসাহে লেখনী ধারণ করেও অবনীন্দ্রনাথ উক্ত প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন।

ভাষার প্রভাব নিয়ে আলোচনা-সূত্রে অবনীন্দ্রনাথ নিজে এক সময় এই কথা বলেছিলেন যে, একমাত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবই তাঁর ভাষার মধ্যে আছে। এ উক্তি কতদূর যুক্তিসাপেক্ষ তার আলোচনা করবেন অবনীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে যাঁরা সম্যক চর্চা করতে প্রস্তুত তাঁরা।

অবনীন্দ্রসাহিত্য তথা বঙ্গসাহিত্যের তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদের উপকারে আসবে এই প্রেরণার বশেই বর্তমান সূচীটি সংগৃহীত হতে আরম্ভ হয়। এই কাজে প্রথমে হাত লাগান আমার ভাই শোভনলাল, পরে প্রধানত বন্ধুবর শ্রীসনৎকুমার গুপ্তের প্রচেষ্টাতেই অবনীন্দ্রনাথের রচনাসূচীটি মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এখনও যে এই তালিকার মধ্যে কিছু কিছু ফাঁক আছে সে সম্বন্ধে আমরা সচেতন। সংগ্রহের প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও অধুনা দুষ্প্রাপ্য কোনো-কোনো সাময়িক পত্র— যাতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে জানা আছে— তা আমরা খুঁজে বার করতে পারি নি। এর মধ্যে নাম করা যেতে পারে নাচঘর, মাস-পয়লা, রবিবার (শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সম্পাদিত), বঙ্গলক্ষ্মী, অর্চনা, অঞ্জলি, বিজলী, শিক্ষক ইত্যাদি। সূচীর মধ্যে যেসব তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে অজ্ঞতাবশত তাতে কিছু ভুলচুকও থাকতে পারে। তথ্যানুসন্ধান-বিষয়ে বা সংশোধন-ক্রিয়ায় পাঠকদের কাছ থেকে যে-কোনো প্রকারের সাহায্য পেলে আমরা পরম উপকৃত হব।

বর্তমান সূচীটি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনার তালিকা। ঐ সঙ্গে তাঁর লিখিত ভূমিকা-সংবলিত বিভিন্ন লেখকের যেসব বই বেরিয়েছে তারও একটি তালিকা দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথের প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ সূচী বর্তমান অবনীন্দ্রসংখ্যার অন্যত্র লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

রচনাসূচীটি প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো। রচনার নাম, বিষয়, প্রকাশের তারিখ, কোন্ পত্রিকায় প্রকাশিত এবং যে-রচনাগুলি পরে অবনীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়েছে তারও নির্দেশ দেওয়া আছে। ক্রমিক সংখ্যায় সাজানো হয়েছে লেখাগুলি। রচনার নাম, বিষয়, তারিখ ও পত্রিকার পরিচয় এবং যদি তা গ্রন্থভুক্ত হয়ে থাকে তা হলে ॥- চিহ্নের পর গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে।

এই সূচী থেকে জানা যায়, সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'দেবীপ্রতিমা', তারিখ শ্রাবণ ১৩০৫। প্রথম প্রবন্ধ 'নবদূর্বা', তারিখ শ্রাবণ ১৩১১। প্রথম শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রশ্নোত্তর,' তারিখ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২। এর প্রায় ন-বছর পরে, ১৩২১ সালে, 'ভারত-ষড়ঙ্গ' এবং 'ষড়ঙ্গ-দর্শন' লেখেন। এবং তারও প্রায় সাত বছর পরে লিখতে শুরু করেন 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'। প্রথম নাটক 'শিব-সদাগর', তারিখ আশ্বিন ১৩২৫। প্রথম গদ্যছন্দ 'উত্তরা', তারিখ পৌষ ১৩৩২। এর দু বছর পরে যখন বিচিত্রা পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথের 'পাহাড়িয়া' 'রংমহল' প্রভৃতি লেখা বার হতে শুরু হয় তখন রবীন্দ্রনাথ এগুলিকে গদ্যছন্দ আখ্যা দেন, একটি রচনা নিজে-হাতে কিছু বদল করে দেন এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরে গদ্যছন্দ লেখা শুরু করেন। অবনীন্দ্রনাথের প্রথম লিখিত পালা 'এসপার ওসপার', রচনার তারিখ ১৩৩৭। মুদ্রিত প্রথম পালা 'উড়নচণ্ডীর পালা', তারিখ ১৩৪৯। প্রথম জীবনস্মৃতি 'আপনকথা', প্রকাশ বঙ্গবাণী পত্রিকায় ১৩৩৩ সালে। পনেরো থেকে আঠারো বছর পরে রানী চন্দের সহযোগে 'ঘরোয়া' এবং 'জোড়াসাঁকোর ধারে' জীবনস্মৃতি গ্রন্থ দুটি রচিত ও প্রকাশিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথের সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা চুরানব্বই। প্রবন্ধ এবং শিল্পপ্রবন্ধ এক শ সতের। নাটক এবং পালা নিয়ে ছাব্বিশ। পদ্য এবং গদ্যছন্দাদি নিয়ে অবনীন্দ্রনাথের আটচল্লিশটি রচনা আছে। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সংখ্যা সাড়ে তিন শ -র উপর।

### সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাপঞ্জী[১]

১ দেবীপ্রতিমা। গল্প। ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ

২ শিলাদিত্য। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ বৈশাখ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৩ গোহ। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৪ পদ্মিনী। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ আষাঢ় ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৫ বাপ্পাদিত্য। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১১ শ্রাবণ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড

৬ নবদূর্বা। প্রবন্ধ। নবযুগ ১৩১১, ২৪ শ্রাবণ

৭ আলেখ্য। গল্প। ভারতী ১৩১২ বৈশাখ

---

১ কোনো কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত রচনাও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হল।

৮ স্বস্তিবচন[১]। কবিতা। ভারতী ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

৯ প্রশ্নোত্তর। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভাণ্ডার ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ

১০ স্বর্গীয় রবিবর্ম্মা। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৩ পৌষ

১১ বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৩ ফাল্গুন

১২ গ্রন্থ-সমালোচনা[২]। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩১৩ চৈত্র

১৩ মানসচর্চ্চা। প্রবন্ধ। শিল্পবিষয়ক। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ কার্তিক

১৪ অরিসিংহ[৩]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ বৈশাখ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড

১৫ হাম্বির[৪]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ ভাদ্র ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড

১৬ হাম্বির[৫]। গল্প : ঐতিহাসিক। ভারতী ১৩১৫ আশ্বিন ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড

১৭ কি ও কেন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ কার্ত্তিক

১৮ স্পষ্ট কথা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ ফাল্গুন

১৯ পরিচয়। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ চৈত্র

২০ আইনে চীন-ই। গল্প। ভারতী ১৩১৬ বৈশাখ

২১ নামকরণ-রহস্য[৬]। প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শন ১৩১৬ বৈশাখ

২২ কলঙ্ক ভঞ্জন[৭]। পত্র : আলোচনা। প্রবাসী ১৩১৬ বৈশাখ

২৩ পান্থ হাফেজ। পদ্য। দেবালয় ১৩১৬ শ্রাবণ

২৪ শিল্পের দেবতা[৮]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৬ কার্তিক

২৫ গঙ্গাযমুনা। গল্প। ভারতী ১৩১৬ পৌষ

২৬ শিল্পে ভক্তিমন্ত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ

২৭ হাফেজ। পদ্য। দেবালয় ১৩১৭ অগ্রহায়ণ

২৮ ভাবসাধন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৭ অগ্রহায়ণ

---

১ ভারতেশ্বরের আমন্ত্রণে মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের বিলাতযাত্রা উপলক্ষে রচিত।

২ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'সতী বেহুলা ও ফুল্লরা' পুস্তকের সমালোচনা।

৩ রাজকাহিনীতে এটি 'হাম্বির' গল্পের প্রথমাংশ রূপে আছে।

৪ রাজকাহিনীতে এটি 'হাম্বির' গল্পের শেষাংশ রূপে আছে।

৫ রাজকাহিনীতে এটি 'হাম্বিরের রাজ্যলাভ' নামে আছে।

৬ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' চিত্রের প্রতিবাদ স্বরূপ পলায়ন-কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার বিষয় আলোচনা করে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বঙ্গদর্শনে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বর্তমান প্রবন্ধটিতে শিল্পকলার দিক থেকে চিত্রটির নামকরণ সমর্থন করা হয়েছে।

৭ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নামে যে ছবি এঁকেছিলেন তদুপলক্ষে ১৩১৫ সালের প্রবাসীতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শিল্পীর নৈপুণ্যের প্রশংসা করেন কিন্তু ছবিটির ঐতিহাসিক ভিত্তিহীনতার কথাও বলেন। বর্তমান চিঠিখানি তারই প্রত্যুত্তরে লেখা।

৮ কলিকাতা গভর্নমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের পূজার ছুটি আরম্ভ উপলক্ষে ছাত্রদের প্রতি অভিভাষণ।

২৯ কালোর আলো। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৮ বৈশাখ
৩০ অবনীন্দ্রবাবুর পত্র। পত্র : স্মৃতিমূলক। ভারতী ১৩১৮ জ্যৈষ্ঠ
৩১ দুই দিক। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩১৮ আশ্বিন
৩২ পুরী-মাহাত্ম্য। প্রবন্ধ। ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ
৩৩ টাইটানিকের হিসাব নিকাশ। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ
৩৪ যুগ্মতারা। গল্প। ভারতী ১৩২০ বৈশাখ
৩৫ প্রাণপ্রতিষ্ঠা। প্রবন্ধ : সচিত্র। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন
৩৬ গোরিয়াঁ। গল্প। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন
৩৭ স্বর্গগত শ্রীমদ্‌ ওকাকুরা। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২০ কার্তিক
৩৮ সূর্য্যিমামার ঘর। প্রবন্ধ। সন্দেশ ১৩২০ অগ্রহায়ণ-পৌষ
৩৯ মূর্ত্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩২০ মাঘ॥ ভারতশিল্পে মূর্তি : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
৪০ যাওয়া আসা। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন
৪১ শেষ বোঝা। চিত্র-পরিচয়। প্রবাসী ১৩২০ ফাল্গুন
৪২ পরিচয়। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২১ বৈশাখ
৪৩ গমনাগমন। ভ্রমণবৃত্তান্ত। সবুজ পত্র ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়॥ পথে বিপথে
৪৪ চিত্রে ছন্দ ও রস। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
৪৫ ভারত ষড়ঙ্গ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ আষাঢ়॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
৪৬ ষড়ঙ্গ দর্শন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২১ শ্রাবণ॥ ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ
৪৭ নালক। গল্প। ভারতী ১৩২২ বৈশাখ-ভাদ্র॥ নালক
৪৮ পথে পথে। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২২ জ্যৈষ্ঠ
৪৯ কালো ফুল। গল্প। ভারতী ১৩২২ আশ্বিন
৫০ আদ্যিকালের ছবি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২২ কার্তিক
৫১ ফাল্গুনী। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩২২ ফাল্গুন
৫২ নিষ্ক্রমণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২২ চৈত্র॥ পথে বিপথে
৫৩ আরোহণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ॥ পথে বিপথে
৫৪ ভারতীয় ছবি। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ
৫৫ বিচরণ। ভ্রমণবৃত্তান্ত। ভারতী ১৩২৩ আষাঢ়॥ পথে বিপথে
৫৬ চৈতন চুটকী। গল্প। ভারতী ১৩২৩ আশ্বিন
৫৭ মোহিনী। গল্প। ভারতী ১৩২৩ চৈত্র॥ পথে বিপথে
৫৮ মাতু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ॥ পথে বিপথে
৫৯ গুরুজী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ॥ পথে বিপথে
৬০ শেমুষী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আষাঢ়॥ পথে বিপথে
৬১ অস্থি। গল্প। ভারতী ১৩২৪ শ্রাবণ॥ পথে বিপথে

৬২ টুপী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ভাদ্র ॥ পথে বিপথে

৬৩ দোশালা। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আশ্বিন ॥ পথে বিপথে

৬৪ ইন্দু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ কার্তিক ॥ পথে বিপথে

৬৫ অরোরা। গল্প। ভারতী ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ॥ পথে বিপথে

৬৬ পর-ঈ-তাউস। গল্প। ভারতী ১৩২৪ পৌষ ॥ পথে বিপথে

৬৭ ছাইভস্ম। গল্প। ভারতী ১৩২৪ মাঘ ॥ পথে বিপথে

৬৮ লুকিবিম্বে। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ফাল্গুন ॥ পথে বিপথে

৬৯ চণ্ড। গল্প : ঐতিহাসিক। পার্বণী ১৩২৫ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড

৭০ শিবসদাগর। নাটক। আগমনী ১৩২৫ ॥ রং-বেরং

৭১ আলপনা। প্রবন্ধ। পার্বণী ১৩২৫

৭২ রূপরেখা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ

৭৩ শিল্প ও শিল্পী। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ

৭৪ বাংলার ব্রত। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৫ কার্তিক-ফাল্গুন ॥ বাংলার ব্রত : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৭৫ পাটেল বিল[৯]। প্রবন্ধ। সবুজ পত্র ১৩২৫ মাঘ

৭৬ মাতৃগুপ্ত। গল্প। ভারতী ১৩২৫ চৈত্র

৭৭ আলোর ফুলকি। উপন্যাস। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ॥ আলোর ফুলকি

৭৮ তোরমান। গল্প। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ

৭৯ কোটরা। গল্প। ভারতী ১৩২৬ আশ্বিন

৮০ দারুব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৬ পৌষ

৮১ উনো দুনো।[১০] প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৬ ফাল্গুন

৮২ রাণাকুম্ভ। গল্প : ঐতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৭ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড

৮৩ রাসধারী। নাটক। পার্বণী ১৩২৭ ॥ একে তিন তিনে এক

৮৪ গঙ্গাফড়িং। গল্প। পার্বণী ১৩২৭ ॥ একে তিন তিনে এক

৮৫ খাতাঞ্চির খাতা। উপন্যাস। সন্দেশ ১৩২৭ বৈশাখ-মাঘ ॥ খাতাঞ্চির খাতা

৮৬ বুড়ো আংলা। উপন্যাস। মৌচাক ১৩২৭-১৩২৮ ॥ বুড়ো আংলা

৮৭ রং বেরং। নাটক। ভারতী ১৩২৭ বৈশাখ

৮৮ নোয়ার কিস্তি। নাটক। ভারতী ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়

৮৯ জেন্ত সভা বা জন্তু-জাতীয় মহাসমিতি। গল্প। ভারতী ১৩২৭ কার্তিক ॥ রং-বেরং

৯০ বারোয়ারি উপন্যাস। উপন্যাসাংশ। ভারতী ১৩২৭ কার্তিক ॥ বারোয়ারি উপন্যাস

৯১ রস ও নীরস। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৭ পৌষ

৯২ ধরাপড়া। নাটক। শিক্ষক ১৩২৮ আষাঢ় ॥ একে তিন তিনে এক

---

৯ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে 'পাটেল বিল'এর সমর্থনে সভাপতির বক্তৃতা। ভারতী ও প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রিত।

১০ হাইল্যাণ্ড ডিবেটিং ক্লাবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

৯৩ ভায়ে ভায়ে[১১]। গল্প : ঐতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৮॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড
৯৪ আলো আঁধারে। গল্প। ভারতী ১৩২৮ কার্তিক
৯৫ শিল্পের অন্ধকার যুগ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৮ মাঘ
৯৬ শিল্পে অনধিকার[১২]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৮ ফাল্গুন-চৈত্র॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
৯৭ বাণী ও বীণা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্ত্তক ১৩২৮ ফাল্গুন
৯৮ শিল্পের অধিকার। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৮ চৈত্র॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
৯৯ হিন্দবাদের প্রথম ও সিন্দবাদের শেষযাত্রা। গল্প। রংমশাল ১৩২৯॥ একে তিন তিনে এক
১০০ সঙ্গীতের পথ। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ
১০১ দৃষ্টি ও সৃষ্টি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১০২ এক যে ছিল বাগান। স্মৃতিকথা। প্রবর্ত্তক ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ
১০৩ ছবি ও সুর। গল্প। ভারতী ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ
১০৪ শিল্প ও ভাষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ আষাঢ়॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১০৫ তালাসী। প্রবন্ধ। প্রবর্তক ১৩২৯ আষাঢ়
১০৬ দুই লাইন। গল্প। ভারতী ১৩২৯ আষাঢ়
১০৭ সত্যেন্দ্র। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩২৯ শ্রাবণ
১০৮ শিল্পের সচলতা ও অচলতা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ শ্রাবণ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১০৯ রঙ্গালয়ের রঙ্গিন আলো[১৩]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ ভাদ্র
১১০ বাতাপি রাক্ষস। গল্প। মৌচাক ১৩২৯ আশ্বিন॥ একে তিন তিনে এক
১১১ সমালোচনা[১৪]। গ্রন্থ-সমালোচনা। ভারতী ১৩২৯ কার্তিক
১১২ হাঁসুলি কি ফাঁসুলি[১৫]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ কার্তিক
১১৩ সৌন্দর্য্যের সন্ধান। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ কার্তিক॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১১৪ শিল্প ও দেহতত্ত্ব। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১১৫ জলে স্থলে[১৬]। গল্প। বুধবার ১৩২৯, ২৬ পৌষ
১১৬ চিঠি। লেখ-চিত্র। বুধবার ১৩২৯, ২৪ মাঘ
১১৭ হাফেজ। প্রবন্ধ। প্রবর্তক ১৩২৯ মাঘ
১১৮ অন্তর ও বাহির। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ ফাল্গুন॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

---

১১ রাজকাহিনীতে এটি সংগ্রামসিংহ নামে মুদ্রিত হয়েছে।
১২ বঙ্গবাণী ১৩২৮ ফাল্গুন সংখ্যাতেও মুদ্রিত।
১৩ নাট্যশিল্পী অমরনাথ রায়ের স্মৃতিসভায় সভাপতির অভিভাষণ।
১৪ দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনা।
১৫ কলিকাতা ক্যানিং হস্টেলের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সভাপতির বক্তৃতা।
১৬ প্রাচী-র ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

১১৯ বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত আর্ট। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবর্তক ১৩২৯ চৈত্র

১২০ মত ও মন্ত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী

১২১ বাসন্তী পর্ব্ব[১৭]। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ চৈত্র

১২২ সন্ধ্যার উৎসব[১৮]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১২৩ উৎসবের কনসার্ট। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩০ বৈশাখ

১২৪ ছেলেভুলানো ছড়া। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ বৈশাখ

১২৫ দর্শন দরবাজা[১৯]। প্রবন্ধ। অয়ন ১৩৩০ বৈশাখ

১২৬ মহা বংবুম হুক্ষীয় সিড়প প্রশ্নোত্তরমালা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ

১২৭ শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রাচী ১৩৩০ আষাঢ়

১২৮ কারুছত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। অয়ন ১৩৩০ শ্রাবণ

১২৯ বড় লেখা ছোট লেখা। প্রবন্ধ। প্রাচী ১৩৩০ শ্রাবণ

১৩০ রীতিমতো শিল্পশিক্ষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। তরুণ ১৩৩০ ভাদ্র

১৩১ এসপার ওসপার। নাটক। ভারতী ১৩৩০ আশ্বিন

১৩২ টাটকা চিঠি। পত্র। তরুণ ১৩৩০ আশ্বিন

১৩৩ শিল্পশাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ আশ্বিন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৩৪ ছেলেমানুষী বিয়ে। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ কার্তিক-অগ্রহায়ণ

১৩৫ আলোয় কালোয়। গল্প। মৌচাক ১৩৩০ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক

১৩৬ শিল্পীর ক্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৩৭ কারিগর ও বাজীকর। গল্প। প্রাচী ১৩৩০ পৌষ

১৩৮ পূর্ণিমা ব্রত। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩০ পৌষ

১৩৯ শিল্পের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার ভালোমন্দ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ মাঘ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৪০ সমালোচনা[২০]। সমালোচনা। ভারতী ১৩৩০ ফাল্গুন

১৪১ রস ও রচনার ধারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩০ ফাল্গুন

১৪২ পথের বীণা। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩১ বৈশাখ

১৪৩ নববর্ষের আবদার। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৩১ জ্যৈষ্ঠ

১৪৪ উন্নতি ও পরিণতি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। মহিলা ১৩৩১, ২ জ্যৈষ্ঠ

১৪৫ নাচঘরের আবহাওয়া। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ৯ জ্যৈষ্ঠ

১৪৬ চরখা না বেহালা। প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠি ১৩৩১ শ্রাবণ

---

১৭ বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে পঠিত।

১৮ হার্ডিঞ্জ হস্টেল-এর তিন নং ওয়ার্ড্-এর সান্ধ্য সম্মিলনীতে পঠিত

১৯ ভারতী'র ১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

২০ কমলাকান্তের পত্র।

১৪৭ বাংলা থিয়েটারের এক টুকরো। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩১, ১৬ শ্রাবণ

১৪৮ শিল্পাচার্যের পত্র[২১]। পত্র। বাঁশরী ১৩৩১ আশ্বিন

১৪৯ নানা পংহি। পদ্য। শনিবারের চিঠি ১৩৩১ আশ্বিন

১৫০ শিল্পবৃত্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫১ সুন্দর। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫২ নির্ভাবনার দুর্ভাবনা[২২]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৫১ চৈত্র

১৫৩ অসুন্দর। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩১ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫৪ শিল্পের 'ক' ও 'খ'। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩২

১৫৫ রূপরেখার রূপকথা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩৩২ বৈশাখ

১৫৬ বড় রাজা ছোট রাজার গল্প। গল্প। মৌচাক ১৩৩২ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক

১৫৭ জাতি ও শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৫৮ স্মৃতির পরশ[২৩]। স্মৃতিকথা। কল্লোল ১৩৩২ আষাঢ়

১৫৯ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়

১৬০ আশুতোষ[২৪]। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩২ আষাঢ়

১৬১ দীপালি। লেখ-চিত্র। শরতের ফুল ১৩৩২ আশ্বিন

১৬২ আর্টিষ্ট। । ভারতী ১৩৩২ আশ্বিন

১৬৩ কনকলতা। গল্প। মৌচাক ১৩৩২ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক

১৬৪ খাসিয়াদের শারদোৎসব। প্রবন্ধ। কল্লোল ১৩৩২ আশ্বিন

১৬৫ অরূপ না রূপ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ কার্তিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৬ রূপবিদ্যা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৭ রূপ দেখা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ পৌষ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৬৮ উত্তরা। গদ্যছন্দ। উত্তরা ১৩৩২ পৌষ

১৬৯ একখানি পত্র। পত্র। নাচঘর ১৩৩২, ৩ পৌষ

১৭০ বড় জ্যাঠামশায়। স্মৃতিকথা। ভারতী ১৩৩২ মাঘ

১৭১ একখানি পত্র। পত্র। উত্তরা ১৩৩২ ফাল্গুন

১৭২ স্মৃতি ও শক্তি। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ ফাল্গুন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

১৭৩ পত্র[২৫]। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল্গুন

১৭৪ পত্র[২৫]। দ্বিতীয়। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল্গুন

---

২১ শিল্পী চারুচন্দ্র রায়কে লিখিত।

২২ রামমোহন লাইব্রেরী হলে কুমার লাইব্রেরীর তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। ২৪, মাঘ।

২৩ রাঁচীর 'শান্তিধাম' সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসস্থান এবং 'শান্তিনিকেতন' এই দুইএর স্মৃতির আলোচনা

২৪ কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি হলে প্রথম বার্ষিক স্মৃতিসভায় পঠিত।

২৫ নন্দলাল বসুকে লেখা।

১৭৫ আর্য ও অনার্য শিল্প। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৭৬ দোতারা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। উত্তরা ১৩৩২ চৈত্র
১৭৭ আসা যাওয়া। গদ্যছন্দ। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩
১৭৮ কোণের ঘর। গল্প। বার্ষিক বসুমতী ১৩৩৩
১৭৯ সাথী। গল্প। বার্ষিক শিশুসাথী ১৩৩৩ ॥ একে তিন তিনে এক
১৮০ আশ্রমের উৎসব ও অনুষ্ঠান। প্রবন্ধ। প্রবর্ত্তক ১৩৩৩ বৈশাখ
১৮১ আশীর্ব্বাদ ও স্বস্তিবচন[২৬]। আশীর্বাণী। প্রবাসী ১৩৩৩ বৈশাখ
১৮২ আর্য্যশিল্পের ক্রম। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৮৩ পত্র[২৭]। পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩৩ বৈশাখ
১৮৪ রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট। পত্র : শিল্পবিষয়ক। শান্তিনিকেতন ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ
১৮৫ আর্টের সহজ পথ। প্রবন্ধ। উত্তরা ১৩৩৩ আশ্বিন
১৮৬ সাহিত্যে শুচিবিচার। প্রবন্ধ। ভারতী ১৩৩৩ কার্তিক
১৮৭ ঋতুমঙ্গল। লেখ-চিত্র। কালিকলম ১৩৩৩ কার্তিক
১৮৮ ভোম্বলদাসের কৈলাসযাত্রা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ কার্তিক ॥ একে তিন তিনে এক
১৮৯ রতা শেয়ালের কথা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ একে তিন তিনে এক
১৯০ রূপ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯১ খেলার পুতুল। সচিত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ পৌষ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯২ একখানি পত্র[২৮]। পত্র। ভারতবর্ষ ১৩৩৩ পৌষ
১৯৩ সিংহরাজ্যের রাজ্যাভিষেক। গল্প। মৌচাক ১৩৩৩ পৌষ ॥ একে তিন তিনে এক
১৯৪ জগদিন্দ্রনাথের স্মরণে। প্রবন্ধ। মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন
১৯৫ ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ[২৯]। গ্রন্থসমালোচনা। মৌচাক ১৩৩৩ ফাল্গুন
১৯৬ আপন কথা। স্মৃতিকথা। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ ফাল্গুন-১৩৩৪ ভাদ্র ॥ আপন কথা
১৯৭ রূপের মান ও পরিমাণ। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী
১৯৮ হীরা-কুনি। গল্প। চালচিত্র ১৩৩৪
১৯৯ এম্ এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। কল্লোল ১৩৩৪
২০০ হাওয়াবদল। গদ্যছন্দ। মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৪ বৈশাখ
২০১ দেয়ালা। গল্প। মৌচাক ১৩৩৪ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক
২০২ মহামাষ তৈল। গল্প। বেণু ১৩৩৪ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক

---

২৬ প্রবাসীর পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় লিখিত।

২৭ 'শান্তিনিকেতন' থেকে সংকলিত।

২৮ এই পত্রখানি শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভারতবর্ষে প্রকাশিত 'ভারতের স্থাপত্যশিল্প' প্রবন্ধ উপলক্ষে লেখকমহাশয়কে লিখিত।

২৯ শ্রীযামিনীকান্ত সোম প্রণীত।

২০৩ ভাব। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২০৪ বর্ণমালা। প্রবর্তক ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ

২০৫ বাবুই পাখীর ওড়নবৃত্তান্ত। গল্প। বেণু ১৩৩৪ আষাঢ়-ভাদ্র॥ রং-বেরং

২০৬ নতুন ও পুরোনোর ছন্দ। প্রবন্ধ। বিচিত্রা ১৩৩৪ আষাঢ়

২০৭ কলি ও কাল। প্রবন্ধ। নওরোজ ১৩৩৪ আষাঢ়

২০৮ পাহাড়িয়া। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ

২০৯ রংমহল। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র

২১০ রসসৃষ্টি। প্রবন্ধ। নাচঘর ১৩৩৪, ১১ আশ্বিন

২১১ হাটবার। গদ্যছন্দ। বেণু ১৩৩৪ আশ্বিন

২১২ তিন দরিয়া। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন

২১৩ মেঘমণ্ডল। গদ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ কার্তিক

২১৪ আতসবাজি। গদ্যছন্দ। উত্তরা ১৩৩৪ কার্তিক

২১৫ লাবণ্য। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বঙ্গবাণী ১৩৩৪ কার্তিক॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২১৬ বাগানে। লেখ-চিত্র। বিচিত্রা ১৩৩৪ চৈত্র

২১৭ সাদৃশ্য। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। প্রবাসী ১৩৩৪ চৈত্র॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী

২১৮ আলোকশিখা। গদ্যছন্দ। রংমশাল ১৩৩৫

২১৯ আশীর্বাণী। আশীর্বাণী। বিশ্ববার্তা ১৩৩৫ রবীন্দ্র সংখ্যা

২২০ ভারতশিল্প[৩০]। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৩৫ বৈশাখ

২২১ বর্ণিকাভঙ্গম। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বিচিত্রা ১৩৩৫ পৌষ

২২২ নতুন খাতা। লেখ-চিত্র। চিত্রা ১৩৩৬ বৈশাখ

২২৩ আষাঢ়ে গল্প। গল্প। শিশুসাথী ১৩৩৭॥ একে তিন তিনে এক

২২৪ খোকাখুকী। গল্প। খোকাখুকু ১৩৩৭ কার্তিক॥ একে তিন তিনে এক

২২৫ অশথ-পাতা। লেখ-চিত্র। বিচিত্রা ১৩৩৭ মাঘ

২২৬ বনের ময়ূর[৩১]। পদ্য। 'মডার্ন রিভিউ' ১৯৩১ মার্চ

২২৭ যাত্রা ও থিয়েটার[৩২]। প্রবন্ধ। জয়ন্তী-উৎসর্গ ১৩৩৮ পৌষ

২২৮ অপরাজিতার মালা। পদ্য। রূপরেখা ১৩৩৯

২২৯ গীত-হাফেজ। পদ্য। রূপরেখা ১৩৩৯

২৩০ শিল্পী শ্রীমান্ নন্দলাল বসু[৩৩]। আশীর্বাণী। বিচিত্রা ১৩৩৯ অগ্রহায়ণ

---

৩০ ডা পি. কে. আচার্য প্রণীত *A Book on Architecture*-এর সমালোচনা।

৩১ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস্-এর উদ্যোগে চীনা চিত্রকরদের দুখানি ছবি উপহার দিয়ে (তার মধ্যে একখানি ময়ূরের ছবি) অবনীন্দ্রনাথ এই কবিতাখানি লিখে দেন।

৩২ রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত।

৩৩ বিচিত্রার 'চিত্রশালা'য় প্রকাশিত নন্দলাল বসুর চিত্রাবলীর সমালোচনা।

২৩১ সহজ মানুষকে নমস্কার। প্রবন্ধ। Acharyya Ray Commemoration Volume 1932

২৩২ বাংলার রঙ ও রূপ[৩৪]। চিত্র-সমালোচনা। বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌষ

২৩৩ রূপকথার দেশ। পদ্য। উদয়ন ১৩৪০ বৈশাখ

২৩৪ নূতনে পুরাতনে[৩৫]। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। উদয়ন ১৩৪০ আষাঢ়

২৩৫ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৫ শ্রাবণ

২৩৬ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ১২ শ্রাবণ

২৩৭ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ২৬ শ্রাবণ

২৩৭ উড়ো চিঠি[৩৬]। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৯ ভাদ্র

২৩৮ ব্রহ্মদেশের নৃত্য। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ৭ বৈশাখ

২৩৯ 'পাউই' নৃত্য। প্রবন্ধ : নৃত্যবিষয়ক। নাচঘর ১৩৪০, ২১ বৈশাখ

২৪০ কাকলী। পদ্য। রূপরেখা ১৩৪১

২৪১ একে তিন তিনে এক। গল্প। মৌচাক ১৩৪১ বৈশাখ-শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক

২৪২ ই. বি. হ্যাভেল। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪১ শ্রাবণ

২৪৩ বর্ষবাণী। লেখ-চিত্র। বর্ষবাণী ১৩৪২

২৪৪ রাবিস রামায়ণের ভূমিকা। পদ্য। নবমঞ্জরী ১৩৪৩

২৪৫ বাসিন্দা-নিবাসিন্দার রূপকথা। গল্প। বর্ষবাণী ১৩৪৩

২৪৬ কাঁচায় পাকায়। গল্প। মৌচাক ১৩৪৪ শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক

২৪৭ মারুতির পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গীতে রামায়ণের গল্প। মৌচাক ১৩৪৪-১৩৪৫ ॥ মারুতির পুঁথি। চাঁইবুড়োর পুঁথি

২৪৮ সিকস্তি পয়স্তি কথা। গল্প। রংমশাল ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র ॥ রং-বেরং

২৪৯ ভবের হাটে হেতি হোতি। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৪ আশ্বিন-পৌষ ॥ রং-বেরং

২৫০ ভূত চৌদশী। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৪ কার্তিক

২৫১ হেতি হোতির বৃত্তান্ত। গল্প। সোনার কাঠি ১৩৪৫

২৫২ দেবীর বাহন। গল্প। ছোটদের মাধুকরী ১৩৪৫ ॥ রং-বেরং

২৫৩ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ বৈশাখ

২৫৪ শিশুসাহিত্য। প্রবন্ধ। রংমশাল ১৩৪৫ আষাঢ়

২৫৫ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ আশ্বিন

২৫৬ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ কার্তিক

২৫৭ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ

---

৩৪ নলিনীকান্ত মজুমদারের ছবির প্রতিলিপি-সংগ্রহের সমালোচনা।

৩৫ স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা।

৩৬ উদয়শঙ্করের নৃত্য উপলক্ষে লেখা।

২৫৮ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ পৌষ
২৫৯ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ ফাল্গুন
২৬০ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৫ চৈত্র
২৬১ পোড়ালঙ্কার পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গিতে রামায়ণের গল্প : অসম্পূর্ণ।. মৌচাক ১৩৪৬ বৈশাখ-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ
২৬২ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ বৈশাখ
২৬৩ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
২৬৪ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ আষাঢ়
২৬৫ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ ভাদ্র
২৬৬ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ আশ্বিন
২৬৭ শিল্পীর খেয়াল। প্রবন্ধ। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৬
২৬৮ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ কার্তিক
২৬৯ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ
২৭০ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ পৌষ
২৭১ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ মাঘ
২৭২ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ ফাল্গুন
২৭৩ বড় জ্যাঠামশায়। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র
২৭৪ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ চৈত্র
২৭৫ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ বৈশাখ
২৭৬ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ
২৭৭ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ শ্রাবণ
২৭৮ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ ভাদ্র
২৭৯ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ আশ্বিন
২৮০ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ কার্তিক
২৮১ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ
২৮২ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ পৌষ
২৮৩ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ মাঘ
২৮৪ চট জলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৭ ফাল্গুন
২৮৫ আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা এবং আমার মাষ্টারি। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে
২৮৬ মহাবীরের পুঁথি। পুঁথির ভঙ্গীতে রামায়ণের গল্প। রংমশাল ১৩৪৮ আশ্বিন - ১৩৫০ ভাদ্র
২৮৭ রবিকাকার গান। স্মৃতিকথা। কবিতা ১৩৪৮ আষাঢ় ॥ ঘরোয়া
২৮৮ শিশুদের রবীন্দ্রনাথ। স্মৃতিকথা। রংমশাল ১৩৪৮ আষাঢ়
২৮৯ আবহাওয়া। স্মৃতিকথা। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন

২৯০ রূপকথার আদিকথা। স্মৃতিকথা। রূপকথা ১৩৪৮ আশ্বিন

২৯১ প্রভাত। পদ্য। অলকা ১৩৪৮ কার্তিক

২৯২ রেনি ডে। গল্প। মধুমেলা ১৩৪৯ ॥ রং-বেরং

২৯৩ উড়নচণ্ডীর পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৯

২৯৪ মাসীমা। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ শ্রাবণ ॥ মাসি

২৯৫ আমাদের সেকালের পুজো। স্মৃতিকথা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৪৯

২৯৬ ফার্ষ্ট টু লাষ্ট[৩৭]। গল্প। শনিবারের চিঠি ১৩৪৯ কার্তিক

২৯৭ হারজিত। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ

২৯৮ রাতশেষের গান। পদ্য। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ

২৯৯ ছুই সন্ধানী। প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ মাঘ

৩০০ বনলতা। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র ॥ মাসি

৩০১ মউর ছালের পালা। যাত্রার পালা। দিগন্ত ১৩৫০

৩০২ টুকরী বুড়ি। গল্প। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫০

৩০৩ চৈত্রের মুহূর্ত্ত। গদ্যকবিতা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ

৩০৪ হাতে খড়ি। গল্প। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ জ্যৈষ্ঠ ॥ মাসি

৩০৫ কঞ্জুষের পালা। যাত্রার পালা। রংমশাল ১৩৫০ আশ্বিন-পৌষ

৩০৬ ভারতীয় চিত্রকলার প্রচারে রামানন্দ। স্মৃতিকথা। প্রবাসী ১৩৫০ পৌষ

৩০৭ আমাদের পারিবারিক সঙ্গীতচর্চ্চা। স্মৃতিকথা। গীতবিতান বার্ষিকী ১৩৫০ মাঘ

৩০৮ শুভ কামনায়[৩৮]। আশীর্ব্বাণী। জয়ন্তী মৌচাক ১৩৫১

৩০৯ গজকচ্ছপের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫১

৩১০ শিশু সাহিত্য[৩৯]। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১৩৫১ বৈশাখ

৩১১ মৌচাক মেলা। প্রবন্ধ। মৌচাক ১৩৫১ বৈশাখ

৩১২ মা গঙ্গা। স্মৃতিকথা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় ॥ জোড়াসাঁকোর ধারে

৩১৩ ভূতপতরীর যাত্রা। যাত্রার পালা। রংমশাল ১৩৫১ বৈশাখ-ফাল্গুন

৩১৪ বহিত্র। গল্প। দেশের মাটি ১৩৫১ আশ্বিন ॥ রং বেরং

৩১৫ রথোযাত্রা গীতাভিনয়। যাত্রার পালা। অর্চ্চনা ১৩৫২ বৈশাখ

৩১৬ রতনমালার বিয়ে। গল্প। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫২

৩১৭ চাইদাদার গল্প। গল্প। শারদীয়া দেশ ১৩৫২

৩১৮ নিদ্রাপরী তন্দ্রাপরীর গান। পদ্য। কলরব ১৩৫২

---

৩৭ শনিবারের চিঠি সম্পাদকের মন্তব্য—'এই গল্পের গোড়ার দিকের ঘটনা বিশ্বভারতী পত্রিকা ভাদ্র সংখ্যার মাসি গল্পে দ্রষ্টব্য'।

৩৮ মৌচাকের পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় লিখিত।

৩৯ প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, দিল্লীতে পঠিত।

৩১৯ নতুন বছর[৪০]। লেখ-চিত্র। উদয়াচল ১৩৫২ আষাঢ়

৩২০ আলিপনা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ শ্রাবণ

৩২১ কাষ্ঠবেড়ালের পুঁথি। গল্প। মৌচাক ১৩৫২ কার্তিক

৩২২ ধোড়াকাক বুড়োশেয়ালের পালা। যাত্রার পালা। আকাশদীপ ১৩৫৩

৩২৩ নেই ও আছে[৪১]। প্রবন্ধ। রংমশাল ১৩৫৩ আষাঢ়

৩২৪ সিন্ধবাদ বিবরণ পত্য। গল্প। সপ্তডিঙা ১৩৫৩॥ রং-বেরং

৩২৫ কলাবনের কলা। গল্প । শারদীয়া দেশ ১৩৫৪

৩২৬ রামানন্দজীবনী। গ্রন্থ-সমালোচনা। প্রবাসী ১৩৫৪ পৌষ

৩২৭ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্ব্বাণী[৪২]। আশীর্ব্বাণী। বিশ্ববার্ত্তা ১৩৫৫, ২৫ বৈশাখ

৩২৮ বেণুকুঞ্জের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৫

৩২৯ সব পেয়েছির আসর। । শারদীয়া যুগান্তর ১৩৫৫

৩৩০ যুগাবতার পালা। যাত্রার পালা। ছায়াপথ ১৩৫৫

৩৩১ সোকার ঘটকালি। গত্য। শারদীয়া বসুমতী ১৩৫৬

৩৩২ লম্বকর্ণ পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৬

৩৩৩ তালপাতি। পত্য। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫৭

৩৩৪ ঋষিযাত্রা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৭

৩৩৫ অতীত ও বর্ত্তমান বাংলা। প্রবন্ধ। পুনশ্চ ১৩৫৭ আশ্বিন

৩৩৬ অক্ষরদের গান। কবিতা। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫১

৩৩৭ আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাণী। চয়নিকা ১৩৫৮ বৈশাখ

৩৩৮ ছেলে-বুড়ো। গত্যছন্দ। কথাসাহিত্য ১৩৫৮ পৌষ

৩৩৯ হংসনামা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৫৯

৩৪০ এসপার ওসপার[৪৩]। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬০

৩৪১ শান্তিনিকেতনে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথম ভাষণ[৪৪]। শ্রীসুধীরচন্দ্র কর 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা', আশ্বিন ১৩৬০

৩৪২ সূর্য্য কি করতে এলেন[৪৫]। গল্প। সমকালীন ১৩৬১ শারদীয়

৩৪৩ উড়ো চিঠি ( এয়ার মেল )[৪৬]। প্রবন্ধ। সুচিত্রিতা ১৩৬১ শারদীয়া

---

৪০ ১৩৪২এর বর্ষবাণীতে 'বর্ষবাণী' নামে প্রকাশিত।

৪১ অবনীন্দ্রনাথের সাতান্ন বছরের জন্মদিনে লিখিত।

৪২ রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।

৪৩ এই নামে যে নাটক আশ্বিন ১৩৩০এর ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে যাত্রার পালায় ভাঙা।

৪৪ ভাষণের তারিখ সম্ভবতঃ ১৩৪৮ চৈত্র।

৪৫ প্রাচী'র ১৩৩০ ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'জলে স্থলে' নামক গল্পের প্রথম খসড়া।

৪৬ নাচঘর হইতে উদ্ধৃত।

৩৪৪ বৃক ও মেষপালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬১

৩৪৫ জাবালির পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া দেশ ১৩৬১

৩৪৬ হানাবাড়ির কারখানা। উপন্যাস। মৌচাক ১৩৬১ বৈশাখ-কার্তিক

৩৪৭ অবনীন্দ্রনাথের পত্র[৪৭]। পত্র। পদ্যে লেখা। কথাশিল্প ১৩৬১ মাঘ

৩৪৮ গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত। গল্প। দেবালয় ১৩৬২

৩৪৯ উড়ো পাখী। স্মৃতিকথা। সমকালীন ১৩৬২ বৈশাখ

৩৫০ এ কার জন্য। পদ্য। ঋতুপত্র ১৩৬২ গ্রীষ্ম সংখ্যা

৩৫১ পরবশ। প্রবন্ধ। সমকালীন ১৩৬২ শারদীয়

৩৫২ ফসকান পালা। যাত্রার পালা। জয়যাত্রা ১৩৬৩

৩৫৩ দুই পথিক ও ভল্লুকের পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৩

৩৫৪ শ্রীকৃষ্ণকথা। গল্প: অসম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ

৩৫৫ নল-দময়ন্তী। গল্প: অসম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ

৩৫৬ কাক ও পনির পালা। যাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৩ কার্তিক

৩৫৭ অবনীন্দ্রনাথের চিঠি[৪৮]। পত্র। সংযোগ ১৩৬৪ শ্রাবণ

৩৫৮ পুতলীর পালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৬৫

৩৫৯ ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী পালা। যাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৫ কার্তিক

৩৬০ ছড়া। পদ্য। উত্তরসূরী ১৩৬৫ কার্তিক

৩৬১ গোল্ডেন গুজ পালা। যাত্রার পালা। দেবদেউল ১৩৬৬

তারিখ জানা যায় নি

৩৬২ ভূতের কেত্তন। পদ্য। সোনালি ফসল

৩৬৩ জেন্ত দেশ। পদ্য। ছোটদের বার্ষিকী

৩৬৪ নগ্ন ক্ষপণকে দেশে রজকঃ কি করিষ্যতি। প্রবন্ধ। মাসপয়লা

অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকা সংবলিত গ্রন্থ

১ জেবুন্নিসা বেগম। সমরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা। ১৩০৬ অগ্রহায়ণ

২ অজন্তা। শ্রীঅসিতকুমার হালদার। ১৩২০

৩ রাজাবাদশা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩২৮

৪ মন্দিরের কথা। শ্রীগুরুদাস সরকার। ১৩২৮

৫ ভারতের দেবদেউল। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। ১৩৪৮ বৈশাখ

---

৪৭ পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথকে লেখা।

৪৮ কন্যা সুরূপা দেবীকে সাহাজাদপুর হইতে লেখা।

Statement about ownership and other particulars about
*VISVA-BHARATI PATRIKA*

FORM IV : Rule 8

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Place of Publication ... ... ... | 6/3, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta 7. |
| 2. | Periodicity of Publication ... | Quarterly. |
| 3. | Printer's Name ... ... ... | Sri Prabhat Chandra Ray. |
| | Nationality ... ... ... | Indian. |
| | Address ... ... ... ... | Sri Gouranga Press Private Ltd. 5, Chintamani Das Lane, Calcutta 9. |
| 4. | Publisher's Name ... ... ... | Sri Saradindu Bose. |
| | Nationality ... ... ... | Indian. |
| | Address ... ... ... ... | Visva-Bharati, 6/3, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta 7. |
| 5. | Editor's Name ... ... ... | Sri Pulinbihari Sen. |
| | Nationality ... ... ... | Indian. |
| | Address ... ... ... ... | Visva-Bharati, 6/3, Dwarkanath Tagore Lane, Calcutta 7. |
| 6. | Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of total capital. | Visva-Bharati University, P.O. Santiniketan. |

I, Saradindu Bose, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Saradindu Bose
Signature of Publisher.

Date 30-3-60
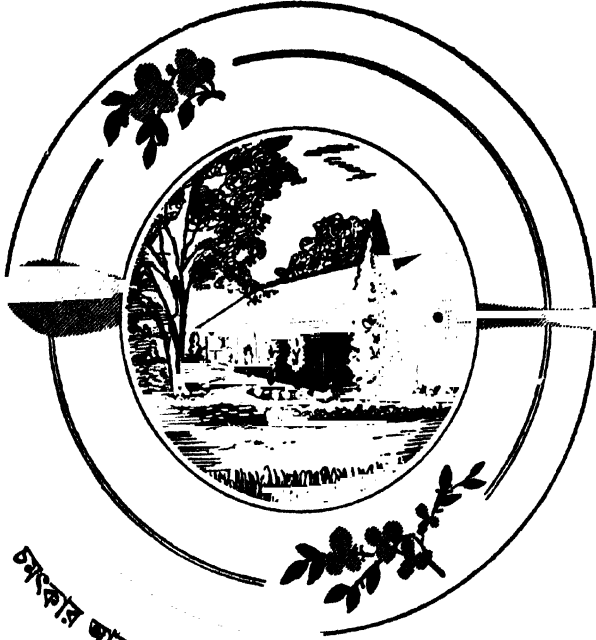
নীল দিগন্তে তরঙ্গায়িত পাহাড়,
উপত্যকার প্রান্তে প্রকৃতির
আরণ্য সৌন্দর্য, হুড্রু নির্ঝর
ও মনোরম আবহাওয়ার
জন্যই রাঁচীর খ্যাতি।

আর দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে
হোটেলের চমৎকার
আহার্য ও স্বাচ্ছন্দ্য রাঁচীকে
কম খ্যাতিমান করেনি।

চমৎকার আহার্য ও আবাসিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

সোনা-রং বালুরাশি, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ,
অনন্যা বেলাভূমি, আর
মহিমান্বিত মন্দির এ সবই
তো পুরীর আকর্ষণ।

কিন্তু পুরীতে দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে হোটেলে থাকার
মতো মনোরম বোধহয়
আর কিছু নেই।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

# গ্রাহকগণের প্রতি

বিশ্বভারতী পত্রিকার ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইল। সপ্তদশ বর্ষের পত্রিকা এক খণ্ডে বিশেষ রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষপূর্তি-সংখ্যা রূপে পূজার পূর্বে প্রকাশিত হইবে।

এই সংখ্যায়

রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে কবির বিবিধ রচনা

রবীন্দ্র-প্রতিকৃতির সংকলন

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক অঙ্কিত একবর্ণ ও বহুবর্ণ চিত্রাবলী

মুদ্রিত হইবে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মূল্যবান গ্রন্থের তুল্য হইবে। ইহা পুরু কাগজে ছাপা ও পুরা কাপড়ে বাঁধাই হইবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা ৪৲, এই বিশেষ সংখ্যার মূল্য বর্ধিত না করিয়া ৪৲ রাখাই স্থির হইয়াছে।

এই সংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে লওয়া সমীচীন হইবে। রেজেস্ট্রিতে ডাকমাশুল ১·২৫ টাকা।

ষোড়শ বর্ষে যাঁহারা ডাকমাশুল-সহ বার্ষিক চাঁদা ৫৷৷৹ জমা দিয়া গ্রাহক ছিলেন, ঐ বর্ষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা একত্র প্রকাশিত হওয়ায়, অর্থাৎ চার সংখ্যার স্থলে তিন সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ায়, তাঁহাদের একটি সংখ্যার ডাকমাশুল ৩৭ ন. প. আমাদের নিকট জমা আছে। সপ্তদশ বর্ষের ডাকমাশুল হইতে উহা বাদ দেওয়া হইবে।

ষোড়শ বর্ষ

চতুর্থ সংখ্যা

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

সম্পাদক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

সুন্দর থেকে সুন্দরতম...
দ ত্ত
অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ রৌপ্য ব্যবসায়ী
১৫৭ ২, বহুবাজার স্ট্রীট কলিকাতা-১২
ফোন:: ৩৪-৪৭৬০

# লক্ষ্মীর সংসার

জামশেদপুর ইস্পাত কারখানায় ১৯১২ সালে প্রথম ইস্পাত তৈরী শুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই এক অল্পবয়সী আদিবাসী স্বামী-স্ত্রী এসে কাজে ঢুকেছিল। স্বামী সীতারাম হাঁসদা আজ জীবিত নেই। স্ত্রী লক্ষ্মী হাঁসদার বয়স এখন ৬১ বছর। কারখানার কাজ থেকে সে গত বছর অবসর নিয়েছে কিন্তু কারখানার সঙ্গে তার পারিবারিক সম্বন্ধ এখনো বজায় রয়েছে—তার তিন ছেলের মধ্যে দু'ছেলে এই ইস্পাত কারখানায় কাজ করছে।

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে সেরাইকেলার এক হো পল্লী থেকে জামশেদপুরের যে এলাকায় লক্ষ্মী প্রথম এসে আস্তানা পাতে, আজও সেখানেই সে তার মস্ত সংসার—ছেলে, মেয়ে ও নাতি-নাতনী নিয়ে ঘরকন্না করছে। এককালের সেই নিঃশব্দ জনমানবহীন অঞ্চল এখন আদিবাসীদের কর্মতৎপরতায় মুখর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব কুঁড়ে ঘর, প্রশস্ত রাস্তা, জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সেখানে গড়ে উঠেছে এবং লক্ষ্মীর স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্যে জায়গাটির নাম রাখা হয়েছে সীতারামডেরা।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকেদের মত আদিবাসীরাও জামশেদপুরে ঘর বেঁধে আনন্দে দিন কাটাচ্ছে, কেননা শিল্প সেখানে শুধু জীবিকার্জনের উপায় নয়, জীবন যাপনেরই একটি অঙ্গ।

ইস্পাতপুরী

The Tata Iron and Steel Company Limited

JWTTN 4083

ওই লোকটা আবার বুঝি শিকল টেনেছে! ও ঐরকম-ই। অযথা-ই ও ট্রেনের শিকল টানবে। তাতে সহযাত্রীদের অসুবিধে হ'লে ওর ভ্রূক্ষেপ-ও নেই। সব্বাইর সময়ের ক্ষতি হ'লে কিম্বা পিছনের ট্রেণ-গুলোর সময়ের গোলমাল হয়ে গেলে ওর অবশ্যি কিছু এসে যায় না, কিন্তু আপনার এবং রেলের হয় সমূহ ক্ষতি। আপনার মত বিবেচক লোক এমন ব্যাপার ঘটতে দিতে পারেন না।

## দুর্বৃত্তকে ধরতে সাহায্য করুন

**বিপজ্জনক পরিস্থিতি**

ট্রেণে বিপদ-সংকেত শিকলের অপব্যবহার ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ৫৭৪২ বার শিকল টানা হয়েছিল, তার ভেতর ৪৫৪৪ বার অপরাধীর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৬২৯৬ তে পৌঁছায়, তার ভেতর ৪৫৫৪ বার দুষ্কৃতকারীর খোঁজ মেলেনি। এটা অত্যন্ত শঙ্কাজনক ব্যাপার, সন্দেহ নেই!

**অপব্যবহারের শাস্তি**

বিপদ-সংকেত শিকলের অপব্যবহার এখন গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ—এর ফলে ২৫০৲ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা তিন মাসের কারাদণ্ড কিম্বা উভয় দণ্ড-ই হতে পারে।

***নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ট্রেনের শিকল টানবেন না***

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে

adarts SER/AC/1/59

KOLAY
Kb
BISCUITS

# বিশ্বভারতী পত্রিকা

ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন


## বিষয়সূচী



## চিত্রসূচী



মূল্য এক টাকা

মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধা

প্রাচীন চিত্র। কাংড়া কলম

বিশ্বভারতী পত্রিকা ষোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৮৮২ শক

## স্বাক্ষর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতি, সে যে নিশিদিন
বর্তমানেরে নিঃশেষ করি
অতীতের শোধে ঋণ।

Memory, the priestess, kills the present
and offers its heart to the shrine of the dead past.

২

শান্তি নিজ আবর্জনা দূর করিবারে
ঝাঁট দিতে থাকে বেগে— ঝড় কহে তারে।

When peace is active sweeping its dirt it is storm.

৩

চাহিছে কীট মৌমাছির
পাইতে অধিকার,
করিল নত ফুলের শির
দারুণ প্রেম তার।

Flower, have pity for the worm, it is not a bee:
its love is a blunder and a burden.

৪

সখার কাছেতে প্রেম চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি চাহে শয়তান।

God seeks comrades and claims love,
the Devil seeks slaves and claims obedience.

৫

হিতৈষীদের স্বার্থবিহীন অত্যাচারে
পীড়িত ধরণী বেদনাভারে।

The world suffers most
from the disinterested tyranny
of its well-wishers.

৬

কাঁটার সংখ্যা ঈর্ষাভরে
ফুল যেন নাহি গণনা করে।

The flower which is single
need not envy the thorns
that are numerous.

৭

দোয়াতখানা উলটি ফেলি
পটের 'পরে
'রাতের ছবি এঁকেছি' ব'লে
গর্ব করে।

To justify their own spilling of ink
they spell the day as night.

৮

অত্যাচারীর বিজয়তোরণ
ভেঙেছে ধুলার 'পর—
শিশুরা তাহারই পাথরে আপন
গড়িছে খেলার ঘর।

With the ruins of terror's triumph
children build their doll's house.

৯

অস্তরবিরে দিল মেঘমালা
আপন স্বর্ণরাশি,
উদিত শশীর তরে বাকি রহে
পাণ্ডুবরন হাসি।

The cloud gives all its gold
to the departing sun
and greets the rising moon
with only a pale smile.

১০

ফাগুন কাননে অবতীর্ণ
ফুলদলে পথ করে কীর্ণ।
অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি,
নিমেষে নিমেষে অনাসৃষ্টি।

Spring scatters the petals of flowers
that are not for the fruits of the future,
but for the moment's whim.

১১

অপাকা কঠিন ফলের মতন
কুমারী, তোমার প্রাণ
ঘনসংকোচে রেখেছে আগলি
আপন আত্মদান।

Maiden, thy beauty is like a fruit
which is yet to mature
tense with an unyielding secret.

১২

যে ঝুম্‌কোফুল ফোটে পথের ধারে
অন্যমনে পথিক দেখে তারে।

সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি।

The voice of wayside pansies
that do not attract the careless glance
murmurs in these desultory lines.

১৩

গানখানি মোর দিনু উপহার—
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে,
নিয়ো তবে মোর নামখানি বাদ দিয়ে।

Leave out my name from the gift
if it be a burden but keep my song.

১৪

মানুষেরে করিবারে স্তব
সত্যের কোরো না পরাভব।

১৫

ঘড়িতে দম দাও নি তুমি ভুলে,
ভাবিছ বসে সূর্য বুঝি
সময় গেল ভুলে।

বর্তমান স্বাক্ষর-পদাবলীর মধ্যে দ্বিতীয়, চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ কবিতা-কয়টি যে পাণ্ডুলিপি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে সেটি শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী-কর্তৃক অনুলিখিত কবির এরূপ অন্যান্য 'স্বাক্ষরে' পূর্ণ— অনেকগুলি যথাযথরূপে বা সামান্য পরিবর্তনে লেখনে মুদ্রিত আছে, কতকগুলি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত স্বাক্ষরসমূহের অন্য সকল রচনাই শ্রীঅমিয়কুমার সেন রবীন্দ্রসদনের বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলন করিয়া দেন— ইহার মধ্যে কতকগুলির ইংরেজি অংশটুকু মাত্র লেখনে পাওয়া যাইবে, কতকগুলির বাংলাও রূপান্তরে উক্ত কাব্যগ্রন্থে বা স্ফুলিঙ্গে বর্তমান, আর অধিকাংশ ইংরেজি সুভাষিতই রবীন্দ্রনাথের Fireflies ( 1928 ) গ্রন্থে মুদ্রিত।

# রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্ত্র

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

রামমোহন রায় মূলতঃ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তকরূপে এ দেশে সুপরিচিত হলেও তাঁর নিজস্ব ধর্মমত এবং ধর্ম-সাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা এখনও হয়নি। গোষ্ঠীগত ভাবে রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমত সুদীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন নায়কের চিন্তাধারা ও সাধনা নানাভাবে তাকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। এর আদিরূপের সঙ্গে সাম্প্রতিক রূপের তাই স্বভাবতঃ বিস্তর প্রভেদ। ধর্মসমাজের ইতিহাসে ধর্মের এই-জাতীয় পরিবর্তন বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী। আদিম খ্রীষ্টধর্ম ও বর্তমান খ্রীষ্টধর্ম, আদিম বৌদ্ধধর্ম ও পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম, প্রাথমিক যুগের শিখধর্ম ও উত্তরকালের শিখধর্মের[১] রূপভেদকে এই বিষয়ে ঐতিহাসিক উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করা চলে। সুতরাং কোনও ধর্মসমাজের ইতিহাসে উক্ত ধর্মের বিভিন্ন নায়কের ব্যক্তিগত ধর্মমত স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবার একটি বিশেষ প্রয়োজন ও মূল্য আছে। তার ফলে কেবল যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে আলোচ্য ব্যক্তির একটি জীবন্ত ও সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় তাই নয়; সামাজিক মতবিবর্তনে নির্দিষ্ট দেশকালে ব্যাখ্যাত তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারার কতটা রক্ষিত, কতটা বা উপেক্ষিত হয়েছে সেটি নির্ধারণ করাও সহজ হয়। বর্তমান নিবন্ধে রামমোহন রায়ের ব্যক্তিগত ধর্মাদর্শের একটি দিককে এমনি ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

রামমোহন তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে ধর্মত্যাগী ও সমাজদ্রোহী বলে যতই নিন্দিত হয়ে থাকুন-না কেন, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মহত্ত্ব সম্পর্কে নিঃসংকোচ গর্ববোধ তাঁর চরিত্র ও কর্মধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এর উদাহরণ তাঁর রচনায় প্রচুর ছড়িয়ে আছে, দু-একটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। জনৈক খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে রামমোহনের তর্কবিতর্কের মধ্যে তাঁর প্রতিপক্ষ উন্নাসিকতার সঙ্গে এমন উক্তি করেন যে, যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণের কৃপায় ভারতীয়গণ ব্যক্তিস্বাধীনতার আস্বাদ পেয়েছেন এবং তাঁদের জ্ঞানোদয় হচ্ছে ( the rays of intelligence now beginning to dawn on them ), সেই খ্রীষ্টীয়গণের ধর্মকে আক্রমণ করা ভারতবাসীর পক্ষে চরম অকৃতজ্ঞতার সূচক। প্রত্যুত্তরে রামমোহন সগর্বে বলেছিলেন[২] : "If by the 'Ray of Intelligence' for which the Christian says we are indebted to the English, he means the introduction of useful mechanical arts, I am ready to express my assent and also my gratitude ; but with the respect to Science, Literature or Religion, I do not acknowledge that we are placed under any obligation. For by reference to history it may be proved that the World was indebted to our ancestors for the first dawn of knowledge, which sprang up in the East, and thanks to the Goddess of Wisdom, we have still a philosophical and copious language of our own, which distinguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract ideas without borrowing the language of foreigners." এই প্রসঙ্গে আমরা এও মনে রাখতে

পারি, তিনি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত ব্লোয়ার বিশপ আব্বে গ্রেগোয়ারের নিকট একসময়ে বলেন, হিন্দু তত্ত্ববিদ্যার সমতুল্য কোনও কিছু তিনি ইউরোপীয় দর্শনে দেখতে পান নি (he has found nothing in European books equal to the scholastic philosophy of the Hindus )[৩] ; তাঁর প্রবর্তিত ধর্ম-আন্দোলন এবং তাঁর সংস্থাপিত ধর্মসমাজের সংগঠনও তাঁর উপরি-উক্ত বিশিষ্ট মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। নানা শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য, মনীষা ও ঐক্যদৃষ্টির ফলে তিনি ইসলাম খ্রীষ্টধর্ম প্রভৃতির সারসত্যকে প্রাচীন ভারতীয় ব্রহ্মবাদের সঙ্গে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অর্থে তাঁর ধর্মমতকে অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌম একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করাই সংগত। তিনি নিজে তাঁর অনুরাগী শিষ্য নন্দকিশোর বসু, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতির নিকট নিজের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এই-জাতীয় উক্তিই করেছিলেন বলে জানা যায়।[৪] ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের *Calcutta Review* পত্রিকায় কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায় সম্পর্কে যে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন,[৫] সেখানেও তিনি রামমোহনকে বৈদান্তিক বা অন্য কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তরূপে চিত্রিত না করে সার্বভৌম একেশ্বরবাদী বলেই অভিহিত করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মজীবনের প্রথম পর্বে সম্ভবতঃ রামমোহনের ধর্মমতকে পূর্ণমাত্রায় বৈদান্তিক মত বলেই মনে করতেন। তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধের পর তাঁর পিতৃব্যপুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে শ্রাদ্ধবিধি সম্পর্কে সংবাদপত্রে তাঁর যে বাদানুবাদ হয়, তার মধ্যে এর পরোক্ষ প্রমাণ আছে। স্বীয় পিতৃশ্রাদ্ধে যদিও দেবেন্দ্রনাথ প্রতীকোপাসনা-মূলক কোনও অনুষ্ঠান করেন নি, তথাপি দানোৎসর্গ প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন "জাস্টিসিয়া" ছদ্মনামে ১৮৪৬ সালের ১২শে অক্টোবর তারিখে দেবেন্দ্রনাথকে তীব্র সমালোচনা করে ইংরেজি ভাষায় *Englishman* কাগজে একখানি পত্র লেখেন। সেই পত্র ১৭৬৮ শকাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে প্রসঙ্গতঃ জাস্টিসিয়া বা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে বলেছেন :[৬] "You give out ostensably that your object is to perpetuate the impulse given to Native Society by Rammohun Roy ; you have spoken strongly from the Vedantic pulpit against the reviewer of Rammohun Roy's life in the *Calcutta Review* ; you had aimed at correcting what you apprehended to be the errors and animadversions of that writer ; you said that Rammohun Roy was strictly speaking a Vedantist ;· ·" এই বিতর্কের সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নি। যেহেতু রামমোহনও শাস্ত্রের অভ্রান্ততা স্বীকার করে নিয়েই তাঁর ভারতীয় শাস্ত্রবিষয়ক বিচারগ্রন্থগুলি লিখেছেন, সেই জন্য রামমোহনের ধর্মমত বেদান্তভিত্তিক এ বিশ্বাস তখন পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের এবং দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক কিশোরীচাঁদের পূর্বোক্ত মত সমালোচনার অর্থ এখানেই খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে যখন অক্ষয়কুমার দত্তের সমালোচনা ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুসন্ধানের ফলে বেদ-বেদান্তের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস ব্রাহ্মসমাজ থেকে দূর হল, তখন ক্রমশঃ রামমোহনের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত সম্পর্কেও ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটল। ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাংবৎসরিক উৎসবের যে বক্তৃতা ১৭৭২ শকাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে। রামমোহন সম্পর্কে উক্ত রচনায় বলা হয়েছে :[৭] "তিনি কেবল এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রকে পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করিতেন এবং তদীয়

আলোচনা এবং তন্মূলক গ্রন্থানুশীলন দ্বারা স্বয়ং চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বদেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারকালে স্বদেশীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, সেইরূপ মোসলমানদিগের সহিত বিচারকালে কোরাণের প্রমাণ এবং খ্রীষ্টানদিগের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন কারণ সত্যস্বরূপ মহারত্ন সর্বস্থান হইতেই লভনীয়। এই ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রদর্শিত পথাবলম্বি ব্রহ্মোপাসকদিগের সাধারণ উপাসনাস্থান এবং সকল দেশে তাঁহার যে ধর্মপ্রচারের অভিলাষ ছিল তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম।" রামমোহনের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্তকে এখানে অসাম্প্রদায়িক বিশ্বজনীন একেশ্বরবাদরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে। নবপ্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের জন্য রামমোহন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ (দ্বারকনাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, বৈকুণ্ঠনাথ রায়, রাধাপ্রসাদ রায় এবং রমানাথ ঠাকুর) যে ট্রাস্টডীড প্রণয়ন করেন তাতেও দেখা যায় জাতিধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে একেশ্বরবাদিগণের একটি উপাসনালয় রূপে ব্রাহ্মসমাজকে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁদের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল।[৮] কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের এই অসাম্প্রদায়িক সার্বভৌমত্ব সত্ত্বেও এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়, রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের ধর্মানুষ্ঠানকে মুখ্যতঃ ভারতীয় এবং হিন্দু রূপ দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রাথমিক যুগের অনুষ্ঠানাদির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে আমরা দেখি, তখন সামাজিক উপাসনার মুখ্যতঃ তিনটি ভাগ ছিল: প্রথমতঃ একটি কুঠরিতে কেবল ব্রাহ্মণগণের উপস্থিতিতে বেদপাঠ; তার পরে প্রকাশ্য হলঘরে সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে উপনিষদ্ পাঠ এবং বেদান্ত ব্যাখ্যা; সর্বশেষে ব্রহ্মসংগীতের পর সভা ভঙ্গ।[৯] এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যখন প্রকাশ্যে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যাদি হত তখন সেখানে অহিন্দু সম্প্রদায়ের উপস্থিত থাকবার কোনও বাধা ছিল না। মধ্যে মধ্যে মুসলমান ও ফিরিঙ্গী বালকগণকে দিয়েও স্তবগান করানো হয়েছে এমন উল্লেখও পাওয়া যায়।[১০] ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে কিছুকাল রামমোহন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তি খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদিগণের (Unitarians) উপাসনালয়ে যাতায়াত করতেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ধর্মানুষ্ঠানবিধির পর্বগুলিকেও রামমোহন সেই অভিজ্ঞতা থেকে একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় সংঘের সামাজিক উপাসনার (Congregational Worship) বিভিন্ন অধ্যায়ের অনুকরণে সজ্জিত করেন। বাইবেল পাঠ, ব্যাখ্যা ও উপদেশ (Sermon) এবং সংগীত, খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগত উপাসনার এই ত্রিপর্বের সংশোধিত রূপ আমরা দেখি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের উপাসনাপদ্ধতির শ্রুতিপাঠ, বেদান্ত ও উপনিষদ্ ব্যাখ্যান এবং ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে। কিন্তু বহিরঙ্গের এই সাদৃশ্য ছাড়া ব্রাহ্মসমাজ ও খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ধর্মানুষ্ঠানে আর কোনও উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ছিল না। রামমোহন এবং তাঁর সহযোগিবৃন্দ ব্রাহ্মসমাজকে সম্পূর্ণ জাতীয় ঐতিহ্য অনুসারে গড়ে তুলবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই ভারতীয় শাস্ত্র এবং ভারতীয় ব্রহ্মবাদকেই তাঁরা ধর্মপ্রচারের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। সার্বভৌম একেশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এই স্পষ্ট স্বাদেশিকতা এবং জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। এই দুইএর মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান রামমোহনের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করে তাঁর স্বাজাত্যবোধের যে পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা যে তদানীন্তন কলিকাতার একেশ্বরবাদী এবং ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়দ্বয়ের বিশেষ উদ্বেগ ও বিরক্তির কারণ হয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।[১১] এই প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকারের উক্তি স্মরণীয়:[১২] "রাজা তাঁহার জীবন ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজে হিন্দুভাবে হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। তথাচ তিনি অন্য ধর্মের গৌরব সুস্পষ্ট-

ভাবে অনুভব করিতেন। সাম্প্রদায়িক পক্ষপাত তাঁহার হৃদয়কে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই।"

রামমোহনের ধর্মসাধনার এবং ধর্মসংগঠনের এই ভারতীয় ভিত্তিকে মনে রাখলে তাঁর শাস্ত্রবিচারের উদ্দেশ্য এবং প্রকৃতি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ হবে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌম একেশ্বরবাদের আদর্শ এবং সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতীয় হিন্দুসমাজকে ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের দিকে ফেরানো এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সামাজিক উপাসনায় ব্যবহারহেতু তিনি প্রধানতঃ হিন্দুশাস্ত্রকেই অবলম্বন করেছিলেন। বেদের জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ এবং পরবর্তীকালের ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা, হিন্দু মোক্ষশাস্ত্রের এই প্রস্থানত্রয়ের সূত্রেই তিনি প্রথম যুগে ব্রাহ্মসমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের শৈশবাবস্থায় 'ব্রাহ্ম' শব্দটির ব্যবহার নবগঠিত মণ্ডলীর মধ্যে যদিও ছিল, তথাপি 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম' বলে এই নূতন মত যে সমধিক পরিচিত হয়েছিল তা এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে অনুধাবনযোগ্য।[১৩] রামমোহন-রচিত গ্রন্থতালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ক আলোচনা অথবা বেদান্তসম্পর্কীয় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির সংস্করণ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। 'বেদান্তগ্রন্থ' নামক পুস্তকে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন; 'বেদান্তসার' উক্ত গ্রন্থেরই সংক্ষিপ্ত রূপ; ঈশ কেন কঠ মুণ্ডক এবং মাণ্ডুক্য, এই পাঁচখানি উপনিষৎ বাঙ্‌লা ব্যাখ্যা সমেত তিনি প্রকাশ করেছেন। শোনা যায় তিনি 'ছান্দোগ্য' এবং 'শ্বেতাশ্বতর' উপনিষদ্ দুখানিও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু এগুলি খুঁজে পাওয়া যায় নি।[১৪] তা ছাড়া তিনি সমগ্র ভগবদ্‌গীতার বাংলা পদ্যানুবাদ করেন এবং 'শারীরক মীমাংসা' শীর্ষক ব্রহ্মসূত্রের সমগ্র শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক মুদ্রিত করে প্রচার করেন। শঙ্করাচার্যের 'আত্মানাত্মবিবেক' শীর্ষক গ্রন্থখানি বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশও তাঁর অন্যতম কীর্তি। বাংলা ছাড়া দেশী বিদেশী অন্যান্য ভাষাতেও এই বিষয়ে তাঁর উদ্যম উল্লেখযোগ্য। 'বেদান্তগ্রন্থ' এবং 'বেদান্তসারের' হিন্দী অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কেন ঈশ মুণ্ডক এবং কঠ উপনিষৎ চতুষ্টয় এবং বেদান্তসার তিনি ইংরেজিতেও অনুবাদ করেন। বেদান্ত-সম্পর্কীয় তাঁর গ্রন্থ জার্মান এবং ডাচ ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। তিনি যে স্বদেশে তাঁর সমকালীন ধর্মজগতে মুখ্যতঃ বৈদান্তিক এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক রূপেই সুপরিচিত ছিলেন তা তাঁর মৃত্যুসংবাদ এ দেশে প্রচারিত হওয়ার পরে, ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ (১৯শে ফাল্গুন ১২৪০ বঙ্গাব্দ) তারিখের সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত শোকসূচক কবিতার নিম্নোদ্ধৃত দুটি পঙ্‌ক্তি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—[১৫]

'বেদান্ত শাস্ত্রের অস্ত নিতান্ত এবার।
স্তব্ধ হইয়া শব্দশাস্ত্র করে হাহাকার॥'

রামমোহনের শাস্ত্রবিচারমূলক গ্রন্থসমূহের যেগুলি এখনও প্রচলিত আছে, তা পাঠ করলে দেখা যাবে কি গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিনি বেদান্তদর্শনের আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের পূর্ববর্তী ধর্মাচার্যগণ (যথা শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ) বিভিন্ন সময়ে স্ব স্ব ধর্মমতের অনুকূলে বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করেছিলেন। এই বিষয়ে আধুনিক যুগের ধর্মাচার্য রামমোহন পূর্বসূরিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের অনুগামী। বেদান্তশাস্ত্রের ভাষ্যকার হিসাবে তিনি কোন্ মার্গ অবলম্বন করেছিলেন সে প্রশ্নের উত্তরও রামমোহনের গ্রন্থগুলি আলোচনা করলে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি যে

বৈদান্তিক পূর্বাচার্যগণের মধ্যে শঙ্করের উপরেই রামমোহনের সর্বাধিক শ্রদ্ধা ছিল। বেদান্তগ্রন্থের আরম্ভে শঙ্করের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:[১৬] "ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে সুগম করিলেন, এ বেদান্তশাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান, অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদক ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।" তিনি বাংলা ভাষায় যে কয়েকখানি উপনিষদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন, সেক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ শঙ্করাচার্যকেই অনুসরণ করেছেন, কেন ঈশ কঠ এবং মাণ্ডুক্য উপনিষৎ গ্রন্থগুলিতেও এ বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।[১৭] বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ তাঁকে শঙ্করপন্থী বলে বিদ্রূপ করলে, উত্তরে তিনি বলেছিলেন: [১৭ক] "আর আমাদের প্রতি আচার্য (অর্থাৎ শঙ্করাচার্য) মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করিয়াছেন সে আমাদের শ্লাঘ্য সুতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।" কিন্তু রামমোহনের স্বরচিত বেদান্তভাষ্য ভালো করে পড়লে দেখা যায়, তিনি অনেক বিষয়ে শঙ্করকে অনুসরণ করলেও, শেষোক্ত আচার্যের সঙ্গে তাঁর কয়েকটি বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য ছিল। ব্রহ্মের নির্গুণত্ব, স্বরূপলক্ষণের বিচার এবং কর্মকাণ্ডের নিকৃষ্টতা সম্পর্কে শঙ্কর ও রামমোহন একমত। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ এবং মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। রামমোহন বেদান্তভাষ্যকাররূপে সম্পূর্ণ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে: প্রথমতঃ তিনি ব্রহ্মোপাসনার উপর অসীম গুরুত্ব আরোপ করেছেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি স্পষ্টই উপদেশ দিয়েছেন, গৃহী বা সংসারী ব্যক্তিও পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী।[১৮] শঙ্কর-দর্শনেও সাধনার অঙ্গরূপে 'উপাসনা' স্বীকৃত; কিন্তু উপাসনা অপেক্ষা সেখানে বোধ বা জ্ঞানকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়েছে। জীবব্রহ্মের অভেদজ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যা দূর হলে তবেই সাধক তাঁর চরম লক্ষ্যস্থল মোক্ষের ভূমিতে উপনীত হতে পারেন, এই হল শঙ্করের সিদ্ধান্ত। উপাসনা এই উচ্চতম অবস্থা মানুষকে দিতে অক্ষম, কেননা উপাস্য-উপাসকের পরস্পর-সম্বন্ধ ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত (শঙ্করের ভাষায় "তত্রোপাস্যোপাসকভাবোঽপি ভেদাধিষ্ঠান এব")।[১৯] কিন্তু রামমোহন শঙ্করের মত অদ্বৈতজ্ঞানভিত্তিক মুক্তিকে ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিলেও খুব জোর দিয়েই এ কথা বলেছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই এই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের অন্তর্ভুক্ত "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্" সূত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "মোক্ষ পর্যন্ত আত্মোপাসনা করিবেক, জীবন্মুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ত্যাগ করিবেক না যে হেতু বেদে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপাসনা করিবেক এমত দেখিতেছি।[২০] 'গায়ত্রীর অর্থ' (প্রকাশকাল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'প্রার্থনাপত্র' (প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ), 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্' (প্রকাশকাল ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'ব্রহ্মোপাসনা' (প্রকাশকাল ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ), 'অনুষ্ঠান' (প্রকাশকাল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) এবং বিতরণার্থ মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র পত্রী' নামক বিভিন্ন সময়ে রচিত তাঁর পুস্তিকাগুলিতে রামমোহন 'উপাসনা' সম্পর্কে তাঁর মতামত অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন। উপাসনার প্রণালী সম্পর্কেও কঠোর শঙ্করপন্থিগণের সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। প্রথমোক্তগণের মতে উপাসনা চিত্তকে শুদ্ধ ও কলুষমুক্ত করবার নিমিত্ত চিত্তের একাগ্রতাসাধন।[২১] উচ্চতর সাধনার প্রস্তুতিরূপেই মুখ্যতঃ এর প্রয়োজন। তাঁর 'অনুষ্ঠান' নামক পুস্তিকাটিতে গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে উপাসনাপ্রণালী বর্ণনা প্রসঙ্গে রামমোহন "কাহাকে উপাসনা কহেন" শিষ্যের এই প্রশ্নের আচার্যের

মুখে উত্তর দিয়েছেন, "তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।"[২২] যদিও তিনি "পরমাত্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি স্মৃতি তন্ত্রাদির অবলম্বন দ্বারা তদর্থ যে পরমাত্মা তাঁহার চিন্তন"কে উপাসনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ মনে করতেন, তথাপি উপাস্যের ঐশ্বর্য বর্ণনাও তাঁর উপাসনা প্রণালীর অংশবিশেষ ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণীয়: "এবং অগ্নি বায়ু সূর্য ইহাঁদের হইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, ব্রীহি যব ঔষধি ও ফল মূল ইত্যাদি বস্তুর দ্বারা যে উপকার জন্মিতেছে সে সকল পরমেশ্বরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাদক শব্দের অনুশীলন ও যুক্তি দ্বারা সেই সেই অর্থের দার্ঢ্য করিবেন।"[২৩] 'ব্রহ্মোপাসনা' শীর্ষক পুস্তিকাতে তিনি "নমস্তে সতে সর্বলোকাশ্রয়ায়", বিতরণার্থ মুদ্রিত 'ক্ষুদ্র পত্রী'তে "বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণম্", এবং "শাশ্বতমভয়মশোকমদেহম্", প্রভৃতি যে স্তবগুলি সন্নিবিষ্ট করেছেন, সেগুলিকে আমরা শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ মনে করতে পারি।[২৪] তাঁর স্বকীয় উপাসনাপ্রণালীর এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা, রামমোহন পরবর্তিকালে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাপদ্ধতিতে গৃহীত উপাস্যের স্বরূপ-আরাধনার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রসঙ্গে তিনি "আরাধনা" শব্দটিও ব্যবহার করেছেন ("...তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই আপন উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন")।[২৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কঠোর শঙ্করপন্থীদের ন্যায় উপাসনাকে সম্পূর্ণ জ্ঞানমূলক মনে না করে, রামমোহন তাকে জ্ঞানাশ্রিত ভক্তির ভিত্তিতে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। শঙ্করের সঙ্গে রামমোহনের দ্বিতীয় মৌলিক পার্থক্য, ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারসমস্যা নিয়ে। শঙ্করের মতে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। কিন্তু রামমোহন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, সংসারী গৃহস্থেরও পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার আছে:[২৬] "যদি কহ আত্মার উপাসনা শাস্ত্রবিহিত বটে এবং দেবতাদের উপাসনাও শাস্ত্রসম্মত হয়, কিন্তু আত্মার উপাসনা সন্ন্যাসীর কর্তব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেরো কর্তব্য হয়। তাহার উত্তর। এইরূপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পারিবে না। যেহেতু বেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে আর মনু প্রভৃতি স্মৃতিতে গৃহস্থেরো আত্মোপাসনা কর্তব্য এরূপ অনেক প্রমাণ আছে·· ·কেবল সন্ন্যাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এমৎ নহে কিন্তু এরূপ গৃহস্থেরো মুক্তি হয়।"

উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল, শঙ্করের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তত্ত্বসিদ্ধান্তে নির্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী হলেও, বৈদান্তিক হিসাবে রামমোহনের কতগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। উপাসনার প্রাধান্য স্বীকৃতি এবং বিশিষ্ট উপাসনাপ্রণালীর উদ্ভাবনের দ্বারা তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ উঠতে পারে, কোন্ প্রভাবের ফলে তাঁর এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর গঠন সম্ভব হয়েছিল। এ দেশের শঙ্করোত্তর কালের বেদান্তাচার্যগণের মধ্যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে যে এমন সমন্বয়ের আভাস দেখা না গিয়েছে তা নয়। শ্রীধর (খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক ?) বিষ্ণুপুরাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তাঁর সুবিখ্যাত টীকাত্রয়ে শঙ্করের সমস্ত সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে ভক্তিই অদ্বৈতমুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। স্বয়ং চৈতন্যদেবের গুরুপরম্পরার মধ্যে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং কেশব ভারতীও এই প্রকার ভক্তিবাদী শঙ্করপন্থী ছিলেন এমন কথা মনে করবার কারণ আছে।[২৭] এ ছাড়া চতুর্দশ শতকে বিদ্যারণ্য ষোড়শ শতকে মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতিগণও শঙ্করমতের মধ্যে উপাসনা ও ভক্তিকে যথেষ্ট

প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য যেন রামমোহনের মতের প্রতিধ্বনি করেই বলেছেন: "উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; অতএব জ্ঞানব্যতিরেকে মুক্তির আর উপায়ান্তর নেই, শাস্ত্রের এই উক্তির সঙ্গে উপাসনার কোনও বিরোধ নেই।"[২৮] উপরি-উক্ত বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে রামমোহন শ্রীধরস্বামীর রচনাবলীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন এবং তিনি এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন যে স্বয়ং চৈতন্যদেব কর্তৃক শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত শ্রীধর, চৈতন্যগুরু কেশব ভারতী প্রভৃতি ভক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও শঙ্করের অনুবর্তী ছিলেন। তর্কপ্রসঙ্গে তাঁর বৈষ্ণব-প্রতিপক্ষকে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন:[২৯] "যদ্যপিও ভগবান্ আচার্যের কৃত ভাষ্যকে মোহের নিমিত্ত করিয়া কহা সকলেরি দুষ্কৃতের কারণ হয় তথাপি বিশেষ করিয়া চৈতন্যদেব সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগ্যের অত্যন্ত অপরাধজনক হইবেক, যেহেতু পূজ্যপাদ ভগবান ভাষ্যকারের শিষ্যানুশিষ্য প্রণালীতে কেশব ভারতী ছিলেন, সেই কেশব ভারতীর শিষ্য চৈতন্যদেব হয়েন, আর শ্রীধরস্বামীও পূজ্যপাদ সম্প্রদায়ের শিষ্যশ্রেণীতে ছিলেন, তাঁহার কৃত গীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কি অন্য সম্প্রদায়ে সর্বথা মান্য, এবং চৈতন্যদেবও ঐ টীকাকে মান্য করিয়াছেন, আর সেই শ্রীধর স্বামী স্বয়ং গীতার টীকাতে লিখেন যে ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা, ইত্যাদি।· ·এবং শ্রীভাগবতের টীকাতেও লিখেন যে, সম্প্রদায়ানুসারেণ পূর্বাপর্যানুসারত ইত্যাদি। অতএব ভগবান আচার্যের মত মোহের কারণ হয় এমৎ কহিলে চৈতন্যদেব ও শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি সেই সম্প্রদায়ের সন্যাসীদিগ্যে মুগ্ধ করিয়া স্বীকার করিতে হইবেক এবং আচার্যমতানুসারে যে সকল শ্রীধরস্বামীর টীকা তাহারি বা কি প্রকারে মান্যতা হইতে পারে, অতএব আচার্যের নিন্দা করাতে এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবদিগ্যের ধর্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়।" কিন্তু নিজধর্মমতের বিবর্তনে বৈষ্ণব চিন্তাধারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। সাম্প্রদায়িক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত কোনও আকারেই তাঁর পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, কেননা তার মধ্যে সাকারোপাসনার প্রাধান্য অত্যধিক, এবং চৈতন্যদেবের অবতারত্ব স্বীকৃত। রামমোহন সাকারোপাসনা ও অবতারবাদ, দুইএরই ঘোর বিরোধী ছিলেন। অপরপক্ষে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ঈশ্বরের রূপকল্পনা বা লীলাবর্ণনার কোনও রূপক ব্যাখ্যা করাও সম্ভব ছিল না কেননা সে মত অনুযায়ী সব লীলাই নিত্য।[৩০] শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র রায় মহাশয় দেখিয়েছেন শঙ্কর ভিন্ন অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে রামমোহন ভক্তিবাদী মধ্বের মতামত যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন।[৩১] কিন্তু মধ্বমত তিনি গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; কেননা তত্ত্বসিদ্ধান্তে মধ্ব ছিলেন বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদী। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচারের অন্তর্গত দ্বিতীয় প্রত্যুত্তরপ্রসঙ্গে রামমোহন অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মধ্বমতের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন।[৩২] রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত-সিদ্ধান্তও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, কেননা তিনি স্বয়ং ছিলেন নির্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী। তা ছাড়া রামানুজ সাকার বিষ্ণূপাসনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তা রামমোহনের মনঃপূত হবার কথা নয়।[৩৩] অপরপক্ষে নিজরচনার মধ্যে বিদ্যারণ্য, মধুসূদন প্রভৃতি জ্ঞানভক্তির সমন্বয়-কারক অদ্বৈতিগণকে অনুসরণ করতেও তাঁকে দেখা যায় না। সুতরাং পূর্ণ অদ্বৈতবাদী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যটুকু কোন্ প্রভাবের ফলে সঞ্জাত, এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। রামমোহনের শাস্ত্রালোচনামূলক গ্রন্থগুলি অনুশীলন করলে স্বভাবতঃ প্রতীতি জন্মায় তাঁর আলোচ্য মনোভাব গঠনে অনেকাংশে সহায়ক হয়েছিল ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র।

সাধারণ অর্থে তন্ত্র বলতে যে কোনও শাস্ত্রকে বোঝালেও এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। "উপাসনাবিশেষ প্রতিপাদক শাস্ত্রবিশেষ" অর্থে শব্দটি আমরা সচরাচর ব্যবহার করে থাকি।[৩৪] তন্ত্র ভারতীয় চিন্তাধারার একটি বিশিষ্ট বিকাশ। এর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে, যে সবের আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে সাধারণ ভাবে এই চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুচারটি কথা বলা যেতে পারে। পণ্ডিতগণের মতে তন্ত্রের অনেকটাই মূলতঃ এসেছে অবৈদিক অনার্য চিন্তাধারা ও আচার-অনুষ্ঠানের থেকে। এর আলোচ্য বিষয়কে প্রধানতঃ দুই ভাগ করা যায়: (১) দর্শন (২) ক্রিয়া। পরবর্তী যুগে অবশ্য এই ভাবধারা আর্য সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করে ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। হিন্দুধর্মের বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীপূজা বা অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্রের দ্বারা অতি গভীর ভাবে প্রভাবিত।[৩৫] উপাস্য দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতির বিভেদ অনুসারে তান্ত্রিক উপাসকগণ বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত, যথা শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, সৌর গাণপত্য স্বায়ম্ভুব কালমুখ প্রভৃতি। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত শৈবশাক্ত মতবাদের মধ্যে আবার দিব্য বীর পশু বাম চীন দক্ষিণ সময়, কুল প্রভৃতি বিভিন্ন আচার বা উপাসনাপদ্ধতির সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৬] তান্ত্রিক পূজা ও সাধনপদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে কতগুলি অর্থহীন ও নীতিমার্গের পরিপন্থী আচার ও ক্রিয়ার সমষ্টি ব'লে সাধারণের কাছে প্রতীয়মান হলেও, এগুলিই তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের সব নয়। তন্ত্রের একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে উক্ত দর্শনের সঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তের কোনও সিদ্ধান্তগত প্রভেদ নেই। তন্ত্র বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদকে গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করেছে। এ সম্পর্কে কুলার্ণব তন্ত্রের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটির মধ্যে তন্ত্রের বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাবে:[৩৭]

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্যাদাত্মচিন্তনম্।
স সর্বং পাতকং হন্যাত্তমঃ সূর্যোদয়ো যথা॥

তন্ত্রদর্শনের এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করেই অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দর্শন সম্পর্কে বলেছেন:[৩৮] "The monistic philosophy of the Vedanta forms its backbone and we see that *Brahman* is regarded as the only true Principle in the world." কিন্তু কেবলমাত্র তন্ত্রধর্মের তত্ত্বসিদ্ধান্তই নয়, তন্ত্রের পূজাপদ্ধতি পর্যন্ত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত। এ সম্পর্কে অপর একজন তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের মতামত কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:[৩৯] "The Tantra form of worship also serves as a course of practical training for the realization of the Vedanta ideal of the identity of the finite with the Infinite, of the individual soul with the Supreme Soul. The various parts of this worship—*Bhutasuddhi* and the different Nyasas—all aim at this realization. The worshipper has to conceive his body as the seat of the deity at the time of offering worship. On the occasion of 'internal worship' (antaryaga) which is the ideal and more preferable from of worship, this process is carried a step further. Here the worshipper has to make attempts to realize the identity of the deity not only with himself but also with all the objects of

worship. It would thus appear that in spite of the differences in doctrinal details the Tantras had the same ideal in view as the Vedanta." তত্ত্বগতভাবে বেদান্ত এবং তন্ত্রের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হলেও, তন্ত্র যে ক্ষেত্রে নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছে তা হল উপাসনা। শাঙ্কর বেদান্তে উপাসনার স্থান যে খুব উচ্চে নয় এ আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। মুখ্যতঃ চিত্তশুদ্ধির জন্যই সেখানে এর প্রয়োজন স্বীকৃত। কিন্তু তন্ত্রে ব্রহ্ম বৈষ্ণবধর্মের পরমেশ্বরের মতই উপাস্য এবং আরাধ্য এবং এই অর্থে ব্রহ্মোপাসনা তান্ত্রিক ধর্মসাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। মহানির্বাণ তন্ত্রে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে :[৪০]

ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে।

"মুক্তিলাভের নিমিত্ত সেই ব্রহ্ম বিনা ধ্যেয়, পূজ্য এবং সুখারাধ্য অন্য কেউ নেই।" এই ব্রহ্মোপাসনাকে আশ্রয় করেই ভক্তি তন্ত্রসাধনায় অতি উচ্চ আসন লাভ করেছে। কুলার্ণবে বলা হয়েছে :[৪১]

ভজনাৎ পরয়া ভক্ত্যা মনোবাক্‌কায়কর্মভিঃ।
তরত্যখিলদুঃখানি তস্মাদ্‌ভক্ত ইতীরিতঃ॥

সুতরাং অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিক সাধক তাঁর সাধনা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞান ভক্তির যে সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছেন কঠোর শঙ্করপন্থী অদ্বৈতিগণের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। (অবশ্য শঙ্করোত্তর কালে অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়ের প্রয়াস হয়েছিল; সে কথার উল্লেখ পূর্বে করেছি। সে প্রসঙ্গ এখানে তুলছি না।)

সাধনপ্রণালীর ক্ষেত্রেও বেদান্ত এবং তন্ত্রের মধ্যে একটি মৌলিক প্রভেদ আছে। বেদান্ত সংসারকে, পার্থিব জীবনের সুখদুঃখকে অসার জ্ঞান করে, সংসারবিমুখ হয়ে মোক্ষসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে সাধককে উপদেশ দেয়। কিন্তু তন্ত্রোক্ত পঞ্চ 'ম'কার সাধন, ষট্‌কর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তন্ত্রশাস্ত্র এই সংসারকে এবং মানুষের ব্যাবহারিক জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে। মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক ভোগবাসনানিচয়কে মোক্ষের পথে চরম বিঘ্ন জ্ঞান করে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে, উক্ত প্রবৃত্তিসমূহকে আশ্রয়পূর্বক সেগুলির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করা তন্ত্রসাধনার প্রধান লক্ষ্য। সেইজন্য বেদান্তের জীবনবিমুখতায় স্থলে তন্ত্রে আমরা দেখি এক বলিষ্ঠ জীবন-স্বীকৃতি, যদিচ উভয়ের মূল উদ্দেশ্য এক। জনৈক সনাতনপন্থী তান্ত্রিক পণ্ডিত বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিদ্বয়ের এই পার্থক্য সম্পর্কে যথার্থ বলেছেন :[৪২] "··বৈদিক সাধকের ন্যায় তান্ত্রিক সাধককে সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক সাধকগণ স্ত্রী পুত্র, মিত্র ভৃত্য পরিজনময় সংসারের যে ঘৃণিত বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা শুনিলে স্বাভাবিক পুরুষেরও ঘৃণার উদ্রেক হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই যে তান্ত্রিক সাধকগণ সেই সংসারেই ব্রহ্মানন্দ-তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণপ্রক্রিয়াকেই প্রত্যক্ষরূপে সাধনার সোপান-পরম্পরা বলিয়া··দেখাইয়া দিতেছেন··তান্ত্রিক সাধক··পঙ্কে ডুবিয়াও পঙ্কবিহারী মৎস্যের ন্যায় নিত্যনির্লিপ্ত।"

সামাজিক ক্ষেত্রেও তন্ত্রমত বেদ-বেদান্ত অপেক্ষা বহুগুণে উদার ও প্রগতিশীল। প্রাচীন যুগে যেমনই হোক পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির সামাজিক দৃষ্টি ছিল অনুদার ও সংকীর্ণ। নারী ও শূদ্রের বেদাধ্যয়ন এমনকি বেদ-শ্রবণের উপরেও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছিল। ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে, এমন বিধান স্বীকার করে নিতেও ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ এতটুকু দ্বিধা করে নি। হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রই বোধ

করি সর্বপ্রথম এই কৃত্রিম বিধিনিষেধের বেড়ি ভাঙবার জন্য এগিয়ে আসে আচণ্ডাল স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মন্ত্রদীক্ষার অধিকার প্রসারিত করে। গৌতমীয় তন্ত্রের আরম্ভেই দেখা যায় ঋষি গৌতম বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেছেন— "যে মন্ত্র সর্বপ্রকার ফলদাতা অথচ সকলের বন্ধু, এবং যে মন্ত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকার এবং যে মন্ত্র নারীদেরও যোগ্য, ভগবন্,সর্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই মন্ত্র আমাকে বলুন"।[৪৩] মহানির্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টতঃ চণ্ডাল এবং যবনদের পর্যন্ত সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে।[৪৪] ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই বিস্ময়কর সমদৃষ্টি তন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রামমোহনের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রধর্মের দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হবার দুটি সম্ভাব্য সূত্র ছিল। প্রথমতঃ তাঁর মাতৃবংশ ছিলেন শাক্ত তান্ত্রিক এবং শৈশবে রামমোহন তাঁর মাতামহ ঘোর তান্ত্রিক শ্যাম ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। অবশ্য এই সংযোগ শিশু রামমোহনের মনের গঠনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা সঠিক জানবার উপায় নেই, তবে তান্ত্রিক মহলে পরবর্তীকালে এই যোগাযোগের উপর খানিকটা গুরুত্ব যে আরোপ করা হত, তা এই সম্পর্কে প্রচলিত দুএকটি কিংবদন্তী থেকেই বুঝতে পারা যায়।[৪৫] মাতামহের এবং মাতৃবংশের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত যেমনই হোক, এ কথা সুনিশ্চিত যে রামমোহন তন্ত্রমতের দ্বারা গভীর রূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন সুবিখ্যাত কৌল তান্ত্রিক সাধক ও সন্ন্যাসী হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধূতের সঙ্গে তাঁর আজীবন অন্তরঙ্গতার ফলে। রামমোহনের চোদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁর সঙ্গে হরিহরানন্দের প্রথম পরিচয় হয়, এবং তা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে আজীবন স্থায়ী হয়। ইনি রংপুরে, এবং পরে রামমোহন কলিকাতার স্থায়ী অধিবাসী হলে, কলিকাতায়, রামমোহনের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে ইনি সুবিখ্যাত কুলার্ণব তন্ত্র প্রকাশ করেন এবং মহানির্বাণ তন্ত্রের সম্বন্ধে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন। রামমোহন এঁর কাছে তন্ত্রশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন।[৪৬] কেউ কেউ বলেছেন হরিহরানন্দ রামমোহনের গুরু ও ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে মনে রাখা উচিত যে গোবিন্দপ্রসাদ রায় বনাম রামমোহন রায় শীর্ষক বৈষয়িক মামলায় রামমোহনের পক্ষ হয়ে সুপ্রীম কোর্টের সম্মুখে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে হরিহরানন্দ রামমোহনের সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার উল্লেখ করলেও রামমোহনকে তাঁর শিষ্য বলে অভিহিত করেন নি। কিন্তু তিনি ঐ প্রসঙ্গে সাধারণভাবে তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের কথা বলেছেন।[৪৭] অবশ্য প্রচলিত অর্থে হরিহরানন্দ, রামমোহনের গুরু হয়ে থাকুন বা না হয়ে থাকুন, রামমোহন যে তাঁকে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও মান্য করতেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কলিকাতায় বাসকালে হরিহরানন্দ রামমোহনের মানিকতলার বাড়িতেই থাকতেন এবং রামমোহন- প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার অধিবেশনে যোগ দিতেন। রামমোহনের চিন্তাধারা ও কার্যাবলীর উপর তাই হরিহরানন্দের সান্নিধ্যহেতু তন্ত্রমতের প্রভাব বিস্তীর্ণ হবার একটি বিশেষ সুযোগ ছিল।

রামমোহনের বিচারগ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্বক অধ্যয়ন করলে তাঁর তন্ত্রশাস্ত্রালোচনার একটি সমগ্র রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে। দেখা যাবে এগুলির মধ্যে তিনি সর্বসমেত উনিশখানি তন্ত্র বা তন্ত্রজাতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং সেসবের অধিকাংশ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যথা, (১) কুলার্ণব তন্ত্র (৩৪ বার)[৪৮] ; (২) মহানির্বাণ তন্ত্র (২২ বার)[৪৯] ; (৩) তন্ত্রসার (৪ বার)[৫০] ; (৪) নির্বাণতন্ত্র (৭ বার)[৫১] ; (৫) কুলাবলী (কৌলাবলী) তন্ত্র (২ বার)[৫২] ; (৬) কুলার্চনচন্দ্রিকা (২ বার)[৫৩] ; (৭) কুলতন্ত্র (৩ বার)[৫৪] ; (৮) কুলার্চনদীপিকা (৬ বার)[৫৫] ; (৯) কুব্জিকা তন্ত্র (১ বার)[৫৬] ; (১০) সময়াতন্ত্র (২ বার)[৫৭] ; (১১) কামাখ্যা তন্ত্র (২ বার)[৫৮] ; (১২) নিরুত্তর

তন্ত্র (১ বার)[৫৯]; (১৩) কালীবিলাস তন্ত্র (১ বার)[৬০]; (১৪) কালীকল্পলতা (২ বার)[৬১]; (১৫) অনন্তসংহিতা (২ বার)[৬২]; (১৬) তন্ত্ররত্নাকর (২ বার)[৬৩]; (১৭) কালিকোপনিষৎ (২ বার)[৬৪]; (১৮) দেবীমাহাত্ম্য (৩ বার)[৬৫]; (১৯) সিদ্ধলহরী তন্ত্র (২ বার)[৬৬]। এই সম্পূর্ণ গাণিতিক হিসাব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় রামমোহন বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত শৈবশাক্ত মতের অন্তর্গত কৌল তান্ত্রিক সাহিত্যই বিশেষরূপে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর মাতৃকুল ছিলেন শাক্ত; এবং তাঁর তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী স্বয়ং ছিলেন বামাচারী কৌল সন্ন্যাসী। এই দুটি কথা মনে রাখলে কৌল সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই প্রবণতা অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দিব্যাচার পশ্বাচার বামাচার সময়াচার দক্ষিণাচার প্রভৃতি বিভিন্ন উপাসনাপদ্ধতির যে তিনি খবর রাখতেন, তা তাঁর সময়াতন্ত্রের এবং রচনাবলীর বিভিন্নস্থানে উপরি উক্ত অন্যান্য বিধিগুলির উল্লেখ থেকেই প্রমাণিত হয়।[৬৭] তন্ত্রমত যে বাংলাদেশে বহুলপ্রচলিত এ সম্পর্কেও রামমোহন সচেতন ছিলেন, কেননা 'পথ্যপ্রদান' গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন[৬৮]: "তন্ত্রমতবিমুখ ব্যক্তি প্রায় এ দেশে অপ্রাপ্য।"

এর পরে স্বভাবতঃ প্রশ্ন উঠবে রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রকে কি দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। তিনি প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র মেনেছেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাদেশবাদ স্বীকারের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁর সার্বভৌম একেশ্বরবাদের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে তিনি দেশকালনিরপেক্ষভাবে শাস্ত্রমাত্রেরই ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক অংশকে প্রত্যাদিষ্ট বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সঙ্গে বিচারে তাঁকে ব্রহ্মণ্যশ্রুতির, খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের সঙ্গে তর্কে বাইবেলের এবং মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের আলোচনাপ্রসঙ্গে কোর্-আনের অভ্রান্ততা মূলতঃ স্বীকার করে নিতে দেখা যায়। এই দৃষ্টি থেকে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রকেও আপ্তশাস্ত্র মনে করতেন, তবে এ কথাও তিনি তাঁর রচনাতে স্পষ্ট বলেছেন, পুরাণ ও তন্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদক অংশই প্রকৃত প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্র, অন্যান্য অংশ সমূহে যেখানে সাকার দেবতার ও সাকার উপাসনাবিধির উল্লেখ আছে তা অশক্ত ও নিম্ন অধিকারিগণের জন্য রচিত।[৬৯] এই অর্থে রামমোহন পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও এগুলিকে তিনি শাস্ত্র হিসাবে বেদের ন্যায় উচ্চস্থান দেন নি। তাঁর ভাষায়[৭০]: "···হিন্দুদের পুরাণতন্ত্রাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ নহেন, বেদের সহিত পুরাণাদির অনৈক্য হইলে ঐ পুরাণাদির বচন অগ্রাহ্য হয়।" সুতরাং তন্ত্রপুরাণাদির অংশবিশেষ আপ্তশাস্ত্ররূপে শ্রদ্ধেয় হলেও রামমোহনের মতে বেদ-উপনিষদের স্থান তদপেক্ষা অনেক উচ্চে। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় শাস্ত্রের প্রত্যাদিষ্টত্ব সম্পর্কে রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গীর স্পষ্টতঃ দুটি স্তর আছে।

তন্ত্রমত সুপ্রাচীন হলেও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচলিত গ্রন্থগুলি প্রায় কোনোটিই খুব প্রাচীন নয়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও যে অনেক তন্ত্রগ্রন্থ যে রচিত হয়েছে তা সেগুলির ভাষা বা বিষয়বস্তুর বিচার করলে ধরা পড়ে। এই জন্য তন্ত্রসম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিবর্গের একটি দুরূহ সমস্যা হল, আলোচ্য তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য নির্ণয়। রামমোহনকেও শাস্ত্রবিচার-প্রসঙ্গে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আলোচ্য কোনও তন্ত্রগ্রন্থের প্রামাণ্য নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি যে দুটি মানদণ্ড নির্ধারণ করেছিলেন তা এই: (১) গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টীকা থাকবে; (২) দ্বিতীয় লক্ষণ, তার বচন নিবন্ধাদি সংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত থাকবে ("···তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই···এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে যে পুরাণ ও তন্ত্রাদি টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য···অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা আছে···অতএব সটীক কিংবা

মহাজনধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন")।[৭১] আশ্চর্যের বিষয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে শাস্ত্রের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য নির্ণয়ের যে দুটি উপায় আধুনিক পণ্ডিত ও গবেষকগণ অবলম্বন করে থাকেন, সনাতন পদ্ধতিতে শাস্ত্রশিক্ষা করেও অপূর্ব মনীষাবলে রামমোহন এক শতাব্দীরও অধিককাল পূর্বে তা উদ্ভাবন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিচারে রামমোহনের প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন চৈতন্যদেবের অবতারত্ব প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে 'অনন্তসংহিতা' নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করলে, রামমোহন উপরি-উক্ত আদর্শের মাপকাঠিতে 'অনন্তসংহিতা'কে প্রামাণ্যহীন অর্বাচীন গ্রন্থ ঘোষণা করেন এবং এই উপলক্ষে কতকটা কৌতুকের বশবর্তী হয়েই দেখান যে ঠিক অনুরূপ একখানি অর্বাচীন গ্রন্থ তন্ত্ররত্নাকরের ভিত্তিতে চৈতন্যসম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করাও চলে, কিন্তু সেরূপ দুর্বল প্রমাণ ব্যবহার করা পণ্ডিতজনোচিত নয় ("এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা নাই এ সকল বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে এ নিমিত্ত আমাদের এবং তাবৎ পণ্ডিতদের নিয়মানুসারে এ সকল বচনকে লিখিতে বাসনা ছিলনা…")।[৭২]

নিজ শাস্ত্রালোচনায় ব্যবহৃত প্রায় সমস্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলির প্রামাণ্যবিচারে উক্ত কঠোর মানদণ্ড যদিও রামমোহন প্রয়োগ করেছিলেন, তথাপি আপাতদৃষ্টিতে এর একটি ব্যতিক্রম ছিল বলে মনে হয়। তা হল মহানির্বাণ তন্ত্র। বর্তমান আকারে এই বহুলপ্রচলিত গ্রন্থটিকে খুব প্রাচীন বলে মনে হয় না, এর খুব পুরাতন পুঁথিও পাওয়া যায় নি। কোনও প্রসিদ্ধ নিবন্ধগ্রন্থে এর থেকে কোনও উদ্ধৃতি আছে, এমন কথাও আমাদের জানা নেই। তথাপি রামমোহন অতি যত্নসহকারে এবং পরম শ্রদ্ধা নিয়ে গ্রন্থখানি যে পাঠ করেছিলেন এবং এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর্থার অ্যাভেলন (স্বর্গীয় স্যার্ জন উড্‌রফ্) তৎসম্পাদিত মহানির্বাণ তন্ত্রের ভূমিকায় এ বিষয়ে লিখেছেন[৭৩]: "The Tantra has been subject of commentary by Hariharananda. The manuscript of the commentary which is with the editor, is almost entirely in the Raja's handwriting. In the beginning of each chapter of the commentary the Raja writes "Om namo Brahmane" and in the beginning of the commentary to the 9th chapter there is in addition to the above, the following invocation 'Shri-shri-natha-padambhoje niyatam matirastu me.' মহানির্বাণ তন্ত্রকে রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং এই গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ টীকা রচনা করেন, এবং কেউ কেউ এ রকম ইঙ্গিতও করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত এই মূল গ্রন্থখানিই হরিহরানন্দের রচিত অথবা তাঁর দ্বারা পরিমার্জিত। শেষোক্ত মত সত্য কিনা তা সুনিশ্চিতভাবে বলবার উপায় নেই, কিন্তু গ্রন্থখানি যে প্রাচীন নয় এ কথা সম্ভবতঃ ঠিক। হয়তো বা হরিহরানন্দ এবং তাঁর রচিত টীকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ রামমোহন এই গ্রন্থখানির প্রামাণ্যনির্ণয়ের ব্যাপারে তাঁর প্রখর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে এইটুকু মনে রাখা যেতে পারে, রামমোহনের প্রতিপক্ষীয় কোনও পণ্ডিত সেযুগে মহানির্বাণ তন্ত্রের বিরুদ্ধে আধুনিকত্বের অভিযোগ আনেন নি। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অভিযোগ করেছিলেন রামমোহন মাত্র কুলার্ণব ও মহানির্বাণের বচনের উপর নির্ভর করেছেন এবং এ দুটির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য, কেননা তা শ্রুতিস্মৃতি ও অপর তন্ত্রাদির বক্তব্যের বিরোধী।[৭৪] এর উত্তরে রামমোহন নানা প্রমাণ উপস্থিত করে দেখান যে কুলার্ণব ও মহানির্বাণ

এই কৌল আগমদ্বয়ের শিক্ষা শ্রুতিবিরোধী নয়, স্থতরাং এ দুটি সদাগম।[৭৫] তাঁর পক্ষে আরও বলবার ছিল যে তিনি এ দুটি ছাড়া অন্য তন্ত্রগ্রন্থের বচনও যথেষ্ট উদ্ধৃত করেছেন। যাই হোক এই তর্ক মহানির্বাণ তন্ত্রের আধুনিকতার প্রশ্নসংক্রান্ত নয়।

তন্ত্রের প্রভাব রামমোহনের জীবনে পড়েছিল, দুটি ক্ষেত্রে— তাঁর চিন্তায় এবং তাঁর কর্মে। অন্যান্য শাস্ত্রের মত তন্ত্রের ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক অংশকেই রামমোহন প্রত্যাদিষ্ট বলে মান্য করতেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতীকোপাসনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তান্ত্রিক মন্ত্র ও ক্রিয়ানুষ্ঠানের যে বিপুল অংশ বিদ্যমান, সেই সাম্প্রদায়িক ও সাকার তন্ত্রোপাসনাকে তিনি গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তন্ত্রোক্ত মারণ উচাটন বশীকরণ ইত্যাদি তথাকথিত কার্যে সিদ্ধিপ্রদ ষট্‌কর্মকে ও তিনি শ্রদ্ধা বা সেসবে বিশ্বাস করতেন বলে মনে হয় না।[৭৬] তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন প্রথমতঃ এই কারণে যে তার মধ্যে তিনি তাঁর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। খুব দৃঢ়ভাবেই এ কথা তিনি একাধিক স্থানে বলেছেন, যেমন[৭৭]: "শিষ্টপরিগৃহীতপ্রসিদ্ধাগমোক্তাত্মতত্ত্বশ্রবণমননাদের্নিঃশ্রেয়সাবাপ্তি-রৈকান্তিকীতি পরমারাধ্যস্য মহেশ্বরস্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপি সফলাসীৎ॥ আত্মানাত্মনোঃ সত্যানৃতত্বে প্রদর্শয়ন্তো লোকানাত্মশ্রবণমননিদিধ্যাসনেষু প্রবর্ত্তয়ন্তো বেদান্তগ্রথিতশব্দা যথা নিঃশ্রেয়সহেতবো ভবন্তি তথৈব তমেবার্থং প্রবদতাং স্মৃত্যাগমপ্রভৃতীনাং তত্তচ্ছ্রোতৃভ্যো নিঃশ্রেয়সপ্রদাতৃত্বং যুক্তম্‌…।" কিন্তু এ ছাড়া তন্ত্র থেকে বিশেষ ভাবে তিনি যে তত্ত্ব লাভ করেছিলেন, তা হল ব্রহ্মোপাসনা। শাঙ্কর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভক্তিভাবের মিশ্রণ বৈদান্তিকরূপে রামমোহনের বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রের উপাসনাতত্ত্বের প্রভাবেই রামমোহনের চিন্তাধারা এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছিল। তাঁর ভক্তিতত্ত্ব রামমোহন আহরণ করেছিলেন, বৈষ্ণব শাস্ত্র থেকে নয়, তন্ত্রশাস্ত্র থেকে। ব্রহ্মোপাসনা শীর্ষক পুস্তিকাতে তিনি মহানির্বাণ তন্ত্র থেকে যে ব্রহ্মস্তোত্রটি তাঁর উপাসনা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়।[৭৮] তাছাড়া গায়ত্রীর অর্থ নামক পুস্তিকাতে ব্রহ্মোপাসনাপ্রসঙ্গে তিনি বার বার তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন।[৭৯] তাঁর উপাসনাপদ্ধতিতে রামমোহন বৈদিক গায়ত্রী মন্ত্রকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন এবং একাধিক স্থলে তিনি এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে এর দ্বারা ব্যক্তিগত উপাসনা নির্বাহ করবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন[৮০]। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে তন্ত্রশাস্ত্রে গায়ত্রীর স্থান অতিশয় উচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ। শ্রুতিসম্মত হিন্দুধর্মীয় পূজাদিতে যেমন উত্তরকালে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দেখা যায়, তেমনি তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্মেও কিছু কিছু বেদমন্ত্রাদি ক্রমশ প্রবেশলাভ করে[৮১]। এই জাতীয় বেদমন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী তন্ত্রশাস্ত্রে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তন্ত্রোক্ত বহু দেবতার নামের সঙ্গে এই মন্ত্র যুক্ত হয়ে, তা নানা সাম্প্রদায়িক রূপ ধারণ করে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁর তন্ত্রসার গ্রন্থে এই প্রকার বিভিন্ন দেবতার নাম সংযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন[৮২]। গায়ত্রী মন্ত্রের মাহাত্ম্যসূচক 'গায়ত্রী তন্ত্র' শীর্ষক একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ ও বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, মহানির্বাণ তন্ত্রে গায়ত্রীকে ব্রহ্মমন্ত্র বলা হয়েছে এবং এই মন্ত্রদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করবার বিধান দেওয়া হয়েছে এবং রামমোহন তাঁর "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানম্‌" গ্রন্থে নানা শ্রুতিস্মৃতি আলোচনার পর মহানির্বাণতন্ত্রের মত বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত করে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন[৮৩]। এ কথা না মেনে উপায় নেই, তন্ত্রশাস্ত্রালোচনার ফলে এই বেদমন্ত্রটির প্রতি রামমোহনের আস্থা ও শ্রদ্ধা বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই, যে বিশিষ্ট

ব্রহ্মোপাসনা-তত্ত্ব তিনি তন্ত্রের ভাবধারা অনুশীলনের ফলে লাভ করেছিলেন, তার মধ্যে গায়ত্রীকে তিনি এত উচ্চ আসন দিয়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ, অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হওয়া সত্ত্বেও যে সন্ন্যাসবিরোধী মনোভাব রামমোহনের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাও অনেকাংশে তান্ত্রিক প্রভাবের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এমন মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সংসারকে তার সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনা বাধা প্রলোভন সমেত সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে যাওয়া যে তন্ত্রসাধনার লক্ষ্য তা আমরা পূর্বে দেখেছি। কুলার্ণব তন্ত্রে এই আদর্শটিকে অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করা হয়েছে[৮৪] :

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ পাতকং সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে চ সংসারঃ কুলধর্মে কুলেশ্বরি ॥

.. .. ..

মৃত্যুর্বৈদ্যায়তে দেবি সাক্ষাৎ স্বর্গায়তে গৃহম্।
স্বর্গঃ সাক্ষাদ্ গৃহায়তে কৌলিকানাং কুলেশ্বরি ॥

মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ সকল বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে গার্হস্থ্যধর্মকে "সকল মানবের আদি এবং ধর্মজনক" বলে অভিহিত করা হয়েছে[৮৫]। এই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই ছিল রামমোহনের আদর্শ। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকাও তিনি প্রণয়ন করেন। এই পুস্তিকায় অবশ্য তন্ত্রগ্রন্থ থেকে কোনও উদ্ধৃতি নেই, প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্য ও মনুস্মৃতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা সাধারণভাবে ধরে নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে, যে রামমোহন তার বলিষ্ঠ জীবন-স্বীকৃতির অনুপ্রেরণা অনেকপরিমাণে তন্ত্রদর্শন থেকে পেয়েছিলেন। গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূল সূত্র এখানেই খুঁজতে হবে।

ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরোপাসনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বজনীন উদারদৃষ্টির জন্যও যে কতকাংশে রামমোহন তান্ত্রিক ভাবধারার নিকট ঋণী, এ কথাও অস্বীকার করা যায় না। দেশজাতিধর্ম নির্বিশেষে ব্রহ্মোপাসকগণের জন্য একটি সার্বজনীন উপাসনালয় স্থাপন করা রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মসমাজ সেই আদর্শেরই রূপায়ন। ব্রাহ্মসমাজের ট্রাস্টডীডে এই আদর্শের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সমাজগৃহ "to be used occupied enjoyed, applied and appropriated as and for a place of public meeting of all sorts and descriptions of peoples without distinction as shall behave and conduct themselves in an orderly sober, religious and devout manner for the worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and Immutable Being· ·" আমরা পূর্বে দেখেছি, রামমোহন-কর্তৃক আলোচিত শাস্ত্রাদির মধ্যে এক তন্ত্রেই ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকল বর্ণ, নারী এমন কি যবন পর্যন্ত সকলেরই পূর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক ও বৈদান্তিক ঐতিহ্যে এ জাতীয় সমদৃষ্টির একান্ত অভাব। সুতরাং এ ক্ষেত্রে রামমোহনের চিন্তাধারার উপর তন্ত্রমতের প্রভাব সম্পর্কে আমরা সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহ হতে পারি। এই প্রসঙ্গে রামমোহন ও তাঁর উপাসকমণ্ডলীর প্রতি প্রযুক্ত 'ব্রাহ্মসমাজ' নামের অন্তর্গত "ব্রাহ্ম" বিশেষণটির উৎপত্তি সম্পর্কে দুএকটি কথা বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বে "ব্রাহ্ম" শব্দটি অপর কোনও

ধর্মমণ্ডলী সম্পর্কে কখনও এ দেশে ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় না। মহানির্বাণ তন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে তত্ত্বচক্রের বর্ণনা কালে ঐ চক্রের অধিকারিগণের প্রসঙ্গে কিন্তু শব্দটিকে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়[৮৬] :

পরব্রহ্মোপাসকা যে ব্রহ্মজ্ঞা ব্রহ্মতৎপরাঃ।
শুদ্ধান্তঃকরণাঃ শান্তাঃ সর্বপ্রাণিহিতে রতাঃ॥
নির্বিকারা নির্বিকল্পা দয়াশীলা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যসকংল্পকা ব্রাহ্ম্যাস্ত এবাত্রাধিকারিণঃ॥

এই "ব্রাহ্ম" বা "ব্রাহ্ম্য" শব্দটি যে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার অন্তত দশ বৎসর পূর্ব হতে রামমোহনের মণ্ডলীসম্পর্কে প্রযুক্ত হত তার প্রমাণ আছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের ক্যালকাটা জার্নালে রামমোহনের তন্ত্রগুরু হরিহরানন্দের সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধ সমালোচনাপূর্ণ একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে তিনি রামমোহনের মণ্ডলীকে "Brahmyu or Unitarian Hindu community" বলে উল্লেখ করেছেন[৮৭]। আরও দুই বৎসর পূর্বে, ১৮১৭ সালে, ব্রহ্মোপাসক অর্থে রামমোহন স্বয়ং শব্দটি ব্যবহার করেছেন মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায়। অন্যত্রও রামমোহন এবং রামমোহনের প্রতিপক্ষ কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন রামমোহনপন্থী ব্রহ্মোপাসকগণকে ঐ নামে অভিহিত করেছেন[৮৮]। স্বয়ং হরিহরানন্দ এবং রামমোহনের উক্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, মহানির্বাণবর্ণিত তত্ত্বচক্রের অধিকারিগণের নামবিশেষের অনুকরণে, রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত উপাসকমণ্ডলী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই "ব্রাহ্ম" বা "ব্রাহ্ম্য" নামে সুপরিচিত ছিলেন। "ব্রাহ্মসমাজ" সেই অভিধারই স্মৃতি বহন করছে। এ কথাও বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত, ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে নারীজাতিকে পুরুষের সমতুল্য আধ্যাত্মিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার মত উদারতা রামমোহন বহুলাংশে তন্ত্রশাস্ত্র থেকে পেয়েছিলেন। রামমোহনের পৌত্রী (রাধাপ্রসাদ রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা) চন্দ্রজ্যোতি দেবী তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে এ বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা এই : "রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগুরু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘরের মেয়েদের ব্রহ্মমন্ত্রে উপাসনা, গায়ত্রী জপ। তাঁর ছোট পুত্রবধূ রমাপ্রসাদের পত্নী দ্রবময়ী দেবীকে ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোকগুলি আওড়াতে ইদানীং আমরা নিজের কানে শুনেছি। গায়ত্রী জপও করতেন দ্রবময়ী দেবী রীতিমত। যে গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিষিদ্ধ, রাজা এনে দিলেন তাকে ঘরের মেয়েদের আয়ত্তের মধ্যে ; ধর্মসংস্কারে মেয়েদের বড় অধিকার পাওয়ার পথ খুললো প্রথম।"[৮৯]

তাঁর সামাজিক ও ব্যক্তিগত মতামত ও আচরণেও রামমোহন যে তন্ত্রের মত ও আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে প্রমাণও উদ্ধার করা যায়। মহানির্বাণ তন্ত্রে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সতীদাহ-প্রথা নিষেধ করা হয়েছে (ভর্ত্রাসহ কুলেশানি ন দহেৎ কুলকামিনীম্)[৯০]। সতীদাহ-আন্দোলনের পুরোধা রামমোহনকে যে এই জাতীয় শাস্ত্রবচন যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করে থাকবে, এ অনুমান আমরা অবশ্যই করতে পারি। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থন রামমোহন করেছেন অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় সহমরণ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় পুস্তকে[৯১]। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে রাখতে পারি মহানির্বাণ তন্ত্রের উক্তি "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ[৯২]।" তাঁর দুখানি বিচারগ্রন্থে রামমোহন মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত শৈববিবাহের আদর্শকে সমর্থন করেছেন। এই বিবাহে জাতিবর্ণধর্মগত কোনও বাধা নেই, কেবলমাত্র পাত্রী সপিণ্ডা বা সধবা

না হলেই যথেষ্ট[৯৩]। সর্বশেষে এ কথা বলা যেতে পারে, মাংসাহার ও পরিমিত সুরাপান সম্পর্কে রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের নির্দেশকেই প্রামাণিক মনে করতেন এবং এর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন[৯৪]।

রামমোহন চিন্তায় ও কর্মে তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রমত কর্তৃক বিশেষ রূপে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা উপরের আলোচনার ফলে দেখা গেল। কিন্তু একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায়। তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য, তার নিজস্ব সাধনপদ্ধতি। রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রাধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কি তান্ত্রিক সাধনাও করেছিলেন? দুঃখের বিষয় এ প্রশ্নের উত্তর দেবার মত ঐতিহাসিক উপাদান আমাদের হাতে নেই। রামমোহনের একটি গভীর সাধকজীবন ছিল, এ ইঙ্গিত তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তী অনেকে দিয়েছেন, কিন্তু এই সাধনার প্রকৃতি ও পদ্ধতি যে কি, তা জানবার উপায় নেই। রামমোহনের জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন, রামমোহন তরুণ বয়সে (একেশ্বরবাদী হবার পূর্বে) একবার বহু অর্থব্যয় করে বাইশবার পুরশ্চরণ করেছিলেন।[৯৫] এই পুরশ্চরণ তান্ত্রিক উপাসনার একটি প্রসিদ্ধ অঙ্গ এবং তন্ত্রমতানুযায়ী এই ক্রিয়ার দ্বারা মন্ত্রশক্তি বর্ধিত ও মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়।[৯৬] পরবর্তীকালে শাস্ত্রবিচারপ্রসঙ্গে রামমোহন কুলার্ণব তন্ত্রের মদ্যমাংস গ্রহণের সমর্থন-সূচক একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "এ বচনের অধিকার তান্ত্রিকের প্রতি হয় অতএব এসকল বচনের বিষয় অধিকারিভেদ স্বীকার না করিলে শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না।"[৯৭] কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে এখানে রামমোহন তান্ত্রিক সাধকের উচ্চাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করছেন, যদিও উল্লেখটি অস্পষ্ট এবং তার নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। তবে কৌল তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মর্মে একটি ঐতিহ্য আছে যে রামমোহন তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এর দুএকটি নিদর্শন উল্লেখ করা যাচ্ছে। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে চুঁচুড়ার অন্তর্গত মদন কামার নামক এক তান্ত্রিকের উল্লেখ করেছেন, "তাঁহার গৃহপ্রাচীরে রাজা রামমোহন রায়ের একখানি প্রতিমূর্তি লম্বমান থাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষের মালা হস্তে করিয়া রাজার প্রতিমূর্তিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত। মদনের প্রতিবাসী প্রবন্ধ-লেখকের জনৈক বন্ধু, তাঁহাকে এইরূপ প্রণামের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল যে, রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।"[৯৮] মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে দিল্লী-ভ্রমণকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করে লিখেছেন:[৯৯] "এখানে সুখানন্দ নাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য।· · ·সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে আমি এবং রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মত তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।" ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মথুরা ভ্রমণ কালে দেবেন্দ্রনাথ সেখানকার সন্ন্যাসিগণের সত্রে এক হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনাপ্রসঙ্গে মহর্ষি জানতে পারেন তিনি শবসাধক তান্ত্রিক। মহর্ষি আরও লক্ষ্য করেন যে এই তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর পুস্তকাদি সমস্তই রামমোহন রায়ের গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ।[১০০] এই সাক্ষ্যগুলি মিলিয়ে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধক ও সিদ্ধপুরুষরূপে রামমোহন সুপরিচিত ছিলেন। এই প্রসিদ্ধির মূলে কোনও সত্য আছে কি না তা নিশ্চিত বলবার উপায় নেই।

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী 'ব্রাহ্মসমাজে'র ধর্মমতে এই তান্ত্রিক ঐতিহ্য কতটা রক্ষিত হয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয়, প্রায় কিছুই হয় নি। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্তী নায়ক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামমোহন কর্তৃক আহরিত এবং 'ব্রহ্মোপাসনা' পুস্তিকায় সন্নিবেশিত মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্রটি, ("নমস্তে সতে

সর্বলোকাশ্রয়ায় ) কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে, তাঁর "ব্রাহ্মধর্ম" নামক সংকলন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০১] স্তোত্রটির পরিমার্জিত সংস্করণে ভক্তিবাদী দেবেন্দ্রনাথ এর নির্বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদমূলক বর্ণনাত্মক বিশেষণগুলি বর্জন করেছিলেন। তন্ত্রের গুরুবাদ, সাকার উপাসনা প্রভৃতি আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মগণের নিকট অপকৃষ্ট মনে হলেও, তন্ত্র যে মূলতঃ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন ছিলেন।[১০২] পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ১৮৪৪-৪৫ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে ব্রাহ্মসমাজে মহানির্বাণতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী দীক্ষাপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৫০এর পর তা বর্জিত হয়।[১০২ক] কিন্তু ক্রমশঃ তন্ত্রের প্রতি এই অবশিষ্ট শ্রদ্ধাটুকুও ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে এবং ব্রাহ্মসমাজ নিজ সমন্বয়াদর্শ থেকে তান্ত্রিক ব্রাহ্মবাদকে প্রায় নির্বাসিত করে দেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রচারক-মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত প্রবীণ শাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়কৃত 'গায়ত্রী ষট্চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাড়া এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথোত্তর যুগের ব্রাহ্মনায়কগণের অন্য কোনও রচনা বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর হয় নি।[১০৩]

তন্ত্রশাস্ত্রে রামমোহনের গভীর জ্ঞান ও শ্রদ্ধা পূর্বে কোনও লেখকের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি তা নয়। মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সার্ জন উড্রফ্, সুবিখ্যাত লেখক পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি পূর্বে রামমোহনের প্রতিভার এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।[১০৪] এঁদের আলোচনার প্রধান ত্রুটি, সেগুলির একদেশদর্শিতা। তাঁরা তিনজনেই বলেছেন, রামমোহন সম্পূর্ণ তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তিতেই ব্রাহ্মধর্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং সে মতবাদও তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মহানির্বাণ তন্ত্রের কয়েকটি ( সবগুলি নয় ! ) সর্গ থেকে। এই প্রসঙ্গে তাঁরা অন্য কোনও তন্ত্রগ্রন্থের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি! এই সিদ্ধান্ত একটি দুর্বল অতিশয়োক্তি মাত্র। রামমোহনের চিন্তাধারার গঠন ও পরিণতির উপর তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব যেমন উপেক্ষণীয় নয় তেমনি তাকে অতিরঞ্জিত করবারও কোনও সার্থকতা নেই। এতে তাঁর প্রতি সুবিচার হয় না। তন্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে মহানির্বাণকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করলেও দেখা যাবে রামমোহন সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করেছেন কুলার্ণবের সাক্ষ্য। তাছাড়া কৌল শাস্ত্রে তাঁর অধ্যয়ন ছিল সুবিস্তীর্ণ, কেবলমাত্র কুলার্ণব-মহানির্বাণ-ভিত্তিক নয়। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে রামমোহন বেদবেদান্তকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন এবং পুরাণ-তন্ত্রাদির প্রামাণ্য স্বীকার করলেও স্পষ্টতঃ সেগুলিকে বেদবেদান্ত অপেক্ষা নিম্নস্তরের জ্ঞান করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক উপাসনায় প্রথম থেকেই বেদ-উপনিষদের প্রাধান্য ছিল, তন্ত্রশাস্ত্রের কোনও স্থান তার মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ। যে তন্ত্রবচন রামমোহন তাঁর উপাসনাপদ্ধতির অঙ্গীভূত করেন, তা সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত উপাসনাতেই সে যুগে ব্যবহৃত হত, সামাজিক উপাসনাতে নয়। রামমোহন ছিলেন মূলতঃ বৈদান্তিক, তন্ত্রশাস্ত্রদ্বারা তাঁর দার্শনিক এবং সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রভাবিত হলেও, তন্ত্র তাঁর নিকট বেদান্তের পরিপূরক হিসাবেই মূল্যবান ছিল। উপরি-উক্ত লেখকত্রয়ের উক্তি অনেক পরিমাণে প্রচলিত কিংবদন্তী-নির্ভর, এবং সেই কারণে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রামমোহন কেবল উপনিষদকে আশ্রয় করেছিলেন বলেই তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমন্বয় প্রচেষ্টা একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে ; ভারতীয় সভ্যতার পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে তিনি বুঝতে পারেননি।[১০৫] এই সিদ্ধান্তও সমানভাবে ভ্রান্ত। ভারতীয় সভ্যতার গতিশীল চরিত্রটি রামমোহন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপলব্ধি

করতে পেরেছিলেন বলেই বেদ-উপনিষদকে আশ্রয় করেও নিজেকে তার মধ্যে আবদ্ধ রাখেন নি। গভীর মনীষা ও শ্রদ্ধার সহিত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলিরও অনুশীলন করেছিলেন। ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম, মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলন, খ্রীষ্টধর্ম, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কোনও কোনও অধ্যায় পর্যন্ত তাঁর আলোচনার বস্তু ছিল। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর শাস্ত্রালোচনার ও সমন্বয়-প্রচেষ্টার এ যাবৎ প্রায় উপেক্ষিত একটি দিকের প্রতি সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

## প্রমাণপঞ্জী

১. শিখ ও ব্রাহ্ম ধর্মদ্বয়ের এই বিষয়ে পরস্পর সাদৃশ্য উদাহরণ হিসাবে বোধ করি সার্থকতম। জনৈক বিখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের এই দুটি সমন্বয়মূলক ধর্মাদর্শের স্বভাব-বৈপরীত্যের উপরে সম্প্রতি অতিমাত্রায় জোর দিয়েছেন ( দ্রষ্টব্য Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, Vol. V p. 106 )। যদি তর্কের খাতিরে তাঁর মতামত স্বীকার করে নেওয়াও যায়, তা হলেও এ কথা সত্যই থাকে যে এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি আদি ও উত্তর কাণ্ডের প্রভেদ সমানভাবে স্পষ্ট। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মের বিবর্তন ও পরিবর্তন তাদের স্ব স্ব স্বভাবনিরপেক্ষ সার্বজনীন সত্য।

২. *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Edited by Kalidas Nag and Debajyoti Burman, Part IV ( Calcutta 1947 ), pp. 71-72.

৩. *The Father of Modern India*, Raja Rammohun Roy Centenary Commemoration Volume, Part II, (Calcutta 1935) p. 162.

৪. রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসুর প্রতি তাঁর উক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬১৩-১৪ ; চন্দ্রশেখর দেব রামমোহনের সঙ্গে তাঁর এই বিষয়ক কথোপকথন নিজেই ইংরেজি ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন, দ্রষ্টব্য তাঁর "Reminiscences of Rammohun Roy" শীর্ষক দুটি রচনা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, পৃ ১৩৯-৪০ ; মাঘ ১৭৯৪ শক, পৃ ১৭৪-৭৫ ; লক্ষ্য করবার বিষয়, চন্দ্রশেখর দেবের নিকটেও রামমোহন বলেছিলেন অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ে ভারতীয় বেদবেদান্তই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র। রামমোহনের সার্বভৌম ধর্মদৃষ্টি সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন ১৭৭৬ শক, পৃ ১৫৯।

৫. *Calcutta Review*, Vol. IV ( 1845 ) pp. 355-93

৬. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৬৮ শকাব্দ, পৃ ৩৮১

৭. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৭৭২ শকাব্দ, পৃ ১৬০-৬১

৮. এই ট্রাস্টডীডখানি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের *History of the Brahmo Samaj* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিশিষ্টরূপে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

৯. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাব্দ, "ব্রাহ্মসমাজের বিবরণ," পৃ ৯১ ; ফাল্গুন, ১৭৮২ শকাব্দ, "ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত" ( লেখক রাজনারায়ণ বসু ), পৃ ১৪৪

১০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাব্দ, পৃ ৯১

১১. রামমোহনের অনুরাগী বন্ধু ও শিষ্য একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, উইলিয়ম অ্যাডাম পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ

প্রতিষ্ঠায় খুশি হতে পারেন নি। কেননা তাঁর প্রত্যাশা ছিল, রামমোহন খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদের দিকেই বেশি করে ঝুঁকবেন ( দ্রষ্টব্য Collet, *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (London 1900), p. 90 ) ; কলিকাতার ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টীয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের তো কথাই নেই। তাঁরা এতকাল ভেবে এসেছিলেন রামমোহন শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন এবং ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে তিনি মিশনারি সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সহায়ক হবেন। হিন্দুধর্মের বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধা ছিল না, এ বিষয়ে রামমোহনের শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাবকে সহানুভূতির সঙ্গে বুঝবার ও তাঁদের ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজস্থাপনের ফলে তাঁদের আশাভঙ্গ হয় এবং তাঁরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার ইংরাজসমাজের অন্যতম মুখপত্র *John Bull* পত্রে "জনৈক খ্রীষ্টান" স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মসমাজপ্রতিষ্ঠার তীব্র নিন্দাসূচক যে চিঠি প্রকাশিত হয়, এবং উক্ত বৎসর ১৬ই অক্টোবর তারিখে ঐ পত্রিকাতেই রামমোহন ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে যে তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়, সেগুলি এই আশাভঙ্গজনিত বিলাপ ছাড়া আর কিছু নয় ( দ্রষ্টব্য J. K. Majumdar, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India: A Selection from Records*, Nos. 37 and 39, pp. 82, 85-86 ).

১২। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনীচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬৩৩

১৩. রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহনের প্রাথমিক শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালীন দৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ লিখেছেন : "যখন তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য পালকিতে উঠান গেল, তখন, তিনি পৌত্তলিক নহেন, তখনকার ব্রাহ্মধর্ম অর্থাৎ বৈদান্তিক ধর্মে প্রাণত্যাগ করিতেছেন, ইহা গ্রামস্থ লোকদিগকে দেখাইবার জন্য আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আপনার কোন্ ধর্মে মৃত্যু হইতেছে, সকলকে বলুন। তিনি বলিলেন 'বৈদান্তিক ধর্মে'।"—রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৪৪

১৪. রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী, রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৮০, পৃ ৮১২

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৩৫৬, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪৮৯

১৬. বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন-গ্রন্থাবলী, সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ পৃ ১৩ ; অতঃপর রামমোহনের যে সকল গ্রন্থাদি উল্লিখিত হয়েছে তা সবই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ রামমোহন-গ্রন্থাবলীভুক্ত, প্রতি ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সে কথা উল্লেখ করা হল না। উল্লিখিত পৃষ্ঠাসংখ্যা ঐ গ্রন্থাবলীর।

১৭. তলবকার উপনিষৎ পৃ ১৮৭ ; ঈশোপনিষৎ পৃ ১৯৫ ; কঠোপনিষৎ পৃ ২১২ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পৃ ২৪৭

১৭ক. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৫-৫৬

১৮. বৈদান্তিক ও বেদান্তভাষ্যকার রূপে রামমোহনের কৃতিত্বের মূল্যায়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত রচনাগুলি দ্রষ্টব্য :

ক. চন্দ্রশেখর বসু, বেদান্তপ্রবেশ, কলিকাতা ১২৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪৮-৬৫

খ. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়, পৃ ৪৪-১৬৫

গ. ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ, ধর্মের তত্ত্ব ও সাধন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা পৃ ২৩২-৪৪

ঘ. ঈশানচন্দ্র রায়, 'Rammohun as a Bhasyakara', *Indian Messenger* Vol. LVIII, No. 3 ( Maghotsava Number 1940 ), pp. 51-52

১৯. ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য ১।২।৪

২০. ব্রহ্মসূত্র, রামমোহন-ভাষ্য ৪।১।১২— বেদান্তগ্রন্থ পৃ ১০১ ; এই প্রসঙ্গে আরও দ্রষ্টব্য, রামমোহনকৃত বেদান্তসার পৃ ১২৪

২১. দ্রষ্টব্য সদানন্দকৃত বেদান্তসার, ৪ : "এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনমুপাসনানাং তু চিত্তৈকাগ্র্যং ·" (জি. এ. জেকব-কৃত সং পৃঃ ৪) ; রামতীর্থ তাঁর বেদান্তসারের টীকায় এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে বলেছেন : "শাস্ত্রবোধিতে সগুণে ব্রহ্মণি দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্যোপেতমনোবৃত্তিস্থিরীকরণলক্ষণানি উপাসনানি" ( উক্ত সংস্করণ, রামতীর্থকৃত বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকা পৃ ৭৩ )।

২২. অনুষ্ঠান পৃ ৬৭

২৩. ঐ, পৃ ৬৯

২৪. ব্রহ্মোপাসনা পৃ ৫২-৫৩ ; ক্ষুদ্রপত্রী পৃ ৭৫-৭৬

২৫. অনুষ্ঠান পৃ ৬৮

২৬. ঈশোপনিষৎ পৃ ১৯৮, ১৯৯ ; ব্রহ্মসূত্র, রামমোহন ভাষ্য ৩।৪।৪৮ ( বেদান্তগ্রন্থ, পৃ ৯৮ )

২৭. সুশীলকুমার দে, *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal* ( Calcutta 1942 ) pp. 10-16

২৮. উপাসনস্য সামর্থ্যাৎ বিদ্যোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ
নান্যঃ পন্থা ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুধ্যতে।

পঞ্চদশী ৯।৭৪, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কৃত সং, পৃ ৫৬৬-৬৭

২৯. গোস্বামীর সহিত বিচার পৃ ৫৫ ; ইদানীংকালে শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ *Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal*এ নানা যুক্তি প্রয়োগে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন, চৈতন্যবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক যোগ মধ্বব সম্প্রদায়ের সঙ্গে নয়, শঙ্করপন্থিগণের সঙ্গে। রামমোহনের "গোস্বামীর সহিত বিচার" গ্রন্থখানি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে ডাঃ দে দেখতে পেতেন ১২৪ বৎসর পূর্বে রামমোহন অবিকল একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। "গোস্বামীর সহিত বিচার" প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে।

৩০. চৈতন্যদেবের অবতারত্বের বিরুদ্ধে রামমোহনের উক্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, পথ্যপ্রদান পৃ. ১৩২-৩৪ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতসম্মত লীলাদির নিত্যতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি স্মরণীয় : "পূর্বে যে সকল অধিকারী দুর্বল ছিলেন, তাঁহারা মনস্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক রূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরব্রহ্মপ্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক রূপকে বিভু ও নিত্য এবং নিত্যধামবাসী

করিয়া জানা ইহা অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে……"—গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬৩।

৩১. দ্রষ্টব্য ১৮ সংখ্যক পাদটীকায় উল্লিখিত তাঁর প্রবন্ধ।

৩২. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮-২৬

৩৩. রামানুজ এবং তাঁর সম্প্রদায় রামমোহনের অজ্ঞাত ছিলেন না যদিও তাঁর বেদান্তবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে রামমোহন রামানুজকে অনুসরণ করেন নি। দ্রষ্টব্য, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ২১-২২, ২৫-২৬, ৩৫, ইত্যাদি ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩৫-৩৬ ; ১৩৮

৩৪. শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, তন্ত্রকথা, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, ভূমিকা

৩৫. উপরি-উক্ত গ্রন্থ, ভূমিকা

৩৬. উপরি-উক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৬-৩৫

৩৭. কুলার্ণব তন্ত্র ৯।৩২, Tantric Texts Series, Vol. V, London 1917, p. 127

৩৮. Surendranath Dasgupta, "General Introduction to Tantra Philosophy," *Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubilee Volume*, Vol. III, Part I, p. 255

৩৯. Chintaharan Chakravarti, "Tantra and Vedanta", *Kalyana-Kalpataru*, Vol III, No 1, p. 176.

৪০. মহানির্বাণ তন্ত্র ২।৫২, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১০

৪১. কুলার্ণব তন্ত্র ১৭।২৯, Tantric Texts Series, Vol. V, p. 257 ; এই প্রসঙ্গে তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্ শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার যথার্থ বলেছেন, "Tantric Yogis who pursue the path of knowledge regard the path of devotion as indispensable…" —Introduction, *The Principles of Tantra*, Translated by Arthur Avalon, Part II, p. cxlvii

৪২. শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, তন্ত্রতত্ত্ব, প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ, কাশী ১৩১৭ বঙ্গাব্দ, পৃ ৮১ ; আরও দ্রষ্টব্য H. V. Guenther, *Yuganaddha : The Tantric View of Life*, Chowkhamba Sanksrit Series Studies Vol. III, Introduction p. ii

৪৩. যেন সর্বফলাবাপ্তিঃ সর্বেষাং বন্ধুরেব যঃ
সর্ববর্ণাধিকারশ্চ নারীণাং যোগ্য এব চ
তং ব্রূহি ভগবন্মন্ত্রং মম সর্বার্থসিদ্ধয়ে।

গৌতমীয় তন্ত্র ১।৭-৮, বসুমতী সং, পৃ ২

৪৪. মহানির্বাণ তন্ত্র ১৪।১৮৫-৮৬, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১৮৭

৪৫. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬০২, পাদটীকা।

৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, রামচন্দ্রবিদ্যাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৯, পৃ ২৬-২৭

৪৭. R. P. Chanda and J. K. Majumder, *Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy*, Calcutta. 1938, p. 174

৪৮. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃ ১৭০, ১৭১, ১৭৫ ; ঈশোপনিষৎ, পৃ ১৯৬, ১৯৭ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃ ২৪৫ ; ২৪৬-৪৭ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ৩৮ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৬৯-৭০, ৭০, ৭৯, ৮৩, ৮৯-৯০ ; প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, পৃ ৪০-৪১ ; গায়ত্রীর অর্থ, পৃ ৩ ; চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৭, ১৮, ১৯ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ৯২, ৯৩, ১০১-১০২, ১৪০, ১৫২ ১৬১, ১৬৪, ১৬৬-৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১ ( দুইবার ), ১৭২, ১৭৬

৪৯. ঈশোপনিষৎ, পৃ ১৯৬ ; মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পৃ ২৪৫ ; উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ৩৮ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৮১, ৯১ ; গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনা-বিধানম্‌, পৃ ৪০ ; ব্রহ্মোপাসনা, পৃ ৫২-৫৩ ; অনুষ্ঠান, পৃ ৭১ ; ব্রাহ্মণেসেবধি, পৃ ১৪ ; চারিপ্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২০ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ৯২, ১০৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬

৫০. ঈশোপনিষৎ, পৃ ২০৩ ; ব্রাহ্মণসেবধি, পৃ ১৬ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১০৯, ১১৪

৫১. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৯, ২১, ৩৭ ( দুইবার ) ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬০ ; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৯১

৫২. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৪

৫৩. পথ্যপ্রদান, পৃ ৯২, ১৫৪

৫৪. পথ্যপ্রদান, পৃ ১০০, ১৫২, ১৬৬

৫৫. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৪৬, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭

৫৬. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৫৪

৫৭. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬১, ১৬৭

৫৮. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬২, ১৬৩

৫৯. পথ্যপ্রদান পৃ ১৬৫

৬০. পথ্যপ্রদান পৃ ১৬৬

৬১. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬৫, ১৬৬

৬২. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩২-৩৩, ১৪১-৪২

৬৩. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩৩-৩৪, ১৭৫

৬৪. উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮, ২৩ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৫

৬৫. কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৭৫ , পথ্যপ্রদান, পৃ ১৫০

৬৬. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬১-৬২, ১৬৩

৬৭. সময়াতন্ত্র সম্পর্কে দ্রষ্টব্য পাদটীকা ৫৭ ; অন্যান্য বিধির উল্লেখ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃ ১৭৪ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৩৬, ১৫৪, ইত্যাদি।

৬৮. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৭৫

৬৯. ঈশোপনিষৎ-ভূমিকা, পৃ ১৯৫-৯৮ ; বেদান্তগ্রন্থ-ভূমিকা, পৃ ৬

৭০. ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২, পৃ ১৬ ; আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত বিচার পৃ ৪৬-৪৭

৭১. ব্রাহ্মণ সেবধি, সংখ্যা ২, পৃ ১৪-১৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৪৯-৫০ ; পথ্যপ্রদান পৃ ১৩২-৩৩ ; কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, পৃ ১৮৪

৭২. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, রামমোহন-গ্রন্থাবলী সা. প. সং, পৃ ৫২ ; রামমোহনের উত্তর পথ্যপ্রদান পৃ ১৩২-৩৪

৭৩. Maha-Nirvana-Tantram, Edited by Arthur Avalon, Introduction, pp. vii-viii ; রামমোহনের হস্তলিখিত হরিহরানন্দ-কৃত মহানির্বাণতন্ত্রের এই টীকাটির পাণ্ডুলিপি বর্তমানে কোথায় আছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া উচিত।

৭৪. কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, রামমোহন-গ্রন্থাবলী সা. প. সং, পৃ ৭৩-৭৪

৭৫. পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬৪-৭৭

৭৬. সাম্প্রদায়িক ও সাকার উপাসনার সমর্থক তন্ত্রগ্রন্থগুলি সম্পর্কে রামমোহনের সমালোচনা-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ৩৭, ৩৯ ; গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫০, ৫৪-৫৫ ইত্যাদি ; মারণ উচাটনাদি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, পৃ ১৬৮ ; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৬৯

৭৭. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, পৃ ৯৮ ; আরও দ্রষ্টব্য, পথ্যপ্রদান, পৃ ৯৩, ইত্যাদি

৭৮. ব্রহ্মোপাসনা, পৃ ৫২-৫৩ ; মহানির্বাণ তন্ত্র ৩।৫৯-৬৩, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১৫-১৬ ; ভক্ত বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ঈশ্বরের রূপ এবং লীলা নিত্য, কিন্তু তন্ত্রের দৃষ্টিতে এগুলি দুর্বল অধিকারীর উপকারার্থে কতগুলি কল্পনা মাত্র, এ সবের পারমার্থিক সত্তা নেই। সুতরাং নিরাকারবাদী রামমোহনের দৃষ্টিতে তান্ত্রিক ভক্তিবাদ অপেক্ষা বৈষ্ণব ভক্তিবাদ স্বভাবতঃ উৎকৃষ্টতর মনে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কুলার্ণবের উক্তি স্মরণীয় :

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।

—কুলার্ণব ৬।৭২, Tantrik Texts Vol. V p. 88

৭৯. গায়ত্রীর অর্থ, পৃ ৩-৫ ; আরও দ্রষ্টব্য, অনুষ্ঠান পৃ ৬৯, ৭১, ৭৩

৮০. দ্রষ্টব্য "গায়ত্রীর অর্থ", "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ", পৃ ৩২-৩৩, "গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্", "অনুষ্ঠান" পৃ ৬৯ ইত্যাদি

৮১. শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "তান্ত্রিক কার্যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগ," বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫৯শ খণ্ড, পৃ ৩৫-৩৭

৮২. তন্ত্রসার, বসুমতী সংস্করণ, পৃ ৮২-৮৩

৮৩. মহানির্বাণ তন্ত্র ৩।১০৫-১১৪, বঙ্গবাসী সং পৃঃ ১৯ ; গায়ত্র্যা ব্রহ্মোপাসনাবিধানম্", পৃ ৪০

৮৪. কুলার্ণব তন্ত্র ২।২৪ ; ৯।৬৩, Tantrik Texts Series Vol. V pp. 19, 131

৮৫. মহানির্বাণ তন্ত্র ৮।২২-২৫, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৭২-৭৩

৮৬. মহানির্বাণ তন্ত্র ৮।২০৬-২০৭, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৮৫

৮৭. J. K. Majumder, *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India*, Calcutta 1941, pp. 112-14

৮৮. মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, পৃ ২৪৩; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৭৩; কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, পাষণ্ডপীড়ন, রামমোহন-গ্রন্থাবলী সা. প. সং, পৃ ৫৬; পথ্যপ্রদান, পৃ ৮৫

৮৯. শ্রীহেমলতা দেবী, "ঘরোয়া ব্যাপারে রামমোহন", *The Father of Modern India*: Rammohun Centenary Commemoration Volume, Part II, pp. 282-84

৯০. মহানির্বাণ তন্ত্র ১০।৭৯, বঙ্গবাসী সং পৃ ১১৯

৯১. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ, পৃ ৪৫

৯২. মহানির্বাণ তন্ত্র ৮।৪৭, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৭৪

৯৩. চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৯-২০; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৫৩-৫৪; মহানির্বাণ তন্ত্র ৮।১৭৭-৮১, বঙ্গবাসী সং, পৃ ৮৩-৮৪

৯৪. চারি প্রশ্নের উত্তর, পৃ ১৭-১৯; পথ্যপ্রদান, পৃ ১৪৩-৫২, ১৫৯-৭৮; "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার" পুস্তিকায় এ বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণও দেওয়া হয়েছে।

৯৫. S. D. Collet, *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, Ist ed. p. 3; নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ১৫

৯৬. জীবহীনো যথা দেহী সর্বকর্মসু ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ॥ —তন্ত্রসার, বসুমতী সং, পৃ ৩৫

আরও দ্রষ্টব্য হরকুমার ঠাকুর, পুরশ্চরণবোধিনী, দশম সং, কলিকাতা, পৃ ৩; পুরশ্চরণরত্নাকর, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য সংকলিত, কলিকাতা ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬

৯৭. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ পৃ ৪০-৪১

৯৮. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সং, পৃ ৬০১-০২, পাদটীকা

৯৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, বিশ্বভারতী ১৯২৭, পৃ ২৩০-৩১

১০০. উপরি-উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ২২৯-৩০

১০১. ব্রাহ্মধর্মঃ, নবম সং, কলিকাতা ১৯৩৭, পৃ ১২-১৩

১০২. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, চৈত্র, ১৭৯০ শক, পৃ ২১৯-২০

১০২ক. Sivanath Sastri, *History of the Brahmo Samaj* Vol. I (Calcutta, 1911) pp. 96-97

১০৩. গায়ত্রীমূলক ষট্‌চক্রের ব্যাখ্যান ও সাধন, দ্বিতীয় সং কলিকাতা ১৮৩৭ শক; প্রীতিভাজন বন্ধু শ্রীসুরথ চক্রবর্তী পুস্তিকাখানি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

১০৪. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "রাজা রামমোহন রায় এবং তন্ত্রশাস্ত্র", বিবিধ প্রবন্ধ, (দ্বিতীয় সংস্করণ, চুঁচুড়া ১৩২৭ বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয় ভাগ, পৃ ১৪৩-৪৯; Arthur Avalon, Mahanirvana Tantram p. vii; পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অ্যাভেলনের মহানির্বাণ তন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যার সমালোচনা, সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২০ পৃ ৩৬৩-৬৮

১০৫. শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৪৫, পৃ ৪৬

# বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

ভবতোষ দত্ত

সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র পরিচিত ঔপন্যাসিকরূপে, যেমন রবীন্দ্রনাথ পরিচিত কবিরূপে। এ বিষয়ে সংস্কার এতই দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে তাঁদের যে অন্যবিধ পরিচয় আছে, তা আমাদের মনে সব সময় থাকে না; অন্ততঃ বিচারবোধ আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। তাঁদের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণে এই সংস্কার অনেক সময়েই দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে থাকে। বাংলা দেশের সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাসের দিক দিয়ে দুজনকে দুই যুগে যে ভাবে অধিনায়কত্ব করতে দেখি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁদের এই ভূমিকার মূলে আছে এক দুঃসাধ্য মননসাধনা। তাঁদের দৃঢ় বিচারবোধ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট আকৃতিকে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল। যদিও দেখা যাবে দুজনের কর্মপথ শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দিকে ধাবিত, কিন্তু মানুষের পরম মূল্যে তাঁরা বিশ্বাস অটুট রেখেছেন। এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই তাঁরা মানুষের দোষ ত্রুটি এবং মহত্ত্বকে মিলিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছেন। এজন্য তাঁদের মনীষার তুলনা যথেষ্ট কৌতূহলজনক হবে বলেই মনে হয় এবং তার মধ্যে শিক্ষণীয়তাও কিছু কম থাকবে না। এ বিষয়ে সোজাসুজি উদ্যোগী হওয়ার আগে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক মনোভাবের সন্ধান নেওয়াও সংগত।

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়ে বালকচিত্তে তার প্রভাবের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে। বঙ্কিমের মৃত্যুর পর চৈতন্য লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ পড়েন তাতেও বঙ্গদর্শনের প্রথম আবির্ভাবকে তিনি সম্রাটের প্রথম সমাগমের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রথম বর্ষার জলধারা বালক যুবা প্রৌঢ় গৃহিণী এবং বধূ সকলেরই হৃদয়তলকে রসসিক্ত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, বয়স বারো কি তেরো। মধ্যাহ্নের শান্ত প্রহরগুলি বঙ্গদর্শনের পাতা উল্টে কেটে যেত— সে-তন্ময়তার কথা রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই ভুলতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের পরিচয় এর আগেই হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্কিমের বন্ধু। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেছিলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কোনো অংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশের জন্য বঙ্কিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন।[১] "বঙ্কিমবাবু বোধহয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কিনা আমার স্মরণ নাই। কিন্তু উহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন।" স্বপ্নপ্রয়াণের প্রথম সর্গটি অবশ্য বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যে সাহিত্যিক আদর্শ স্থাপিত করেছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই পথের পথিক ছিলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে বাঙালীদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার সূত্রপাত হল বটে, কিন্তু তাদের সংহত করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩০৮এ রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার নিয়ে লিখেছিলেন "তখনকার সেই নির্ঝরধারাটি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পূর্ণ ছিল; তিনিই তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার দিক্ নির্দেশ করিয়াছিলেন। সেই ধারাটির মধ্যে সর্বত্রই

---

১ বিপিনবিহারী গুপ্ত, 'পুরাতন প্রসঙ্গ', ২য় পর্যায়, পৃ ১৯৩।

যেন তিনি দৃশ্যমান ও বহমান ছিলেন।" এই বিচিত্র ভাবের বন্যায় বাঙালী পাঠক প্লাবিত হয়ে গেল। বঙ্গদর্শনের এই ভাবুকতার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন। তখন তাঁর বয়স অল্প। উপন্যাসের রোমান্স এবং ছবিগুলি তাঁর বালক-মনকে যতটা আকৃষ্ট করবে প্রবন্ধ তাকে ততটা আকৃষ্ট করবে না, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের নিজের পরিবারেই একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তো ছিলেনই, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি অন্যান্যরাও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গ্রন্থিবন্ধন যে এঁদের দ্বারাই হয়েছিল, তার জন্য কোনো প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন উপলক্ষে মরকতকুঞ্জে। 'জীবনস্মৃতি'তে এবং 'সাধনা'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি স্পষ্ট রেখায়িত ছবি এঁকেছেন যাতে শুধু দৈহিক রূপটি নয়, অন্তরের রূপটিও অসাধারণ তীক্ষ্ণতায় ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয়বার দুজনের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর মাসে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে বরণ করে নেন বাংলার প্রধান লেখকদলের মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের পাণ্ডিত্য ও রসসৃষ্টির শক্তি তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে মহিমাপূর্ণ আসনে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত। তরুণ বাঙালীর কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের পাত্র। নিভৃতে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের আদর্শ মনে মনে লালন করলেও বঙ্কিমের কাছে স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা স্বভাবতই ছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম থেকেই গভীর স্নেহ পোষণ করেছেন। বঙ্গদর্শনে হেমচন্দ্র-রঙ্গলালের যে ধরণের কবিতা প্রকাশিত হত, রবীন্দ্রনাথ একেবারে প্রথম দিকে তার কিছু কিছু অনুকরণ করেছিলেন কিন্তু বাল্মীকিপ্রতিভা (১৮৮১) কিংবা সন্ধ্যাসঙ্গীতে (১৮৮২) সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি এবং আদর্শকেই অবলম্বন করেছিলেন। অথচ এই দুটি গ্রন্থ সম্পর্কেই বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।[২] জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আহূত বিদ্বজ্জনসমাগমে (১২৮৭, ১৬ ফাল্গুন) 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ রায় উপস্থিত ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন,[৩]

"যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাল্মীকিপ্রতিভা' পড়িয়াছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে [ বাল্মীকির কবিত্ব লাভ পরিচ্ছেদে ] রবীন্দ্রবাবুর অনুগমন করিয়াছেন।"— বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আশ্বিন।

পরের বৎসরেই রবীন্দ্রনাথের 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হল। এই বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি হয়েছিল তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন জীবনস্মৃতিতে—

"সন্ধ্যাসঙ্গীতের জন্ম হইলে পর সূতিকাগৃহে উচ্চস্বরে শাঁখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্য কোনো প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি— রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর

২ 'চার অধ্যায়'এর ভূমিকায় (প্রথম সংস্করণ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ই তাঁর কাব্যের প্রথম অকুণ্ঠিত প্রশংসাবাদ করেছিলেন।— রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৩ খণ্ড, পৃ ৫৪১। এই উক্তি ঠিক নয়।

৩ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনস্মৃতি' ১৩৬৩, পৃ ২১১-১২।

গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন 'না'। তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইয়াছিলাম।"

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই (১২৮৯ সাল, ২ শ্রাবণ) জোড়াসাঁকোয় স্থাপিত সারস্বত সমাজে বঙ্কিমচন্দ্র হন সহ-সভাপতি। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। এই সমাজের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র; এবং বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়াও সহযোগী-সভাপতি ছিলেন শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু যোগ দেন নি। সেই বৎসরেই ২৩এ জানুয়ারি ১১ই মাঘের উৎসবে সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে বাড়ি থেকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে যান। সরলা দেবী চৌধুরানী 'জীবনের ঝরাপাতা'য় সম্ভবত এই দিনের স্মৃতিই লিখেছেন—

"একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল— দীর্ঘনাসা তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি বঙ্কিম।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সরলা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। ভারতীতে সরলা দেবীর 'রতিবিলাপ' এবং 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে বঙ্কিম নিজেই চিঠি লেখেন প্রশংসা করে। নিজের একসেট বইও বঙ্কিম নবীনা লেখিকাকে উপহার দিয়েছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাড়িতে বঙ্কিম এসেছেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে মধুর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। সরলা দেবী বঙ্কিমের 'সাধের তরণী' গানটিতে সুর দেন। 'শতগান'এ তার স্বরলিপিও দেওয়া আছে।

ঠাকুর-পরিবারের লেখক লেখিকা সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৌহার্দ্য ছিল যদিও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির আগে একটি ঘটনা ঘটে যা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কবিতাপুস্তক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শন ও ভ্রমরে প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুদ্র কবিতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনা 'ললিতা ও মানস' এই বইতে ছাপা হয়েছিল। ১২৮৫র ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় 'কবিতাপুস্তকে'র কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করা হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন 'ভারতী'র সম্পাদক।

"আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিমবাবুর 'কবিতাপুস্তক' আমাদিগের ভাল লাগিল না— জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ— সাধারণ, সামান্য অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থান পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না— বঙ্কিমবাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদগন্ধহীন— কিছুই না— হইবে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

এর পরেও 'ভারতী'তে বঙ্কিম সমালোচিত হয়েছিলেন। ১২৮৭ জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় সংখ্যায় জনৈক লেখক 'শকুন্তলা' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের শকুন্তলা সমালোচনার প্রতিকূল বিচার করেছিলেন। এরও প্রায় দশ বৎসর পর ১২৯৭এর কার্তিক মাসে 'ভারতী'তেই 'কাব্যের উদ্দেশ্য' নামে একটি প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে বঙ্কিমের রসসৃষ্টির মতবাদকেই আক্রমণ করা হয়েছিল। এইসব সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোনো যোগ হয়তো ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমের সম্বন্ধে কোনো অন্ধতাও যে ছিল না, এর থেকে সেটাও বোঝা সহজ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে বঙ্কিমের যে বিখ্যাত মতভেদ ঘটে সেটা ১৮৮৪র ঘটনা। বঙ্কিমের উক্তিতেই জানা যায় লিখিতভাবে বঙ্কিমের মতের প্রতিবাদের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কোনো মনোবাদ ঘটে নি। দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমের কাব্যের এবং সাহিত্যিক মতবাদের প্রতিবাদ হলেও ঠাকুর-পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগে কোনো ফাটল ধরে নি। একালের কোনো কোনো লেখক বঙ্কিম সম্পর্কে ঈর্ষা এবং সংকীর্ণতার ইঙ্গিত করেছেন বলে এই ঘটনাগুলিকে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'নবজীবনে' (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) এবং বঙ্কিমের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রচার'পত্রে (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রধান লেখক। এই দুই পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথও গদ্য পদ্য রচনা দিয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাদবিতর্ক আরম্ভ হল। বঙ্কিমচন্দ্র সাধারণত তাঁর সমালোচনার উত্তর দিতেন না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত বলেই বঙ্কিম উত্তর দিয়েছিলেন এবং প্রত্যুত্তরের আর উত্তর দেন নি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে অসাধারণ শালীনতা এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র করে লিখেছিলেন—

"এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে, যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

তার অন্য প্রমাণও আছে। এর কিছুদিন পরেই 'ভারতী'র লেখক-গোষ্ঠীতে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। আর-একটি প্রমাণ রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রায় শেষের দিকে রেখে গিয়েছেন। রবীন্দ্ররচনাবলী প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'বৌঠাকুরানীর হাটে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বঙ্কিমের একটি চিঠি স্মরণ করেছেন—

"সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য মাঝে মাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্নকরক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে বইটি যদিও কাঁচা বয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে— এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ছেলেমানুষির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এসেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"[৪]

---

৪ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এ সম্পর্কে আছে: "রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন?' উত্তর— 'পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে, কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধহয় রবি বেশি 'গিফটেড' কিন্তু 'পৃকোসাস', এখনি তার বয়স ২২।২৩, সে কথা সেদিন রবিকে বলেছি।'" সুরেশ সমাজপতি, 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ' পৃ ১৯৬।

রবীন্দ্রনাথও এই সময়ে বঙ্কিমের উপন্যাসের আলোচনা করেছেন।[৫] রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন বিচারবোধ যে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এই গদ্য রচনাগুলিতে স্পষ্টতই তার আভাস আছে। স্পষ্ট ভাষণের সাহসও দেখা গেল বঙ্কিমের সঙ্গে বিতর্কে। এর পরে আরো দুটি ঘটনা যোজনা করা যায়। ১২৯৯ সালের চৈত্র মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র চিঠি লিখে জানান 'প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে।' ১৩০০ সালে চৈতন্য লাইব্রেরিতে রবীন্দ্রনাথ 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে প্রবন্ধ পড়েন। সে সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সম্ভবত মৃত্যুর পূর্বে এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ সভায় যোগদান।

রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের পারস্পরিক সম্পর্কের এই বিবরণ অসম্পূর্ণ। অনেক খুঁটিনাটি তথ্য আরো সংগ্রহ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আরও বহুবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। এখানে আমরা মূল আলোচনার পটভূমিরূপে দুজনের প্রতি দুজনের মনোভাবের একটা আভাস মাত্র দিলাম।

আমাদের মূল আলোচনা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্ক থেকেই আরম্ভ করব। এই বিতর্কের মধ্য দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোঝা সহজ হবে। তবে এটা মনে রাখা দরকার বঙ্কিমচন্দ্র তখন তাঁর মনীষার পরিণত স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা তখন সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। 'সত্য' বলতে কি বোঝায় ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়েছে বলা যায়। বঙ্কিমের চিন্তার প্রণালী এবং বৈশিষ্ট্য যাঁরা অনুধাবন করেছেন, তাঁরা এটা বুঝতে পারবেন বঙ্কিমের সত্যের ধারণা 'মিস্‌টিক্যাল' বা অতীন্দ্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর যুক্তি এবং বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে কোনো অনির্দিষ্টতা থাকবার কথা নয়। উপনিষদের ঋষি যে সত্যধর্মের কথা বলেছিলেন, যার ব্যাখ্যাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই সত্যকেও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে যান নি। সেই ব্যাখ্যাতে সেকালের সমাজের প্রয়োজন কিছু মিটত না, পুরনো দর্শনের বড় জোর আর-এক নতুন ভাষ্য হত মাত্র। সত্যের যে পর্যায় আচার্য শঙ্কর স্থির করেছিলেন যুক্তির দিক দিয়ে তা অনতিক্রম্য। শঙ্করের সত্য-ধারণাতে সৃষ্টির খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়রূপেরই যথাযোগ্য স্বীকৃতি আছে। তবু শঙ্করের বৈদান্তিক মতবাদ খণ্ডের পূর্ণ মর্যাদা দিতে শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুপ্রেরিত করে নি। ফলে কর্ম-সাধনার দিক দিয়ে আমাদের জীবনে শূন্যতাই রয়ে গিয়েছে। মধ্যযুগের সমাজে বেদান্তের চর্চা হ্রাস পেয়েছে। উপনিষদেরই আর-এক ব্যাখ্যায় বৈষ্ণব দর্শনের সৃষ্টি হল। ঈশ্বর লীলাময় বলেই তাঁর বহু বিচিত্র লীলা রচনা করতে বৈষ্ণবরা অনেক নতুন আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছেন। ভগবানকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করাতে ভক্তের সঙ্গে যেন প্রত্যক্ষ যোগ গড়ে উঠল। আনুষ্ঠানিকতার উদ্ভবের বীজ নিহিত ছিল এখানে।

এই ধর্মবিশ্বাস এক দিকে যেমন বৈরাগ্যপ্রবণ করে তুলল তেমনি গৃহী মানুষের মধ্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিস্তার ঘটাল। স্মার্ত ধর্ম নামক যে বিশ্বাস বহু পূর্বকাল থেকে চলে এসেছে, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরোপলব্ধির ধর্ম সেটা নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যক্তির কর্তব্যপালনের বিধিনিষেধ দিয়ে স্মৃতির বিধান। বৈদিক গৃহ্য এবং ধর্মসূত্র থেকে স্মৃতির উদ্ভব, মধ্যযুগের জটিল আচারের জালে তার বিস্তার। আদিতে স্মৃতির ছিল তিনটি শাখা, আচার, ব্যবহার এবং প্রায়শ্চিত্ত। তার থেকে আহ্নিক সংস্কার শুদ্ধি

৫ ভারতী ১২৯০ অচলিত সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ ১৩১ 'বাউলের গান'।

প্রায়শ্চিত্ত শ্রাদ্ধ কৃত্য পূজা প্রতিষ্ঠা দান কাল ব্যবহার বিবাদ রাজধর্ম ইত্যাদি বহুবিধ কর্তব্য নির্দেশের ব্যবস্থা হল। ব্যক্তি ও পরিবারের প্রাত্যহিক কর্তব্য থেকে সনাতন সমাজগত কর্তব্য পর্যন্ত সর্বত্র স্মৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চৈতন্য-যুগ পর্যন্ত বাংলা দেশে অন্ততঃ চোদ্দ জন বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিতের নাম পাই। তাঁদের মধ্যে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের বিধানই আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে দীর্ঘকাল শাসন করে এসেছে। রঘুনন্দন পূর্ববর্তী বিধানের কতকগুলি গ্রহণ করেছেন, কতকগুলি মার্জনা করেছেন, কতকগুলি নিজে রচনা করেছেন। যে-কালে রঘুনন্দন এই ব্যবস্থা দিয়েছিলেন সে কালে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্টই বলেছেন—

"স্মার্ত রঘুনন্দন একজন বিষম protestant ছিলেন। তিনি গোঁড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব ভারতবাসীর বৈদিক গোঁড়ামির অপহ্নবকর্তা। তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি সকলের মধ্যে যে ব্যাপক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন তাহা অপূর্ব এবং অতুল্য। তাঁহারই প্রভাবে বাংলায় আচারীদিগের 'ছুংমার্গ' দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই।"

তবু এইসব আচার-বিচারের পশ্চাৎপটে ঠিক কোন্ গভীরতর দার্শনিক যুক্তি ছিল, জানি না। এ নিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচনাও অনাবশ্যক। পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে সমাজ যে আচারের জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছিল তাতে অর্থহীন অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটি চিঠিতে বঙ্কিম রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখেছিলেন—

"স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে— বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে— ইহা অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন— হিন্দুধর্ম সনাতন— তাঁহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে।"

অথচ এইসব বিধি-নিয়মগুলির পিছনে হয়তো একটা সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি ছিল। বৌদ্ধদের শীল আত্মিক উপলব্ধির জন্য নয়, ব্যক্তির মনকে সংযত করার জন্য। হিন্দুধর্মের উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় যে সত্যের ধারণা ছিল। তার সঙ্গে এই আনুষ্ঠানিকতার যোগ যে কোথায় ঠিক বলা যায় না। যেখানেই থাক্, এ যে অনিবার্যভাবে সত্যবোধে নিয়ে যেতে সাহায্য করে নি, তা বলাই বাহুল্য। মনের যে বিকাশ ঘটলে মানব-কল্যাণ ও ব্যক্তিগত শুচিতার যুক্তি-বুদ্ধি স্বয়ম্প্রকাশ হয়, সেই বিকাশের দ্বার রুদ্ধই ছিল। গীতায় যে নীতিসর্বস্বতার উর্ধ্বে যাওয়ার আহ্বান আছে, সেটা তো চিত্তোন্নতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই প্রশস্ত দৃষ্টিই মানুষকে কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা এনে দেবে। আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে, মধ্যযুগে আচার-সর্বস্বতা অন্ধতার সৃষ্টি করে চিত্তোন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করেছিল। এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। উচ্চতর দার্শনিক সত্যবোধকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যদি নাও পেয়ে থাকি, তবু এর একটা অলক্ষ্য প্রভাব আমাদের জীবনাচরণে থেকে গিয়েছে। সত্যকে ধ্রুব বলেই জানি, তাই আমাদের প্রাত্যহিক কর্ম স্থিরতাপন্থী হয়ে সামাজিক অচলতার সৃষ্টি করেছে। আমরা বরণ করে নিয়েছি অভ্যাসকে।

সমাজজীবনের এই জড়তার বিরুদ্ধে রামমোহন যুদ্ধ করেছিলেন। মধ্যযুগের সংকীর্ণ সত্য ধারণাকে অস্বীকার করে তিনি জীবনের কল্যাণবোধকে উদারতর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সামাজিক সংস্কার-কর্মগুলি কোন্ প্রবল সর্বব্যাপী সত্যের অনুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আনুমানিক উত্তর ছাড়া এই প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া কঠিন। তিনি

ছিলেন শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবাদী। নির্গুণ ব্রহ্মচেতনা তাঁকে কেমন করে সংসারের কর্মভার তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, অর্থাৎ সত্যের কোন্ রূপ তিনি অন্তরে অনুভব করেছিলেন যার জন্য সাধক রূপান্তরিত হলেন কর্মীতে? রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের প্রসঙ্গে বার বার সত্যসাধনার কথা বলেছেন। তাঁর মতে যে দেশাচার সমাজকে বিশ্বমানব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, রামমোহন তাকেই ঘুচিয়ে বৃহৎ ঐক্যের কথা প্রচার করতে এসেছিলেন। রামমোহনের সত্যধারণা ঐক্যবোধের উপরেই স্থাপিত। তিনি যে অদ্বৈতপন্থী হয়ে প্রতিমাপূজা ও ধর্মের অন্যান্য সংকীর্ণতার বিরোধিতা করেছিলেন, সেটা এই ঐক্যবোধ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু এই ঐক্যবোধ এবং ব্রহ্মানুভূতি এক নয়। বরং বলা যায় তাঁর প্রখর বুদ্ধির জাগরণের ফলে যেসব দিক দিয়ে তাঁর মনে ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছিল, ধর্ম তাদের অন্যতমমাত্র। এ জন্য প্রত্যাশিত শান্তরসাশ্রিত জীবন তাঁর নয়। তাঁর জীবন ছিল বজ্রদীপ্ত কর্মময়।

এই বুদ্ধি নীতিরই বুদ্ধি। রামমোহন সমাজের সংস্কারে বাঙালীকে আহ্বান করেছেন, নৈতিক চেতনাই তার প্রেরণা। প্রতি কর্ম-প্রচেষ্টার মূলে বিচ্ছিন্ন ও অন্যনিরপেক্ষ নীতির চেতনাই ছিল। তাঁর সমগ্র জীবন ব্যক্তিগত এবং সমাজগত একটি সামগ্রিক সত্যোপলব্ধি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—এমন করে রামমোহনের জীবনকে ব্যাখ্যা করা না গেলেও এটা ঠিক যে মধ্যযুগের বিকৃতি থেকে সত্যকে ঐক্যবোধরূপে রামমোহনই পুনর্জীবিত করলেন এবং সেটা যুগান্তর ঘটাল আমাদের সমাজে।

কারণ, দেখতে পাচ্ছি ডিরোজিওর ছাত্ররা রামমোহনের এই নৈতিক আদর্শকেই মেনে নিয়েছেন। রামমোহনের সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেব নব্যবঙ্গের নেতৃত্ব করেছিলেন। রামমোহনের সংস্কারকর্মে তাঁরা উৎসাহিত হয়েছেন, রামমোহনের স্মৃতিবার্ষিকী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। নব্যবঙ্গেরা নিজেদের কোনো দার্শনিক মতবাদকে সৃষ্টি করে তুলতে পারেন নি, যদিও বিদেশী শাস্ত্রের চর্চা করে প্রখর বিচারবুদ্ধিকে আয়ত্ত করেছেন; সভা স্থাপন করে, পত্রিকা চালিয়ে, সমাজ ও ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছেন। বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং তার পরেও নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা খুবই বেশি হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিফর্মার' পত্রিকাটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাঙালীকে নীতিশিক্ষা দেবার মহৎ ব্রতই নিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ব্রাহ্ম মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেই নীতিশিক্ষার উপর সব সময়েই জোর দিয়েছেন। ডিরোজিও ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেন নি, জাগিয়েছিলেন অপরিসীম নীতিনিষ্ঠা এবং বিচারশক্তি। তখন এমন কথাও শোনা যেত হিন্দু কলেজের ছাত্র মিথ্যা বলতে জানে না—Indeed the College boy was a synonym for truth. কথাটা গৌরব করবার মত, যদিও অভিভাবকেরা ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন নিজের সমাজধর্মের প্রতি নীতিপালনের অনিচ্ছা দেখে। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্তরা চিরাচরিত সমাজনীতিকে মানতে পারে নি। তাদের বিচারশক্তিকে তারা প্রয়োগ করল নূতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং তাই দিয়ে তারা স্থির করে নিল সত্যের নূতন স্বরূপকে। রামমোহনের সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই যে, নব্যবঙ্গের যুক্তিতর্কের ভাষা ও প্রণালী বিদেশীয়; স্বদেশী সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও অগভীর। কিন্তু সমাজের আনুষ্ঠানিকতায় যে নীতিবোধের মৃত্যুকে তারা দেখেছিল, সেই নীতিকে অন্যভাবে তারা চেয়েছিল ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তাদের কাছে ভগবান নয়, লোকব্যবহারের সততাই হচ্ছে চরম সত্য। এর মধ্যে খ্রীষ্টীয় আদর্শ হয়তো ছিল, তার সঙ্গে ছিল বিদেশী বিদ্যায় দীক্ষা। তাই দিয়ে তারা স্থির করেছে নৈতিক সত্যকে। স্বাধীন

বিচারবোধ সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য কিন্তু এর কোনো সর্বস্বীকৃত নিরিখ নেই, এটাই এর ত্রুটি। সুতরাং নৈতিক সত্য থাকল সম্পূর্ণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে এই নৈতিক আদর্শ পুরোপুরিই পেয়েছিলেন। তিনি অধ্যাত্মবাদী হয়ে উঠলেন, বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসও করেছিলেন, কিন্তু পরে মতের পরিবর্তনও হয়েছিল। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত সত্যধর্মকে অবলম্বন করে শাস্ত্রবচন বাছাই করলেন অর্থাৎ ব্যক্তিতান্ত্রিক জ্ঞানদীপ্ত বিচারবোধই বড় হল। স্মরণীয় এই যে অক্ষয়কুমার দত্ত এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবেই তাঁর মত তিনি পরিবর্তন করেছিলেন। নব্যবঙ্গের নীতিবাদিতার সঙ্গে যুক্ত হল ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা। দেবেন্দ্রনাথের পর কেশবচন্দ্রের আদর্শও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপূর্ণ সত্যবোধের দ্বারাই তৈরি হয়েছিল। শেষ পরিণাম হল মরমিয়াবাদ।

মধ্যযুগের বাঙালী সত্যকে কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও হৃদয়হীন সংস্কারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ও বিকৃত করে এনেছিল। সতীদাহ যারা পালন ও সমর্থন করেছে, তারাও সত্যপালনের আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। কৌলীন্য এবং বহু বিবাহের স্মার্ত নির্দেশকে মহানন্দে শিরোধার্য করেও তারা ভাবল, ধর্ম পালন করল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে সত্যধারণার পরিবর্তন ঘটতে চলল। সত্য হল মানবনৈতিক। অর্থাৎ সত্য দেখা দিল শাস্ত্র-পুঁথির বাইরে ব্যবহারের জগতে। সমাজ সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদয় হয়েছে। বিদেশী সাহিত্য ধর্ম ও সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মানুষের আচরণের বিস্তৃত ক্ষেত্র নিয়ে এই সমাজের ধারণা গড়ে উঠেছে। এই জগতে সত্যপালনের কোনো লিখিত শাস্ত্র নেই। পুরনো সংহিতা এবং স্মৃতি থেকে আর বিধান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। স্বভাবতই প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়াল ব্যক্তিরই বিচারবোধ। বাংলার নতুন যুগের লব্ধ সম্পদগুলির মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ অন্যতম।

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট সতর্ক হওয়া দরকার। পুরনো সমাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। ইংরেজি শিক্ষা যারা পায় নি (এবং যারা পেয়েছে তাদের মধ্যেও অনেকে) এখনো পুরনো বিধানকে মেনে চলে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বলি আর নতুন মূল্যবোধই বলি— এর উদ্ভব এবং প্রতিপত্তি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে। বঙ্কিম যা লিখেছিলেন, তা শিক্ষিত সমাজের জন্যই। ইংরেজি বিদ্যা এবং শাস্ত্র থেকেই তিনি প্রামাণ্যতা সংগ্রহ করেছেন, ধর্মতত্ত্বের মূল থিয়োরি তৈরি হয়েছিল ইংরেজি দর্শনের প্রভাবে। বঙ্কিম নিশ্চয়ই আশা করেন নি তাঁর রচনা সাধারণ লোকেরা বুঝবে। নব্যবঙ্গেরাও কি সেই আশা করেছিল? এই শিক্ষিত সমাজ স্বাধীন বিচারবোধে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। বঙ্কিম এই বিচারবোধকে শ্রদ্ধা ও লালন করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম যখন বলেছিলেন, লোকহিতৈষার লক্ষ্য সম্মুখে রেখে মিথ্যা কখনো কখনো সত্য হয়, তখন কি তিনি শিক্ষিত মনের বিচারবোধের উপরেই ভরসা রাখেন নি? এ বিষয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে একটা অনড় নীতিকে পালন করার অর্থ সেই অভ্যাসেরই বশ্যতা স্বীকার করা যে অভ্যাসের বুদ্ধিহীন বিচারহীন হৃদয়হীনতাকেই আধুনিক শিক্ষা ধিক্কার দিয়েছে। বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সত্য কোনো অবস্থাতেই মিথ্যা হয় না। এ সত্য কোন্ সত্য? এও যেন কোনো স্মার্ত সত্য। বঙ্কিম এই অচল সত্যকে অনুগমন করার পরিবর্তে চেয়েছিলেন বিচারবুদ্ধি দিয়ে সত্যকে বারবার নির্ধারণ করে নিতে।

প্রশ্ন হতে পারে মিথ্যাকে যদি এমনি করে সত্য করে তুলতে হয়, তবে কি তার মধ্যে অপব্যবহারের মস্ত ফাঁক থেকে যায় না? বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার মধ্যে সেই আশঙ্কা চিরকালই নিহিত। অশিক্ষিত মন অনেক সময়েই স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খল স্বার্থসাধনে পরিণত করতে পারে। এই জন্যই খ্রীষ্ট এবং বুদ্ধের

নীতি। এইজন্যই যত অনুশাসন এবং বিধি। এক সময়ে অবস্থাবৈগুণ্যে এই বিধিও অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন তাকে মেনে চলাই হয় দুর্ভোগ। এ রকম অচল বিধির চেয়ে চিত্তের বিচারবোধকে জাগ্রত রাখার আবশ্যকতাই বেশি। অর্থাৎ চাই একটি মার্জিত সভ্য জাগ্রত মন যে-মন ন্যায় এবং অন্যায়, উচিত এবং অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিম মনের সেই অনুশীলনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ধর্মতত্ত্বের (নবজীবনে ধারাবাহিক প্রকাশ ১২৯১-৯২) আলোচনার সূত্রপাতেই প্রচারের প্রথম সংখ্যাতে (১২৯১) 'হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধ প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। সরলা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এ তথ্য মূল্যবান্।[৬]

তা হলে সত্যকে নির্ণয় করা চলে একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই। অতীন্দ্রিয় সত্যের কথা হচ্ছে না যদিও সেই সত্য তপস্যার দ্বারাই লভ্য। যে-সত্যকে নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংশয়-বিচার-বিতর্ক ঊনবিংশ শতকে হয়েছে তা হচ্ছে তার লোকব্যবহারে প্রযোজ্যতা। আমাদের আলোচ্যও তাই। বঙ্কিম বলেছিলেন সত্যের নৈতিক রূপ আছে এবং সেই রূপকে স্থির করতে হয় শিক্ষা দিয়ে। এই শিক্ষা যে কি বঙ্কিম তা বুঝিয়েছেন ধর্মতত্ত্বে। 'ধর্মতত্ত্ব' বইটা মূলত শিক্ষাবিধির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেই রচিত। অনুশীলনতত্ত্ব শিক্ষারই তত্ত্ব। বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনের দ্বারাই আদর্শ মনুষ্যত্ব গড়া সম্ভব। বঙ্কিম স্বপ্ন দেখেছিলেন, শিক্ষার দ্বারা বিবেকবান্ কর্মনিষ্ঠ মানুষকে গড়ে তুলবার।

বঙ্কিম ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকের কাছেই এই বাণী পরিবেশন করেছিলেন। ধর্মতত্ত্বের জটিল যুক্তি এবং প্রমাণ কি অগণ্য সাধারণ মানুষ অনুধাবন করতে পারত?[৭] বলা বাহুল্য, শুধু নিরক্ষর পাঠকের কথা নয়। মোটামুটি লেখাপড়া জানা মানুষের অন্তরকেই তো জাগানো দরকার। শশধর তর্কচূড়ামণি, কেশবচন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ বা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের মত জনসমাজে বক্তৃতা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শ্রোতার কাছে প্রাঞ্জল করবার চেষ্টাও তিনি করেন নি। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত নয়, গ্রহণক্ষমতা পরিণত নয়, তারা বঙ্কিমের বক্তব্য কতখানি বুঝতে পারবে সন্দেহ। আবার মাত্র বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনের জন্যই ধর্মতত্ত্ব রচিত হয় নি। বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সময়েই তিনি শিক্ষাকে দূরবিস্তৃত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে দেশের বিস্তীর্ণ অবশিষ্ট সমাজের যে প্রভেদ জন্মে গিয়েছিল বঙ্কিম তার জন্য শঙ্কিত হয়েছিলেন—[৮]

"সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোনকালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

---

৬ সরলাদেবী চৌধুরানী, 'জীবনের ঝরাপাতা' ১৮৭৯ শক, পৃ ৩৫।

৭ "এই অনুশীলন ধর্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে মনস্বিগণ কর্তৃক ইহা গৃহীত হইলে ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে।" ধর্মতত্ত্ব, ২১ অধ্যায়।

৮ 'বঙ্গদর্শন' পত্রসূচনা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় প্রতিষ্ঠাতাদের পরিকল্পনা ছিল শিক্ষাকে পরিস্রুত করে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বঙ্কিম এই শিক্ষাকল্পনাকে পরিহাস করে বলেছেন—

"বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে। কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষার এরূপ প্রভেদ থাকে যে বিদ্বানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?"

'সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে' বঙ্কিম এই বিশ্বাসটিকে দৃঢ়ভাবেই ধরেছিলেন নিশ্চয়, তা না হলে এই দুরূহ আলোচনার অবতারণা করতেন না, 'পপুলার' বা লোকপ্রিয় আলোচনাই করতেন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাতেই যে এইসব আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, এ বিশ্বাসও তিনি শেষজীবন পর্যন্ত অটুট রেখেছিলেন। রাজশাহীতে ১২৯৯ সালে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার হেরফের' পড়লে বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চিঠি লিখেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য ছিল দুটি: প্রথমত বাংলা ভাষা শিক্ষা, দ্বিতীয়ত শিক্ষণীয় বিষয়কে জীবনের অঙ্গীভূত করে কাজে পরিণত করা। 'সাধনা'য় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন[৯]—

"এ বিষয়ে আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আলাদা আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে নি। বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে মনুষ্যত্ব অর্জনের কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"তাহাদের গ্রন্থজগৎ একপ্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্যপ্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক একদিকে য়ুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে লালন করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লূতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্যদিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না।"

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'শিক্ষার হেরফের'। বঙ্কিম অবশ্য হিন্দুধর্মের সু এবং কু সংস্কারগুলি বাছাই করার ক্ষমতা অর্জনের কথা একাধিকবার বলেছেন। উদ্ধৃতাংশের বক্তব্যই ছিল শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। পরে শিক্ষা সম্বন্ধীয় সব আলোচনাতেই তিনি সামাজিক জড়তা ও আচারপরায়ণতার বদলে মুক্তবুদ্ধি মানব ঐক্যের শিক্ষাকেই যথার্থ শিক্ষা বলেছেন। 'কালান্তরে' 'সমস্যা' এবং 'সমাধান' নামে প্রবন্ধ দুটিতে এই কথাই প্রভূততম জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে—

"অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হারিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমুখে আমরা দেশজোড়া পরবশতার পাথর চাপিয়ে বসেছি। এইটেই যখন আমাদের সমস্যা, তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না।"

---

৯ রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ৬১৬।

বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণ বিকাশ যেমন বঙ্কিমের শিক্ষার লক্ষ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাতেও লক্ষ্য ছিল তাই। বঙ্কিমের কাছে বুদ্ধির চর্চা ছিল সমাজস্থিতি এবং লোককল্যাণের জন্য, রবীন্দ্রনাথের কাছে বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য। দুজনেরই কাম্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ হলেও বঙ্কিম-কল্পিত ব্যক্তিত্ব সংযমিত (controlled) কারণ সমাজ ও জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপ্রাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনো সীমা নেই, কারণ বুদ্ধির সীমাহীনতা কখনোই অবাঞ্ছনীয় নয়। দুজনের মধ্যে তুলনা করবার প্রধান অসুবিধা এই যে রবীন্দ্রনাথ যেমন এ বিষয়ে তত্ত্বগত আলোচনা করেন নি, বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি প্রয়োগগত আলোচনা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তায় বঙ্কিমের তত্ত্ব যথাযথ পুনরাবৃত্ত হয়েছে বলা না গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার যে পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে বঙ্কিমের শিক্ষাপ্রকৃতির কিছু মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে তখন দেশ ও সমাজের একটা সম্পূর্ণায়ত বাস্তব চেহারা ছিল। স্বদেশী সমাজ, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি আদর্শ সামনে থাকাতে শিক্ষাকে একটা ছাঁচে ঢেলে ব্যক্তিত্বের সংযত বিকাশ ঘটাবার দিকে তাঁর একটা ঝোঁক ছিল। এর জন্য কতকগুলি বিশিষ্ট পন্থাও তাঁর কল্পনায় ছিল, যেমন— ব্রহ্মচর্য, গুরুগৃহবাস, প্রকৃতির সাহচর্য। স্কুল-কলেজের শিক্ষাকে সেকালে তিনি বলেছিলেন কল— তাতে সমান মাপের মানুষ তৈরি হয় মাত্র। প্রকৃতির সাহচর্যের কল্পনা তাঁর মনকে রঞ্জিত করেছিল। মনকে স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পেতে দিতে হবে[১০]—

"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে এমনতরো মানুষ তৈয়ারি করিবার প্রণালী এক আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না ও পরের কাজের জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র এমন মানুষ তৈরির বিধান অন্যরূপ।"

এইজন্য শুধু বই পড়ার শিক্ষাকে তিনি মনে করেছেন ক্ষতিকর। জীবনের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তারই উপর শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলা দরকার। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা প্রকৃতির শিক্ষার চিন্তা এমন করে বঙ্কিম করেন নি। এজন্য বঙ্কিমের শিক্ষাপদ্ধতি পুথিঘেঁষা তাতে মননবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনেই চেষ্টা নিবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুভূতিকে ( feeling ) ধারালো করবার দিকে বেশি জোর পড়েছিল।

পরের যুগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্বন্ধে মূল মতের খুব বেশি পরিবর্তন না করলেও পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য ইত্যাদির উপর মোহ কমে এসেছিল; তাঁর উদ্দেশ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছিল চিন্তার স্বাধীনতার উন্মেষের দিকে। এককালে শিক্ষার মধ্যে স্বাদেশিক মনোভাবের যে প্রাধান্য তিনি দিয়েছিলেন পরে তাও হ্রাস পেয়েছিল। বিদ্যার যেমন গণ্ডী নেই, চিন্তার রাজ্যের ব্যাপকত্বারও তেমনি গণ্ডী নেই। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত মত অবশ্য উল্লেখযোগ্য। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতন পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতে চায় না।"

---

১০ রবীন্দ্ররচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ২৯৩, 'শিক্ষাসংস্কার'।

এই মতটি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে প্রবলভাবে ধ্বনিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা আধুনিকতর পদ্ধতিতে পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু যে সময় তিনি এ কথা বলেছিলেন তখন দেশে গান্ধীজির আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের মুখর উন্মাদনা (১৯২১)। বিশ্ব থেকে সংকুচিত করে বাঙালী বা ভারতবাসীকে স্বাজাত্যবোধের অন্ধতায় বন্দী করবার উদ্যমের বিরুদ্ধেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদ। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বমনস্কতার সঙ্গে শিক্ষার বিশ্বতোমুখিনতাও সম্পর্কিত। তবু, আধুনিক বাংলার প্রবণতাকে যাঁরা গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে এসেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার কথা রামমোহন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ পর্যন্ত কে না বলেছেন? বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পরে 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩১৫ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালে পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধ্যে ভাবের মিলনের ইতিহাস দিয়েছেন। পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের মিলনের কাজে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন রামমোহন, রাণাডে, বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ পরে যেসব প্রসঙ্গে পূর্বে পশ্চিমে সহযোগিতার উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় 'কালান্তর' এবং 'সভ্যতার সংকট'। পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করব না, এমন প্রস্তাব সর্বনাশকর। উনবিংশ শতাব্দীর এই মূল ভাবনা বিংশ শতাব্দী পুরোপুরি গ্রহণ করে বিকাশ ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই শতাব্দীর উত্তরসূরী।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানকে গ্রহণ ও স্বীকরণের মধ্য দিয়েই আধুনিকতার সর্বময় প্রসার শুরু হয়েছে। বঙ্কিম কি তার বিরোধিতা করেছিলেন? বঙ্কিমের নবমানবতার কল্পনা ও যুক্তিবাদিতা— এসবের মূলে পাশ্চাত্য বিদ্যার পূর্ণ প্রভাব তো ছিলই শিক্ষার নির্দিষ্ট বিষয়গুলিও পশ্চিমী সংস্কৃতি থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সে দেশের Physics, Chemistry, Astronomy। তাঁর কল্পিত মনুষ্যত্ব এসব জ্ঞানকে আয়ত্ত না করে তৈরি হতে পারে না। ধর্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার এক দানবী মূর্তি এঁকেছিলেন এবং তার বিষশ্বাস যেন আমাদের সমাজকে আচ্ছন্ন না করে সেই সতর্কতাও তিনি সেই সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। কেউ কেউ একে বঙ্কিমের পাশ্চাত্যবিমুখতা এবং অন্ধ জাতীয়তার দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন। এ রকম মত যে একেবারেই ভ্রান্ত তার প্রমাণ, রবীন্দ্রনাথও অন্ধ স্বাজাত্যবোধকে যে বইতে সমালোচনা করেছেন সেই 'মুক্তধারা' নাটকেই যন্ত্র-সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। 'শিক্ষার মিলনে' রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"কলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; তা হলে কলের বাইরে কিছু যদি না থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আত্মীয়কে খোঁজে সে দাঁড়ায় কোথায়? এক রোখে বিজ্ঞানের চর্চা করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর জন্যে আর জায়গা রাখলে না। একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি। আর ওরাই কি এক ঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌচচ্ছে?"

বলাই বাহুল্য এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের একটা দিক মাত্র। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি শিল্পযন্ত্র কলকারখানাকে রবীন্দ্রনাথ একান্ত বর্জনীয় মনে করেন নি তবে যন্ত্রশিল্প যদি মানুষকে অর্থগৃধ্নু ও শক্তিমদমত্ত স্বার্থান্ধ করে তোলে, তবে যে মানব-ঐক্যের উপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সত্যধারণাকে স্থাপিত করেছিলেন সেই ঐক্যই বিধ্বস্ত হবে। এ সম্পর্কে হয়তো আরও অনেক আলোচনার অবকাশ

আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার দরকার নেই। এটুকুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতোই মনুষ্যত্বের সার্থকতার চিন্তাই করেছিলেন। যন্ত্র-সভ্যতার নীতিহীন বিকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই বিরোধী।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে 'ধর্মতত্ত্ব' রচনায় নিরত, সেই যুগেই তাঁর মনে জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। ধর্মতত্ত্বে (রচনা ১৮৮৪) দেশপ্রেম ঈশ্বরভক্তির নীচেই নির্দিষ্ট হয়েছিল। 'আনন্দমঠ' ১৮৮০র কাছাকাছি সময়ে রচিত। জাতীয়তাবাদের পর্যালোচনা এবং ধর্মালোচনা একই সঙ্গে ঘটতে থাকায় এমন অনুমান করাই স্বাভাবিক যে মানবধর্ম থেকে দেশপ্রীতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ধর্মতত্ত্ব বইটা থেকেই অবশ্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট হওয়া যায়। তবু উল্লেখ করছি এই কারণে যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের একটা বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করলেন যাকে অধ্যাত্মসাধনার বহির্ভূত করা চলল না। দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত হল এক গভীর পুণ্যবোধ। যারা দীর্ঘকাল সামাজিক আচার পালনকেই জীবনের চরম কর্তব্য বলে ভেবে এসেছে তাদের কাছে তিনি এক নতুন অনুষ্ঠেয় কর্মের বাণী শোনালেন। একদিকে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনা, আর-একদিকে দেশপ্রীতির ধর্ম এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন না হলেও 'আনন্দমঠ' বইখানি এ বিষয়ে খানিকটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি করেছে, এ কথাও সত্য। ইংরেজ-রাজত্বকে স্বীকার করার কথা বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্যান্য জায়গায় থাকলেও আনন্দমঠের উপসংহারে যে ভাবে কথাটা এসেছে সেটা আকস্মিক বলেই মনে হয়। উপন্যাস-শিল্পের এই ত্রুটির কথা ছেড়ে দিলেও বঙ্কিমচন্দ্র দেশের মাতৃমূর্তি সাধনায় যে-আবেগ সৃষ্টি করলেন তা সত্যই অভূতপূর্ব। দুটি সমালোচনা এর সম্পর্কে ওঠে। প্রথমত এই দেশপ্রেম সাম্প্রদায়িক রূপকল্পনাকে প্রতীক করায় সর্বজনীন আবেগ তাতে প্রকাশ পেতে পারল না, দ্বিতীয়ত এই দেশপ্রেম অতীত ঐতিহ্য নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বলে সম্মুখের আকর্ষণ সমাজের কাছে তত প্রবল হয়ে উঠতে পারল না।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমযুগের কতকগুলি আদর্শ যে গ্রহণ করেছিলেন তা আমরা দেখেছি। ব্যক্তির বিচারবোধ উন্মেষের জন্য শিক্ষা, মানবিকতার ধর্ম, ইংরেজের সহযোগিতা—এ সবই রবীন্দ্রনাথ মেনে নিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বড় আদর্শ ছিল এই দেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথও এই দেশপ্রেমকে সমাজকে জাগাবার একটা উপায় বলে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ যখন চিন্তাক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন দেশপ্রেমের সঙ্গে রাজনীতির মিশ্রণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা বললেও রাজনীতির জনয়িতা বলতে রাজী নই। আমাদের দেশে রাজনৈতিক বুদ্ধির উদ্ভব ও বিকাশ অন্যভাবে হয়েছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও জমিদার-সভার মধ্য দিয়ে অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারাই এ দেশীয় রাজনীতির সূচনা হয়েছে। দেশপ্রেম এবং রাজনীতি আলাদা বস্তু, যদিও দেশপ্রেম রাজনীতিকে আশ্রয় করেই শাসনতান্ত্রিক অধিকারকে হস্তগত করবার চেষ্টা করে। বঙ্কিমের দেশপ্রেমে অন্ধতা একেবারেই ছিল না। যিনি ইংরেজের সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন "ইউরোপীয় patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব।" তাঁর দেশপ্রেম যে অন্ধ ছিল না এ কথার বিস্তৃত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। দেশপ্রীতি

এবং সার্বলৌকিক প্রীতির মিলনের কথা তিনি বার বারই বলেছেন।[১১] রবীন্দ্রনাথ 'মুক্তধারা' নাটকে এবং নানা রচনায় পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন, সেই আবেগ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন এবং সেকালের সন্ত্রাসবাদ নামে অভিহিত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরে একটা পথ খুঁজে নিয়েছিল। তাতে ছিল মারাঠা নেতা বালগঙ্গাধর টিলকের গভীর প্রেরণা। বঙ্কিম দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের আবেগ। সেটা যে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান্ করল ঠিক এই পথটিতে বঙ্কিমের সম্মতি থাকত কিনা সন্দেহ, অন্তত আনন্দমঠের উপসংহার থেকে এই সন্দেহ জাগে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু দেশপ্রেমকে রাজনৈতিক গর্ত থেকে উদ্ধার করবারই চেষ্টা করেছেন। সেই বঙ্কিম-সৃষ্ট দেশানুরাগ তিনি জাতিকে সংহত করবার কাজেই লাগাবার আয়োজন করেছিলেন। এই স্বপ্ন বঙ্কিমের। বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্কিম লিখেছিলেন—

"বাঙালী মহারাষ্ট্রী তৈলঙ্গী পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে।"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রবন্ধটির পুনর্মুদ্রণের সময় পাদটীকায় বঙ্কিমের মন্তব্য ছিল "এখানে যাহা কথিত হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহা সিদ্ধ করিতেছেন।" কংগ্রেসে তখন ইংরেজি ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা চলত। বিদেশী ভাষার দ্বারা কার্যপরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ পরে প্রবল আপত্তি করেছিলেন এবং তাঁর যুক্তিও প্রবল ছিল। কিন্তু বঙ্কিমের দেশানুরাগ যে একটা সংহতির কল্পনা করেছে, সেটাই লক্ষণীয়। তিনি কংগ্রেসের এই উদ্যম দেখে গেলেন মাত্র। তার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় দেখা দিল জাতিগত সংহতি সৃষ্টির স্পষ্টতর প্রয়াস।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমে কেন যে নিবিড় অতীত-ধ্যান বল দিয়েছিল তার রহস্য অনেকেই বুঝেছেন বলে মনে করেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যেসব ভারতবাসী রাজত্ব স্থাপনে সহায়তা করেছিল এবং পরের যুগে যারা ইংরেজি জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়েছিল, তাদের সকলের মধ্যেই একটা মূল জিনিসের অভাব ছিল, তার নাম আত্মমর্যাদাবোধ। একদিকে উন্নততর সাহিত্য ও জ্ঞানসাধনা আর-এক দিকে উন্নততর নৈতিক বুদ্ধি— এ দুয়ের সম্মুখীন হয়ে স্বভাবতই নিজেদের সম্পর্কে গর্ব করবার বা মর্যাদা বোধ করবার মত বস্তু সমসাময়িক বা নিকট-অতীতে কিছুই পাওয়া যায় নি। সে জন্যই একা বঙ্কিম নন, সেকালের সবাই প্রাচীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির দিকেই বিশেষ করে চোখ ফিরিয়েছিলেন। জাতিকে আত্মসচেতন করতে হলে এ ছাড়া আর কীই বা করবার ছিল? রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ ধর্মের প্রত্যয় সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এসবের মূলেও প্রচ্ছন্ন ছিল দেশানুরাগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন এগিয়ে এলেন, তখন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে যতখানি শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম নিয়ে আমাদের আধুনিক সমাজের যাত্রা শুরু হয়েছিল, এই শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই তাতে ভাঁটা পড়তে শুরু হল। একটা কারণ তো খুবই আধিভৌতিক। যতটা আশা করা গিয়েছিল, শাসনকার্যে ইংরেজ বাঙালীকে ততখানি বিশ্বাস করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে পঠিত রবীন্দ্রনাথের 'ইংরেজ ও

---

১১ ধর্মতত্ত্ব ২৫ অধ্যায়।

ভারতবাসী' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ইলবার্ট বিলও মোহভঙ্গ করতে সহায়তা করেছিল। তার সঙ্গে আরও কারণ অবশ্যই ছিল।

ইংরেজ চরিত্রের পরিচয় যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হতে লাগল, তাতে আর অতটা হীনতাবোধের প্রয়োজন হল না। দেশপ্রেম থাকল, অতীত-গর্বও হয়তো থাকল কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আর-একটা দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ইংরেজের কাছে চাকরির প্রত্যাশায় বা ভালো ইংরেজি বলার বাহবার লোভে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকসমাজের বাইরে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখলে চলবে না। অনেক দিন পরে নিজের রাজনৈতিক মতের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন[১২]—

"সাধনা পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি।··তখনকার পলিটিক্‌সের সমস্ত আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই রাষ্ট্রসম্মিলনীতে গ্রাম্যজনমণ্ডলী সভাতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারিতেন না।"

কারণ এ পর্যন্ত ইংরেজি জানা শ্রোতাই ছিল সকলের বক্তৃতা ও ভাষণের লক্ষ্য। দেশপ্রেমের বর্ষণ চলত শুধু শিক্ষিত সমাজের ক্ষুদ্র সরোবরটিতে। আর সমস্ত দেশ থাকত রসহীন নিরুদ্যম শতাব্দীর সংকীর্ণ বুদ্ধিতে মোহগ্রস্ত। কংগ্রেস যদিও বিভিন্ন প্রদেশের যোগ রচনার ভার নিয়েছিল, তবু সেও ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ। দেশের অন্তঃস্থলে ঐক্যের যোগকে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের এসব উদ্যম দেশানুরাগমূলক বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নয়। আমাদের পল্লীকেন্দ্রিক সমাজের মধ্যে যে অনৈক্য, আচারের যে শতধা বিচ্ছিন্নতা ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা সমস্ত দেশকে একচিত্ত করে তুলবার পথে বাধা সৃষ্টি করে আছে, রবীন্দ্রনাথ বারবার তাকে দূর করবার কথা বলতে লাগলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও তিনি এ কথা বলতে বিরত হন নি। ইংরেজকে দোষারোপ করবার আগে নিজেদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধকে জাগাবার এবং সামাজিক বিভেদ দূর করে ঐক্য সৃষ্টির কথা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনই বারবার বলে গেলেন। সেকালে জোর পড়েছিল বাঙালী সমাজের ভূমিকার উপর, পরের যুগে জোর পড়েছিল ভারতীয় এবং বিশ্বসমাজের ভূমিকায়। গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর যেটুকু মতভেদ ঘটেছিল, তা ঠিক এই নিয়েই। নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-যুগ এবং তাঁর যুগের তুলনা করতে গিয়ে ভাবের বিচিত্রগামিতার উল্লেখ করেছিলেন। বাঙালী-চিত্ত যে এখন নিছক তত্ত্ব এবং চিন্তাচর্চা ছেড়ে সাধারণ লোকজীবনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সেই ইঙ্গিত আছে নবপর্যায় বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়।

"এখন বঙ্গসাহিত্য অতি দূরবিস্তৃত। এখনকার সম্পাদকের একমাত্র চেষ্টা হইবে বর্তমান বঙ্গচিত্তের শ্রেষ্ঠ আদর্শকে উপযুক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়াতে চিরস্থায়ী সত্যের সহিত বিচিত্র মৃগতৃষ্ণিকার প্রভেদ নির্ণয় করা দুরূহ হইয়াছে। এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণও স্বভাবতই নানাশক্তির দ্বারা নানাপথে আকৃষ্ট হইতেছেন।"

---

১২ কালান্তর, 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত'।

ইংরেজ-চরিত্রের সম্বন্ধে মোহ কেটে গেলে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন নিজেদের মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবার জন্য। কিন্তু মনে রাখা দরকার এই মোহভঙ্গের ফলে ইংরেজ-চরিত্রেই যে অবিশ্বাস এসেছিল তা নয়। ইংরেজ জাতির চারিত্র্যশক্তি বরাবরই শ্রদ্ধার যোগ্য ছিল। অশ্রদ্ধেয় হল স্থানীয় শাসকশ্রেণী। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ ছোট ইংরেজ আর বড় ইংরেজ— এই পার্থক্য টানলেন। এক সময়ে সব ইংরেজই আমাদের চোখে ছিল বড় ইংরেজ। বঙ্কিমের সময় থেকেই সন্দেহের যে সূচনা হয়, 'রাজা ও প্রজা'র প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করে তুললেন। সমগ্রভাবে মূল ইংরেজ চরিত্রে আস্থা রেখে ভারতবর্ষাগত ইংরেজদের সঙ্গে শুরু হল দাবি-দাওয়া আর প্রতিবাদের যুদ্ধ। এরা নিজের থেকে আমাদের অভাবের শূন্য পাত্র পূর্ণ করে দেবে, এ বিশ্বাস যখন শিথিল হল তখনই প্রশ্ন এল ঘর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের সামলানোর। হিন্দুমুসলমানের বিরোধমূলক কোনো ঘটনার পর, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পর, দেশীয় ব্যক্তির উপর ইংরেজ রাজকর্মচারীর অত্যাচারের কোনো উত্তেজনার সময় রবীন্দ্রনাথের সেই একই পরামর্শ ছিল: নিজেদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতার অবসান করে এক হয়ে দাঁড়াতে হবেই। রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গেল নিম্নতন লোকসমাজের কাছে বিভেদ যেখানে রাজনৈতিক মতবাদের নয়, চিরাগত সামাজিক আচার এবং অভ্যাসের। লোকসমাজের কাছে শিক্ষিত সমাজের বাণী পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় বঙ্কিমচন্দ্রও চিন্তা করেছিলেন। স্বদেশী সমাজের যুগে যাত্রাকথকতা প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে তার কল্পনা প্রথম দেখা দিয়েছিল।[১৩]

সমাজচিন্তার দিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যটি স্পষ্ট করেই বলা যাক। সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীতে জাগরণের ক্ষেত্রটি ছিল কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ। বঙ্কিম ইংরেজ-সান্নিধ্যের ফল আত্মস্থ করে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মমর্যাদাবান্ মানুষ হয়ে গড়ে ওঠবার কল্পনা করেছিলেন। বঙ্কিমের আলোচনা তত্ত্বাশ্রয়ী। মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করবার জন্য অতীতের কীর্তি ও কর্মশক্তির দিকেই তাকিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের সময় অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পল্লীসমাজ এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালী-জীবনের দিকেই দৃষ্টি ফেরালেন। তত্ত্ব বা শাস্ত্রাশ্রয়ী আলোচনা না করে সহজ মানবতাবোধের নামে সামাজিক অনৈক্য এবং অযৌক্তিক সংস্কার দূর করবার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিলেন। লোকজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক উৎসাহের অন্যতম দৃষ্টান্ত হিসাবে অবশ্যই লোকসাহিত্য সংগ্রহের উল্লেখ কর্তব্য। বঙ্কিম সামাজিক সংস্কারের আলাদা আলাদা প্রয়াসকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কারকর্মকে আলাদাভাবেই অবশ্যকর্তব্য করে তুলেছেন। 'সমাজ' নামে বইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়। এই ব্যাপারে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কারক রামমোহন বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী, যদিও পূর্বগামীদের সঙ্গে লোকজীবন এবং লোকসংস্কৃতির এতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল না। বঙ্কিম একটা সামগ্রিক জীবনদর্শনকে অনুভব করাতে চেয়েছেন; রবীন্দ্রনাথ কোনো পূর্ণাঙ্গ সর্বব্যাপী পরিশোধিত জীবনতত্ত্বের থিয়োরেটিক্যাল আলোচনা করার চেয়ে সোজাসুজি সংস্কার-কার্যে হাত দেবার উৎসাহ দিয়েছেন। এর পিছনে নৈতিক বুদ্ধি থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ বেশি আস্থা রেখেছেন commonsense বা সহজ

---

১৩ বঙ্গদর্শন ১২৮৫ অগ্রহায়ণ।

বুদ্ধির উপর। বুদ্ধি বা যুক্তির তীক্ষ্ণতা দিয়ে অনেক সহজকে জটিল করে তোলা যায়। বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রেরণা কোথায় ছিল সে কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি অর্থপূর্ণ উক্তি করেছিলেন—

"বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায় কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ কিন্তু সবল নহে।"

বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্রের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা এবং তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রভূত প্রশংসা করেও রবীন্দ্রনাথ কৃষ্ণচরিত্রকে বলেছিলেন অবাস্তব 'মূর্তিমান থিয়োরি'। এই সূত্র অবলম্বন করেই দুজনের চিন্তাপদ্ধতির পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ। চিন্তাকে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্র পুথি পাণ্ডিত্যের হাতধরা না করে রুক্ষ অভিজ্ঞতার পথে চলতে শেখালেন। জীবনযাপনের আদর্শ আর মনুর বিধানে পাওয়া যাবে না, কর্তব্য নির্ধারণের জন্য স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারস্থ হওয়া অনাবশ্যক। মানবসম্পর্কের সহজ সত্যকে পেতে যুক্তি যতই অমোঘ হোক, সে কেবল নির্বস্তুকতার ধূমজালই সৃষ্টি করে। সত্যকে পাওয়ার উপায় জীবনের বাস্তবকে সহজ অভিজ্ঞতার আলো দিয়ে দেখা। 'ডাকঘর'এর অমল পণ্ডিত হতে চায় নি, সে চেয়েছে রসিক হতে— জীবনের স্পর্শকে ইন্দ্রিয় দিয়ে লুটে নিতে। 'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বঞ্চনা বাড়িয়া উঠে ফুরায় সত্যের যত পুঁজি'। সত্যকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয় জীবন দিয়ে। বঙ্কিম-রবীন্দ্রের বিতর্কের সত্য-ধারণাকে রবীন্দ্রনাথ পরিবর্তিত করে নিয়েছেন। বঙ্কিমের মতে সত্য পরিবর্তনশীল, পরে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথও তাই মনে করেছেন। বঙ্কিম যুক্তি সংগ্রহ করেছেন গ্রন্থজগৎ থেকে যদিও যেটা প্রমাণ করতে যাচ্ছেন সেটা তাঁর জীবনের উপলব্ধি। মনীষার বিচারে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিকে পূর্বনির্ধারিত বিধানের বশ্যতা থেকে মুক্তি দিয়ে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন। শুধু স্মৃতির বা সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিধান নয়, স্বাজাত্যবোধ এবং কর্মের অন্ধ আচার থেকেও। বুদ্ধির বিকাশে বাধা দেয় এমন কোনো আচরণকেই তিনি স্বীকার করতে সম্মত হলেন না— তার তত্ত্ব যা-ই থাকুক-না কেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চরকা-খদ্দরের দ্বারা অর্থনৈতিক বয়কটের তত্ত্বকেও তিনি মানতে পারলেন না। অত্যন্ত ঋজু কণ্ঠে বলেছেন[১৪]—

"সংকীর্ণ অভ্যাসের কাজে বাহ্য নৈপুণ্যই বাড়ে, আর বদ্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো অভ্যাসের চক্র প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই জন্যেই যেসব কাজ মুখ্যত কোনো একটা শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি সকল দেশেই মানুষ তাকে অবজ্ঞা করেছে। কার্লাইল খুব চড়া গলায় dignity of labour প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের মানুষ যুগে যুগে তার চেয়ে অনেক বেশি চড়া গলায় indignity of labour সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়ে আসছে।"

বুদ্ধির সামান্যতম ব্যাঘাতের ত্রাসে শেষের দিকে তাঁর এক আশ্চর্য স্পর্শকাতরতা এসেছিল। কর্মবাদী প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ শেষের দিকে হয়ে দাঁড়ালেন বুদ্ধিবাদী ইনটেলেকচুয়াল। নির্বাধ বুদ্ধির অগ্রসরণের শেষ পরিণাম যে কি হতে পারে, সে সম্পর্কে তাঁর শঙ্কা ছিল না।

মনীষী বঙ্কিম এবং মনীষী রবীন্দ্রনাথের তুলনায় যে কথাগুলি উপরে বলেছি তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাঠকরা পাবেন বঙ্কিমের 'সাম্যে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' পড়লে কিংবা বঙ্কিমের 'বঙ্গদেশের

---

১৪ কালান্তর, 'চরকা'।

কৃষক'এর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা পড়লে। কৃষকদের দুর্দশা নিবারণের শেষ ভরসা বঙ্কিম মানুষের শুভবুদ্ধির উপরেই রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথও মহাজন জমিদার বা বর্তমান কোনো শ্রেণীতে নিঃসংশয়িত হতে না পেরে সেই শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করেছিলেন। কিন্তু দুজনের আলোচনাপদ্ধতি একেবারে পৃথক। একজন অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বের সঙ্গে নানা সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি মিলিয়ে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন, অন্যজন প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবনের থেকে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, 'বঙ্গদেশের কৃষকে' বঙ্কিম নিছক তাত্ত্বিক আলোচনার রাজ্য ছেড়ে জীবন্ত সমস্যার চিন্তায় ব্যাপৃত, আবার স্বদেশী যুগের প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ পারিপার্শ্বিক সমাজকে মুখ্যত উপজীব্য করলেও ইতিহাস সমাজতত্ত্ব এবং রাজনীতির প্রসঙ্গ এনেছেন বক্তব্যকে জোরালো করতে।

তবু, বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিমিত, রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিস্তৃত। এই বিস্তারে বক্তব্য বা যুক্তিরও যে বিস্তার আছে, তা নয়। মূল কথাটি খুবই সরল এবং যে হেতু সেটা একটা উপলব্ধির সত্যের মত, সে জন্যে তাতে যুক্তির যে কিছু অনিবার্যতা আছে, তা নয়। এ হচ্ছে সহজ বুদ্ধির সত্য। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় মূল বক্তব্যটিকে পাঠকের কাছে সোজাসুজি আনবার আগে রবীন্দ্রনাথ যে কথার বিস্তীর্ণ আয়োজন করেন, তা যুক্তির নয়, পাঠক-মনের আনুকূল্য লাভের উপযুক্ত পরিবেশ রচনার। পরিবেশ রচনা করতে কখনও উপমা কখনও কৌতূহলজনক কোনো ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা এমনকি কখনও 'প্যারাবল্' জাতীয় কথিকা প্রভৃতিও ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাকে বিস্তারিত করতে করতে অসম্ভবতাকে বুঝিয়ে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাহুল্য শিল্পেরই শোভা, বিজ্ঞানের বাহুল্য নেই। বঙ্কিমের প্রবন্ধ যে পরিমিত বাহুল্যবর্জিত তথ্যনিষ্ঠ গবেষণাধর্মী ( scholarly ) সে তাঁরই বৈজ্ঞানিকধর্মী যুক্তিবাদিতার জন্য। বঙ্কিমের প্রবন্ধ পরিবেশ সৃষ্টি করে না, তর্কশক্তিকে শাণিত করে। এইজন্য তাঁর প্রবন্ধের কোনো অংশ চোখ এড়িয়ে গেলে যুক্তির শৃঙ্খলটিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

মনীষার বিচার হবে কি দিয়ে— যুক্তির অমোঘতা দিয়ে, না, অভিজ্ঞতার বিশ্বাস্যতা দিয়ে ?

# বেকার-সমস্যা ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

অমর্ত্যকুমার সেন

আজ প্রায় দশ বছর হল, সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা চলেছে। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ প্রায় শেষ হল ; তৃতীয় পরিকল্পনাটির খসড়া বের হয়েছে, কাজ কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে। গত দশ বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাটিকে বিচার করলে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে ; সে সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চাই।

আগের সঙ্গে তুলনা করলে গত দশ বছরে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু উন্নতি নিঃসন্দেহে হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে ( ১৯৫১-৫৬ ) দেশের আয় বেড়েছে শতকরা আঠারো ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময়ে ( ১৯৫৬-৬১ ) জাতীয় আয় শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়বে এরকম আশা করা গিয়েছিল। সে আশা মিটবে বলে মনে হয় না, তবে শতকরা বিশ ভাগ বৃদ্ধি শেষ অবধি হতে পারে, হিসেবে এইরকম পাওয়া যাচ্ছে। এই দশ বছরে দেশের জনসংখ্যাও বেশ খানিকটা বেড়েছে, তবুও জনপ্রতি আয় বেড়েছে সব মিলিয়ে শতকরা প্রায় বিশ ভাগ। জনপ্রতি আয়বৃদ্ধির এই হার রুশ, বা চীন, বা জাপান, কিম্বা উনবিংশ শতকের ইংলণ্ড-আমেরিকার তুলনায় সামান্যই, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ'কে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এক বিষয়ে কিন্তু গত দশ বছরে, উন্নতি তো দূরের কথা, বেশ ভীতিজনক অবনতি ঘটেছে। বেকার-সমস্যা সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা দেয় নি ; কর্মহীনের সংখ্যা এ দেশে বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। 'ন্যাশনাল সাম্পল্ সার্ভে' থেকে জানা যায় যে ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে অন্তত দেড় কোটি লোক পূর্ণবেকার বা অর্ধবেকার। এ ছাড়া শহরে শহরে বেকারের ভিড়ের কথা তো আমরা সকলেই জানি। তার উপর জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বছর বছর কর্মসন্ধানীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এ বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছিল ; ঠিক করা হয়েছিল যে পরিকল্পনার গোড়ায় যত সংখ্যক বেকার ছিলেন, তার থেকে বেকারের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে কর্মসন্ধানীদের সংখ্যা যে হারে বাড়বে, চাকরির ব্যবস্থাও সেই হারে যাতে বাড়ে, তা দেখা হবে। এ রকম একটা প্রচেষ্টাকে বেকার-সমস্যা সমাধানের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয়তো বলা যায় না, তবে এতে সাফল্যলাভ করলে অন্তত বেকারের ভিড়ের ক্রমবর্ধমান চাপটাকে আটকে রাখা যেত। কিন্তু সেই প্রচেষ্টাও সফল হয় নি ; দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ায় বেকারের সংখ্যা যা ছিল, পরিকল্পনার শেষে সেই সংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ বেশি হবে মনে হয়।[১] পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই বেকারদের পল্টনে বছর বছর চার লক্ষ লোকের যোগ দেওয়া মোটেই আশ্বস্ত হবার মত ব্যাপার নয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে কর্মঠ ব্যক্তির সংখ্যা বাড়বে দেড় কোটি। তাই অন্তত দেড় কোটি নতুন চাকরির ব্যবস্থা না হলে বেকারদের সংখ্যা আরো বেড়ে চলবে। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় বলা হয়েছে যে,

---

১ *Third Five Year Plan, A Draft Outline* (*Planning* Commission, Govt. of India, June 1960), পৃ. ৮৪।

এই পাঁচ বছরে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে ( মোট দশ হাজার দু শো কোটি টাকা ) তাতে এক শো চল্লিশ লক্ষ লোকের নতুন চাকরি জুটবে। তাই অন্য কোনো ব্যবস্থা না করলে আরো দশ লক্ষ কর্মান্বেষী, সরকারী হিসেব মতেই, কর্মহীন হবে। তা ছাড়া অনেকেই এই সংশয় পোষণ করেন যে যতটা চাকরির সংস্থান হবে বলে পরিকল্পনায় ঘোষণা করা হচ্ছে, ততটা হবার সম্ভাবনা সামান্য। অধ্যাপক শ্রীঅমিয় দাশগুপ্ত একটি হিসেব ক'রে দেখিয়েছেন যে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমতা না কমিয়ে ঐ দশ হাজার দু শো কোটি টাকার পরিকল্পিত খরচ থেকে এক লক্ষ বিশ হাজারের বেশি চাকরির ব্যবস্থা হবে না।[২] এই হিসেব যদি ঠিক হয়, তবে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে দেশে ত্রিশ লক্ষ নতুন বেকার দেখা দেবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেমন বেকারদের সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে না এমন প্রতিজ্ঞা করেও শেষ অবধি বিশ লক্ষ নতুন লোক বেকারত্ব লাভ করেছেন, তেমনি তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ে ত্রিশ লক্ষ এ বেকার-সমুদ্রে যোগ দিতে পারেন। যে দেশে নানা সরকারী পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থনৈতিক প্রগতির প্রচেষ্টা হচ্ছে, সেই দেশে দশ বছরে নতুন আধ কোটি কর্মঠ লোকের বেকারত্ব লাভ আশ্চর্য হবার মত ঘটনা। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় তৃতীয় পরিকল্পনার কলেবর নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

### বেকার-সমস্যার অর্থনৈতিক দিক

বেকার-সমস্যার দুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে তার সামাজিক অত্যাচারের দিক। বেকার হওয়ার কি কি অসুবিধা তা নিয়ে বোধ হয় আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োজন নেই। বেকার-সমস্যার আর-একটি দিক হচ্ছে তার অর্থনৈতিক অপচয়ের দিক। দেশের শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার না হলে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতাও কমে যায়; ফলে জাতীয় জীবনযাত্রার মান যতটা উঁচু হতে পারত ততটা হয় না।

এই দুটো দিককে একসঙ্গে দেখলে বেকার-সমস্যার কারণ নিয়ে একটু খটকা লাগে। কর্মহীনতার ফলে যাঁরা বেকার তাঁরা তো ভুগছেনই, দেশের আর দশজনও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। বেকারদের চাকরি হলে দেশের উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়বে, যাঁরা বেকার ছিলেন তাঁরাও বেঁচে-বর্তে থাকবেন। তা হলে সমস্যাটা কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা দরকার। প্রথমতঃ, ধনতান্ত্রিক দেশে বেকার-সমস্যা সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের চাহিদার অভাব। আয় স্বল্প হলে লোকের চাহিদা কম হয়, চাহিদা কম হলে অতিরিক্ত জিনিসপত্র উৎপাদন ক'রে শিল্পপতিরা লাভ করতে পারেন না। ফলে উৎপাদন কম হয়। উৎপাদন কমে গেলে বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগ করার প্রয়োজন ঘটে না। সেই কারণে লোকের আয় কম হয়। তার ফলে আবার চাহিদা অল্প হয়ে দাঁড়ায়।— ধনতান্ত্রিক সমাজে বেকার-সমস্যা প্রায়ই এমন চক্রাকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু যেখানে সরকারই দেশের হয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করেন, সরকারই ইচ্ছেমত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, সেখানে চাহিদাহীনতা সহজে জন্মাতে পারে না।

বেকার-সমস্যার আর-একটি দিক হচ্ছে এই যে, উৎপাদন-ব্যবস্থায় জনবলই একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, তার সঙ্গে যন্ত্রপাতিরও দরকার আছে: এখন, ভারতবর্ষের মত আর্থিক দিক থেকে অনুন্নত দেশে, যন্ত্রপাতি

---

২ Dr. A. K. Das Gupta, "Investment & Employment in Third Five Year Plan", *Yojana*, July 24, 1960, পৃষ্ঠা ১৫। পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় এ প্রসঙ্গে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তৈরি করে, এ ধরণের শিল্পের বিশেষ অভাব। ফলে চাহিদা বাড়লে যন্ত্রপাতির অভাব পড়ে, এবং সে অভাবের কল্যাণে শ্রমিক-নিয়োগ সম্ভব হয় না। অন্যদিকে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হলে বিদেশী মুদ্রার অভাব দেখা দেয়, ফলে সমস্যাটি অন্য রূপ নিয়ে থেকে যায়। এ অবস্থায় একটি উপায় হচ্ছে দেশের রপ্তানি বাড়ানো যাতে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য বিদেশী মুদ্রা জোটে। অথচ রপ্তানি বাড়ানো মোটেই সহজ নয়। দেশের ক্রয়যোগ্য জিনিসপত্র বিদেশে চালান দিলে দেশের বাজারে ঐসব জিনিসের অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে দেশে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। এ ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে রপ্তানির দিক থেকে একটা বিশেষ সমস্যা হচ্ছে এই যে বিদেশে রপ্তানি করার মত জিনিস আমরা খুব একটা তৈরি করি না। আমাদের চিরাচরিত রপ্তানি মাল যেগুলি—যেমন, চা, পাটজাতদ্রব্য, কাপড় ইত্যাদি—সেগুলির আন্তর্জাতিক চাহিদা সহজে বাড়ানো সম্ভব নয়। নতুন রপ্তানি মাল—যেমন, বিজলী পাখা, সেলাই কল, ইত্যাদি—বিক্রির ব্যাপারেও আমাদের খুব একটা অগ্রসর হবার সুযোগ অদূর ভবিষ্যতে আছে বলে মনে হয় না, কারণ এসব জিনিসে ভারতবর্ষের জগৎজোড়া সুনাম হতে সময় লাগবে।

এইসমস্ত কারণে, যন্ত্রপাতির অভাব মেটাতে আমাদের নিজেদেরই যন্ত্রপাতি তৈরি করা প্রয়োজন। এদেশ-ওদেশের কাছে ধার করে যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা আমাদের কিছুদিন হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু দেশের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে হলে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি তৈরির শক্তি আমাদের হওয়া দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতেও তৃতীয় পরিকল্পনাকে বিচার করা উচিত। সুখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় যন্ত্রপাতি তৈরি করার দিকে বেশ কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সব মিলে পরিকল্পনার কলেবরটি ছোট হওয়ায় যন্ত্রপাতি প্রস্তুত বিষয়ে ভারতের পরনির্ভরশীলতা এই পাঁচ বছরে তেমন কমবে না। পরিকল্পনার কলেবর নিয়ে পরে আলোচনা করব, তার আগে আর দু-একটি বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

**কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন**

কোনো জিনিস উৎপাদন করতে যদি আজ কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাদের তৈরি জিনিস উৎপন্ন হতে কিছু সময় লাগবে, ফলে প্রথমে কিছুদিন তাদের তৈরি জিনিস বাজারে পাওয়া যাবে না। এদিকে তারা তাদের মজুরির টাকা খরচ করে নানা জিনিস কিনবে। তাই, এই উৎপাদন-প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদন বাড়তে বেশ খানিকটা সময় নেবে, কিন্তু চাহিদা বাড়বে তখন-তখনই। ফলে, কিছুদিন বাজারে জিনিসপত্রের অভাব ঘটতে পারে, এবং তাদের অগ্নিমূল্য হবার একটা সম্ভাবনা আছে। এই সমস্যা এড়াতে হলে কোনো-না-কোনো উপায়ে উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা কমানো দরকার। চাহিদা কমানোর একটি পথ হচ্ছে দেশের করবৃদ্ধি, যাতে খরচে লোকের হাতে টাকা কমে। অন্যদিকে শ্রমিকরা যেসব জিনিস প্রধানত কেনে বা কিনতে চায়, সে সমস্ত জিনিসের উৎপাদনবৃদ্ধি এই সূত্রে খুবই জরুরি। এ ধরণের দ্রব্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে খাদ্যশস্য। বেকার-সমস্যা কমাতে হলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার।

তৃতীয় পরিকল্পনায় চাষবাস বাড়ানোর দিকে সরকার বেশ খানিকটা নজর দিয়েছেন। ১৯৬০-৬১ সালে আমাদের খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় সাড়ে সাত কোটি টন হবে বলে মনে হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬র মধ্যে, সেটাকে বাড়িয়ে দশ বা সাড়ে দশ করার পরিকল্পনা আছে। এ

প্রচেষ্টা সফল হলে উল্লসিত হবার বেশ একটু কারণ থাকবে। এ প্রসঙ্গে কিন্তু দুটি জিনিস বলা বোধ হয় প্রয়োজন। প্রথমতঃ, এ কথা মনে রাখা দরকার যে উৎপাদনবৃদ্ধির মালমসলা যোগাড় করা আর উৎপাদন-বৃদ্ধি পাওয়া এক নয়। সেচব্যবস্থার উন্নতি, কিম্বা ব্যবহারযোগ্য রাসায়নিক সার তৈরি হলেও তার প্রয়োগে বেশ-কিছু অসুবিধা আছে, যতদিন-না ভারতবর্ষের গ্রামগুলির সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। একদিকে ভূমিহীন চাষী, অন্যদিকে কর্মবিমুখ ভূস্বামীর ভিত্তিতে গড়া চাষ-ব্যবস্থায় জমির উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ানোর দিকে খুব একটা নজর আশা করা যায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে তৈরি সেচব্যবস্থার অপচয় দেখলে এ বিষয়ে একটু আন্দাজ সহজেই পাওয়া যায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে নতুন ৬৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ-সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মোটে ৩৩ লক্ষ একরে সেই সেচব্যবস্থার সুযোগ নেওয়া হয়। এমন-কি ১৯৫৮-৫৯ সালেও নতুন ৯৬ লক্ষ একরের সেচ-সম্ভাবনার মধ্যে মোটে ৬৪ লক্ষ একরের ব্যবহার কার্যতঃ হয়েছিল।[৩] তা ছাড়া অনেক জায়গায় সেচের ব্যবহার হলেও, তার পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হয় নি। জমিতে বছরে দুটো ফসল তোলার চেষ্টা অল্পই হয়েছে, যদিও আমাদের সেচব্যবস্থার একটি প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল তাই। পরবর্তী সময়কার সঠিক খবর এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি, তবে যতটা জানা গেছে তাতে মনে হয় যে সেচ-সম্ভাবনার বিপুল অপচয় এখনো চলেছে। গ্রামাঞ্চলের সমাজ-ব্যবস্থার (বিশেষতঃ জমি-অধিকারের) আমূল পরিবর্তন না করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। তাই তৃতীয় পরিকল্পনায় যে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর নানারকম চেষ্টার কথা লেখা আছে, সেগুলোর সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এ জাতীয় সামাজিক পরিবর্তনের উপর। দুঃখের বিষয় যে, এ সম্পর্কে তৃতীয় পরিকল্পনায় খুব তেমন আলোচনা নেই।

### বিনিয়োগের পরিমাণ

এ প্রশ্নটা যদি মুলতবি রাখি, এবং ধরে নিই যে গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন না করেও ঐ দশ সাড়ে-দশ কোটি টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে, অর্থাৎ খাদ্যশস্য উৎপাদন শতকরা তেত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ বাড়বে, তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে সেই তুলনায় পরিকল্পনায় বেকারদের কাজে নিয়োগ ক'রে দেশের কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টাটি এত স্তিমিত হল কেন। এই পাঁচ বছরে দেশের আয় বাড়বে মোটে শতকরা পঁচিশ ভাগ, আর খাদ্যশস্য বিক্রীত হবে শতকরা তেত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ বেশি। এ চিত্রটি খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। দেশের জনসংখ্যাও অবশ্য শতকরা দশ ভাগের বেশি বাড়বে, কিন্তু বেকারদের সংখ্যা বেড়ে চললে দেশের লোকের খাদ্য কেনার সামর্থ্য হবে কি করে? ন্যাশনাল সাম্পল্ সার্ভে থেকে যে সমস্ত অর্থনৈতিক তথ্য পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় না যে, আয়ের পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শস্য ভোজনের পরিমাণ তেত্রিশ বা চল্লিশ ভাগ বৃদ্ধি খুব একটা সম্ভাব্য ঘটনা। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে তৃতীয় পরিকল্পনায় বেকারসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিকারের অভাব আরও অর্থহীন লাগে। সত্যিই যদি দশ বা সাড়ে-দশ কোটি টন খাদ্যশস্য তৈরি করা যায়, তা হলে পরিকল্পনায় আরও কিছু বেশি অর্থ বিনিয়োগ করলেও খাদ্যের দাম বাড়ত বলে মনে হয় না।

এবারে আসা যাক সরকারী করের ব্যাপারে। বর্তমান হারে আয়কর বিক্রয়কর ইত্যাদির সাহায্যে

---

৩ *Third Five Year Plan, A Draft Outline*, পৃ. ১১৮

তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে সরকার যত টাকা পাবেন, তার অনেকটাই যাবে সরকারী দৈনন্দিন খরচের খাতায়। পরিকল্পনায় ব্যবহার করার জন্য বাকি থাকবে পাঁচ বছরে মোট ৩৫০ কোটি টাকার মত। এ ছাড়া নতুন কর বসিয়ে বা করের হার বাড়িয়ে সরকার রোজগার করবেন আর ১,৬৫০ কোটি আন্দাজ। তাই সব মিলে দু হাজার কোটি টাকা সরকার পাবেন কর থেকে। দশ হাজার দু শো কোটি টাকার পরিকল্পনায় বাকি অংশের খানিকটা আসবে জাতীয়কৃত শিল্পগুলির লাভ থেকে, খানিকটা জনসাধারণের দেওয়া ধার থেকে, কিছু বিদেশী সাহায্য থেকে, কিছু শিল্পপতিদের জমানো বা ব্যাঙ্কের কাছে ধার নেওয়া টাকা থেকে, আর অল্প কিছু আসছে নতুন-ছাপা টাকা থেকে। তৃতীয় পরিকল্পনাতে নতুন ছাপা টাকায় খরচপত্র চালাতে সরকার বেশ একটু ভয় পেয়েছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খরচের চার হাজার ছ শো কোটির মধ্যে এক হাজার এক শো পঁচাত্তর কোটি টাকা এসেছে নতুন ছাপা নোট থেকে ; তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী খরচ সাত হাজার দু শো পঞ্চাশ কোটির মধ্যে মোটে পাঁচ শো পঞ্চাশ কোটি এই তহবিল থেকে নেওয়া হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তার থেকেই সরকার মুদ্রাস্ফীতির বিষয়ে শঙ্কিত হয়েছেন বলে মনে হয়। মুদ্রাস্ফীতির ভয়ের যে কারণ নেই তা নয়, কিন্তু দেশে যদি উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ থাকে তা হলে নতুন অনেক নোট ছাপালেও মূল্যবৃদ্ধি না ঘটতে পারে ; কারণ, ঐ থেকে যে নতুন চাহিদা জন্মাবে, তার অনেকটাই, বা পুরোটাই, নতুন উৎপাদন থেকে মেটানো সম্ভব। তবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা থাকলে এসব ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ আছে বইকি। সে ক্ষেত্রে করবৃদ্ধির প্রচেষ্টা মূল্য ঠিক রাখার দিক দিয়ে খুবই প্রয়োজন।

#### করব্যবস্থার কয়েকটি দিক

সরকার যখন লোকের আয় বা ব্যয়ের উপর কর বসান, তখন জনসাধারণের কেনার ক্ষমতা কমে যায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও অল্প হয়। তাই দেশের কৃষি শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি গড়ে তুলতে সরকার যদি অনেক খরচ করতে চান, তা হলে করের আশ্রয় নেওয়া নির্ভরযোগ্য, কারণ এসব কারণে লোকের মোট আয়ের যেমন উন্নতি হবে, অন্য দিকে করের ফলে খরচ করার ক্ষমতা কমবে। ব্যাপারটা শুনতে একটু ঘোরালো লাগছে, একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মনে করা যাক, শ্যাম টেনিস খেলবার জন্য নতুন দু জোড়া সাদা পাৎলুন কিনবে ভাবছে। যদু বেচারা বেকার, বাড়ির লোকের গঞ্জনা শোনে, আর ঘরে বাঁদিপোতার গামছা প'রে বসে থাকে। এখন, সরকার স্থির করলেন রাস্তা বানাবেন, সেই কাজে যদু নিযুক্ত হল। নতুন-পাওয়া রোজগারের টাকায় যদু পাৎলুন কিনতে চলল। বাজারে যদি যদুর সংখ্যা অনেক হয়, তা হলে পাৎলুনের দাম বেড়ে যাবে। কিন্তু শ্যামের আয়ের উপর কর বসালে তারা তাদের পুরনো পাৎলুনেই টেনিস খেলবে, ফলে বাজারে পাৎলুনের চাহিদা আগের মতই থাকবে। একদিকে বসল কর, অন্যদিকে যদুর জুটল চাকরি। একদিকে শ্যাম টেনিস খেলবার জন্য নতুন পাৎলুন পেল না, অন্যদিকে যদু বাঁদিপোতার গামছার কবল থেকে উদ্ধার পেল। মাঝের থেকে কিন্তু দেশের একটা রাস্তা লাভ হল। কর দিয়ে সরকারী খরচে দেশের নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করার এই দিকটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। খবরের কাগজ পড়ে আমাদের অনেকেরই মনে হতে পারে যে সরকারী করের একমাত্র উদ্দেশ্য কিছু টাকা সংগ্রহ। কিন্তু টাকার কেয়ার

সরকার করেন না। সরকার তো নোট ছাপিয়ে যত চান তত টাকা বানিয়ে নিতে পারেন। করের উদ্দেশ্য কিছু কিছু লোকের খরচ করার ক্ষমতা কমানো। যাতে চাহিদার চাপে মূল্যবৃদ্ধি কম হয়। পরিকল্পনায় যে টাকা খরচ হবে সে টাকা কি ক'রে জুটবে সেটা বড় প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পরিকল্পিত নতুন খরচের ফলে যে বাজারে চাহিদার বৃদ্ধি হবে, সেটাকে সামলাতে আশপাশের অন্যান্য চাহিদার হার কিভাবে কমানো যায়।

এ বিষয়ে বিক্রয়করের ফলাফল নিয়ে অর্থনীতিবিদ্‌দের মহলে একটু-আধটু মতবিরোধ হয়েছে। অনেকেরই মনে হয়েছে যে বিক্রয়করের ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে; যে সময়ে এমনিতেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে সে সময়ে এ কর বসালে তাকে আরো উস্কানি দেওয়া হবে। এ যুক্তিটি কিন্তু মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। পেট্রোলের উপর কর বসালে পেট্রোলের দাম বাড়তে পারে, কিন্তু পেট্রোলের দাম বাড়লে, যাঁরা পেট্রোল কেনেন তাঁদের হাতে কম টাকা থাকবে, তাই তাঁরা অন্যান্য জিনিসপত্র কম কিনতে পারবেন। সে জায়গায় যদি বিক্রয়কর না থাকত তো দু'টা ফল হতে পারত। একটি সম্ভাবনা হচ্ছে এই যে সে ক্ষেত্রেও পেট্রোলের দাম চাহিদার চাপে বেশ বেশিই হত। সে অবস্থায় পেট্রোলের বিক্রেতারা নতুন স্ফীত রোজগারের কল্যাণে বেশি বেশি খরচ করতেন। অন্য সম্ভাবনাটি হচ্ছে এই যে পেট্রোলের দাম কম হত। ফলে পেট্রোলের ক্রেতারা অন্যান্য জিনিসে প্রচুর খরচ করতেন। যেটিই হোক-না কেন, বিক্রয়কর না থাকলে দেশে খরচ এবং জিনিসপত্রের চাহিদা বেশি হত, ফলে তাদের দরদামও বেড়ে চলত।

**ভারতীয় করব্যবস্থা**

তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য বসানো করের বিষয়ে দুটো প্রশ্ন সবার আগে করা দরকার। প্রথমতঃ, পরিমাণে কর কি আরও বসানো যেত? কর বেশি বসিয়ে কি পরিকল্পনার কলেবরটি এভাবে বাড়ানো যেত, যাতে বেকাররা চাকরি পেতেন? দ্বিতীয়তঃ, কর যেভাবে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মধ্যে ভাগ করা হয়েছে তা কি সন্তোষজনক? এ দুটি প্রশ্নের জবাবেই আমি একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ব্রিটেন একটি ধনতান্ত্রিক দেশ; আমাদের মত সমাজতন্ত্র তাদের আদর্শ নয়। অথচ ধনীদের উপরে বসানো করের পরিমাণ আমাদের দেশে ব্রিটেনের তুলনাতে অনেক কম। এ সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯৫৪ সালে বৃটিশ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে ধনী শতকরা এক ভাগ লোক ঐ দেশের জাতীয় আয়ের শতকরা ন' ভাগ রোজগার করেছে, আয়কর দেবার আগে। আয়করের কল্যাণে তাদের মোট আয় এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা পাঁচ ভাগে। আমাদের দেশের সবচেয়ে ধনী শতকরা এক ভাগের আয় জাতীয় আয়ের শতকরা এগারো ভাগ; আয়কর দেবার পরে তা হয়ে দাঁড়ায় শতকরা দশ ভাগ।[৪] তেমনি যদি ব্রিটেনের উপরের দিকের শতকরা পাঁচ ভাগ লোককে দেখা যায়, কর দেবার আগে তাদের মোট আয় জাতীয় আয়ের শতকরা একুশ ভাগ, করের

৪ ভারতবর্ষের তথ্যগুলি ১৯৫৫-৫৬ সংক্রান্ত। এ দুটো বছরের (এবং ১৯৪৯ এর) তুলনা সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে —"The Inequality of Indian Incomes", by H. F. Lydall, *The Economic Weekly*, Special Number, June, 1960, পৃ. ৮৭৩-৭৪

পর তা শতকরা পনেরো ভাগে দাঁড়ায়। ভারতবর্ষে ঐ উপরওয়ালা শতকরা পাঁচ ভাগের আয়, আয়কর দেবার আগে জাতীয় আয়ের শতকরা তেইশ ভাগ, কর মিটিয়ে দিয়েও শতকরা বাইশ ভাগ বজায় থাকে। এসব তথ্যের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় যে বিলেতে কর চাপিয়ে ধনীদের কাছ থেকে যতটা টাকা নেওয়া হয়, আমরা তার ধারে-কাছেও যাই না।

এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার অনেক কিছুই রয়েছে। ভারত সরকারের আদর্শ হল সমাজতন্ত্র, ব্রিটেনের তা নয়। অথচ ভারতের তুলনায় ধনীদের উপর কর ধনতান্ত্রিক দেশ ব্রিটেনে অনেক বেশি। এই প্রসঙ্গে বোধ হয় এটাও বলা উচিত যে জাতীয় স্বার্থের কথা বলে ভারতবর্ষে রেল-কর্মী প্রভৃতি সরকারী চাকুরেদের ধর্মঘট বে-আইনি ঘোষণা করা হয়; অন্যদিকে ব্রিটেনে রেলকর্মীদের ধর্মঘট দস্তুরমত আইনানুগতভাবে হতে পারে। ১৯২৫ সালে তা হয়েওছিল। দেশের অর্থনীতির উন্নতির যদি একটা সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা হয়, তা হলে এ জাতীয় ধর্মঘট বে-আইনি ক'রে দেবার সপক্ষে যুক্তি হয়তো ভারি। কিন্তু এক দিকে গণতন্ত্রের আদর্শ বজায় রাখার নামে সমাজব্যবস্থার চিরাচরিত চেহারা অপরিবর্তিত রাখা, এমন-কি ধনীদের উপর অত্যাবশ্যক আয়কর অবধি না বসানো, অন্য দিকে ধর্মঘটকে বে-আইনি করা, এর মধ্যে একটা অবিচার আছে এটা মনে করা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি

এ প্রসঙ্গে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতি নিয়েও আলোচনা করা দরকার। অনেক অর্থনীতিবিদ্‌ই মনে করেন যে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতির কল্যাণে কোনোরকম বড় পরিকল্পনা ভারতবর্ষে এখন করা সম্ভব নয়। মুদ্রা-ঘাটতি যে ভারতবর্ষের একটা খুবই বড় সমস্যা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় ( পৃ ৫৩ ) বলা হয়েছে যে, এই পাঁচ বছরে ভারতবর্ষের উৎপাদন বজায় রাখতে যে পরিমাণ কাঁচা মাল, আধা-তৈরি মাল ইত্যাদি অত্যাবশ্যক জিনিস আমদানি করতে হবে তার দাম প্রায় তিন হাজার পাঁচ শো সত্তর কোটি টাকা, এবং ভারতবর্ষের মোট রপ্তানি এই পাঁচ বছরে হবে মোট তিন হাজার চার শো পঞ্চাশ কোটি টাকা। আমাদের উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করলে মুদ্রাঘাটতির পরিমাণ আরও বেশি হবে। তাই বিদেশী সাহায্য ছাড়া আমাদের দেশে এখন কোনোরকম যন্ত্রপাতি আমদানি সম্ভব নয়, তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ায় এমন বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বেশি বড় পরিকল্পনা করার সাহস আমরা পাব কোথা থেকে? এ যুক্তির মধ্যে অনেক সত্য কথা আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে তিনটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ, ভারতীয় উৎপাদন-ব্যবস্থায় নিত্যব্যবহার্য বস্তু যেমন অনেক তৈরি হয়, ধনীদের ভোগ্য দ্রব্যও কম তৈরি হয় না। অনেক বিলাসদ্রব্যের প্রস্তুতিতে বিদেশী কাঁচামাল, বা বিদেশে আধা-তৈরি জিনিস প্রচুর পরিমাণে লাগে। এ-জাতীয় উৎপাদন দেশে কমালে, আমদানির উপর চাপ হ্রাস পাবে। ধনীদের উপর কর বসালে বিলাসদ্রব্যের চাহিদাও কমবে। দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে আধা বা পুরো তৈরি যেসব জিনিস আমাদের এখনও কিনতে হয় তার কিছু কিছু দেশে তৈরির ব্যবস্থা করলে বিদেশী মুদ্রার অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হবে। তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করলে বিদেশী মুদ্রার প্রয়োজন বিন্দুমাত্র না বাড়িয়েও কয়েক ধরণের উৎপাদন বেশ কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। ভূমিহীন চাষী ও কর্মবিমুখ ভূস্বামীর ভিত্তিতে গড়া সমাজ-ব্যবস্থায় সেচ, এবং অন্যান্য অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধার কতটা অপচয় হয় এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এই সমাজরীতির

বদল করলে দেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার অধিকতর ব্যবহার বিদেশী মুদ্রার সাহায্য ছাড়াই হতে পারে। এইসব কারণে বিদেশী মুদ্রার ঘাটতিকে ভীরু পরিকল্পনার অজুহাত না বানিয়ে, সাহসী পরিকল্পনার কারণ হিসেবেই ধরা উচিত ছিল। এ বিষয়ে তৃতীয় পরিকল্পনার নিশ্চেষ্টতায় ক্ষুব্ধ হবার যথেষ্ট কারণ আছে।

গত পাঁচ বছরে বেকারের সংখ্যা কমা তো দূরের কথা, বেড়েছে বিশ লক্ষ। সামনের পাঁচ বছরে তা বাড়বে অন্তত আরও দশ লক্ষ, একটি হিসেবমতে তিরিশ লক্ষ। বেকারদের সংখ্যা কমাতে হলে, অন্ততঃ আর যাতে না বাড়ে, তা দেখতে হলে, এবারকার তৃতীয় পরিকল্পনার চেয়ে অনেক বড় অনেক বেশি সাহসী পরিকল্পনার দরকার। সে রকম একটি পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে, সমাজের— বিশেষত গ্রামীণ সমাজের, ভিত্‌বদল প্রয়োজন। করব্যবস্থা প্রমুখ অর্থনৈতিক রীতিনীতির পরিবর্তন তো অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় পরিকল্পনা সফল হোক, এটা আমরা সকলেই চাইব। কিন্তু দেশের আর্থিক দুর্গতি পুরোপুরি রোধ করার কোনোরকম সাহসী প্রচেষ্টা যে এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় করা হল না, এটা অনেকের মনেই আপশোসের সঞ্চার করবে।

ট্রিনিটি কলেজ, কেম্ব্রিজ

# বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও রামায়ণ কাব্যসৃষ্টি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা এবং বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি নিজে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন যে আর্যদর্শন পত্রিকায় সে-সময় বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল কাব্য প্রকাশিত হচ্ছিল এবং ঐ কাব্যের "আরম্ভ সর্গ হইতেই বাল্মীকি-প্রতিভার" ভাবটি তাঁর মনে আসে। বিদ্বজ্জনসভার দ্বিতীয় বাৎসরিক সম্মিলন উপলক্ষে "দস্যু রত্নাকরের কবি হইবার কাহিনী" নিয়ে একখানি নাটক লিখবার প্রস্তাব উদ্যোক্তাদের সংগত বোধ হল। তখন সারদামঙ্গলে বর্ণিত বাল্মীকি-কাহিনীর সঙ্গে "দস্যু রত্নাকরের বিবরণ জড়াইয়া দিয়া এই নাটকের গল্পটা একরূপ খাড়া হইল"। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাদেবী সরস্বতী সেজেছিলেন। "বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে এই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।"

দেখা যাচ্ছে রত্নাকর দস্যুর কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের প্রথমে মনে এসেছিল। পরে তিনি তার সঙ্গে বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ অংশকে যুক্ত করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এই কাহিনী একটি নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। একটি নিরাশ্রয়া বন্দিনী বালিকার (ছদ্মবেশিনী সরস্বতী) করুণ মুখচ্ছবি ও ব্যাকুলতা দস্যু-বাল্মীকিকে কবি-বাল্মীকি পর্যায়ে উন্নীত করেছে। কবি নিজেই লিখেছেন: "বাল্মীকি-প্রতিভাতে দস্যুর নির্মমতাকে ভেদ করে উচ্ছ্বসিত হল তার অন্তর্গূঢ় করুণা"। সেই করুণাবশে সে তার অনুচরদের হরিণ-শাবক দুটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছে এবং নিজেও ঘোষণা করেছে— 'আজ হতে বিসর্জিনু এ ছার ধনুক বাণ'। পরে ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ হত হলে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি তার মুখ থেকে অকস্মাৎ উচ্চারিত হয়েছে করুণায়। আর সেই মুহূর্তে সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটেছে। তখন দস্যুর উপাস্য দেবী কালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বাল্মীকি, লক্ষ্মীর প্রদত্ত ধনরাশি প্রত্যাখ্যান করেছে, সরস্বতীর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে। সরস্বতী আশীর্বাদ করে বলেছেন:

এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার।
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার॥

আর্যদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যাংশে (১৮৭৪) বর্ণিত নিম্নোদ্ধৃত বাল্মীকির কবিত্বলাভ -প্রসঙ্গটি তরুণ কবিচিত্তকে মাতিয়ে তুলেছিল:

শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,

হানিল শবরে বাণ
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায় ॥
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;
সহসা ললাট ভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে ॥

তার পর 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে' মর্তে নেমে এলেন, মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রক্তাক্ত ক্রৌঞ্চদেহ ও ক্রন্দনরতা ক্রৌঞ্চীর দৃশ্য তাঁকে ব্যথিত-ব্যাকুল করে তুলল। তখন—

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে
নেহারেন ফিরে ফিরে যেন উন্মাদিনী ;
কাতরা করুণা ভরে
গান সকরুণ স্বরে
ধীরে ধীরে বাজে তাঁর বীণা বিষাদিনী ॥
সে শোক সংগীত কথা
শুনে কাঁদে তরুলতা
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি
গদ গদ আদি কবি
অন্তরে করুণা সিন্ধু উথলিয়া যায় ॥

বিহারীলাল রামায়ণ মহাকাব্যে বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভের পূর্ণ বর্ণনা করেন নি, আংশিক বর্ণনা করেছেন। কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। বিহারীলাল সেজন্য ক্রৌঞ্চ-বৃত্তান্তের সঙ্গে সরস্বতীর বেদনা ও বীণাধ্বনির সংযোগ ঘটিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্মীকি-প্রতিভায় বাল্মীকিরচিত মূল রামায়ণ অনুসরণ করেন নি। তিনি অনুসরণ করেছিলেন কৃত্তিবাসী রামায়ণ। সেজন্য বাল্মীকিকে দস্যু নায়করূপে বর্ণনা করেছেন। দস্যু বা ডাকাতেরা সাধারণতঃ কালীপূজক ও সুরাপায়ী। রবীন্দ্রনাথও বাল্মীকিকে কালীপূজক করেছেন। দস্যুদের উপাস্য কালী লোলরসনা, হিংসার প্রতীক। এখানে রবীন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত দস্যু-রত্নাকরের কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে

পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান । শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু

কালীতুলির চিত্র । আয়তন আনুমানিক · ১৭´×৩´ ফুট

রত্নাকর দস্যু হলেও কালীপূজক নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত হয়েছে—ধূর্জটির নির্দেশে মহাপাপী উদ্ধারের জন্য ব্রহ্মা ও নারদ রামনাম প্রচারের জন্য মর্ত্যে এলেন। সেখানে চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করত। সন্ন্যাসীর বেশে ব্রহ্মা ও নারদ বনের পথে এলে রত্নাকর লৌহমুদ্‌গরাঘাতে তাঁদের হত্যা করবার সংকল্প করল। কিন্তু ব্রহ্মার মায়ায় মুদ্‌গর করবদ্ধ হল এবং ব্রহ্মা যখন হত্যায় কৃতসংকল্প, রত্নাকরকে কিছুতেই নিরস্ত করতে পারলেন না, তখন বললেন, 'তুমি এই যে পাপ করছ এর কেউ কি অংশ নেবে?' রত্নাকর বলল, তার পাপের ভাগী চার জন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৃত পাপের ভাগ সংসারের কেউই যখন নিতে স্বীকৃত হল না তখন নিজের মাথায় সে মুদ্‌গর দিয়ে আঘাত করল। শেষে ব্রহ্মা তাকে রামনাম জপ করতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু

পাপে জড় জিহ্বা 'রাম' বলিতে না পারে।

ব্রহ্মা একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ দেখালে রত্নাকর অনেক কষ্টে 'মরা' শব্দ উচ্চারণ করল। তখন:

মরা মরা বলিতে আইল রামনাম
পাইল সকল পাপে মুনি পরিত্রাণ॥

রামনাম জপ করতে করতে তার দেহ বল্মীকাচ্ছাদিত হল। ব্রহ্মা তখন তার নামকরণ করলেন বাল্মীকি এবং বললেন:

সাতকাণ্ড কর গিয়া রামের পুরাণ

বাল্মীকি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় ব্রহ্মা বললেন:

সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বাতে
হইবে কবিতারাশি তোমার মুখেতে॥
শ্লোকছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা॥ —শ্রীরামপুরী সংস্করণ, ১৮০২

এই কথা বলে ব্রহ্মা চলে গেলেন। তার পর কৃত্তিবাস ক্রৌঞ্চবধ ও 'মা নিষাদ' শ্লোকোৎপত্তি বর্ণনা করেছেন।

কৃত্তিবাস রত্নাকর দস্যুর যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাস এ-কাহিনী কোথা থেকে পেলেন? ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কৃত্তিবাস-কথিত 'চ্যবন ঋষির পুত্র নাম রত্নাকর' নেই। সেখানে ঋষি বাল্মীকি স্বমুখে পূর্বজীবনবৃত্তান্ত রামচন্দ্রের কাছে বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি বললেন, 'রাম, আমি ব্রাহ্মণবংশে জাত হলেও কিরাতদের সঙ্গে বর্ধিত হয়েছিলাম এবং শূদ্রাচাররত ছিলাম। মুনিদের পথে দেখে তাঁদের পরিচ্ছদ কেড়ে নেবার সংকল্প করেছিলাম। তাঁরা আমাকে বললেন, কুটুম্বদের জিজ্ঞাসা করে এসো, তাঁরা তোমার পাপের অংশভাক্ হতে রাজি আছেন কি না। গৃহে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কেউই আমার পাপের ফলভোগী হতে রাজি হল না। তখন ধনুর্বাণ ফেলে আমি সেই মুনিদের শরণ নিলাম। তাঁরা 'রাম' নাম জপ করতে বললেন, কিন্তু অপারগ হওয়ায় 'মরা' শব্দে উচ্চারণের বিধান দিলেন। 'মরা' থেকে 'রাম' উচ্চারণ এল। এইভাবে বহুবর্ষ একাগ্রচিত্তে জপ করতে করতে আমার দেহ বল্মীকস্তূপে পরিণত হল। তখন মুনিরা আমাকে বাল্মীকি আখ্যা দিলেন।'—অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ ৬৪-৮৭

'অধ্যাত্মরামায়ণ' রামভক্তি প্রচারের কাব্য। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে রামনাম জপ করলে মহাপাপীও উদ্ধার হয়। এই পুরাণখানি রচনার শেষ সম্ভাব্য কাল চতুর্দশ শতক। কৃত্তিবাস, মাধবকন্দলী, তুলসীদাস, একনাথ সকলেই অধ্যাত্মরামায়ণের ভক্তিবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা চলে যে ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুশাসন পর্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকেও পাই বাল্মীকি বলছেন তিনি পূর্বে 'ব্রহ্মঘ্ন' ছিলেন পরে ঈশাণের শরণ লাভ করে পাপমুক্ত হন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর-কাহিনী এবং বিহারীলালের বর্ণিত বাল্মীকির কবিত্বলাভ ও সরস্বতী-প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের রচনায় আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনদর্শন এই বাল্মীকি-প্রতিভা থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে। বাল্মীকি-প্রতিভায় দেখি দস্যু-বাল্মীকির কবি-বাল্মীকিতে রূপান্তর ঘটার মূলে বন্দিনী বালিকার কাতর মুখচ্ছবি ও করুণ ক্রন্দন। মানব-বাল্মীকিকে আচ্ছন্ন করে ছিল যে দস্যু-বাল্মীকি তার মুক্তি ঘটল। বাল্মীকির দস্যুরূপের, কালীপূজকের, হিংসা-সাধকের অন্তরে যে-মানবরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, সেই মানবরূপের যেই জাগরণ ঘটল তখনই হল নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। হিংসার পরিবর্তে এল করুণা— সেই করুণাবোধেরই পরিণতি ক্রৌঞ্চমিথুনের প্রতি সাশ্রু সহানুভূতি। তখন হিংসার প্রতীক লোলরসনা কালীমূর্তির পরিবর্তে বাল্মীকির চিত্তে দেখা দিল শুভ্রবর্ণা বীণাপাণি সরস্বতী-মূর্তি। বাল্মীকির চিত্তে এই পরিবর্তন এনেছে শাস্ত্র নয়, যজ্ঞ নয়, দৈবাদেশ নয়— একটি নিরাশ্রয়া ভীতা বালিকার কাতর আকুল আবেদন। শিশুচিত্ত নিষ্পাপ, নির্মল। এই পবিত্র হৃদয়ের স্পর্শে বাল্মীকির হিংসাজনিত পাপভার দূরে গেল। এই কথাটি প্রকৃতির প্রতিশোধ ও বিসর্জন নাটকেও ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে মায়াবাদী সন্ন্যাসী ও বালিকা 'রঘুর দুহিতা' এবং বিসর্জন নাটকে রঘুপতি ও অর্পণা প্রকৃতপক্ষে বাল্মীকি-প্রতিভার বাল্মীকি ও বন্দিনী বালিকার পূর্ণতর রূপ। রাজর্ষি উপন্যাস ও মুক্তধারা নাটকে শিশুচিত্তের প্রভাব গোবিন্দমাণিক্য ও বিশ্বজিতের চরিত্রে সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত ঘটনাকে মোটামুটিভাবে রূপ দিলেও তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

মহর্ষি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের প্রারম্ভে পাই মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই পৃথিবীতে সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কে অগ্রগণ্য? ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, উদার ও সর্বভূতহিতরত কে আছেন? তিনি কি বীর্যবান, বদান্য, জিতক্রোধ ও অসূয়ামুক্ত?

বাল্মীকির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নারদ বললেন, এতগুলি দুর্লভ গুণের সমাবেশ কোনো দেবতার মধ্যেও দেখা যায় না। তবে ইক্ষ্বাকুবংশের রামচন্দ্রের মধ্যে এই গুণগুলির চেয়েও মহত্তর গুণ বিদ্যমান। রামচন্দ্রের বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বললেন রামচন্দ্র নির্বিকার, মহামনা, শত্রুহন্তা, জ্ঞানী ও প্রজারক্ষক।

নারদ আরও বললেন, তিনি ধৈর্যে সমুদ্র, স্থৈর্যে হিমাচল, বীর্যে বিষ্ণু, আনন্দবর্ধনে চন্দ্র, ক্রোধে প্রলয়াগ্নি, ক্ষমায় পৃথিবী, ত্যাগে কুবের সদৃশ। রামের চরিতকথা-বর্ণনাশেষে তিনি বাল্মীকিকে বললেন, তুমি যে-সব গুণের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে রামচন্দ্রে সেইসব গুণ বিরাজিত। তখন বাল্মীকি বললেন, যে-ব্যক্তি রামচরিত পাঠ করে সে সর্বাধিক পাপ থেকে মুক্ত হয়। শংকরের অনুগ্রহ লাভ করে মৃত্যুর পর ব্রহ্মে বিলীন হয়। এখানেই প্রথম সর্গ সমাপ্ত হয়েছে। রামায়ণপাঠের এই পুণ্যফল বর্ণনা স্পষ্টতঃই পরবর্তী কালের যোজনা।

দ্বিতীয় সর্গে পাই বাল্মীকি নারদের প্রস্থানের পর তমসা নদীতীরে গেলেন। স্নানশেষে বল্কল পরিধান করে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করলেন। এমন সময়ে এক নিষাদ ক্রৌঞ্চমিথুনের পুরুষটিকে নিহত করল। ক্রৌঞ্চীর বিলাপে ঋষি বাল্মীকির চিত্তে করুণরসের উদ্রেক হল, তাঁর মুখ থেকে 'মা নিষাদ' শ্লোকটি উৎসারিত হল। নিষাদের উদ্দেশ্যে এই বাক্য উচ্চারণ করে তাঁর হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল :

শকুনং শোচতাহেবং কিমেতদ্ব্যাহৃতং ময়া।— ১৮

এই পাখির জন্য শোকার্ত হয়ে এ আমি কি রচনা করলাম! শোক থেকে জাত বলে এর নাম হল শ্লোক। আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হলে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা বাল্মীকিকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন—

শ্লোক এবাস্ত্বয়ং বদ্ধস্তব বাক্যস্য শোচতঃ
মচ্ছন্দাদেব তে ব্রহ্মন্ প্রবৃত্তেয়ং সরস্বতী ॥
রামস্য চরিতং কৃৎস্নং কুরু ত্বমৃষিসত্তম
ধর্মাত্মনো গুণবতো লোকে রামস্য ধীমতঃ ॥
বৃত্তং প্রথয় রামস্য যথা তে নারদাচ্ছ্রুতম্
রহস্যং চ প্রকাশং চ যদ্‌বৃত্তং তস্য ধীমতঃ ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মা বললেন, আমার ইচ্ছানুসারে তোমার মুখ থেকে উক্ত শ্লোক উৎসারিত হয়েছে, হে ঋষিসত্তম, তুমি নারদের মুখশ্রুত রামচন্দ্রের চরিতকথা রচনা করো।

ব্রহ্মা শেষে জানালেন, আমার অনুগ্রহে সমস্ত অবিদিত বৃত্তান্ত তোমার বিদিত হবে। এই কাব্যে তোমার কোনো বাক্যই মিথ্যা হবে না। তুমি পুণ্যরামকথা শ্লোকবদ্ধ করো। যতদিন পৃথিবীতে নদী ও পর্বতসমূহ থাকবে ততদিন তোমার রামায়ণীকথা অম্লান থাকবে।

তখন বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনা আরম্ভ করলেন।

'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির রামায়ণ কাব্য-রচনা-প্রসঙ্গটিকে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি দ্বিতীয় সর্গটিকে প্রথমে স্থান দিয়ে তার পর প্রথম সর্গের নারদের বক্তব্যকে গ্রথিত করেছেন। ফলে কবিতাটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয়েছে। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় দেখি নবছন্দ লাভ করবার পর বাল্মীকি 'তরুণ গরুড় সম' মহৎ ক্ষুধা বোধ করেছেন। নারদ এসে তাঁকে নবছন্দে দেবতার জয়গান রচনা করতে অনুরোধ জ্ঞাপন করলে বাল্মীকি বললেন, 'দেবতার সামগীতি গাহিতেছে বিশ্বচরাচর', কাজেই তিনি মানববন্দনায় ব্রতী হবেন তাঁর নবছন্দ নিয়ে। তাই তিনি নারদকে প্রশ্ন করলেন :

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দরকান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্যনাম।

নারদ ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন :

অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

প্রকৃতপক্ষে বীর্যবান মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই যে সুগভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছেন, সেই পরিপূর্ণ মানবাদর্শ ই তিনি রামচন্দ্রের মধ্যে রূপায়িত করেছেন, বাল্মীকির বর্ণনার আক্ষরিক অনুকরণ করেন নি। মূল রামায়ণে বাল্মীকি-নারদ-সংবাদে রামচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত মহত্তর জীবনাদর্শকে ঠিক পাওয়া যায় না। গীতায় বর্ণিত 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ' -রূপটিই যেন রবীন্দ্রনাথের বর্ণনায় ফুটেছে। ঈশোপনিষদের যে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাণীটিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন তাকে তিনি রামচরিত্রে সমন্বিত করেছেন—

কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—

দুঃখবহনের এই উজ্জ্বল আদর্শের পরিচয় বাল্মীকি-নারদ-সংবাদে নেই। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখা দিল হিংসার পরাজয় ও প্রেমের জয়, মানবধর্মের জয়। সেখানে তিনি কৃত্তিবাস ও বিহারীলালকে অতিক্রম করে গেছেন সেই তরুণ বয়সে। আর 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে রামচরিত্রকে উপলক্ষ করে কবির চিরন্তন মানবধর্মের আদর্শ।

# বোরিস পাস্তেরনাক

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পাস্তেরনাক[১] এবং তাঁর লিখিত উপন্যাস 'জীভাগো' আজ বিশ্ববিশ্রুত। এই গ্রন্থখানির জন্য লেখক নোবেল কমিটি থেকে পুরস্কার পেয়েছেন, আর পেয়েছেন তিরস্কার তাঁর দেশবাসীদের ( অর্থাৎ যাঁরা রাজনীতি-সম্পৃক্ত তাঁদের ) কাছ থেকে। সে বিবাদের বিবৃতি আমার বক্তব্যের অন্তর্গত নয়, আমি বলছি অন্য কথা।

শুনেছি 'জীভাগো' শব্দটি রুশ ভাষায় আমাদের 'জীব' বা 'জীবন' শব্দটির আত্মীয়—'জীভাগো' অর্থে হবে জীবন্ত, জীবনময়, জীবনধারা, এই রকমের কিছু। বইখানি তবে হল পাস্তেরনাকের জীবনবেদের কথা— জীবন, জীবনরহস্য তিনি যে চোখে দেখেছেন, তার অর্থ বা গতি যা আবিষ্কার করেছেন, তাই হল এ বইখানির মর্মকথা।

পাস্তেরনাকের জীবনবেদের প্রথম সূত্র এবং মুখ্যমন্ত্র হল— সমস্ত জীবন এক, পৃথিবীর জগতের জীবনধারা এক অভিন্ন। একই প্রাণস্পন্দ, একই গতির দোল বিশ্বের মধ্যে লীলায়িত। মানুষ পশু তরুলতা, সব একসূত্রে বাঁধা, এক সুরে এক ছন্দে এক প্রাণে তরঙ্গিত। সকলের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে রয়েছে একটা সমধর্ম সমকর্ম সমগতি, সমলক্ষ্য। এই সম্মেলনই হল পরমপ্রীতির, হয়তো একমাত্র তৃপ্তির, উৎস। আপনাকে খুলে ধরে, হারিয়ে ফেলে যদি এই বিশ্বসংগতে এক হয়ে যেতে পারে তবেই মিলবে শান্তি, স্বস্তি, পরম সার্থকতা।—

এক নিমেষ, কোনো ভার নাই তার—
এ ছাড়া জীবন আর কি ?
সকল জীবনের মধ্যে গলে যাওয়া
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে—

জীবন তার সকল ভার, গুরুভার হারায়, লঘু হয়ে প্রায় শূন্যই হয়ে যায়, যখন আমরা পারি বিশ্বের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে মিশিয়ে দিতে।

কিন্তু এই যে একপ্রাণতা, এই যে 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' এর অন্তরে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আবার একটা বৈষম্য, একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারণ পাস্তেরনাকের জীবনবেদে দ্বিতীয় সূক্ত হল ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য। সমস্ত সৃষ্টি এক অভিন্ন বটে, কিন্তু তা হল একটা সমবায় অর্থাৎ ভিন্নতার নিবিড় সমষ্টি। এদিক দিয়ে যখন দেখি, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর যখন অভিনিবেশ হয় তখন কিন্তু চিত্রটি হয়ে ওঠে আর-এক রকম, সম্পূর্ণ

---

১ প্রবন্ধটি লেখার পর পাস্তেরনাকের মৃত্যু হয়েছে। আমি আমার প্রবন্ধে বলেছি পাস্তেরনাকের জীবন একটি ট্রাজেডি—প্রায় গ্রীক ট্রাজেডি; তাঁর মৃত্যু যেভাবে হয়েছে তা তাঁর এই ট্রাজেডির যেন অব্যর্থ পরিণাম ও পরিণতি, ঠিক তাঁর নায়কের জীবনের মত।

বিপরীত। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অর্থ সংগ্রাম; শুধু সংগ্রাম নয়, অন্ধকারের আবির্ভাব, ষড়রিপুর কুৎসিত লীলা। জীবন হয়ে ওঠে বিষভাণ্ড। সমস্তের বিরুদ্ধে ব্যক্তির ব্যর্থতা।

তখন মনে হয় যে শান্তি যে ঐক্য যে পরম অনুভূতি পাস্তেরনাক পেয়েছেন, তা এ জগতের নয়, জগতের ভিতরে যদি থাকে তা তবে জগতের ভিতর দিয়ে পার হয়ে গিয়ে ওপারের কথা কিছু। এ জগৎ হয় তখন একটা পরম মায়া— এবং মায়ারূপে দেখতে পারলেই তা হয়ে ওঠে মরীচিকা-সুন্দর। আর তা মায়া হয়ে ওঠে তখনই যখন তাকে দেখি সমগ্ররূপে। কিন্তু ব্যষ্টিরূপে সেখানে ফুটে ওঠে যে দৃশ্যতা ভয়াবহ। তখন দেখি সারা জীবনটা এক অভিন্ন, সমস্ত সৃষ্টি একজোট হয়ে রয়েছে, কিন্তু তা হল যেন বেদনার পুঁটুলি, প্রতিমূর্ত দুঃখ ও কারুণ্য— যা দিয়ে তৈরি তাঁর ইষ্ট যীশুখৃষ্ট। কবি জিজ্ঞাসা করছেন, কি বুঝতে চাও তুমি সৃষ্টি সম্বন্ধে—এই যে কাল-কবলিত, মৃত্যুর দাস জগৎখানি কি তা?

"হায়! বিশ্বসৃষ্টি তো অতি সরল ব্যাপার একটা—চতুর লোকে অন্য কথা যাই বলুক-না—লতাগুল্মেরা পর্যন্ত অনুভব করে মর্মে তাদের বাসা করেছে মৃত্যু, ইহজগতে প্রত্যেক বস্তুরই আছে একটা সর্বশেষ!"

আরো অনুরূপ চিত্র দেখি যা দেয় একই শিক্ষা—

ধূসর প্রেতমূর্তি সব, গাছের সারি, শাখার পুঞ্জ,
পথ বেয়ে চলেছে অজস্র ধারায়,
বিদায় নিতে চলেছে নিষ্পলক রাত্রির কাছে,
নিষ্পলক রাত্রি ওদের তো কতই দেখেছে—

জীবনধারা যে কি তার সুখ-দুঃখ তৃষ্ণা-তৃপ্তি নিয়ে সে সম্বন্ধে কবি একটি কথিকা বলছেন, তাতে পাবেন জীবনের মর্ম-আলেখ্য— দেখবেন কি সুন্দর কি করুণ ছবি!

কাঁটা ঝোপ-ঝাড়ের মাঝে, সুদূর এক দেশে
ঘোড়ায় চলেছে মানুষ এক, সুদূর এক যুগে,

চলেছে যুদ্ধে, কিন্তু হঠাৎ দেখে সম্মুখে
বালুরাশির মাঝে কালো ঘোর বন এক অদূরে,

অর্ধস্ফুট স্বরে কে বলে ওঠে তার আর্তপ্রাণে
'চাবুক চালাও, ঘোড়াকে জল দিতে থেমো না'।

শুনল না কথা, চলল তবু ছুটে
বনের ভিতরে, পূর্ণ বেগে,

নেমে পড়ল চড়াই থেকে, চেয়ে দেখলে উৎরাই,
ফাঁকা জায়গাটি পার হয়ে, আর-একটা পাহাড় পার হল,

সরু ফাটল দিয়ে চলল হাঁটাপথ ধরে,
দেখলে পায়ের দাগ গিয়েছে ঘাটের দিকে—

ডাক না শুনে, নিজের মনের ইশারায় কান না পেতে
ঘোড়াটিকে নিয়ে ছুটল পাহাড়গুলির শেষে।

নদী একটা— পাশে গুহা, ঘাটের উপরে
গন্ধকের আগুন জ্বলছে গুহার মুখে,

রক্তবর্ণ ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা যায় না কিছু ;
সারারাত্রি দূর হতে কার ডাকে ধ্বনিত হয়ে উঠল,

সোয়ার ধরলে তার বল্লম, দেখল চেয়ে
অতিকায় এক জানোয়ারের নাসাগ্র, আর লেজ আর আঁশ—

মুখ থেকে তার নির্গত আগুনের হল্কা, আর গ্রীবা দিয়ে
জড়িয়ে ধরেছে, ক্রমেই শক্ত করে, এক নারীদেহ, ত্রিধা বলয়ে,

তার আপন স্কন্ধেরই পাশে অজগরের কণ্ঠ—
ফুঁসছে যেন চাবুক একখানি।

দেশের রীতি—বন্দী এক কুমারীকে
অর্পণ করতে হবে বনের অজগরের কবলে,

এই শর্তেই অজগর রাজি হয়েছে
দেশের লোকের ঘরদোর বাঁচিয়ে রাখতে।

অজগরের আহার্য হল মেয়েটি,
তার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরেছে, জড়িয়ে ধরেছে হাত দুখানি ;

আকুল দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে একবার
সে নিশানা করল তার বল্লম অজগরকে লক্ষ্য করে,

চোখ বন্ধ করে—কত আকাশ, কত মেঘ,
কত জল, কত ঘাট, কত নদী— কত দিন, কত যুগ—

মানুষটি ভূতলে, শিরস্ত্রাণ লুটিয়ে পড়েছে,
কিন্তু বিশ্বস্ত বাহনটি কাছে দাঁড়িয়ে, ফেলছে দীর্ঘশ্বাস।

অজগরের দেহটিও পড়ে রয়েছে অশ্বটির পাশে ;
মানুষটি অচেতন, মেয়েটি মূর্ছিত।

দ্বিপ্রহর! নির্মল আকাশ! সুকোমল নীলিমা!
পৃথিবীর তনয়া? রাজার ঝিয়ারী?

কখনো অশ্রুর ধারায় ভেসে যায়, আনন্দের আতিশয্যে,
কখনো বা বিস্মৃতির তলে যায় ডুবে দুজনার অন্তর;

আবার জেগে ওঠে—কিন্তু রক্ত-ক্ষরণে
হিমশীতল ধমনী তাদের—দুর্বল ক্ষীণ দুজনেই,

চোখ বন্ধ তাদের— কত আকাশ, কত মেঘ গেল,
কত জল, কত ঘাট, কত নদী— কত দিন, কত যুগ!

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীকে একটা চিরন্তন প্রতীক করে ধরেছেন কবি— তা একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র নয়, তা ঘটে চলল নিত্যকাল ধরে। অসমাপ্ত করুণ গাথা এই মানুষের অসমাপ্ত জীবনকাহিনী। কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে কোনো অজগরের হাত থেকে রক্ষা করতে ছুটেছে। তিনজনই দেখছি হত বা আহত রক্তাক্ত।

জীবনের এই যে করুণ ভাগ্যচক্র, এ থেকে মুক্তি নেই, উদ্ধার নেই? বুক বেঁধে কণ্ঠ চেপে বলতে হবে শুধু—

চোখের জল ফেলো না, ব্যথিত ওষ্ঠ
কুঞ্চিত কোরো না
আবার হয়তো বসন্তের ব্রণজ্বালা ফিরে দেখা দেবে।

জীবন কেবল হল এই রকম একটা নিত্য ঘূর্ণায়মান উত্থান-পতন বিঘ্নিত রথচক্রই—

কোথা হতে এল
এইসব চূর্ণখণ্ড, ছন্দিত যারা বেদনায়
আনন্দে, মত্ততায়, যন্ত্রণায়—

কবি বলছেন, না, তার অপরিহার্য অনিবার্য প্রয়োজন নেই, এসবেরই মধ্যে আছে একটা দিক খোলা—

"আমি বন্দী এখানে—কিন্তু রাত্রি তার নির্যাতনের মধ্যে আমাকে যতই বেঁধে রাখুক-না, আমি ছুটে বের হব, কোন অনুরাগ আমাকে সব বাঁধন ছিঁড়তে তাড়া দিয়েছে!"

ফলতঃ পাস্তেরনাকের সম্মুখে সর্বদা জাগ্রত রয়েছে খৃষ্টের মূর্তি— খৃষ্টই তাঁর জীবনের ইষ্ট, মানবীয় জীবনের আলেখ্য। এই খৃষ্ট বা ইষ্ট -অনুরাগই দিয়েছে মুক্তি তাঁকে। জীবনে সংকুল বিপদের সম্মুখে খৃষ্ট নিজেই কি কাতর কণ্ঠে বলে ওঠেন নি—

হে পিতা! হে পিতা! সরিয়ে নাও আমার ওষ্ঠের
কাছ থেকে এই বিষপাত্র!

কিন্তু তবুও তিনি স্বীকার করে নিলেন, পার হয়ে গেলেন কালরাত্রি—দেখলেন তার প্রয়োজন, তার সার্থকতা। কারণ, পূর্ণদৃষ্টিতে সত্যদৃষ্টিতে দেখা যায়— মানুষের উপর দুর্যোগ যখন ঘিরে আসে, জীবনের পরিণামও হয়ে

ওঠে ঘোর দুর্যোগ, বাহ্যতঃ— তাই হয় পরম সুযোগ, তাই হয় ভাগবত আশীর্বাদ, ভগবৎ-প্রসাদ— Grace ; বাইবেলে কথিত এক কাহিনী কবি বলছেন এইভাবে—

"একটা গাছ দাঁড়িয়ে— হেমন্তর গাছ— ফল ফুল পাতা শূন্য— রিক্ত শুষ্ক ডাল শুধু— হাড়গুলি যেন বের হয়ে আছে। খৃষ্ট পথে যেতে যেতে দেখলেন গাছটিকে—চেয়ে বললেন তাকে, 'তুই নিষ্ফলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছিস— আচ্ছা, থাক্ তবে চিরকাল ঐ রকম!' খৃষ্টের এই অভিশাপ মাথায় বহন করে গাছটি রইল ঐ রকম দাঁড়িয়ে চিরকাল।"

কবি বলছেন ভগবানের এই হল অঘটনঘটনপটীয়ান পরম আশীর্বাদ। কি রকম নিষ্ঠুর পরিহাস, নয় কি? না, তা তো নয়—

"আমাদের বিপদের, আমাদের বিপর্যয়ের চরম যখন তখনই তিনি আমাদের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমাদের গ্রাস করে ফেলেন।"

তাই তো বলা হয় ভগবান দিনের আলোকে আসেন না আমাদের কাছে, তিনি আসেন গভীর নিশীথে, আমাদের অজ্ঞাতে তস্করের মত— বিপদের মধ্যে সম্পদকে দেখতে পারাই হল অধ্যাত্মপুরুষের কৃতিত্ব— জগতের জীবনের যত দুঃখ তা কেবল অমিশ্র দুঃখ?— কবি বলছেন, না, দুঃখেরই মধ্যে নিহিত সুখের রেশ, তা আবিষ্কার করাই সমস্ত জীবনের রহস্য। প্রাকৃত বোধ দিয়েও দেখা যায়, কবি বলছেন—

সমস্ত জীবনকে উষ্ণ করে তোলে
দুঃখেরই এক কণা।

দুঃখ হল তপস্যার এক রূপ, যদিও তা আরোপিত, তা স্বেচ্ছাবৃত নয়। সমস্ত প্রকৃতি এই তপস্যার মূর্তি গ্রহণ করে হিমঋতুতে, তাই মনে হয় পাস্তেরনাক হিমঋতুকে এত ভালোবাসেন এবং এত সুন্দর চিত্র দিয়েছেন তার। অবশ্য রুশদের শীতকাল বিখ্যাত এবং শীতের দৃশ্য রুশ-চেতনার অঙ্গীভূত বিশেষভাবে। পাস্তেরনাক এই শীতকে একটা প্রতীকে পরিণত করেছেন। বাহ্যপ্রকৃতি যেমন, মানুষের জীবন-জগৎটিও আন্তর সত্যের দিক দিয়ে তেমনি হল যেন কুয়াশা-কুজ্ঝটিকা-হিমানী-আচ্ছন্ন একটা বিরূপ রিক্ততা। এ রকম অবস্থায় কি করতে পার, কি করা উচিত তোমার? আশ্রয় গ্রহণ করো নিজ নিকেতনে, অন্তরের নীড়ের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রদীপ জ্বালিয়ে। ভগবান তোমাকে দিয়েছেন এই ভাবে তোমার আত্মাভিনিবেশের পরম সুযোগ। যখন তুমি এইভাবে নির্জন নিঃসঙ্গ একাকী সর্বহারা, ভগবান তখনই পাঠিয়ে দেন তাঁর দিব্যদূত—

ধূসর কুয়াশায় সব হারিয়ে যায়,
হিমানীনিথর রাতের কোলে,
ঘরের পিলসুজে রয়েছে দীপ,
জ্বলছে তার শিখা,
শিখা কেঁপে উঠল হঠাৎ,
শত্রুর প্রলোভন?
কিন্তু উপরে ভাসল ছায়া,
কোন্ দেবতার?

বাহিরে এই শীতের মাসে
ঝঞ্ঝা চলেছে ঘোর রবে,
কিন্তু ঘরের পিলসুজে রয়েছে দীপ।
জ্বলছে তার শিখা।

আমার মনে হয় খৃষ্টের যে দুটি মহাবাক্য, তার মধ্যে পাওয়া যাবে তিনি জীবনসমস্যার কি মীমাংসা দিয়েছেন এবং পাস্তেরনাক সেই ভাবের ভাবুক হয়েই গড়েছেন তাঁর জীবনবেদ। প্রথম মহাকাব্য হল—

The Kingdom of Heaven is within you.

স্বর্গরাজ্য রয়েছে অন্তরে তোমার। অন্তরের আয়তনেই শান্তি, স্বস্তি, জ্যোতি, পরমপ্রীতি। কিন্তু এর অর্থ নয় বাহিরের জীবনও হয়ে উঠবে নির্বিঘ্ন, নিরাময়, সুখময়। তা আশা করা যায় না, আশা করা উচিতও নয়— বাহ্যজীবন, প্রাকৃতজীবন, প্রকৃতির গতি স্বভাবতঃই হল দ্বন্দ্বসংকুল বিরোধবিঘ্নিত। বলেছি, প্রাকৃতিক জীবনে ঊষর হিমঋতু আছে, খৃষ্টের জীবনে তাই তো এল জুডাস, এল পীটরেরও প্রতারণা, তাই খৃষ্টের দ্বিতীয় মহাবাক্য—

Render unto Caeser what is Caeser's

অর্থাৎ প্রকৃতির দুর্যোগ এড়িয়ে চলা যাবে না, তাকে স্বীকার করতে হবে, তার ভিতর দিয়ে চলতে হবে— এভাবে চলতে চলতেই সন্ধান পেতে হবে অতি-প্রাকৃতের— এই সাহস থাকা চাই, দুর্যোগের রাত্রি পার হবার। এই রকম এক অন্ধকার বর্ষার রাত্রিতে বনজঙ্গল পার হয়ে

মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামস্তমালদ্রুমৈ
র্নক্তং—

শ্রীরাধা কি চলেন নি শ্রীকৃষ্ণের অভিসারে? পাস্তেরনাকও বলছেন তাই—

সাহস থাকলেই দেখা যায় সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে,
এই বস্তুই তো আমাদের অন্তরে আমাদের প্রলুব্ধ করে চলেছে।

দুর্যোগকে সুযোগ করতে হয় এই রকমে, বাধা-বিপত্তিকে বহন করে ( খৃষ্ট যেমন বহন করেছিলেন ক্রুশ ) অথবা বাহন করে ( আমাদের দেবতারা যেমন করেছেন এক-এক জীবকে )।

কাব্যবিতান। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ও শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

কাব্যদীপালি। শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব সম্পাদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন। শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য বারো টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতা। শ্রীবুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লি.। কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা।

কবিতা রচনা করা এবং কবিতা সংকলন করা, কোন্‌টা যে বেশি শক্ত এই নিয়ে একটি কৌতুকপ্রদ বিতর্কের অবতারণা হতে পারে। কবিতা লিখতে যিনি ব্যর্থ হলেন তিনিই হয়ে বসলেন ক্রিটিক, এই উক্তিটি বহুপ্রচলিত। তবু এটাও ঠিক যে সত্যিকারের ক্রিটিকের কর্তব্য সহজ মোটেই নয়। কেননা, ক্রিটিককে কেবল কতকগুলো বই মুখস্থ করে সমালোচনার সূত্র শিখলেই চলে না, তার সঙ্গে আরো একটি জিনিস দরকার যা বড়ো সহজলভ্য নয়। এমন-কি কথাটা অন্য দিক দিয়েও বিবেচনা করা যায়। সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনার চেয়ে সংকলনের মধ্যেই বরং সেই দুর্লভ বস্তুটির নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কবিতাকে বেছে নেবার রসবোধের স্বাধীনতা আছে। অবশ্য সংকলনকর্মে শুধু রসবোধই নয়, সমালোচনাশক্তিরও সমান প্রয়োজন। সংকলন যদি বিভিন্ন কবির রচনা থেকেই হয়, তবে বাছাই করা নানা কারণে দুরূহ হয়ে ওঠে। বাছাইয়ের কোনো স্পষ্ট নীতি স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেউ দেশপ্রীতিমূলক কবিতা সংগ্রহ করতে পারেন, কেউ প্রেমের কবিতাকে নিয়েই শুধু সংকলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ স্পর্শক্ষম মান স্থির করে নেওয়া যেমন শক্ত নয়, তেমনি সহজ নয় এরই মধ্যে ভালো কবিতা বেছে তোলা।

কোন্ কবিতা রসোত্তীর্ণ, কোন্ কবিতা নয়, তা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য কেউ এ পর্যন্ত বলতে পারেন নি। তবু রসিক ব্যক্তি মোটামুটি সেটা বুঝতে পারেন। গত্যন্তরহীন হয়ে এ কথাই বলা যায় যে কবিতা যদি ভালো হয়, তাহলে সে নিজের শক্তিতেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে রসকে বলা হয়েছে অলৌকিক; দেশ-কালের লৌকিক প্রেরণা বা রুচি রসের নিয়ন্তা নয়। লৌকিকতার বাঁধনমুক্ত বলে এই সংজ্ঞার সর্বজনগ্রাহ্য হবার যুক্তিগত যোগ্যতা আছে। তবু কবিতা সত্যই অলৌকিক কিনা এই নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে, যেহেতু রুচিকে অতিক্রম করা প্রায় পর্বতলঙ্ঘনের মতই দুঃসাধ্য। 'আধুনিক'-অভিধেয় কবিতা নিয়ে সংশয়ের কথা অনেকেই স্মরণ করবেন। অথচ কাব্য-সংকলনকালে রুচিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যেমন সংগতও নয়, সম্ভবও নয়, তেমনি শুধু রুচিকে মাত্র অবলম্বন করেও সাফল্যলাভের সম্ভাবনাও অল্প। কারণ বহু কবির রচনাসংকলন অর্থ একটা লৌকিক উদ্দেশ্যকে মর্যাদা দেওয়া। সংকলনকার্যে আত্মনিষ্ঠা এবং পাঠকনিষ্ঠা দুয়েরই সমান প্রয়োজন।

ভালো কবিতার সংগ্রহ হয়েছে বটে, কিন্তু যাঁরা কবিতার শুধু রসাস্বাদন নয় অধ্যয়ন করতে চাইবেন তাঁরা কিঞ্চিৎ অসুবিধাই বোধ করবেন। বৃহৎকায় 'গীতিকবিতা সংকলনটি' আবার ঠিক এর বিপরীত। পাঠ্য, অপাঠ্য, দুষ্পাঠ্য প্রভৃতি নানাজাতীয় ৪৬৬টি কবিতার গহন অরণ্যের মধ্যে পাঠক যাতে পথ না হারান, তার ব্যবস্থা করা হয়েছে ছয়টি খণ্ড ভাগ করে— প্রেমবিষয়ক, দেশপ্রেমবিষয়ক, গার্হস্থ্যজীবনবিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক, বিষাদবিষয়ক, তত্ত্ববিষয়ক। এই ছয়ভাগের দ্বারাই পাঠকেরা পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা কাব্যের (১৮৬০-১৯১০) রূপরীতি বেশ ভালো ভাবেই অনুধাবন করতে পারবেন।

এই সংকলনটির বৈশিষ্ট্য এই যে এতে কবিতা শুধুই মুদ্রিত গ্রন্থ থেকেই নেওয়া হয় নি। পুরনো মাসিক পত্র থেকেও উপযুক্ত বিবেচনা করলে সম্পাদকদ্বয় কবিতা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের রুচিবোধ কিছু উদার বলেই মনে হয়। প্রবীণ সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কবিরা সহজেই পাসের মার্ক পেয়ে যান বলে মনে হল। সারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস থেকে বিশী মহাশয় যেখানে ২৮৮টি কবিতা চয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাশ বৎসরের পরিধি থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেখানে ৪৬৬টি কবিতা বেছে নিয়েছেন। কবিদের কবিতাসংখ্যাও নির্দিষ্ট রাখেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের বাংলা কবিতার আকৃতি-প্রকৃতি বোঝানোই এই সংকলনের উদ্দেশ্য। কবিতার মান সম্পর্কে ততটা বিচারপ্রবণ না হয়ে বরং তার বৈচিত্র্যের দিকেই ঝোঁক তাঁরা বেশি দিয়েছেন। অর্থাৎ গীতিকবিতা সংকলনে ছাত্রদের প্রয়োজনই তাঁদের প্রধান চিন্তনীয় হয়েছে বলে মনে হয়। প্যালগ্রেভের কাব্য-সংকলনের মতো একটা বিস্তৃত এবং প্রয়োজনীয় কার্যসিদ্ধি করাই এর উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় এই অভিধানাকৃতি বিপুল গ্রন্থটিতে কবিতা সংকলনের ব্যাপারে অসতর্কতার চিহ্ন রয়ে গিয়েছে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মাতৃস্তুতি' দেশপ্রেমের অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশপ্রেমবিষয়ক ছাড়া গান সংকলিত হয় নি, এ কথা বলা হলেও রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির একাধিক গান 'বিষাদবিষক' এবং 'গার্হস্থ্যবিষয়ক' অংশে ঢুকে পড়েছে। নবীনচন্দ্র সেনের 'পিতৃহীন যুবক' তত্ত্ববিষয়ক কবিতারূপে শ্রেণীভুক্ত হবার উপযুক্ততা কি? কবিতার মূল উৎস নির্দেশেও সংগতির অভাব রয়ে গিয়েছে। কবিদের তালিকায় আলাদা করে জীবিতকাল নির্দেশ করা হলেও কবিতাতে কোথাও কবির সময় দেওয়া আছে, আবার কোথাও দেওয়া নেই। চিত্তরঞ্জন দাশ এবং প্রিয়নাথ সেনের কবিতাও এতে সম্ভবত অনবধানতাবশতঃ গৃহীত হয় নি।

এসব ত্রুটি এমন কিছু মারাত্মক নয়। নতুন সংস্করণে অনায়াসেই সংশোধন করে নেওয়া চলবে। এ বইটির উপযোগিতার কথা বিবেচনা করলে এ সব আপাততঃ উপেক্ষা করলেও ক্ষতি নেই। বাংলা গীতিকবিতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে এ যুগের পাঠকদের পরিচয় সাধনই এর উদ্দেশ্য। বিস্তৃত ভূমিকায় সম্পাদকেরা সে বিষয়ে সাহায্যও করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান সংকলনে বাদ দেওয়ার কারণ "উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতে হইলে তাঁহাকে দূরে রাখাই প্রয়োজন এবং রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা যে অমূল তরু নহে তাহা গত শতকের গীতিকাব্যভূমি হইতেই প্রাণরস আহরণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় এই সংকলনে"। গীতিকবিতা সংকলনের ভূমিকায় সেকালের কাব্য

সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের আলোচনা করা হয়েছে। এটা পড়লে পাঠকদের একটা সুসম্বদ্ধ ধারণা গড়ে উঠবে আশা করি। অবশ্য কয়েকটি মন্তব্য বিতর্কমূলক। যেমন,

'কবিতাবলীতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ শেলীর নিকট।' পৃ ১/০

'রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার জোরেই হৃদয়াবেগকে ইহারা [ মহিলা কবিরা ] সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন।' পৃ ১।০

'বিষাদ রবীন্দ্রকাব্যে বরাবরই বর্তমান।' পৃ ১।/০

'গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য, বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিপ্রধান ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপ লাভ করে।' পৃ ।৶০

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব এবং শ্রীমতী রাধারাণী দেবী সম্পাদিত 'কাব্যদীপালি' এবং শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' আবার বিশেষ এক রীতি অবলম্বনের ফলে একই শ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য। 'কাব্যদীপালি' প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। দ্বিতীয় সংস্করণের ( ১৩৩৮ ) পর তৃতীয় সংস্করণে ( ১৩৬৬ ) অনেক নতুন কবি স্থান পেয়েছেন। এক সময়ে 'কাব্যদীপালি' প্রায় একক সংকলন-গ্রন্থই ছিল বলা চলে। সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশের সময় বাংলা কাব্যের আরো সংকলন বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে জন্য এর উপযোগিতা যে কিছু কমেছে তা নয়। মধ্যযুগোত্তর বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে এতে। সংকলকদ্বয়ের ভাষায় 'এবার কাব্যদিপালী হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগ— এই দুই কালের কাব্যনির্দেশিকা।' এই দাবির মধ্যে কিছু যে সত্য আছে, তাতে সন্দেহ নেই। যদিও এ কথা ঠিক যে বিশেষ এক শ্রেণীর কবিতা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখলে আধুনিক বাংলা কাব্যের বৈচিত্র্যের স্বাদ ঠিক দেওয়া যায় না, তথাপি এ কথাও ঠিক বাংলা কবিতার উৎকর্ষ ঘটেছে প্রধানত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেই। একেবারে সাম্প্রতিক কালের কবিদের অবশ্য মোহভঙ্গ হচ্ছে বলে শোনা যায় এবং বিশ্বাস জন্মাচ্ছে যে প্রেমে পতন ছাড়া কিছু নেই। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখা হলেও প্রেমকে বাদ দিয়ে প্রায় কোনো কবিই কবিতা লিখতে পারেন নি ( সমর সেনও না, সুকান্ত ভট্টাচার্যও না )—সব কবিই এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যেখান থেকে বাংলা সাহিত্যের মূল সুরটি উঠছে। অবশ্য ভালো প্রেমের কবিতা বাছতে গিয়ে মানদণ্ডটি কিছু ঢিলে করতেই হয়েছে। নিছক্ রোমান্টিক উন্মনস্কতাকেও প্রেমেরই সুর বলে ধরে নিতে হয়েছে, সুতরাং এ কথা বলাই ঠিক হবে—রোমান্টিক ভাবই হচ্ছে 'কাব্যদীপালি'র কবিতা বাছাইয়ের মান। প্রেম আর প্রকৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান বিষয় হলেও প্রেমের মধ্যে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের ছায়াপাত স্বাভাবিক ভাবেই ঘটছে। অন্য ধরণের কবিতা যথেষ্টই রচিত হলেও যাঁরা মনে করেন প্রেমের নন্দনস্বপ্ন রচনাতেই রস, সেই সব রোমান্টিক পাঠক 'কাব্যদীপালি' পড়ে তৃপ্তি পাবেন।

'কাব্যদীপালি'তে অপেক্ষাকৃত অল্পপরিচিত কবিরাও স্বীকৃত হয়েছেন। ভালো প্রেমের কবিতা নির্বাচনে সম্পাদক সে দ্বিধা বর্জন করেছেন ; এবং এ কথাও সত্য যে ভালো কবিতা বলতে শব্দ এবং ছন্দ, এই দুই দিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের পর রবীন্দ্রনাথের পূরবী-মহুয়ার যুগ পর্যন্ত কবিতার প্রসাধন-পারিপাট্য বাংলা কাব্যের একটা যুগের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্র-পূর্ব বলে পরিচিত কবিদের এ বিষয়ে শৈথিল্যকে মার্জনা করে শুধু নামের জন্যই যেমন কবিতা নির্বাচন করা হয় নি, তেমনি আবার রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংশয়কেও এই সংকলনে পরিহার করা হয়েছে। মোটামুটি

বলা যায়, যে-অঙ্গসজ্জাকে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত এবং প্রচলিত করে গিয়েছেন, কবিতার সেই রূপকর্মকেই 'কাব্যদীপালি'তে বিশেষভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী কবিরা যেমন আছেন, রবীন্দ্র-পরবর্তীরাও তেমনি আছেন। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা কাব্যভাষায় যে পরিচ্ছন্নতা, শব্দচয়নে যে শুচিতা এবং মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে যে মিষ্টতা এসেছে, কখনও কখনও কাব্যকে তারা কৃত্রিম করে তুলেছে, এ কথা সত্য। কোনো দুজন কবির রচনাকে আলাদা করে নেওয়াও শক্ত হয়ে ওঠে, কবিতা কখনও কখনও এমনই রীতিবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। নতুন শব্দসম্পদ অনেক সময়েই সৃষ্টি হয় নি, নতুন কোনো শব্দচিত্রও তেমন গড়ে ওঠে নি। রোমান্টিক কল্পনার প্রাধান্যের যুগে সংস্কৃত কাব্যে প্রচলিত শব্দ, অনুপ্রাসের শিঞ্জিনী, রবীন্দ্রনাথ-উদ্‌ভাবিত ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্তের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রেম নামক এক চিরকালীন অনুভূতির কবিতা বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে বলে ক্লাসিকাল শব্দ প্রয়োগ স্বাভাবিক। যদিও 'কাব্যদীপালি' আধুনিকতর কবিদের স্বীকার করে নিয়েছে, তবু কবিতা-নির্বাচনে ঝোঁকটা এইসব গুণের উপরেই পড়েছে। ফলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করতে গিয়েও অতিপ্রসাধিতা 'পূরবী'-র পরে সম্পাদকেরা অগ্রসর হন নি। এই সময়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অসংখ্য কবি দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষাকে পরিপাটি সুন্দর এবং শুচি করে তুলেছেন। 'কাব্যদীপালি' মূলত সেই সময়ের প্রতিনিধিস্থানীয় সংকলন বলে গৃহীত হতে পারে। কবিদের নামের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে কবিতাগুলি সাজানোতে নিছক কাব্যরস ছাড়া আর কোনো ঐতিহাসিক অথবা আর কোনো বিবেচনা কবিতা-সংকলনে প্রযুক্ত হয় নি।

এই বিবেচনা করেই সংকলিত হয়েছে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (কবিতা-সংখ্যা ২০০)। এই বই প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪০এ। তারপর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদনায় এর তিনটি সংস্করণ হয়েছে। 'কাব্যদীপালি' যেমন মূলত প্রেমের বিষয় নিয়ে প্রস্তুত, এটিও তেমনি অন্য একটি সুনির্দিষ্ট পূর্ব-কল্পিত নিরিখ নিয়ে সংকলিত। বাংলা কবিতার আধুনিকত্বের একটা সুষ্ঠু পরিচয় দিয়ে বুদ্ধদেববাবু কবিতা নির্বাচন করেছেন। সুতরাং এদিক দিয়ে তাঁর কৈফিয়ত খুবই পরিষ্কার। এতে কোনো অনুযোগ ওঠার সম্ভাবনা অল্পই। যদি ওঠে তা হলে সেই পুরোনো তর্কই উঠবে— আধুনিকতা কি, আধুনিক না হলে কি কবিতা হবে না, ইত্যাদি। সেসব প্রসঙ্গ এখানে অপ্রয়োজনীয়। এই সংকলনের ভূমিকায় বুদ্ধদেববাবু যে কথাগুলি বলেছেন, এ বিষয়ে তাকে শেষ কথা বলেই মনে করি। তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাঁদের মনোভাব এতে খুবই স্পষ্ট। "এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয়, যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে সনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের প্রতিবাদের কবিতা; সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের; আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তি।"

সংশয় বা বিদ্রোহের মধ্যে যদি বা নূতনত্ব থেকে থাকে বিশ্ববিধানে আস্থাবান্ চিত্তবৃত্তিতে নূতনত্ব নেই। তবু এও যদি আধুনিক কবিতা বলে গৃহীত হয়, তবে অবশ্যই 'আধুনিকত্ব' বলতে আরো কিছু বুঝতে হবে। অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে গভীর বিশ্বাসের সুর আছে কিংবা জীবনানন্দের মধ্যে আছে করুণ বিষণ্ণতার সুর। তবু তাঁরা আধুনিক। আধুনিকতা একটা বীক্ষণ-বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের ভাষাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বাংলা কবিতার ভাষায় তির্যক ভঙ্গি নিয়ে এসেছিলেন, আর মোহিতলাল

এনেছিলেন স্পষ্ট ভাষণ, আর নজরুল এনেছিলেন সমাজচেতনা। এই তিনের স্বাভাবিক পরিণতিতে আধুনিক বাংলা কবিতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য। ইতিহাসের সূত্রে এই তিনজনকে স্মরণ করি বটে, কিন্তু আধুনিকতার নিজস্ব বিকাশে বাংলা কবিতা অনেক দূরে সরে এসেছে। একটা বড় বিশেষত্ব এ যুগের কাব্যের সীমাতিক্রান্ত অ্যাবসট্রাকৃট চরিত্রলক্ষণ। এ যুগের কবিতায় সেই ছাপ পাওয়া কঠিন, যেটা বাংলা কবিতার ধারায় এতকাল চলে এসেছিল। বাঙালী বা ভারতীয় স্বভাব নিয়ে যে বাগ্‌বাহুল্য এতকাল আমরা করে এসেছি, আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা কঠিন। হয়তো আধুনিক কবিতার স্ববোধ্যতার পক্ষে সেটাই প্রধান বাধা। কাব্যসংস্কারকেও বদলাতে হচ্ছে। এই পরিবর্তন প্রীতিকর যদি কখনও কখনও মনে নাও হয়, তবু স্বীকার না করে উপায় নেই। 'মানুষ' বলতে যদি কোনো দেশকালাতীত সত্তাকে বোঝায়, তবে এই নতুন অর্থ বোঝাতে নতুন সংকেত এবং প্রতীক আসবেই। ফর্মের এই সব নূতনত্ব দিয়েই আধুনিকতা, এর প্রচুর বিচিত্র দৃষ্টান্ত বর্তমান সংকলনে ছড়িয়ে আছে।

'আধুনিক বাংলা কবিতা'র মনোরম্যতা শুধু সেখানেই নয়। সংজ্ঞাকে ব্যাপক করার ফলে বিচিত্র এবং বিরোধী মনোভাব সম্পন্ন আধুনিকদের সমান মর্যাদার সঙ্গে সংকলনে স্থান দেওয়া হয়েছে। কুমুদরঞ্জন মল্লিক বা কালিদাস রায় বাদ গিয়েছেন কারণ তাঁদের কবিতায় এক ধরণের কাব্যসংস্কার আছে যা এ যুগের কবিরা বর্জন করতে চান। কিন্তু তাঁদের নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়ই ফাঁক নেই। বিশ্বাসের মূল্য দিয়ে ফর্ম নিয়ে তাঁরা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেন না। ফর্ম নিয়ে কোনো নতুন পরীক্ষা করেন নি বলেই আধুনিকরূপে তাঁরা গণ্য নন। 'কাব্যবিতানে' বা 'কাব্যদীপালি'তে এঁদের স্থান হবে, কিন্তু 'আধুনিক কবিতা সংকলনে' তাঁরা নির্বাচিত হবেন না। 'আধুনিকত্ব' এবং 'কবিত্ব' এ দুয়ের মিলন যিনি ঘটিয়েছেন, এতে তিনিই প্রবেশাধিকার পাবেন। এই সীমা মেনে নিয়ে সম্পাদক কবিতা বাছাইয়ে যে ঔদার্য দেখিয়েছেন, তা শ্রদ্ধাযোগ্য। অজিত দত্তের রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে আছেন বিষ্ণু দের বাস্তব-তীক্ষ্ণতা, জীবনানন্দের নিঃসঙ্গ বেদনাবোধের সঙ্গে সমর সেনের বিদ্রূপাত্মক সমাজজিজ্ঞাসা, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মর্‌বিড নাস্তিক্যবোধের সঙ্গে আছে অমিয় চক্রবর্তী এবং অন্নদাশংকরের বিশ্বাসের গভীরতা। তরুণতর কবিরা সকলেই যে কিছু নতুন সুর কিংবা নতুন মনোভাব নিয়ে আসছেন, তা না হলেও কবিতারচনার বিশিষ্ট রীতির উপর অধিকারের ফলে এঁরাও মর্যাদা পেয়েছেন। সর্বকনিষ্ঠ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (জন্ম ১৯৩৩)। যে প্রভূত সমর্থন অগ্রজ আধুনিকেরা পেয়েছেন, তাতে এটাই মনে হয়, আধুনিকতা বস্তুটা হয়তো শুধুই উন্মার্গগামিতা নয়। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের এটাই সর্বোত্তম সার্থকতা।

ভবতোষ দত্ত

বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরি, কলিকাতা ৯। মূল্য ৩·২৫ টাকা।

নিবেদনে লেখক বলেছেন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এই শ্রেণীর বই এই প্রথম। কথাটা অযথা নয় এই অর্থেই যে, গদ্যের শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে বিশেষ হয় নি। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন 'বাংলা গদ্যের ইতিহাস' লিখেছেন। স্পষ্টতই অরুণবাবু তাঁর বইকে ওই বই থেকে কোনো কোনো দিক দিয়ে আলাদা করতে চান। 'কথারম্ভ' নামে প্রথম অধ্যায়টিতে লেখক তাঁর আলোচনার পরিধি নির্দেশ করে বলেছেন,

"বাংলার বড় বড় প্রবন্ধকার আমার আলোচনার ক্ষেত্র নন। যাঁরা বাংলা গদ্যকে গড়ে পিটে তুলেছেন, দুরূহ চিন্তা প্রকাশে সক্ষম ও সূক্ষ্ম আলোচনার যোগ্য বাহন করে তুলেছেন আমি কেবল তাঁদেরই গদ্যরীতি বা স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করেছি।" সুতরাং ইতিহাসরচনা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তিনি বিশিষ্ট গদ্যলেখকের স্টাইলের নিজস্বতা বোঝাতে চেয়েছেন এবং এইজন্য ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য না রেখে এক-এক জনের স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পকলার আলোচনা করেছেন। সুতরাং লেখকের সমালোচনার অভিনবত্ব আছে। তবে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষের 'বাংলা গদ্যের চার যুগ' বইখানা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে লেখা হলেও শিল্পরূপের আলোচনাও তিনি কিছু কিছু করেছিলেন বটে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে কুন্তকই রচনার অনন্যপর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করেছিলেন। রীতি কথাটির দ্বারা এই অর্থকে ঠিক বোঝানো যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রচনার দিক দিয়ে গীতা এবং কালিদাসের কাব্য একই রীতিভুক্ত, কিন্তু নিশ্চয়ই স্টাইল এক নয়। এই ব্যক্তিত্ববোধক স্টাইলই অরুণবাবুর আলোচ্য। কারও ভাষা সংস্কৃতবহুল বা চলতি বললে রীতিই বোঝায়, স্টাইল নয়। অরুণবাবু এই দিক দিয়েই বাংলা গদ্যের শিল্পরূপের আলোচনা করতে চেয়েছেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের সংস্কৃতভারবহুল ভাষার আলোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র যুগের ধ্বনিমন্দ্রিত আলোচনার তুলনা করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন অরুণবাবুর অভিপ্রায় কি।

যাই হোক, বইয়ের শেষে 'উনিশ শতকের গদ্য' এবং 'গদ্যের ভবিষ্যৎ' নামে দুটি প্রবন্ধের মধ্যে সামগ্রিক আলোচনা করে ঐক্যসূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ দুটি প্রণিধানযোগ্য। লেখক এখানে এই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন, "উনিশ শতকে যুক্তিপন্থী গদ্যের বহুল চর্চা না করেই আমরা কাব্যগুণসমৃদ্ধ আলংকারিক গদ্যচর্চা করেছি। তার উপর রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা গদ্য অপূর্ব শ্রী ও সুষমা -মণ্ডিত হয়েছে, অলংকারের নিক্বণে ও ধ্বনিরোলে আমরণ দিশেহারা হয়ে গেছি। ফলে তাল রাখতে পারি নি— বাংলা গদ্যের আজ অবনতি ঘটেছে।" রম্যরচনার অতিচর্চার যুগে কথাটা সত্য ; কিন্তু সবটাই কি সত্য ? প্রমথ চৌধুরী -প্রভাবিত বাংলা গদ্যের সম্পর্কে কথাটা কি সম্পূর্ণ মেনে নিতে হবে ? অরুণবাবু এই উক্তিটি বিস্তারিত করলে ভালো করতেন। বাংলা গদ্যের এটা একটা বড় প্রশ্ন, সুতরাং আলোচিত হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথের যে প্রভাব বাংলা গদ্যের উপর বিশেষ করে পড়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন, সেটা কোন্‌টা— সবুজপত্র-পূর্ববর্তী না সবুজপত্র-পরবর্তী ?

আকারে ক্ষুদ্র হলেও 'বাংলা গদ্যের শিল্পিসমাজ' এমন-একটা বই যা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে না। শুধু এর বিষয়বস্তুর জন্যই নয়, আলোচনার ভঙ্গিটিও সুন্দর। বাইশ জনের আলোচনা এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট উদ্‌ধৃতি থাকায় বক্তব্য সহজবোধ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে প্রবন্ধটি দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে সযত্নে রচিত। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা আরও বিস্তৃত হলে ভালো হত।

ভবতোষ দত্ত

**ভক্ত কবীর।** শ্রীউপেন্দ্রকুমার দাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে কবীরের আবির্ভাব একটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যখন দুটি বিপরীতমুখী ধর্মের সংঘাতে ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র আলোড়িত হচ্ছিল, ভারতের সেই দুর্দিনে যিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও নিঃসংশয় উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন— হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষেই ধর্ম নিয়ে বিবাদ চরম মূর্খতা, ধর্ম কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াপদ্ধতিতে আবদ্ধ নয়, সকল ধর্মের ভিত্তি ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি, ভগবৎ-প্রেম ও উচ্চ নৈতিক আদর্শই ধর্মপথের একমাত্র পাথেয়, এখানে হিন্দু ও মুসলমানে কোনো প্রভেদ নেই— আল্লা ও ভগবানে, রাম ও রহিমে, কোরান ও পুরাণে, মক্কা ও কাশীতে, কাবা ও কৈলাসে কোনো পার্থক্য নেই— সেই কবীর নিরক্ষর দরিদ্র সমাজের অবহেলিত-সম্প্রদায়ের একটি লোক। কবীরের এই বাণী মানবহৃদয়ের চিরন্তন বাণী— তাই ভারতের ধর্মের ইতিহাসে কবীর-ধর্মের এক অভিনব গৌরব আছে।

ভারতবর্ষে জীবনের সঙ্গে ধর্মের একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। জীবন থেকেই ধর্মের উদ্‌ভব হয়েছে এবং জীবনের সঙ্গে তাল রাখবার জন্যে ধম যুগে যুগে নানা রূপান্তর লাভ করেছে। এই যে অসাম্প্রদায়িক, সকল ধর্মের মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবীর-ধর্ম, এও জীবনের তাগিদেই উদ্‌ভূত হয়েছিল। কবীরের আবির্ভাবকালের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এইরূপ একটি ধর্মের প্রয়োজন ছিল। এই ধর্ম সমসাময়িক জীবন থেকেই উদ্‌ভূত হয়েছিল। এতদিন ভক্তিধর্ম সমাজের ব্রাহ্মণাদি উচ্চ স্তরের লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং ভক্তিমার্গীদের জাতিবিচার ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যাদিজ্ঞানও লোপ পায় নি। রামানন্দই প্রথম ঘোষণা করলেন— ব্রাহ্মণ-শূদ্র উচ্চ-নীচ জাতির বিচার নিরর্থক, বিষ্ণুর ভক্তেরা সবাই এক— সকলেই বৈষ্ণব, তাদের মধ্যে আহারাদির বাছ-বিচার অবাঞ্ছনীয়— সকল ভক্তই এক। তিনি সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের মধ্য থেকে তাঁর শিষ্য গ্রহণ করলেন— পিপা রাজপুত, কবীর মুসলমান জোলা, সেনা নাপিত, ধনা জাঠ কৃষক, রুইদাস মুচি, পদ্মাবতী একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। এই শিষ্যদের নিয়ে ভারতের নানা স্থান ঘুরে তাঁর মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি বিষ্ণু নারায়ণ বা কৃষ্ণের স্থলে রামকেই পরমদেবতারূপে বেশি প্রচার করেছেন। তাঁরই প্রচারণে সমগ্র উত্তর-ভারতে রাম-পূজা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। রামানন্দের এই ভক্তিবাদ-প্রচারের প্রধান বাহন ছিল দেশীয় ভাষা। পূর্বের বৈষ্ণবাচার্যগণের যুক্তি-তর্ক-প্রচারণ সবই গ্রথিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাষায়, রামানন্দ দেশীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচার করে ভক্তিবাদকে জনসাধারণের কাছে একান্ত গ্রহণীয় করে তুললেন। রামানন্দ আচার্যগণ-প্রচারিত ভক্তিধর্মের উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করলেন।

এই সময়েই কবীরের উদ্‌ভব ও তাঁর বাণী-প্রচার। কবীর রামানন্দের শিষ্য বলে কথিত। যে মূল বিষয়টি নিয়ে হিন্দু-মুসলমান একেবারেই মিলতে পারছিল না সেই মূর্তিপূজা-সমস্যা কবীর সমাধান করলেন। এক ভগবান সত্য— তিনি রাম হরি গোবিন্দ নারায়ণ আল্লা খোদা সবই। যে-নামেই যে ডাকুক, সকলেই সেই এক ভগবানকে ডাকছে। ভগবান কোনো মূর্তিতে আবদ্ধ নন। তিনি সকলের— সকল নামের উপলক্ষ্য। কেবল হৃদয়ের একান্ত ভক্তি ও আত্মনিবেদনে তাঁকে পাওয়া যায়— কোনো আচার-অনুষ্ঠানে নয়। কবীর সর্বপ্রকার মূর্তিপূজা ও অবতারবাদ অস্বীকার করলেন। কবীরের এই

নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রচারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ অনেকখানি কমিয়ে ফেলল, দুই সম্প্রদায় যত দূর সম্ভব পরস্পরের নিকটবর্তী হল। একই দেশে বৎসরের পর বৎসর বাস করার জন্যে এবং নবদীক্ষিত মুসলমান সমাজের সকলেই হিন্দু হওয়ায় পূর্বসংস্কারের প্রভাববশে এবং কিছু পরিমাণ সুফী-প্রভাবের কারণেও কবীরের আগে থেকেই উৎকট বিদ্বেষ কতকটা প্রশমিত হয়ে আসছিল, এই সময় কবীর উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের সর্বপ্রধান বাধা অপসারিত করলেন এবং তাঁরই প্রভাবে ভারতের ধর্মজীবনে এক নূতন আবহাওয়ার সৃষ্টি হল।

সকল ধর্মের আচার অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর -বর্জিত যে মূল সত্য যে ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেম, তাকেই কবীর অনুসরণ করেছেন তাঁর জীবনে এবং তারই জয়গান করেছেন। শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা পঞ্জাবের নানক (১৪৬৯), দাদূ-পন্থের প্রতিষ্ঠাতা আমেদাবাদের দাদূ (১৫৪৪), সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যার জগজীবন রাম (১৬৬০), সাধ্-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বীরভান (১৬৫৮), মালবের বাবা লাল, গাজীপুরের শিবনারায়ণ প্রভৃতি ধর্ম-প্রচারকগণ কবীরের ভাব আদর্শ ও নীতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মধ্যযুগে উত্তরপশ্চিম-ভারতের ধর্মের নবজাগরণের মূল অনুপ্রেরণার উৎসই কবীর।

দুঃখের বিষয়, এই যুগান্তকারী ধর্মসংস্কারকের জন্ম বংশপরিচয় ব্যক্তিগত জীবনের কার্যাবলীর কোনো ঐতিহাসিক-তথ্য-প্রতিষ্ঠিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং সবটাই কিংবদন্তীভিত্তিক হওয়ায় বিভিন্ন মতের উদ্‌ভব হয়েছে। তবে বিভিন্ন মত ও নানা উল্লেখ বিচার করে এইটুকু সংগতভাবে অনুমান করা যায় যে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মুসলমান জোলার ঘরে জন্মেছিলেন বা লালিত-পালিত হয়েছিলেন, নিজে বস্ত্র বয়ন করতেন, রামানন্দের শিষ্যও হতে পারেন, তাঁর হিন্দু ও মুসলমান অনেক শিষ্য ছিল এবং তিনি এমনই অসাম্প্রদায়িক সাধুব্যক্তি ছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু শিষ্যেরা তাঁকে হিন্দু বলে এবং মুসলমান শিষ্যেরা তাঁকে মুসলমান বলে দাবি করেছিল।

কবীর সম্বন্ধে একটি বিষয়ের সংগত মীমাংসা এখন পর্যন্তও হয়নি। তাঁর বিপুলায়তন সাহিত্যের নানা স্থানে যোগের কথার উল্লেখ আছে। ভক্তিমার্গ যোগমার্গ থেকে পৃথক এবং উভয় পথের সাধকের করণীয়ও পৃথক। কবীর ভক্তশ্রেষ্ঠ হয়েও কেন যোগ অবলম্বন করতেন, তার নিঃসংশয় কারণ নির্দেশ করা যায় না। কবীরের যোগের স্বরূপনির্ণয় এই আলোচনার পরিসরে সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি বলা যায়, তাঁর যোগ হঠযোগের পর্যায়ভুক্ত। মনে হয়, তিনি যোগপথকে ভক্তিপথের সহায়কভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। যোগের দ্বারা চিত্তস্থৈর্যসাধন দেহশোধন প্রভৃতি করে তিনি একান্তভাবে ভগবৎ-মুখী হয়েছিলেন। তাঁর কর্ম ও জ্ঞান কেবল তাঁর ঐকান্তিক ভক্তিকেই পরিপুষ্ট করেছে।

ডক্টর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী প্রভৃতি লেখক জোলার ঘরে কবীরের জন্ম বা লালিত-পালিত হওয়া, কবীরের যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। এই জোলারা পূর্বে ছিল নাথধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে হঠযোগসাধনার প্রচলন ছিল। কবীর যে-পরিবারে জন্মেছিলেন বা মানুষ হয়েছিলেন, তারা মাত্র এক-আধ পুরুষ আগে মুসলমান হয়েছে এবং পূর্বেকার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার এবং আচার-অনুষ্ঠান পুরোমাত্রায় তাদের মধ্যে বজায় ছিল।

এ অনুমান অসংগত নয়। জোলা-সম্প্রদায় আদিতে ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম থেকে শৈবধর্মপ্রভাবে নাথধর্মের উদ্‌ভব হয়। নাথধর্মে শুদ্ধ হঠযোগের ক্রিয়াই মূল সাধনা। উত্তরপশ্চিম-

ভারতের জোলা-সম্প্রদায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে ছিল নাথধর্মাবলম্বী। বাংলার জোলা-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই কিন্তু বরাবরই ছিল সহজিয়া বৌদ্ধ। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও অনেকে এই সহজ-সাধনা ত্যাগ করেননি। বাংলার বিভিন্ন জেলার জোলা-সম্প্রদায়ের মধ্যেই বেশি বাউল-ফকিরের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। কবীরের জন্মান্তর ও কর্মবাদে বিশ্বাসও এই সূত্র থেকে আসতে পারে বলে মনে হয়। অবশ্য সুফী-প্রভাবও তাঁর উপর ছিল।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার দাস কবীর সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ বাঙালী পাঠক এই গ্রন্থপাঠে কবীরের জীবন ও বাণীর সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারবেন। এই গ্রন্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ এর অনুবাদগুলি। অনুবাদগুলি সর্বত্র মূলানুগ হয়েও ভাষার লালিত্যে ও সাবলীল প্রবাহে একটা স্বতন্ত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এদিক দিয়ে অনুবাদকের কৃতিত্ব প্রশংসার যোগ্য। বিখ্যাত ফরাসি লেখক Anatole Franceএর অনুবাদ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে—Translations, like women, are either faithful or beautiful, rarely both। উপেন্দ্রবাবু এই faithful ও beautifulএর সমন্বয় সাধন করেছেন। আমরা তাঁকে কবীরের আরো কয়েক শত পদের এইরূপ অনুবাদ প্রকাশ করতে অনুরোধ করছি, তাতে বাংলা সাহিত্যের যথার্থ সমৃদ্ধি বাড়বে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদের সংখ্যা সহজেই বাড়ানো যেতে পারে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

বারো মাসের ছড়া। শ্রীবুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্‌, কলিকাতা। তিন টাকা।
কথার কথা। শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। স্বাক্ষর, কলিকাতা। দেড় টাকা।
গল্প আর গল্প। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি. কলিকাতা। দুই টাকা।
আলিভুলির দেশে। শ্রীসুখলতা রাও। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি.। দুই টাকা।
গল্পময় ভারত। শ্রীসুশীল জানা। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি.। চার টাকা।
অথ ভারত-কথকতা। কথক ঠাকুর। বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রা. লি,। নয় সিকা।
জগন্নাথের খেয়ালখাতা। জগন্নাথ পণ্ডিত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা। আড়াই টাকা।
সুন্দরবনে সাত বৎসর। ভুবনমোহন রায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সিটি বুক সোসাইটি, কলিকাতা। সাড়ে তিন টাকা।

এই আটখানি বই দেখলেই বোঝা যায় আজকাল শিশুসাহিত্যের ব্যাপারে প্রকাশকরা আগেকার চেয়ে অনেক দায়িত্ব-সচেতন হয়েছেন। সব বইগুলিরই কাগজ ছাপা বাঁধাই ছবি সজ্জা ইত্যাদি প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য জগন্নাথের খেয়ালখাতা বইখানির টাইপ আর-একটু বড় হলে ছেলেদের পড়বার সুবিধা হত। সুন্দরবনে সাত বৎসরের কাগজ ও বাঁধাই এত ভালো যে তার তুলনায় এর দাম কমই ধরা হয়েছে বলতে হবে। অন্যান্য বইগুলিরও দাম যুক্তিযুক্ত।

ছখানি বইই গল্পসংকলন, শুধু প্রথম দুখানি তা নয়। তাদের একটি ছড়ার বই, আর-একটি ভাষা ও শব্দরহস্য সম্বন্ধে।

বারো মাসের ছড়ার কবিতাগুলির প্রধান গুণ এই যে, তারা কোথাও ছন্দ বা ভঙ্গির টানে স্বতঃস্ফূর্ত দোলনকে অতিক্রম করে নি। একদিকে আছে ঘর— মা বাবা দাদা দিদি, তার পর ছোকানু প্রভৃতি চরিত্রের কথায় কাজে সমস্ত মন কেড়ে-রাখা ; আর, আর-একদিকে প্রকৃতির সেইসব খেলা যা গৃহস্থের গার্হস্থ্যের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি মারে, আসর জমাতে চায়। এই দুই মিলিয়ে যেসব নাট্যমুহূর্ত বা স্বপ্নসম্ভোগ— যেমন রামধনু দেখার উত্তেজনা বা নদীস্বপ্ন আকাশস্বপ্ন পরীর স্বপ্নের মধ্যে মনকে সহজ আনন্দে মেলে দিতে পারা— এই নিয়েই বইখানির অধিকাংশ কবিতা। ঘরোয়া ছবি ও কণ্ঠ কবিতাগুলিকে উধাও হয়ে উড়ে যেতে না দিয়ে ঘরের সীমানার মধ্যে ধরে রেখেছে। তার ফলে কবিতা হয়েছে ঘরোয়া, কিন্তু ঘরও হয়েছে খানিকটা কবিতার পাগলামির হাওয়ায় উতল। তাই রামধনু দেখতে

পেয়ালা ফুরোলে মা বাবা গেলেন,
ন'দি খোঁপা ঠিক করে।

এ ছাড়া আছে ব্লেকের কবিতার অনুবাদ, একটা হাসির গল্প, দু-একটি ব্যঙ্গ কবিতা— যার রস সুকুমার রায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়— এবং জোনাকি নামে একটি ছন্দের কৌতুকনৃত্যের কবিতা। যেসব ছেলেমেয়ে অযথা-উত্তেজক বই পড়ে মনের সূক্ষ্মতা নষ্ট হতে দেয় নি, তারা এই বই ভালোবাসবে।

আগেকার দিনের মত ব্যাকরণ আর অভিধানের সাহায্যে ভাষা শেখার দিন আর নেই। এখন ভাষাকে দেখা হয় মানুষের মন আর জীবনের জীবন্ত প্রতিরূপ হিসাবে। ব্যাকরণের নিয়মের নিগড়ে ভাষাকে না বেঁধে ভাষাকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে তার রীতিনীতি হালচাল চিনে ও মেনে নেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করা হয়। তার ফলে ভাষার তত্ত্বগুলির বিভীষিকা গেছে কমে, সেগুলি হয়ে উঠেছে রহস্যময়, চিত্তাকর্ষক। বিদেশী ভাষায় এই রকমের প্রথমপরিচয়-গ্রন্থ আজকাল অনেক হয়েছে। বাংলায় অতি সরস ভঙ্গিতে ভাষাতত্ত্বের এই প্রবেশক গ্রন্থ লেখায় ছেলেদের মন এই দিকে জাগিয়ে তোলবার সাহায্য হবে।

গল্প আর গল্পে অনেক ধরণের গল্প একত্র হয়েছে। রাক্ষস দৈত্য প্রভৃতির গল্পে ব্যঙ্গের সুর মিশিয়ে তার মধ্য দিয়ে আধুনিক জীবনের নানা দিকে সকৌতুক কটাক্ষপাতের দৃষ্টান্ত— রূপকথার কেলেঙ্কারি, কুরুক্ষেত্রে ভজা। 'কালরাক্ষস কোথায় থাকে'তে লেগেছে সূক্ষ্ম রহস্য ও আদর্শের রেশ। দুটি দু ধরণের ছেলের স্টাডি আছে— তাদের একজন অত্যন্ত সত্যবাদী, আর-একজন ভাবী বৈজ্ঞানিক। আকাশের আতঙ্ক গল্পে আছে বৈজ্ঞানিক রোমান্স— যাতে প্রেমেনবাবু সিদ্ধহস্ত। রতন পাঙ্গালীর হাতী ধরা ও পোষ মানানোর গল্পে ঐ বিষয়ে এমন অনেক তথ্য আছে যা অনেকের কাছেই বিশেষ চিত্তাকর্ষক বলে মনে হবে। আর, তা ছাড়া গল্পের স্বর্গে কল্পনাকে একেবারে বিনাশর্তে মুক্তিদান করায় যা ঘটবার তাই ঘটেছে।

এখন, পাঠকপাঠিকার মধ্যে অনেকেই বিশেষ পছন্দ করবে সেই রাক্ষসটাকে— যে হাউ মাউ খাঁউ করে কেঁদে ফেলে বললে, 'ধর্মাবতার, আমি নেহাত মুখ্‌খু সাদাসিদে রাক্ষস'। অনেকে রুদ্ধশ্বাসে পড়বে রতন পাঙ্গালী, আর সেই ব্যাপার— সেই 'আকাশের আতঙ্ক'।

রূপকথার দেশে, স্বপ্নের রাজ্যে অতি সহজ অতি অনায়াস বিচরণ সুখলতা রাওয়ের 'আলিভুলির দেশে'। বইখানির মধ্যে নমু নামে মেয়েটি যেমন তার জেগে-থাকার পৃথিবী আর দিবাস্বপ্নের দেশের তফাত বুঝে

উঠতে পারে না, যখন-তখন চলে যায় আলিভুলির দেশে— যেন ঠিক চৌকাঠের এপার আর ওপার— সুখলতা রাও নিজেও ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দে ছেলেমেয়েদের হাসিকান্না খেলাধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন— জোনাকি, পঞ্চভূত, রত্নের রানী রত্না, চাঁদের মেয়ে, আর আলিভুলি ও নানা খুচরো পরী তো আছেই— এদের সকলের জীবন। আর, এর ফলে শিশুজীবনের সরল অনুভূতির মধ্যে ঝরে পড়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেতনা, সুন্দর আদর্শ ও আবেগের ঐশ্বর্য। গল্প বলার অকৃত্রিম ভঙ্গিটি মুহূর্তের জন্যেও নষ্ট হয় নি, তাই অনেকগুলি গল্পে উপদেশ বা শিক্ষার মত কিছু উপাদান থাকলেও গল্পের মাধুর্য তার জন্যে কিছুমাত্র কমে নি। কয়েকটি গল্পে আছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে কল্পনা। শেষের দিকে গল্পগুলিতে শিশুমন ও তার চারপাশের সামাজিক জীবনের দুঃখকষ্টের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখানেও গল্প বলার ভঙ্গি একই রকম। সে ভঙ্গির সামনে বাদানুবাদ দাঁড়াতে পারে না; যেমন অনাড়ম্বর এই আনন্দের নিমন্ত্রণ, তেমনি বিনা ওজরে তা গ্রহণ করতেও হয়।

গল্পময় ভারত ও অথ ভারত-কথকতা বই দুখানির নাম থেকেই বোঝা যায় সেই প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে যে সাহিত্যিক সম্পদ্ সঞ্চিত হয়েছে তার থেকে কতকগুলি কাহিনী বেছে নিয়েই এই সংকলন। জাতকের গল্প দুটি বইয়েই আছে। কিন্তু গল্পময় ভারতের অধিকাংশ গল্প নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। বেদ-উপনিষদের গল্প কিছু-কিছু আছে; কিন্তু বেশির ভাগ গল্প বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকগুলির আখ্যানভাগের অনুলিখন। আর আছে আধুনিক কালের পূর্ববঙ্গের মাণিকচন্দ্র, মৈমনসিংহ গীতিকার কাহিনী। দ্বিতীয় বইটিতে জাতকের গল্প ছাড়া আছে বাংলা ও আসামের কয়েকটি উপকথা। দুটি বইয়েই পুরোনো কাহিনীকে কল্পনার সাহায্যে সরস ও সজীব ক'রে তোলার চেষ্টা অনেক পরিমাণে সার্থক হয়েছে। ছেলেমেয়েরা এই দুখানি বইই যে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

জগন্নাথের খেয়ালখাতা খুব ছোটদের জন্যে নয়। এর রস গ্রহণ করতে পারবে চোদ্দ পনেরো বা তারও চেয়ে বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা। এর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশ পত্রিকায়, তখন সুকুমার রায় তার ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবিটিও এই বইয়ে দেওয়া হয়েছে। হিন্দুস্থানী জমাদারের মুখে শোনা কাহিনীগুলিই এই বইয়ের সম্পদ্। একদিকে বাড়িতে ছেলেদের ও তাদের বড়দা ও ভুলুবাবুর মুখে পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপার— যেমন ফুটবল খেলা, শিকার করা, ভূতপ্রেত ইত্যাদি সব-কিছু সম্বন্ধেই টীকাটিপ্পনী; আর, অপর দিকে জমাদার সাহেবের অতি চোস্ত্ ইডিয়মেটিক হিন্দী বুলি ও চমৎকার গল্প— যা ক্লাসিক হয়ে থাকবার যোগ্য। মেঘরাজ আনসূয়া তো আমাদের দেশের *Taming of the Shrew*। ভৌতিক ব্যাপারও কি প্রচুর টেকনিকাল তথ্যে পূর্ণ। মোট কথা, এই বইএর ভাষা, এর গল্পের বিষয়, রহস্যের দৌড়— সবই একে সাবালক পাঠকেরই পক্ষে উপযুক্ত করেছে, ছেলেমেয়েদের জন্যে ততটা নয়। বইটি রসিক ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত।

সুন্দরবনে সাত বৎসর বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করবে সন্দেহ নেই। এককালে বিখ্যাত শিশুপত্রিকা 'সখা ও সাথী'র সম্পাদক এই গল্পটির লেখক, কিন্তু এর শেষ কয়েক অধ্যায় তিনি লিখে যেতে পারেন নি। গল্পটি শেষ ক'রে দেবার ভার দেওয়া হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। দুই লেখকের হাতের প্রভাব যে একেবারে আলাদা করা যায় না তা নয়। বিভূতিবাবুর হাতে পড়ে গল্পের কেন্দ্রচরিত্র সেই হারিয়ে-

যাওয়া কিশোর ছেলে নীলু হয়ে উঠেছে ভাবুক, যা সে আগে ছিল না ; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার দৃষ্টি তার হঠাৎ খুলে গিয়েছে। তা হোক, বেমানান হয় নি। আর, দুই লেখকেরই অ্যাড্‌ভেঞ্চার ও অরণ্যরহস্য সম্বন্ধে শুধু প্রীতি নয়, সাক্ষাৎ-অভিজ্ঞতা থাকায় গল্পের সেই দিকটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনকে আকর্ষণ ক'রে রাখে। পাতায় পাতায় সুন্দরবনের জন্তুদের বিচিত্র চরিত্রের বিবরণ ও ছবি, আর নীলু ও মগদস্যুদলের এমন একটি গল্প যাতে আজকালকার রহস্য-রোমান্সের অস্বাভাবিকতা কোথাও আরোপ করা হয় নি। পড়লে মনে হয় সব সত্যিই ঠিক এ রকম হয়েছে। আর শেষটা 'পথের পাঁচালী' -লেখকের করস্পর্শেরও একটা আকর্ষণ আছে বৈ-কি। এ বই সব ছেলেমেয়েই পড়বে আশা করি।

সুনীলচন্দ্র সরকার

STUDIES IN THE BENGAL RENAISSANCE : Bipin Chandra Pal Birth Centenary Commemoration Volume : Edited by Sri Atul Chandra Gupta. National Council of Education, Jadavpur, Calcutta-32. Rs. 15·00

THE DAYS OF JOHN COMPANY : Selections from Calcutta Gazette, 1824-1832 : Compiled and Edited by Anil Chandra Das Gupta. B. G. Press, Calcutta. Rs. 11·00

HISTORY OF THE INDIAN ASSOCIATION : Jogesh Chandra Bagal. Indian Association, Calcutta. Rs. 7·50

WOMEN'S EDUCATION IN EASTERN INDIA, THE FIRST PHASE : Jogesh Chandra Bagal. World Press, Calcutta. Rs 7·50

বাংলার নব্যসংস্কৃতি। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১·৪০ ন. প.

কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা। ৫·০০ ন. প.

বিদ্যাসাগর-পরিচয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ২·০০ ন. প.

বরণীয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি., কলিকাতা। ৫·০০ ন. প.

জাগৃতি ও জাতীয়তা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা। ৪·৫০ ন. প.

মুক্তির সন্ধানে ভারত। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা। ১০·০০ ন. প.

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান। শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলিকাতা। ৫·০০ ন. প.

বাংলার 'রেনেসাঁস'-আন্দোলনের উত্তরাধিকার উনিশ শতকের শেষ পর্ব থেকে বিশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত যাঁরা পারিপার্শ্বিক প্রাতিকূল্যের মধ্যে বহন করে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রগণ্য। জীবনের অপরাহ্ণে বিপিনচন্দ্রের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তা আধ্যাত্মিকতার আবরণে কতকটা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, স্বদেশীযুগে তার বলিষ্ঠতা তাঁকে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক ও কর্মনায়করূপে গড়ে

বিপিনচন্দ্র পাল

শিল্পী শ্রীমুকুলচন্দ্র দে
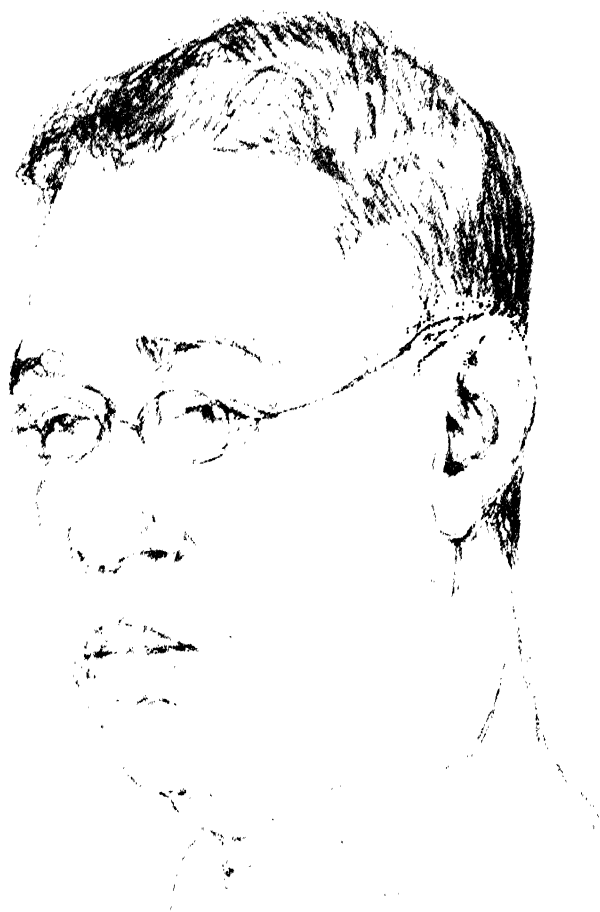
তুলেছিল। তাঁর জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে বাংলার বিদ্বজ্জনেরা *Studies in the Bengal Renaissance* নামে সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁর স্মৃতির যোগ্য তর্পণ করেছেন।

আঠার ও উনিশ শতকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ধীরে ধীরে বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করার ফলে ভারত-ইয়োরোপের ভাবধারার সংঘাত ও লেনদেনের সুযোগ ঘটে। ঐতিহাসিক কারণেই সুযোগ প্রশস্ত হয় বাংলাদেশে। পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও জীবনবোধের সাহচর্যের ফলে বাংলার ধর্ম সমাজ রাজনীতি সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যে প্রায়বিস্মৃত পুরাতনের সমীক্ষা ও নূতন আদর্শের আত্মপ্রতিষ্ঠার আলোড়ন শুরু হয়, তাকেই আমরা ইয়োরোপীয় ইতিহাসের অনুকরণে 'রেনেসাঁস' বলে থাকি। কিন্তু ইয়োরোপের ও ভারতের বা বাংলাদেশের প্রকৃত ঐতিহাসিক অবস্থার পারস্পরিক সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে কতখানি আমাদের দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগৃতি-আন্দোলনকে রেনেসাঁস আখ্যা দেওয়া যায় তা নিয়ে অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। এখানে সে-তর্কের অবতারণা করে লাভ নেই। পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের সামগ্রিক গভীরতা অথবা দৃঢ়মূল আত্মস্থতা, কোনোটাই এ দেশে ছিল না। রাজনৈতিক বশ্যতা ও মানসিক জড়ত্ব আমাদের নবজাগৃতি আন্দোলনের উপর অনুভূমিক (দেশগত) ও ঊর্ধ্বভূমিক (সামাজিক শ্রেণীগত) উভয় রকমের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল। অর্থাৎ এ দেশের যাবতীয় নবজাগরণ প্রধানতঃ শহরকেন্দ্রিক ও বিদ্বান-বিত্তবান মধ্যশ্রেণীবদ্ধ। তার বাইরে নবচেতনার সূর্য মেঘচুম্বী প্রথা-সংস্কারের দেয়াল ভেদ করে রশ্মি ছড়াতে পারে নি। কিন্তু এত সব সীমা-স্ববিরোধ সত্ত্বেও উনিশ শতকের বাংলার চিন্তালোড়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতিফলনকে 'রেনেসাঁস' আখ্যা দিলে বিশেষ অতিশয়োক্তি হয় বলে মনে হয় না। আলোচ্য সংকলনের ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে তাঁর যে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য নিবেদন করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ৪১ জন লেখক নানাদিক থেকে বাংলার রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশবৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। সকলের দৃষ্টিকোণ যে অভিন্ন তা নয়, বরং রচনাগুণের ভিন্নতা তার চেয়ে অনেক বেশি। মতের স্বাতন্ত্র্যের দিক থেকে শ্রীবিষ্ণু দে'র মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধে রচনাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলার রেনেসাঁসকে তিনি প্রধানতঃ 'অ্যাংলো-রেনেসাঁস' বলতে চেয়েছেন, এবং এই অবৈধ রেনেসাঁসের ব্যর্থতা মাইকেলের জীবন ও সাহিত্যসাধনার দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মত ও যুক্তি তর্কাতীত না হলেও অবশ্যই বিবেচনার যোগ্য। এই রচনাটি ছাড়া অন্যান্য কোনো রচনায় মূল বিষয় সম্পর্কে স্বতন্ত্র সুরের বিশেষ কোনো অনুরণন শোনা যায় না। অন্যান্য লেখকদের নিজস্ব মতামত থাকলেও হয়তো তাঁরা প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনার মধ্যে এরকম তর্কসাপেক্ষ প্রসঙ্গ, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে, উত্থাপন করতে চাননি।

সংকলনটির একটি বড় ত্রুটি হয়েছে এই যে আলোচ্য বিষয়গুলি অত্যধিক পরিমাণে খণ্ডিত হয়েছে এবং সেই খণ্ডগুলির যোগফলরূপে বাংলার নবজাগরণের একটি অখণ্ড রূপ পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে নি। স্বল্পপরিসরে অনেক গুরুবিষয়ের রচনায় লেখকের ভাববিস্তার ব্যাহত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অতি সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ উনিশ শতকের বিশাল ও জটিল আর্থনীতিক পশ্চাদ্‌ভূমির আলোচনা করেছেন। মাত্র সাত পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো বিশেষজ্ঞের পক্ষেই এ-বিষয়ের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয়। আরও বেশি জায়গার মধ্যে লেখককে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার সুযোগ দিলে বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত। অবশ্য অতি সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও,

উনিশ শতকী অর্থনীতির মূল ধারাগুলিকে তিনি সূত্রাকারে সুস্পষ্ট করেই প্রকাশ করেছেন। উনিশ শতকের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারের ইতিবৃত্ত, অনেকেই জানেন, পর্ব থেকে পর্বান্তরে উত্থান-পতনের অসমতল পথে তরঙ্গিত হয়ে গেছে। বিস্তৃত দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার) এই ইতিবৃত্তের পরিচয় দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ছিল। তা না দিয়ে রামমোহন, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন যুগপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিষয়গুলি বিচ্ছিন্নাকারে আলোচিত হয়েছে। তাতে সংস্কারেতিহাস ও ব্যক্তিচরিত্র উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, এবং এই মূল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বিবরণের অভাবে আলোচ্য সংকলনের প্রকৃত ইতিহাস-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। এর মধ্যে উনিশ শতকের রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের ধারাটি কেবল সুষ্ঠুরূপে ফুটে উঠেছে সংকলনের ছটি অধ্যায়ের মধ্যে (১৩৯-২৫৭ পৃষ্ঠা)। এই ছটি অধ্যায় পর্বভেদে লিখেছেন যথাক্রমে শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশশিভূষণ চৌধুরী, শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীগোপাল হালদার। সমগ্র সংকলনের মধ্যে এই কয়েকটি রচনাই বর্তমান সমালোচকের কাছে সর্বাধিক সুবিন্যস্ত বলে মনে হয়েছে; এগুলির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের ও ভারতের জাতীয়তাবাদের ক্রমোন্মেষের অখণ্ড চিত্রটিও প্রতিভাত হয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন দিক এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাগুলি সুলিখিত। খণ্ডিত হলেও এগুলির বিষয়োদ্ঘাটনে তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি, যতটা ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার বিষয়ে ঘটেছে। সংকলনের গোড়ায় বাংলার নবজাগরণের যে-কোনো দিক সম্বন্ধে বিপিনচন্দ্রের নিজের একটি ইংরেজি রচনা উদ্ধৃত করে দিলে ভালো হত বলে মনে হয়।

জন কোম্পানির আমলের দিনগুলির বিবরণ আছে দ্বিতীয় গ্রন্থে। ১৮২৪ থেকে ১৮৩২ সাল পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা থেকে বিবরণের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৭৮৪, ৪ মার্চ তারিখে 'ক্যালকাটা গেজেট' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রায় পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত 'গেজেট' ঠিক বর্তমানের সরকারী বিজ্ঞপ্তি-নিয়মকানুনের যথাযথ বিবরণ প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ দেশবিদেশের সংবাদও সম্পাদকীয় মন্তব্য সহ পরিবেশিত হত। সেই সময়কার গেজেটের বিভিন্ন রচনায়, সংবাদে, সম্পাদকীয়তে, এমনকি নানারকমের বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত, তদানীন্তন বাংলার সমাজচিত্র বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। পূর্বে তাই সিটন-কার (W. S. Seton-Carr) ও স্যাণ্ডিম্যান (Hugh Sandemann) গেজেটে প্রকাশিত রচনাদির নির্বাচিত সংকলন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত উপকরণ পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ১৮৩২ সাল পর্যন্ত 'ক্যালকাটা গেজেট' পত্রিকা অন্যান্য সাপ্তাহিক পত্রের মতন প্রকাশিত হয়। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের সংকলক স্যাণ্ডিম্যানের ইচ্ছা ছিল আরও এক খণ্ডে ১৮২৪-১৮৩২ সালের উপকরণ সংকলন করে কাজটি শেষ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই অসমাপ্ত কাজ দীর্ঘকাল অনুসন্ধানীদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকার পর শ্রীঅনিলচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। কোনো আশু পুরস্কার বা অ্যাকাডেমিক সম্মানের মুখাপেক্ষী না হয়েও সংকলয়িতা উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি মূল্যবান অপরিহার্য আকরগ্রন্থ অনুরাগীদের উপহার দিয়েছেন, এজন্য তিনি বিদ্যানুরাগী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

প্রধানতঃ রামমোহন ও ডিরোজীয়ানদের যুগের উপকরণই ‘ক্যালকাটা গেজেট’ পত্রিকা থেকে আলোচ্য গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। নবযুগের বাংলার ইতিহাসে এই পর্বের গুরুত্ব যে কতখানি তা ইতিহাসের অনুসন্ধানী ছাত্ররা বিলক্ষণ জানেন। তার আর্থনীতিক অবস্থা, ব্যাবসাবাণিজ্যের হাল, সমাজসংস্কার-আন্দোলন, নব্যশিক্ষার বিধিব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এত পর্যাপ্ত পরিমাণে সংকলয়িতা ন বছরের (১৮২৪-১৮৩২) পুরাতন ‘ক্যালকাটা গেজেট’ পত্রিকার জীর্ণ ফাইল ঘেঁটে সংগ্রহ করেছেন যা দীর্ঘকাল গবেষকদের অনুসন্ধানের খোরাক যোগাবে। সংকলনে উদ্ধৃত বিভিন্ন সংবাদ, রচনা ও বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে তাৎকালিক বাঙালীসমাজের একটি চমৎকার চিত্র যে-কোনো শ্রমসহিষ্ণু পাঠকের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। কেবল বাঙালী-সমাজের নয়, ইংরেজ-সমাজের উপাদানগুলিও সম্পাদকের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায়নি। গেজেটের বিচিত্র তথ্যস্তূপ ঘেঁটে ঐতিহাসিকের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ আহরণে তিনি যে প্রখর ইতিহাসবোধ ও অসাধারণ শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয় তো বটেই, ভবিষ্যতের অনুরূপ কর্মীদের অনুসরণীয়।

উনিশ শতকের বাংলার সমাজের নানাদিক নিয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল দীর্ঘকাল ধরে একনিষ্ঠভাবে গবেষণা করছেন। আলোচ্য তাঁর আটখানি বইয়ের মধ্যে তার ফলাফলের পরিচয় অনেকটা পাওয়া যায়। ভারত-সভার ইতিহাস ( ১৮৭৬-১৯৫১ ) ও পূর্বভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বই দুখানি ইংরেজিতে রচিত। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিবেশ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর ‘আত্মচরিত’ গ্রন্থে লিখেছেন : “· ·বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিন জনে [ শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ] কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয়বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল।· ·‘ভারত-সভা’ স্থাপনের বিজ্ঞাপন বাহির হইল। সে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার ২।১ দিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে ‘ইণ্ডিয়ান লীগ’ নামে মধ্যবিত্তদিগের জন্য একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্য এক সভা হইবে।· ·ইণ্ডিয়ান লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সভা অগ্রে স্থাপিত হইল, মনে নাই”— আত্মচরিত, ১৩২৫, ২১৭-১৯ পৃষ্ঠা। সহজ ভাষায় শাস্ত্রী মহাশয় এখানে ভারত-সভার উৎপত্তির সামাজিক পশ্চাদ্‌ভূমির উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত দলাদলির কথা যা তিনি বলেছেন তা আপাততঃ আমাদের আলোচ্য নয় বলে সেই অংশটুকু উদ্ধৃতি থেকে বর্জন করা হল। ভারত-সভার আদিপর্বের ইতিহাস যোগেশবাবু তাঁর গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তথ্যপ্রমাণসহ তিনি দেখিয়েছেন যে ভারত-সভার আগে ‘ইণ্ডিয়ান লীগ’ স্থাপিত হয়েছিল। ভারত-সভা স্থাপিত হওয়ার পরে লীগের স্বতন্ত্র সত্তা ক্রমে লোপ পেয়ে যায়। ভারত-সভা এ দেশের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়ে কিভাবে জাতীয় চেতনা বিস্তারে ও জনকল্যাণকর্মে সাহায্য করেছে, গ্রন্থকার সে বিষয়ে সভার রিপোর্ট ও অন্যান্য বিবরণাদি থেকে সংগৃহীত

পর্যাপ্ত তথ্যসহ আলোচনা করেছেন। 'পূর্বভারতে স্ত্রীশিক্ষা' বিষয়ে ইংরেজি-গ্রন্থে লেখক ১৮১৯ সালের 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' থেকে আরম্ভ করে 'বেথুন' স্কুলে'র প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি পর্যন্ত ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। চ্যাপম্যান, লাসিংটন, শার্প ও রিচি প্রভৃতির অধুনা-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থে এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার এই আদিপর্বের ইতিহাস সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। স্বল্পপরিসরে এই সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি প্রামাণিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করে লেখক কৌতূহলীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'বাংলার নব্যসংস্কৃতি' বইখানিতে উনিশ শতকের বিভিন্ন সভাসমিতির নাতিদীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা প্রভৃতি প্রায় কুড়ি-বাইশটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূলক সভা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু। আলোচনা যতদূর সম্ভব তথ্যসমৃদ্ধ।

'কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্দ্র' বইখানিতে লেখক শহরের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান, প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি ইত্যাদির যথাসম্ভব বিবরণ সন্নিবেশ করেছেন। কলকাতা শহরের নানারকমের বিচিত্র কাহিনীর প্রতি বহু লেখক ও পাঠক সম্প্রতি যে বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তথাপি কলকাতার কোনো ঐতিহাসিক পরিচায়কগ্রন্থ বাংলাভাষায় বা ইংরেজিতে নেই বললেই হয়, রেভারেণ্ড ফার্মিঙ্গার ও সুরাবর্দি সাহেবের দুখানি অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ইংরেজি বই ছাড়া। বাংলাভাষায় রচিত আলোচ্য বইখানি এদিক দিয়ে কৌতূহলীদের অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তি করতে সাহায্য করবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত লেখকের বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালা 'বিদ্যাসাগর-পরিচয়' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকালীন বাংলাদেশের অবস্থা, তাঁর শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস, সাহিত্যসাধনা ও সমাজহিত-প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিষয়ে লেখক যে তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন তাতে সাধারণ পাঠক ও অনুসন্ধানী উভয়েই উপকৃত হবেন।

'বরণীয়' বইখানিতে এমন কয়েকজন সুখ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তির জীবনকাহিনী বিবৃত হয়েছে যাঁরা লেখকের জীবনে নানাদিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন। লেখকের 'গুরুমহাশয়' থেকে আরম্ভ করে 'পিতৃদেব' পর্যন্ত ৩১ জন 'বাঙালী'র জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। তার মধ্যে অশ্বিনীকুমার দত্ত, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ স্বনামধন্যদের কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু শিক্ষক নিবারণচন্দ্র বৈদ্য, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বিশ্বাস বা নিশিকান্তের মা-র কথা কারও জানবার কথা নয়। দেশের বহমান সমাজ-জীবনে সকলশ্রেণীর মানুষের অল্পবিস্তর দান আছে। যাঁদের দান বিস্তর তাঁরা সমাজে সুপরিচিত, আর যাঁদের দান অল্প তাঁরা অজ্ঞাত। সমাজের ইতিহাসরচয়িতার কাছে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, খ্যাত ও অখ্যাত, সকলেরই উপাদানমর্যাদা সমান। বর্তমান গ্রন্থের চরিতরচনাগুলি কতকটা লেখকের আত্মজীবনমুখী হলেও সামাজিক রচনা হিসেবে পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য মনে হবে।

'জাগৃতি ও জাতীয়তা' গ্রন্থের প্রথম বিভাগে জাগৃতি-বিষয়ে এবং দ্বিতীয় বিভাগে জাতীয়তা-বিষয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। প্রথম বিভাগে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাতে বাংলাদেশে যে চিন্তালোড়নের সৃষ্টি হয় তার বিবরণ দিয়ে, নূতন সংস্কৃতচর্চা, বাংলাশিক্ষা ও বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্যে কিভাবে জাগরণের

গতি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের চেয়ে তথ্যসন্নিবেশে তাঁর অধিকতর নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে, এবং জাতীয়তা বিভাগের রচনাগুলিতেও তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখা যায়। অবশ্য এই গ্রন্থের 'জাতীয়তা' অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক ইতিহাস নয়, ইতিহাসের ভূমিকা-স্বরূপ। যাঁরা জাতীয়তার বিস্তৃত ইতিহাসপাঠে ইচ্ছুক তাঁরা লেখকের 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' অবশ্য পাঠ করবেন। ১৩৩৭ সনে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়, সম্প্রতি সংশোধিত ও বর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কংগ্রেস-পূর্ব যুগ ও কংগ্রেস-যুগ, প্রধানতঃ এই দুই ভাগে বইখানিতে জাতীয়তার ইতিহাস বিভক্ত। রামমোহন থেকে ভারত-সভা পর্যন্ত ইতিবৃত্ত বিভিন্ন পর্বে বিবৃত করে লেখক কংগ্রেস-যুগে পৌঁছেছেন, এবং স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ক্রমবিস্তারে সাহায্য করে কংগ্রেস কিভাবে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পথে অগ্রসর হয়েছে, লেখক সেই সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যায়ক্রমে রচনা করেছেন। খণ্ডিত ভারতের কথাও বাদ দেওয়া হয় নি। এদিক দিয়ে বাংলা ভাষায় জাতীয় আন্দোলনের একখানি ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য। অবশ্য যোগেশবাবুর জাতীয়তার ইতিবৃত্ত আলোচ্য গ্রন্থে প্রধানতঃ এ দেশের নূতন মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বাদেশিকতাবোধ ও স্বার্থের বিকাশ-বিবরণের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ। তার সঙ্গে গণ-আন্দোলনের ধারাটির বিচার-বিশ্লেষণ করে, জাতীয় চেতনা বিস্তারে তার দানের কথাটুকুও যদি তিনি আলোচনা করতেন তাহলে গ্রন্থখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ হত। অবশ্য স্বতন্ত্রভাবে *Peasant Revolution in Bengal* (Calcutta, 1953) গ্রন্থে এ বিষয়ে লেখক আলোচনা করেছেন।

'বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান' নাম থেকেই বোঝা যায় আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাংলা 'সাহিত্যে' বিজ্ঞান আলোচনার বিবরণ, বাংলাদেশে বিজ্ঞানচর্চার পূর্ণ ইতিহাস নয়। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত রবার্ট মে-র 'অঙ্কপুস্তক' বাংলাভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-বিষয়ক মুদ্রিত বই। এই সময় থেকে, অর্থাৎ হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে, বর্তমানকালের জগদানন্দ রায়, শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য পর্যন্ত শতাধিক বৎসরের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই ইতিহাসের ধারাকে বিভক্ত করা হয়েছে তিনটি পর্বে— হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রথম পর্ব, অক্ষয়কুমার থেকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব এবং রামেন্দ্রসুন্দর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব। পরিশিষ্টে আলোচিত হয়েছে চিকিৎসাবিজ্ঞান কৃষিবিজ্ঞান শিল্পবিজ্ঞান ইত্যাদি 'কারিগরী বিজ্ঞান'। প্রত্যেক পর্বের বিবরণে লেখক সযত্নে বিজ্ঞান-সাহিত্যের রচয়িতাদের রচনাবলীর যথাসম্ভব বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন এবং তাৎকালিক পত্রিকার বিজ্ঞান-অনুশীলনের কাহিনীও পর্যাপ্ত উদ্ধৃতিসহ বিবৃত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞানসাধনার ক্রমিক ইতিবৃত্ত এইভাবে পূর্বে কেউ রচনা করার চেষ্টা করেছেন বলে জানি না সেদিক দিয়ে লেখক শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ-পথে প্রথম দুঃসাহসী অভিযাত্রীর সাধুবাদ দাবি করতে পারেন।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের পর্বভেদ-প্রসঙ্গে লেখক যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা নিয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু কোনো ইতিহাসেরই কালানুক্রমিক পর্বভেদ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত নয়, কতকটা ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক বলা চলে। এক-একটি পর্বের ছেদ না টানলে রচনার শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ

হবার সম্ভাবনা থাকে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে লেখকের পর্বভেদ তর্কসাপেক্ষ হলেও, অধিকার-বহির্ভূত নয়। প্রধানতঃ পদার্থবিজ্ঞান রসায়নবিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান ভূবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানকেই প্রকৃত বিজ্ঞানের বিষয়ভুক্ত করেছেন লেখক, এবং সংগত কারণেই করেছেন। আয়ুর্বেদ ফলিত-জ্যোতিষ ও হোমিয়োপ্যাথিকে বাদ দেওয়া আদৌ অসংগত হয়নি। বিষয়ালোচনাপ্রসঙ্গে কেবল একটি কথা মনে হয়েছে এই যে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে হঠাৎ যেভাবে বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্‌ভব দেখানো হয়েছে সেটা বোধ হয় কতকটা 'অবৈজ্ঞানিক'। সমাজে কোনো বিষয়েরই উদ্‌ভব হঠাৎ শূন্যতা থেকে হয় না, বিজ্ঞানের তো হতেই পারে না। বিজ্ঞান-অনুশীলনের সূত্রপাত এ দেশে ১৭৮৪ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে হয়েছে বলাই বোধ করি সংগত, এবং এশিয়াটিক সোসাইটি যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল সেটাও বাংলার গৌরব নয় শুধু, ভারতের গৌরব, সারা এশিয়ার গৌরব। তার প্রতিষ্ঠাকালীন উদ্দেশ্য এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছিল, "enquiry into the history and antiquities, arts, sciences and literature of Asia"। উইলিয়ম জোন্স এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature"—এই কথাই তো বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র। আরও বিশদভাবে তিনি বলেছিলেন, "You will examine their improvements and methods in arithmetic and geometry—in trigonometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics."। হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠার বত্রিশ বছর আগেকার কথা। বিজ্ঞানের অনুশীলন কতদূর পর্যন্ত এই সময়ে হয়েছিল তার বিস্তারিত পরিচয় *Asiatick Researches* এবং সোসাইটির Journal ও Proceedings-এর রচনাবলীর Index-এর মধ্যেই পাওয়া যাবে। অবশ্য সবই ইংরেজিতে লেখা এবং ইয়োরোপীয়দের লেখা, কিন্তু তাতে কি? বাংলায় বিজ্ঞানের বইও তো প্রথমে ইংরেজরা লিখেছিলেন। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্‌ভব ও বিজ্ঞানচর্চার অনুশীলনের ক্ষেত্র তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন প্রধানতঃ এ দেশের এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্য দিয়ে। প্রথম পর্বের অবতারণার পূর্বে লেখক যদি এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা 'উদ্‌যোগপর্ব' বা ঐ জাতীয় কোনো নাম দিয়ে সন্নিবেশিত করতেন, তা হলে বইখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হত মনে হয়।

তা সত্ত্বেও এ বইয়ের বিষয়গুরুত্ব ও মর্যাদা লেখক যে যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করেছেন তা স্বীকার করতে হবে। লেখকের ভাষা সহজবোধ্য এবং বিজ্ঞানের দুরূহতায় তা বিশেষ আড়ষ্ট হয় নি বলে তাঁর কৃতিত্ব আরও বেশি। যেটুকু আড়ষ্টতা ও একঘেয়েমি মধ্যে মধ্যে লেখায় প্রকাশ পেয়েছে তা বিজ্ঞানপুস্তকের তালিকাসুলভ পরিচয়-বাহুল্যের জন্য। তথ্য সংগ্রহে ও নির্বাচনে লেখক যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা একবাক্যে প্রশংসনীয়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এ বই প্রকাশ করে বিদ্যোৎসাহী বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

বিনয় ঘোষ

বাণভট্টের আত্মকথা। হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

দু কুনকে ধান। তকসী শিবশঙ্কর পিল্লাই। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, তিন টাকা।

মাটির মানুষ। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, দুই টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

মাটির মূর্তি। রামবৃক্ষ বেণীপুরী। সাহিত্য অকাদেমী, নিউ দিল্লী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। দুই টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

নানার হাতি। ভকস মুহম্মদ বশীর। সাহিত্য অকাদেমীর পক্ষে ত্রিবেণী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, দুই টাকা।

বাণভট্টের আত্মকথা অভিনব উপন্যাস। সংস্কৃত সাহিত্যের সুপরিচিত কবি বাণভট্টের কল্পিত জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। বাণভট্টের হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী প্রসিদ্ধ বই। বাণভট্ট এ দুখানি বইতে যেসব কথা বলেছেন তা থেকে কবিজীবনী জানবার জন্যে পাঠকের আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। কবি নিজে সে কাজ করেছেন হর্ষচরিতের প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে এবং কাদম্বরীর সূচনাতে। কিন্তু সে যৎসামান্য। হর্ষচরিত এবং কাদম্বরীতে কবিজীবনীর যে সংবাদ পাওয়া যায় তাতে কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। পাঠকের অগস্ত্যতৃষ্ণা গণ্ডূষে মিটতে চায় না। প্রধানত এই তৃষ্ণা মেটাবার আগ্রহ থেকেই 'বাণভট্টের আত্মকথা'র সৃষ্টি। বলা বাহুল্য, লেখক হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী তথ্যের উপর বেশি জোর দেন নি। সামান্য তথ্যের উপর নির্ভর করে গ্রন্থরচনা করতে হলে লেখকের কল্পনাশক্তির বিস্তৃতি চাই, সতর্কতার প্রয়োজন বেশি, পরিবেশ ফুটিয়ে তোলবার মত দক্ষতাও অর্জন করতে হয়। বাণভট্টের সময়ের চিত্ররূপের বাস্তবতা পরিস্ফুট করবার জন্যে দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছেই। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের সঙ্গে যদি সংযমের শাসন থাকে তবেই এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে সেই অপরূপতা আছে। তথ্যস্বল্পতা-বিষয়ে লেখকও সচেতন। সেজন্যে শ্রীহর্ষের রত্নাবলী এবং বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছেন লেখক। দ্বিবেদী মহাশয় পাদটীকায় সে-সমস্ত গ্রন্থের এবং গ্রন্থের অংশবিশেষ উল্লেখও করেছেন। এই কারণে 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে ঐতিহাসিক পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ আছে। বর্ণনাতে সংস্কৃত সাহিত্যের মনোহারিত্ব এবং চমৎকারিত্বের স্বাদ পাওয়া যায়।

লেখকের রচনাশৈলী বাণভট্টের কাদম্বরীর অনুরূপ। কাহিনীর গতিপ্রবাহের দিকে বাণভট্টের মত হজারীপ্রসাদও অবহিত নন। বাণভট্টের মতই দ্বিবেদী মহাশয় রাজপ্রাসাদের সূক্ষ্ম কারুকার্য পর্যবেক্ষণে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, চৈত্য কিংবা মন্দিরের পূত সৌন্দর্য আস্বাদনে আগ্রহশীল, নরনারীর অনুভূতির বৈচিত্র্য অনুসন্ধানে উৎসাহী। প্রকৃতির শোভা বর্ণনায় বাণভট্টের মত লেখকও অকৃপণ। সেকালের বৈদিক-অবৈদিক অনুষ্ঠান-উৎসবের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করে হজারীপ্রসাদ পৌরাণিক কালটিকে বাস্তব করে তুলেছেন। বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যে উপমার পর উপমার মালা গেঁথে যেতে হজারীপ্রসাদের ক্লান্তি দেখা যায় না। লেখক বিস্মৃতযুগে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন। শ্রীহর্ষের সভা প্রত্যক্ষ করেছেন।

নচেৎ এমনভাবে বাণভট্টের যুগটিকে পাঠকের হৃদয়বেদ্য করা সহজ হত না। রাজসভার অনেক রত্নের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনিও এক রত্ন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র আজ অনেক স্পষ্ট। তথাপি ইতিহাস সেকালের সব খুঁটিনাটি বিবরণ উদ্‌ঘাটিত করতে সমর্থ হয় নি। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে চেষ্টা করেছিলেন গবেষণায় ও সাহিত্যে। তাঁর উপন্যাসগুলি নানা ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রাচীন কালের একটা মোটামুটি চিত্র প্রকাশ করেছে। হজারীপ্রসাদ প্রাচীন ভারতের সেই বিস্মৃতযুগের ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। বাণভট্ট এমনই একটা সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যে-সময়ে কি ধর্মবিশ্বাসে কি রাষ্ট্রনীতিতে কি সমাজব্যবস্থাতে এক বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। বাণভট্ট শ্রীহর্ষের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, রণনীতি লক্ষ্য করেছেন, রাজ্যের বিলাসকলাকুতূহল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। যশোবর্মা, রাজ্যবর্ধন, শ্রীহর্ষের কাহিনী 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে অনেকখানি অংশ জুড়েছে। লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে বাণভট্ট নিপুণিকার সহায়তায় সেই রাজদ্বন্দ্বে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কেমনভাবে বাণভট্ট বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে ভট্টিণীর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাণভট্টের সেই পরিক্রমার অত্যুজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন দ্বিবেদী মহাশয় কল্পনাবলে। হর্ষচরিতের ঘটনা বর্ণনার সম্মোহনশক্তি এবং কাদম্বরীর শিল্পকুশলতা এই উভয় গুণ 'বাণভট্টের আত্মকথা'তে দেখা যায়। নিপুণিকা এবং ভট্টিণী, পত্রলেখা এবং মহাশ্বেতার মত পাঠকচিত্তকে চিরকাল আকর্ষণ করবে। দূরত্বের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। দূরত্বের মোহকে দ্বিবেদী মহাশয় সৌন্দর্যের বাতাবরণে স্থাপিত করে অসামান্যতা দিয়েছেন। অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে; আমাদের সে রাজ্যের সঙ্গে লেখক রাখীবন্ধন করিয়ে দিয়েছেন। 'বাণভট্টের আত্মকথা'র এই অত্যাশ্চর্য শক্তি বিস্ময়কর।

বইটির অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়। পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের অধিকারী শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় এই বইটির সার্থক অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে এক অনবদ্য বস্তু উপহার দিলেন।

শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের 'দু কুনকে ধান' কেরলের চাষী-মজুরের কাহিনী। কেরল অঞ্চলে যারা জমিতে ফসল ফলায় তাদের বলা হয় পরয়ন এবং পুলয়ন। পরয়ন এবং পুলয়ন সম্প্রদায় জমির মালিক নয়। পরিশ্রমের বিনিময়ে দু কুনকে ধান তাদের রোজকার বরাদ্দ। এদের বিধাতা তম্পুরাণ সম্প্রদায়। তম্পুরাণার পরয়ন-পুলয়নদের ঋণ দেয়, মাঝে মাঝে চাষীদের বিপদে সাহায্যও করে। ঋণের জালে পরয়ন পুলয়ন তম্পুরাণদের কাছে বাঁধা পড়ে। ফলে 'দাস'দের উপর মালিকদের একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপিত হয়ে যায়। দীর্ঘকালের এই প্রথাকে মেনে নিয়ে কেরলের জমিব্যবস্থা চললেও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরয়ন-পুলয়নরা আত্মসচেতন হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। শিবশঙ্কর পিল্লাই তাঁর 'দু কুনকে ধান' বইটিতে কোরণ নামে এক চাষীর জীবনালেখ্যর সাহায্যে জমিব্যবস্থার এই ভয়াবহ দিকটি অনাবৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। তম্পুরাণদের নৃশংসতা-বর্বরতাকে লেখক কশাঘাত করেছেন। তিনি পরয়ন-পুলয়নদের মর্মজ্বালা আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। কোরণের সংগ্রামকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিত্রিত করে তিনি সংগ্রামের সাফল্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। গ্রন্থে কোরাণের স্ত্রী চিরুতার নারীজীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রীযুক্ত পিল্লাই সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। অত্যাচার, অবিচার সংগ্রাম ইত্যাদির বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে শিবশঙ্কর পিল্লাই মানবমনের চিরন্তন স্নেহ-প্রেম-মমতার

কথাও বিস্মৃত হন নি। এই সকল বর্ণনায় লেখকের শিল্পকুশলতার সঙ্গে আন্তরিকতার অপরূপ যোগাযোগ ঘটাতে 'দু কুনকে ধান' সর্বহারার জীবনভাষ্যরূপে পরিণত হয়েছে।

শ্রীযুক্ত কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর 'মাটির মানুষ' উড়িষ্যার মধ্যবিত্ত চাষীজীবনের প্রতিচ্ছবি। একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ বর্তমানকালে দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের মহিমা আজও আমাদের আকর্ষণ করে। বরজু প্রধান এবং ছকড়ি এই দুই ভাইয়ের সংসারে ভাঙন ধরল। বরজু ভাইকে আঁকড়ে ধরতে চায়। কিন্তু ছকড়ি পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী। পরিণামে স্নেহের জয় সূচিত হয়েছে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী একজনের সংকীর্ণতা এবং আর একজনের মহত্ত্বকে পাশাপাশি স্থাপন করে একটি উঁচু আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। সৌভ্রাত্রের পরম রমণীয়তা বইটির প্রধান আকর্ষণ।

শ্রীযুক্ত রামবৃক্ষ বেণীপুরী এমন কতকগুলি চরিত্র নিয়ে 'মাটির মূর্তি' রচনা করেছেন যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতিপরিচয়ের। এই অতিপরিচয়ের জন্যে এদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল সামান্য, এদের জীবনের কোনও মহত্ত্বই আমরা দেখতে পাই না। এমন-কি সাহিত্যে এদের প্রবেশাধিকার আছে কিনা সে বিষয়েও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। সেই কারণে লেখক 'এই সব মাটির মূর্তি' সম্বন্ধে কৈফিয়ত দিয়েছেন এই বলে 'এই অসুন্দর মূর্তিগুলোর মধ্যে যে বস্তু আছে তা খুঁজে দেখার কথা আমাদের মনেই হয় না; এ বস্তুটির নাম প্রাণ। শকুন্তলা বশিষ্ঠ শিবাজী এবং নেতাজীর ভক্তবৃন্দদের নিজের গ্রামে বুধিয়া বালগোবিন ভগত বলদেব সিং এবং "দেব"দের চেনবার জানবার অবসর কোথায়?' শ্রীযুক্ত বেণীপুরীর মানুষের জীবনকে চেনবার জানবার কৌতূহল অসামান্য। এই কৌতূহলের বশে তিনি কয়েকটি গ্রাম্য অখ্যাত অনাদৃত মানুষের জীবনকাহিনী নিয়ে মনুমেণ্ট গড়ে তুলেছেন। বিষয়ের তুচ্ছতা লেখকের সহানুভূতিতে এবং আন্তরিকতায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সাহিত্যের 'সত্যে'র ইঙ্গিতবাহী এই জীবনচরিতগুলি, হিন্দী সাহিত্যে কেন, যে-কোনো সাহিত্যে অমরতার দাবি করতে পারে।

মোট বারোটি চলাফেলা মানুষদের কথাচিত্র নিয়ে 'মাটির মূর্তি' রচিত। চরিত্রগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে মহৎ বস্তু চোখে পড়বার নয়। কিন্তু সাধারণ জীবনে যে আসাধারণতার প্রকাশ দেখা যায়, শ্রীযুক্ত বেণীপুরী তারই চকিত-চমক ক্ষণগুলিকে তাঁর লেখায় ভাস্বর করে রেখেছেন। লেখকের মমত্ববোধের স্পর্শে এই দ্বাদশ পুত্তলিকা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। বেণীপুরী পর্বতশীর্ষের আলোকের কথা বলেন নি, সমতল-ভূমির চিত্র রচনা করেছেন। শিখরদেশের আলোক আমাদের বিস্মিত করে, কিন্তু সে বড় দূরের; সমতলভূমির আলোক আমরা গ্রহণ করি, তার সঙ্গে আমাদের নিত্য চেনা-জানার সম্পর্ক। বুধিয়া রাজিয়া বৈজুমামা সরযুভাই আমাদেরই পরিচিত জগতের। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্যকালের। শ্রীযুক্ত বেণীপুরী এই নিত্যকালের সম্পর্কটিকে পাকা করে দিলেন।

ভৈকম মুহম্মদ বশীরের নানার হাতি একটি অভিজাত মালয়লম মুসলমান পরিবারের কাহিনী। সেকালের বিশ্বাস এবং প্রতাপ নিয়ে ভট্টনটীমা একালকে জয় করতে চেয়েছিল। ভট্টনটীমার বংশ প্রাচীন ঐতিহ্যের গৌরবে দীপ্ত। বংশমহিমার ঐশ্বর্য নিয়ে ভট্টনটীমা একালেও দেশবরেণ্য। তাঁর স্ত্রী বংশগৌরব সম্বন্ধে সচেতন, এ বংশের একটি হাতি ছিল— ভট্টনটীমার কন্যা কুঞ্জুপাতুম্মার নানার হাতি। কাহিনী-অংশে হাতির উপস্থিতি নেই। কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মার স্বপ্ন রচিত হয়েছিল এই হাতিটিকে কেন্দ্র করে, এই হাতিটি

ভট্টনটীমার বংশের সৌভাগ্যের প্রতীক। তারই স্পর্শ আছে কুঞ্জুপাতুম্মার মুখে ছোট্ট একটি তিলকে আশ্রয় করে। কুঞ্জুপাতুম্মার জীবন কেটেছে পিতামাতার শিক্ষায়। সে শিক্ষায় ছিল আভিজাত্য, চিরাচরিত ধর্মনীতি, এবং সাধারণজীবনের প্রতি উপেক্ষা। কুঞ্জুপাতুম্মা মানুষ হয়েছে এই পরিবারে। প্রথার বন্ধনে, শাস্ত্রীয় অনুশাসনে, অবরোধের অন্তরালে। এই প্রাচীরের মধ্যে তার জগৎ। এমন সময় দেখা দিল বিপর্যয়। ভট্টনটীমা মামলায় হেরে গেল। প্রাচীন ঐতিহ্য ছেড়ে তারা প্রকাশ্য রাস্তায় নেমে এল। বাঁধল নূতন ঘর। সেখানে প্রকৃতির ছায়ায় কুঞ্জুপাতুম্মা নিজেকে আবিষ্কার করল। সেকালের বিশ্বাসে ঘা লাগল নূতন চেতনার। তার জীবনে এল নিজার আহম্মদ আর সখী লুটাপী। লুটাপী আর নিজার আহম্মদ কুঞ্জুপাতুম্মাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে দিল। বহু তিক্ততার মধ্য দিয়ে কুঞ্জুপাতুম্মা লাভ করল নিজারকে। তার এই ভাগ্যপরিবর্তনে গ্রামবাসীরা ব্যঙ্গ করল। নানার হাত্তিকে তারা বলতে লাগল কুড়িআনা ( ছোট ছোট পোকা )। কিন্তু কুঞ্জুপাতুম্মা এতকাল ছিল অসূর্যম্পশ্যা, এখন সে সোজা হয়ে জগৎ ও জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই ব্যঙ্গের উত্তরে সে ঈষৎ হেসে বাস্তবকে বরণ করে নিল প্রসন্নমনে।

মুহম্মদ বশীর সেকাল ও একালের দ্বন্দ্বসংঘাত দেখিয়েছেন কুঞ্জুপাতুম্মাকে কেন্দ্র করে। পরিণামে একালের জয় সূচিত হয়েছে। এই জাতীয় অধিকাংশ রচনায় আজকাল হৃদয়ের উত্তাপ কিঞ্চিৎ কম থাকে। একটা পরিচিত সুলভ সামাজিক সমস্যাকে ছকে ফেলে বর্ণনা করার লোভ লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু মুহম্মদ বশীরের রচনায় হৃদয়ের উত্তাপ আছে। ভট্টনটীমার চরিত্র-অঙ্কনে লেখক ক্ষয়িষ্ণু জীবনের যে প্রতিচ্ছবি দিয়েছেন তা অভিজ্ঞতার দ্বারা পুষ্ট, সমবেদনার দ্বারা অনুরণিত। কুঞ্জুপাতুম্মার মা কুঞ্জুতাচুম্মার সঙ্গে ভট্টনটীমার কলহ প্রাত্যহিকতার একঘেয়ে বর্ণনায় পর্যবসিত হয় নি। লেখকের রচনায় কুঞ্জুপাতুম্মার চরিত্রটি আশ্চর্য সাফল্য পেয়েছে। কুঞ্জুপাতুম্মার সরল বিশ্বাস, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় আত্মীয়তা, নবজাত প্রেমের আবেগমধুর প্রকাশ মুহম্মদ বশীর দরদ দিয়ে এঁকেছেন। বাংলা সাহিত্যে এই অনুবাদ-গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। নিলীনা আব্রাহামের অনুবাদকর্ম প্রশংসার্হ।

বিভিন্নভাষী ভারতবাসীর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলবার জন্যে সাহিত্য অকাদেমী অনুবাদকার্যে অগ্রসর হয়েছেন। এ প্রচেষ্টার সার্থকতা সকলেই স্বীকার করবেন। প্রতিবেশী রাজ্যগুলির মানুষকে জানবার পক্ষে সাহিত্য একটা বড় সম্পদ। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থগুলি সাহিত্য অকাদেমীর সেই আন্তরিকতাকে সপ্রমাণ করেছে।

বিজিতকুমার দত্ত

সাহিত্য পত্রিকা ॥ ১৩৬৪, বর্ষা ও শীত সংখ্যা। ১৩৬৫, বর্ষা ও শীত সংখ্যা। ১৩৬৬, বর্ষা ও শীত সংখ্যা। সম্পাদক আবদুল হাই ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ॥

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ॥ প্রথম সংখ্যা পৌষ, ১৩৬৩। দ্বিতীয় সংখ্যা ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪। দ্বিতীয় বর্ষ : দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৩৬৫ ॥

Indian Literature : Vol I, No I and 2. Vol II, No I and 2. Sahitya Akademi, New Delhi.

বাংলা ভাষা পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রেরই মাতৃভাষা। মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করছে আলোচ্য প্রথম পত্রিকা দুখানি। 'সাহিত্য পত্রিকা' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সব কয়টি প্রবন্ধই গবেষণাধর্মী। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা, প্রাচীন পুঁথি সম্পাদনা, প্রাচীন গীতি ও পদসংকলন প্রকাশ, প্রধানত এই তিনটি প্রসঙ্গ মুখ্য স্থান অধিকার করলেও ঐতিহাসিক ও সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবীণ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ্ এবংনবীন অধ্যাপক আবদুল হাই উভয়ে ব্রতী হয়েছেন। শহীদুল্লাহ্ সাহেব তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (শীত সংখ্যা ১৩৬৫) নামের সুবৃহৎ প্রবন্ধে—প্রকৃতপক্ষে একখানি সম্পূর্ণ বই—একটি বিতর্কমূলক প্রস্তাব তুলছেন। তিনি মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার জন্ম 'গৌড়ী প্রাকৃত' ও 'গৌড়ী অপভ্রংশে' নির্দেশ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখানো যায় এবং ভাষাতত্ত্বের ছাত্রেরা অনেকেই তাঁর সিদ্ধান্তকে স্বীকার করবেন না। তবু নতুন ধরণের চিন্তার দিক দিয়ে শহীদুল্লাহ্ সাহেবের বক্তব্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

অধ্যাপক আবদুল হাই 'বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি' 'বাংলার সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি' ও 'বাংলা স্বরধ্বনি ও ধ্বনির ব্যবহার' 'বাংলা শব্দ ও অক্ষর ভাগ' এই চারটি প্রবন্ধে বাংলাভাষার ধ্বনিগত রূপ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে প্রয়োগ-সিদ্ধ আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানসম্মত রীতিতে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি যে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার জন্য তিনি সাধুবাদ পাবার যোগ্য। তিনি চলিত বাংলায় ঝরঝরে গদ্যে বাংলা ভাষাতত্ত্বের ধ্বনিগত রূপের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। বক্তব্য কোথাও দুর্বোধ্য বা পরিভাষা-কণ্টকিত হয় নি। প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বাংলা স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি ও যুক্ত-ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিচার করেছেন। ভাষাতত্ত্বের উপর লিখিত এমন মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ রচনা বাংলায় বেশি চোখে পড়ে না। ১৩৬৬ বর্ষা সংখ্যায় হাই সাহেবের 'ধ্বনিগুণ' প্রবন্ধটিতে ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনার পর চোখে পড়ে পুঁথি-সম্পাদনার সযত্ন ও সতর্ক প্রয়াস। পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ সাহিত্যসেবীরা যে এদিকে ঝুঁকেছেন এ খুব আশার কথা। 'সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় আহমদ শরীফ, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খানের বিদ্যাসুন্দর কাব্য নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে উভয়ের রচনা সম্পূর্ণ মুদ্রিত করেছেন। উভয়ের কাব্য পড়লে দেখা যাবে শ্রীধর যে বিদ্যাসুন্দর কাব্য লিখেছিলেন সাবিরিদ খান তাকেই অনুকরণ করেছিলেন। সাবিরিদ খানের কাব্যে শ্রীধরের কাব্যের আক্ষরিক মিল দেখা যায়। দ্বিজ শ্রীধর ও সাবিরিদ খান উভয়ের রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে চট্টগ্রামে, উভয়ের

কাব্যের পত্র-সংখ্যা (যা পুঁথিতে পাওয়া গেছে) প্রায় একই। দ্বিজ শ্রীধর গৌড়ে গিয়ে কাব্যরচনা করেছিলেন এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ কোথাও নেই। আহমদ শরীফ সাহেব সাবিরিদ খানকে দ্বিজ শ্রীধরের পূর্ববর্তী কবি বলে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু তার মধ্যে অনুমানের অংশই বেশি। বরং এর তুলনায় 'আলাউল বিরচিত তোহ্ফা' সম্পাদনায় তিনি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আলাউলের জীবনেতিহাস ও কাব্যসাধনা সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। বিশেষত 'তোহ্ফা' কাব্যখানি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হওয়ায় অনেকেরই ঐ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হবে। এই পর্যায়ে (১৩৬৫ বর্ষা সংখ্যায়) মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সংগৃহীত 'লালন শাহ ফকীরের গান'গুলি (২৯৭টি) মুদ্রণের জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয়। লালন শাহ ফকীরের গান রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল। লালন শাহের জীবনী ও তাঁর সাধনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকলে ভালো হত। ১৩৬৬র শীত সংখ্যায় আহমদ শরীফ মুহম্মদ খান -বিরচিত 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদে'র একখানি পাণ্ডুলিপিকে অবলম্বন করে বইখানি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন।

'সাহিত্য পত্রিকা'র তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বিস্মৃতপ্রায় কবিদের কাব্যালোচনা। কাজী দীন মুহম্মদের 'পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল' (বর্ষা সংখ্যা ১৩৬৪), আনিসুজ্জামানের 'সায়ের ফকির গরীবুল্লাহ্' ও 'সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য' (বর্ষা ও শীত সংখ্যা ১৩৬৫) প্রবন্ধগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আনিসুজ্জামান গরীবুল্লাহ্ সম্পর্কে বহু তথ্য উপস্থাপিত করেছেন এবং গরীবুল্লাহ্র কবিপ্রতিভা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য : "গরীবুল্লাহ্ও আমাদের ঐতিহাসিক কৌতূহলের সামগ্রী। তিনি প্রায় ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক— কিন্তু সেই কবিত্ব ও বৈদগ্ধ্য তাঁর সাধ্যাতীত ছিল ; রায় গুণাকরের পাশে সায়ের তাই ম্লান। রামপ্রসাদের তিনি সমকালীন— কিন্তু যে আত্মভাবমুখীন গীতি রচনার জন্য কবিরঞ্জনের প্রতিষ্ঠা, গরীবুল্লাহ্র কাব্যে সেই আত্মতন্ময়তার একান্ত অভাব।· ·রোমান্টিক প্রণয়কাব্য হিসেবে তাঁর ইউসুফ-জেলেখা উল্লেখযোগ্য রচনা— এটাই তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচায়ক।" ১৩৬৬ বর্ষা সংখ্যায় আনিসুজ্জামানের 'শেখ ফজলল করিম' প্রবন্ধটিও তথ্যের দিক থেকে মূল্যবান। 'সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত অন্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীঅজিতকুমার গুহের 'রূপ প্রতীকের ধারা', শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের 'উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি', কাজী আবদুল মান্নানের 'উনিশ শতকের সাহিত্যপত্র ও মুসলিম মানস', আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহর 'বাঙলা সাহিত্যে উপাখ্যান : গুলে বকাওলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে দৌলত কাজী রচিত 'লোরচন্দ্রাণী' কাব্য সম্পর্কে গোলকুণ্ডা-বিজাপুর রাষ্ট্রের সাহিত্যচর্চার সঙ্গে আরাকান রাজসভার যোগ উল্লিখিত হয়েছে। তাঁর আরেকটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ 'উর্দু ইতিহাস-সাহিত্য (শীত সংখ্যা ১৩৬৬)।

১৩৬৬ বর্ষা সংখ্যার একটি সুচিন্তিত ও তথ্যবহুল প্রবন্ধ মনিরুজ্জামানের 'বাঙলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান'। শীত সংখ্যার তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কাজী আবদুল মান্নানের 'জাতীয় আন্দোলন-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি', মুহম্মদ সিদ্দিক খানের 'বাংলা মুদ্রণের গোড়ার কথা' এবং মুনীর চৌধুরীর 'বাংলা আত্মজীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন'। এ সংখ্যার আর-একটি সম্পদ মিশরের বিখ্যাত সুফী কবি-সাধক বু'সিরী-র কবিতার নূরুদ্দীন আহম্মদ-কৃত বঙ্গানুবাদ। 'সাহিত্য পত্রিকা' তার উদ্‌যোগের জন্য সর্বজননন্দিত হবে।

"শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-বিজ্ঞান, শাসন-ব্যবস্থা প্রভৃতি জীবনের সর্বস্তরে দেশের ভাষা দ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাভ করুক—ইহাই একাডেমীর একমাত্র প্রার্থনা।" এই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে 'বাংলা একাডেমী'র প্রতিষ্ঠা এবং আলোচ্য পত্রিকা তারই মুখপত্র। এই পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধে মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের কয়েকজন মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আবদুল কাদিরের 'পদ্মাবতী', আশরাফ সিদ্দিকীর 'মীর মশাররফ হোসেন', গোলাম সাকলায়েনের 'দাদ আলীর কাব্য পরিচয়' প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা চলে। কবিদের পরিচয় দানে ও গ্রন্থপঞ্জীরচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। রচনাগুলিতে মুসলমান কবি ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বহু অজ্ঞাত তথ্য জানবার সুবিধা হল। এই প্রবন্ধগুলি রচনায় লেখকেরা সমকালীন ইতিহাসকে বিস্মৃত হন নি। কবিদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী রচনায় স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সাহিত্যসাধকচরিতমালা'য় গৃহীত রীতি অনুসৃত হয়েছে। অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে এস. এ. হালীমের 'সৈয়দ ও লোদী আমলে উর্দু ভাষা-সাহিত্যের বিকাশ', মমতাজুর রহমান তরফদারের 'চৈনিক পরিব্রাজকের দৃষ্টিতে মুসলিম বাংলা' বিশেষভাবে মূল্যবান। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়ের অনূদিত ও বিশ্বভারতী অ্যানালস্-এ প্রকাশিত চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণী থেকে শেষোক্ত প্রবন্ধটির উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। আর-একটি প্রশংসনীয় কাজ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সংগৃহীত 'পাগলা কানাই'য়ের গীতসংকলন। পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণামূলক এই সকল উদ্যোগ বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কাছে পরম কাম্য। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাওয়া দরকার এবং উচ্চমানের প্রবন্ধ আরও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাক্ষ্য পত্রিকাগুলির সর্বত্র বিস্তৃত, তবে সেই উৎসাহ কেবলমাত্র মুসলিম সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কেই যেন নিঃশেষে ব্যয়িত না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

বহুভাষাভিত্তিক ভারত-রাষ্ট্রে ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি ভাষা এখনও পর্যন্ত আমাদের বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীর পরস্পরের মতামত জ্ঞাপনের একমাত্র বাহন। তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্র রূপে ইংরেজি ভাষাই সর্বাগ্রগণ্য। সেজন্যই ভারতীয় সাহিত্য অকাদেমির মুখপত্র *Indian Literature* ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হওয়া যুক্তিপূর্ণ। আলোচ্য চারটি সংখ্যায় শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হয়নি, জাপানী যুগোস্লোভ আমেরিকান ফরাসী ইংরেজি বুলগারিয়ান রুশীয় প্রভৃতি বহু বিদেশী সাহিত্যিকের রচনাও মুদ্রিত হয়েছে।

দীর্ঘকাল এক ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে প্রদেশভেদে ও অঞ্চলভেদে ভাষাভেদ হেতু প্রতিবেশীর সাহিত্যসৃষ্টিকে উপলব্ধি করার উপযুক্ত সুযোগ হয় নি। তার ফলে ক্ষতি হয়েছে আমাদেরই। সাহিত্য অকাদেমি আমাদের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক দানপ্রতিদানের অনুকূল পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দরকার। শ্রীসোমনাথ মৈত্রের 'Short Stories of Tagore', শ্রীএম. ইউ. মালকানির 'Tagore the Playwright', শ্রীহুমায়ুন কবীরের 'Tagore's Poetry' এবং ভিক্টোরিয়া

ও'কাম্পোর 'West meets East—Tagore on the banks of the river Plate'—সব কয়টি প্রবন্ধই সুলিখিত। তবে শ্রী মালকানির রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনা সম্পর্কিত প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ ও অসমৃদ্ধ।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য সম্পর্কে শ্রী ভি. রাঘবনের 'The Aesthetics of Ancient Indian Drama' প্রবন্ধটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পার্থক্যটি সুচারুরূপে আলোচিত হয়েছে। আশা করা যায়, সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে আরও আলোচনা পরে বার হবে। ভারতীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের আলোচনা পর্যায়ে তামিল সাহিত্যের বিখ্যাত কবি 'ভারতী', মালয়ালাম সাহিত্যের ভল্লাথল, কানাড়ীর ত্যাগরাজকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। উর্দু সাহিত্য সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা লিখেছেন জনাব এ. এ. এ. ফৈজী এবং র‍্যাল্‌ফ রাসেল। ফৈজী সাহেব লিখছেন উর্দু সাহিত্যের অমর শিল্পী গালিব সম্পর্কে, আর শ্রীরাসেল লিখেছেন আঠারোর শতকের একজন ব্যঙ্গরসিক কবি সউদার বিষয়ে। এই পর্যায়ে খাজা আহমদ ফারুকীর মওলানা আজাদ সম্পর্কিত রচনাটি সুপাঠ্য।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসার সম্পর্কে শ্রীউমাশঙ্কর যোশীর 'Modernism and Indian Literature' এবং শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের 'The meeting of East and West' প্রবন্ধটি প্রগতিশীল দৃষ্টির সাক্ষ্যবহ। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প', শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিভূতিভূষণের আরণ্যক' এবং শ্রীসরোজ আচার্যের 'রাজশেখর বসুর আনন্দী বাঈ ও অন্যান্য গল্প' সম্পর্কে তিনটি লেখা বার হয়েছে।

বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনায় পত্রিকাখানির বিভিন্ন সংখ্যা সমৃদ্ধ হয়েছে। জাপান থেকে শুরু করে ইউরোপ-আমেরিকার দানে তার ডালা ভরে উঠেছে। জাপানী লেখক Seijiro Yoshizamaর Tales of Genji, Ivo Andricএর Cedomir Minderovic (The Chronicler of Bosnia), Philip Youngএর 'American poetry in the 20th Century', Stanislas Ostrorogএর Moliere's plays, H. D. F. Kittoর Greek drama, Panteley Zarev-এর Lyudmil Stoyanov এবং M. C. Bradbrookএর Ibsen প্রভৃতি রচনাগুলি সর্বজনবোধ্য করে রচিত, অথচ উচ্চমানের।

পত্রিকাখানির আর-একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রতি সংখ্যায় বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকগুলির তালিকা। এই গ্রন্থপঞ্জী মুদ্রিত হওয়ায় দেশে ও বিদেশে পাঠকগোষ্ঠীর উপকার হবে। আলোচ্য চারটি সংখ্যায় যথাক্রমে অসমীয়া বাংলা গুজরাটী ও হিন্দী পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তবে বিস্ময়ের বিষয় বাংলা সাহিত্যের তালিকায় দেখা গেল দীনবন্ধু মিত্রের 'আমার জীবন' স্থান পেয়েছে। দীনবন্ধু মিত্র এ-নামের কোনো বই লেখেননি। রামরাম বসুর লেখা 'লিপিমালা' আর যাই হোক 'Fiction' পর্যায়ভুক্ত হবার যোগ্য নয়। এ রকম ভুল তালিকাটিতে আছে। ঐ তালিকা আরও মনোযোগের সঙ্গে রচিত হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য

গ্রন্থবার্তা। শীলভদ্র। প্রথম খণ্ড, শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা ৯। মূল্য চার টাকা।
গ্রন্থবার্তা। শীলভদ্র। দ্বিতীয় খণ্ড, এভারেস্ট বুক হাউস, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।
সোনার আলপনা। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এভারেস্ট বুক হাউস, কলিকাতা ১২। মূল্য আট টাকা।

প্রতিদিন বইয়ের দোকানে শো-কেসে পুরোনো বইয়ের পাশে নতুন-নতুন বইয়ের ভিড়। উদাসীন পথিক থমকে দাঁড়ান, এবং কিছুক্ষণ যে চোখ বুলিয়েও নেন তার কারণ শুধু মোহন মলাটের আকর্ষণই নয়। লেখক প্রকাশক প্রচ্ছদশিল্পী আর মুদ্রকের সমবেত সহযোগিতায় যে-একটি বিচিত্র নাটক ঐ শো-কেসের মধ্যে অভিনীত হয়ে চলেছে, তার দর্শক হওয়ার রোমাঞ্চ এর ভিতরে নিহিত। আর, যাঁরা শুধু নিঃস্পৃহ অথচ কৌতূহলী দর্শক নন? যাঁরা পাঠক? এঁরা শুধু দৃষ্টির রস পাবার জন্য নয়, অন্তর্দৃষ্টির রসতৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ঐ কাচঘরের বাইরে দাঁড়ান, তারপর বই কেনবার জন্য উৎসুক হয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন।

বস্তুত, আজকের পাঠকের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা নির্বাচনের সমস্যা। যেসব ‘গ্রন্থ সমালোচকের সৌজন্যে ‘ক্লাসিক্‌স’ নামাঙ্কে চিহ্নিত হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে নাহয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু যেসব বই একেবারে নতুন? যে-বইয়ের লেখকের নাম কখনো শুনি নি? অনতি-‘স্নব’ পাঠকের পক্ষে এইসব বইয়ের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী হওয়া সম্ভব নয়। এই সময়ে প্রয়োজন একজন প্রদর্শকের, যিনি প্রাচীন শোণিতে মানুষ অথচ যোগ্য নতুনকেও সমাদর করতে পারেন। আলোচ্য তিনটি গ্রন্থের লেখক সেই রকম একজন প্রদর্শক, যিনি অনিঃশেষ গ্রন্থতীর্থের দর্শনীয় স্থানগুলিতে আমাদের নিয়ে যেতে সক্ষম। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতই শীলভদ্র, সুরুচিশীলিত যাঁর বোধ এবং বন্ধুজনোচিত যাঁর সাহায্য করবার প্রবণতা।

বিখ্যাত ও হঠাৎ-প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত ও অপরিচিত— বিভিন্ন রচয়িতার প্রতিই গ্রন্থকার তাঁর প্রসন্ন অথচ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরেছেন। বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখ্য প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর মন জাগর, উৎসুক। তাঁর আনন্দ আত্মতৃপ্তির ইন্ধনে নয়, সমস্ত পাঠকের সঙ্গে মিলিত রসাস্বাদনে। লেখক এবং পাঠকের মাঝখানে তিনি উভয়ত আতিথেয় সেতুর মতই দাঁড়িয়ে আছেন। পাঠক এবং লেখক— উভয় শিবিরের দাবি-দাওয়া বা চাহিদা-সরবরাহের সমস্যাগুলি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত জাগরূক।

এই ধরণের পরিচিতিমূলক রচনায় একটা আশঙ্কা থেকে যায়। গ্রন্থের অভ্যন্তরে আর প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, শুধু কথঞ্চিৎ রম্য ঔৎসুক্য পাঠকচিত্তে উদ্রেক ক'রেই এ ধরণের রচনার লেখক মনে করেন, দায়িত্ব শেষ হল। কিন্তু আলোচ্য লেখক কথাবস্তু এবং বিন্যাসবিধি দুয়েরই দিকে মনোযোগী। অনুবাদ-সাহিত্যের আপেক্ষিক সুবিধা ও সীমা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ সচেতন। সাধারণত, লেখকদের জীবনের আলোয় তাঁদের রচনার নন্দনতত্ত্ব ও প্রকৃতি তিনি নির্ধারণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কীট্‌সের আলোচনায়, প্রচলিত একটি রীতি অনুযায়ী, জীবন-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উপর জোর দিতে গিয়ে কীট্‌সের রচনার আন্তর গরিমা তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে ব'লে অদীক্ষিত পাঠকের মনে কীট্‌সের জন্য যতটা অনুকম্পা জাগবে সে-অনুপাতে হয়তো কবি কীট্‌সের পরিচয় জানবার জন্য আগ্রহ জেগে উঠবে না। বহির্জীবনের সর্ববিধ উত্তেজনা ও সংক্ষোভের অন্তরালে যে কবি-পুরুষ সমাহিত ও সক্রিয়, তার খবর এখানে আশা করছিলাম। অবশ্য, এ রকম দু-একটি মাত্র দৃষ্টান্ত বাদ দিলে অধিকাংশ রচয়িতাসূত্রেই আলোচ্য লেখকের শিল্প-বিবেক গূঢ়তলচারী এবং সংবেদনশীল।

'গ্রন্থবার্তা'র দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি *Writers at Work* নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে লেখকদের নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞার প্রস্তুতির স্তরটি তুলে ধরবার যে-আয়োজন আছে, এ-তিনখানি বই পড়েও অনুরূপ আস্বাদ পেলাম। শেষ পর্যন্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লেখকদেরই পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং লেখকদের রচনা-রহস্য পাঠকদের কাছে গোচর করার ব্রত নিয়েছেন। এই ব্রতে যে-বৈচিত্র্য ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর রয়েছে, তার জন্য তিনি পাঠকমাত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করবেন। সেই পাঠকদের তালিকায় অন্তর্গত হতে পেরে গৌরব অনুভব করছি।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পুঁথি পরিচয়। দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সংকলিত। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। মূল্য পনেরো টাকা।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি। সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বাংলা পুথির পরিচায়িকা। সম্পাদক আহমদ শরীফ, বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। মূল্য কুড়ি টাকা।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য যেরূপ প্রসিদ্ধি ও গৌরব লাভ করিয়াছে পুরাতন হস্তলিখিত পুথির মূল্য কম না হইলেও ইহার আলোচনা তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে বলা যায় না। লিপিতত্ত্ব মুদ্রাতত্ত্বের মত পুথিতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্বের একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে পরিগণিত হয় নাই। তাই পুথির আলোচনায় তেমন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ এই পুথির মধ্যে দেশের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অমূল্য নিদর্শন সমূহ বিধৃত হইয়া আছে। পুথির সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত দেশের সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া অসম্ভব।

সত্য বটে, পুথিসংগ্রহ ও পুথির বিবরণ সংকলনের কাজ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহু পুথি সংগৃহীত হইয়া নানা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত হইয়াছে। অনেক পুথির বিবরণ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক পুথি অবলম্বনে অপরিচিতপূর্ব অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, কার্য সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর হইতেছে না। পুথি আলোচনার দুইটি প্রধান ক্ষেত্র: প্রথম, পুথি হইতে গ্রন্থের উদ্ধার ও প্রকাশ; দ্বিতীয়, পুথির পরিচয় ও বিবরণ সংকলন। দুই ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্ট আদর্শ বর্তমান আছে—কিন্তু সাধারণতঃ সে আদর্শ অনুসারে কাজ হয় না। অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে অবলম্বিত পুথিগুলি সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা না করিয়া এখান ওখান হইতে কিছু কিছু পাঠান্তর পাদটীকায় সন্নিবেশিত করিলেই কার্য সুসম্পন্ন হইল মনে করা হয়। কোন্ পুথি হইতে পাঠান্তর উদ্ধৃত হইল অনেকে তাহা নির্দেশ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না, পাঠান্তরের গুণাগুণ বিচার ও প্রকৃত পাঠ নিরূপণের চেষ্টা ত দূরের কথা। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার গ্রন্থের পুথিগুলি প্রায়শঃ লিপিকর-প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং জনপ্রিয় গ্রন্থের পুথিসমূহের পরস্পরের মধ্যে মিল অপেক্ষা অমিল বেশি। সুতরাং গ্রন্থের সুষ্ঠু সংস্করণ সম্পাদন অতীব দুরূহ। ফলে সন্তোষজনক সংস্করণ বিরল। পুথির বিবরণ সংকলনের কার্যেও আশানুরূপ আগ্রহ ও পরিশ্রমের পরিচয় অল্পক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। দুই-চারিখানি ছাড়া

বিবরণ-গ্রন্থগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিতে পারে না। বস্তুতঃ বিবরণগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৈশিষ্ট্যহীন—যেন এক ছাঁচে প্রস্তুত। যে কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এইরূপ বিবরণ সংকলন করিতে পারেন— ইহার জন্য কোন বিশেষ গুণের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে থাকে পুথির বাহ্যিক পরিচয় (উপকরণ, পত্রসংখ্যা, পত্রের মাপ, প্রতি পত্রে পঙ্‌ক্তিসংখ্যা, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে অক্ষরসংখ্যা প্রভৃতি)। অন্তরঙ্গ পরিচয়ের মধ্যে পুথির আরম্ভ মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ইহা হইতে পুথির বিষয়বস্তু বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা হয় না। একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুথি হইতে একই ভাবে আরম্ভ ও শেষের অংশ উদ্ধৃত হইলে বিবরণ-গ্রন্থের আকার স্ফীত হইতে পারে কিন্তু পাঠকের তেমন কোনও উপকার হয় না। তবে এইসকল বিবরণ-গ্রন্থ যাঁহারা আলোচনা করেন তেমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়ায় ইহাদের দোষগুণ লইয়া সাধারণতঃ কোন উচ্চবাচ্য করা হয় না। ইহাদের ত্রুটিগুলি গা-সহা হইয়া গিয়াছে। গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা প্রণয়নে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হইতেছে। কিন্তু গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানীরাও পুথির বিবরণ সম্পর্কে উৎসাহযুক্ত মনে হয় না। সুখের বিষয়, সম্প্রতি ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। সংস্কৃত আরবী ফারসী ও পালি পুথির বিবরণ সরকার-নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে সংকলন ও প্রকাশের ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করিতেছেন। সরকারী নিয়মে পুথির বিবরণকে অযথা স্ফীত করিবার সুযোগ থাকিবে না। পুথি সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য স্বতন্ত্র স্তম্ভে সন্নিবেশিত হইবে। কোন পুথি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকিলে তাহা মন্তব্যের ঘরে উল্লিখিত হইবে— পরিশিষ্টে দরকারমত পুথির অংশ উদ্ধৃত হইবে এবং ভূমিকায় পুথিগুলির মূল্যবিচার ও আনুষঙ্গিক আলোচনা থাকিবে। ইতিপূর্বেও এই পদ্ধতিতে কিছু কিছু বিবরণ সংকলিত হইয়াছে— মামুলি ধরণের বিবরণের মধ্যেও কেহ কেহ বিবৃত পুথিসম্পর্কে নানা তথ্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে পুথির বিবরণের দোষগুলির মত গুণগুলিও পণ্ডিতসমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। ফলে এই ব্যাপারে কোন সুপরিকল্পিত পদ্ধতি এখনও গড়িয়া ওঠে নাই।

এইরূপ বিশৃঙ্খলা ও বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল তাঁহার 'পুঁথিপরিচয়ে' একটি কথঞ্চিৎ নবীন পদ্ধতির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি তালিকাভুক্ত সমস্ত পুথির বিবরণ না দিয়া নির্বাচিত কতকগুলি পুথির বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন এবং ভূমিকায় পুথিগুলির নানা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার বিবরণেও পুথি হইতে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে— অনেক ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুথির সম্পূর্ণ অংশই উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে পুথির বর্ণনীয় বিষয়ের পূর্ণ পরিচয় বা বর্ণনীয় পুথি নির্বাচনের হেতু স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হয় নাই। পদমেরু নামক বৃহৎ পদসংগ্রহগ্রন্থের পুথিতে এবং বহু বিচ্ছিন্ন পত্রে প্রাপ্ত পদের যে সূচী এই বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা পদাবলী লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের যথেষ্ট কাজে লাগিবে। কোনও বিষয় লইয়া বিশেষ আলোচনা যাঁহারা করিতে চান পুথির বিবরণ এইরূপ ভাবে তাঁহাদের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিতে পারিলেই বিবরণ সংকলন সার্থক হয়। পুথির প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করাই বিবরণ-সংকলয়িতার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। আদর্শ বিবরণ প্রস্তুত করিতে হইলে পুথি পড়িয়া তাহার বিষয়বস্তুর পরিচয় দিতে হইবে— অন্য পুথির, বিশেষ করিয়া মুদ্রিত বিবরণ বা সংস্করণের সহিত আলোচ্য পুথির মিল-অমিল দেখাইয়া দিতে হইবে। পুথির বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা জানিতে পারিলেই গবেষক ঠিক করিতে পারেন ইহা তাঁহার কাজে লাগিবে কি লাগিবে না। অন্যথা কোন গ্রন্থের সমস্ত পুথি আলোচনা করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

পুথির বিবরণ যিনি সংকলন করিবেন তাঁহাকে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ পুথির চর্চাতেই একদল পণ্ডিতকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে— অবসরমত এ কাজ করিলে চলিবে না। বিভিন্ন সংগ্রহে অজস্র পুথি রহিয়াছে যাহাদের কোনও বিবরণ এখন পর্যন্ত সংকলিত হয় নাই— যাহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এমন পুথির সংখ্যা কম নহে যেগুলির যথোচিত অনুশীলন হয় নাই। ভবিষ্যতে কোনও পণ্ডিত দরকারমত এগুলির আলোচনা করিবেন এই আশায় এগুলিকে অনালোচিত বা অর্ধালোচিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিলে কালের কঠোর বিধানে ইহারা আংশিকভাবেও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, যথাসম্ভব সত্বর পুথিগুলি পর্যালোচনার সুব্যবস্থা হইলে দেশের ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ উপকরণ উদ্‌ঘাটিত হইবে। যে বিষয়ের পুথি কেবল সেই বিষয়ের তথ্যই যে পুথির মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করিলে উহার মধ্য হইতে নানা প্রয়োজনীয় বিষয় আবিষ্কৃত হইতে পারে। গ্রন্থের মূল্য যাহাই হউক-না কেন এই সমস্ত তথ্যের মূল্য অবিসংবাদিত। দুই-একটি উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্যটি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থের পুথিতে গ্রন্থকার গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের উপসংহারে পৃষ্ঠপোষকের ও তাঁহার পূর্বপুরুষদের বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণশ্লোকগুলি একত্র করিয়া পৃষ্ঠপোষক রাজার সুন্দর বংশপ্রশস্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিকের নিকট এই প্রশস্তির মূল্য আছে। আবার বিভিন্ন গ্রন্থের পুথির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার ও তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করাও সম্ভবপর হইয়াছে। পুথির উপকরণ, লিপি, লিপিকর, লিপিকাল, লেখনশৈলী, পুথির মালিক প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পুথির আলোচনা হইতে পাওয়া যাইতে পারে দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক্ হইতে তাহাদেরও মূল্য কম নহে। আলোচ্য বিবরণ-গ্রন্থ দুইখানির মধ্যে এইরূপ অনেক তথ্য ছড়ান রহিয়াছে। সম্পাদকগণ সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন নাই। আমি এখানে এইরূপ কিছু কিছু তথ্যের সন্ধান দিতেছি।

তালপাতায় লেখা বাংলা ভাষার পুথি বিরল। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় এরূপ কোন পুথি চোখে পড়ে নাই। এসিয়াটিক সোসাইটিতে কালিকামঙ্গল ও ভক্তিপ্রদীপ নামে দুইখানি গ্রন্থের দুইখানি তালপাতায় লিখিত পুথি আছে। চণ্ডীমঙ্গলের একখানি তালপাতার পুথির উল্লেখ পুঁথিপরিচয়ে ( পৃ ৯২ ) পাওয়া যায়। বাংলা পুথিতে নকলের তারিখ হিসাবে অনেকগুলি অব্দের উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষ বিবরণ জানা না গেলেও এগুলি একত্র সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন আছে। পুঁথিপরিচয়ে উল্লিখিত অব্দের মধ্যে অম্‌লি ( পৃ ২৬৫, ২৮৭, ৩৩৪ ) ও এইতি সন ( পৃ ১৫৪ ) স্বল্প-পরিচিত। বিলায়তি বা আম্‌লি সনের প্রচলন উড়িষ্যায় আছে। দুইখানি পুথির শেষে দুইটি কৌতুককর নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বিরাট্ পর্বের একখানি পুথির লেখক পুথিখানিকে গোপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] কবিচন্দ্র-রচিত শিবরামের যুদ্ধের পুথিতে অনুরূপ নির্দেশ দেখা যায়—

'এই পুস্তক যিনি ছাপা করিবে তাহাকে ইষ্টদেবের দিব্য'—পুঁথিপরিচয়, পৃ ৩৬২।

---

১ কিন্তু কেহ গোপনিয় না করেন। তথাহি শাস্ত্রবাক্য।

লিখিতং বহুযত্নেন যদ্ গোপয়তি পুস্তকম্।
মাতা তস্য ভবেদ্ গর্ধী পিতা তস্য [চ] শূকরঃ।—পুঁথিপরিচয়, পৃ ২৮৯

এইরূপ নিষেধ অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

পুথির শেষে লিপিকরেরা নিজেদের ত্রুটি স্বীকার, পুথি-চুরি নিষেধ প্রভৃতি বিষয়ে যে-সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই সংস্কৃতের অনুবাদ ( পুঁথিপরিচয়, পৃ ২৯, ২৫৬ ) বা সংস্কৃত উক্তির অনুরূপ ( পুঁথিপরিচয়, পৃ ৩২৯ )। নূতন কথাও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় ( পুঁথিপরিচয়, পৃ ২৬২, ২৭৬, ২৮৫ )। বিকৃত সংস্কৃতে লেখা একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—

হস্তী বিচলিতপাদানাং জিহ্বা বিচলিত পণ্ডিত ( পৃ ২৬২, ২৮৫ )
হস্তী টলতি পাদেন জিহ্বা টলতি পণ্ডিত ( পৃ ২৭৬ )[১]

কোন কোন পুথিতে পুথির মূল্য সম্বন্ধে কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। ১২৪৪ সালে নকল করা ৪২ পত্রের একখানি দণ্ডীপর্বের পুথির দক্ষিণা আট আনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ( পৃ ১২৭ )। পুথির মালিকদের মধ্যে উড়িষ্যার খুরদার গৌরহরি দত্তের নাম করা যাইতে পারে। তিনি ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের পুথির নকল করাইয়াছিলেন। দত্তমহাশয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন বলিয়া মনে হয় ( পৃঃ ১০৩, ২৭২, ২৮৭-২৮৮, ২৮৯, ২৯২, ২৯৪, ৩৩১ )। পুথি নকল করিবার সময় লিপিকরেরা সমসাময়িক নানা ব্যাপারের কথা পুথিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। একখানি পুথিতে কাশী, নদীয়া ও উড়িষ্যার পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বশতঃ দুই দিনে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হইবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে ( পৃ ২৮৭ ):

'এই সম্বৎসরে দো আশ্বিনি হৈবাতে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব কাশী ও নদিয়ার পণ্ডিতদের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সকলে কার্তিক মাসে পূজা করিলেন। উড়িষ্যাদেশে শ্রীশ্রীজগন্নাথজির শ্রীমন্দিরে শ্রীবিমলা ঠাকুরানের পূজা দো আশ্বিনির বিধান না মানিয়া পূর্বানুসারে আশ্বিন মাসে ১৬ দিন পূজা করিয়া দশেরা করিলেন।'

আবদুল করিম সাহেবের পুথির বিবরণে এ জাতীয় যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাহাদের কয়েকটি উল্লেখ করা যাইতেছে।—

ইহাতে বর্ণিত পুথিগুলির ভাষা বাংলা হইলেও অক্ষর অনেক স্থলে আরবী ( পৃ ১২৪, ১২৫, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ২৪৪, ৩১৫, ৪৩৬, ৫৩৮, ৫৬৭, ৫৮০ )। পুথিগুলির রচয়িতা ও মালিক মুসলমান— বিষয়বস্তুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি। তবে ইহাদের লিপিকরের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুর সন্ধান পাওয়া যায়। দজ্জালনামার লিপিকর রামচন্দ্র গুহদাস ( পৃ ২৩৩ )। পেশাদার লিপিকর বলিয়া উল্লিখিত কালিদাস নন্দীও একাধিক পুথির নকল করিয়াছিলেন ( পৃ ৭৭, ৭৮, ২২৪, ৩৮০, ৪২১, ৫৩৬ )। হিন্দুসাহিত্যিকগণ যেমন সম্পন্ন মুসলমানদের নিকট হইতে সাহিত্যরচনায় প্রেরণা লাভ করিতেন, মুসলমান সাহিত্যিকগণও সেইরূপ হিন্দু জমিদারদের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিতেন। এই বিবরণ-গ্রন্থে বর্ণিত দুইখানি পুথিতে (পৃ ৯৮,১৭০) তাহার প্রমাণ আছে। মোহাম্মদ নওয়াজিম খান বালীগ্রামের জমিদার বংশের আদিপুরুষ বৈদ্যনাথ রায়ের আদেশে গুলে বকাওলি গ্রন্থ রচনা করেন। জমিদার ত্রাহিরাম চৌধুরীর আদেশে মোহাম্মদ লাকি কর্তৃক তুতিনামা রচিত হয়। প্রধানতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত এই পুথিগুলিতে মঘী সন ও ত্রিপুরাব্দের বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। হিজরা, বঙ্গাব্দ ও শকাব্দেরও কিছু কিছু ব্যবহার আছে।

করিম সাহেব সংকলিত বিবরণ-গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার বিষয়বস্তু। মধ্যযুগের বাংলা মুসলিম সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে এই বিবরণে বর্ণিত পুথিগুলি বিশেষ মূল্যবান্। বাংলার, বিশেষ করিয়া

১ এরূপ কোন কথা সংস্কৃত পুথিতে চোখে পড়ে নাই।

বাংলার মুসলমান সমাজের, সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনার পক্ষে এই জাতীয় পুথির অনুশীলন অপরিহার্য। পুথিচর্চার দিক হইতেও ইহাদের নানা বৈচিত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। বাংলা পুথির অনুশীলনে করিম সাহেবের কৃত কার্য সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত দুইখণ্ড বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রাচীনতম বিবরণ-গ্রন্থ। পরলোকগত প্রাচীন সাহিত্যরসিকের জীবনব্যাপী সাধনার ফলস্বরূপ এই মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও পুথি লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকার পাকিস্তান এসিয়াটিক সোসাইটি এই গ্রন্থের এক ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অনুসন্ধিৎসু অবাঙালি পাঠকের নিকটও ইহাকে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থখানির দুই-একটি ত্রুটির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুথিগুলি অবলম্বনে বাংলার মুসলিম সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভূমিকায় সংযোজিত হইলে এবং পুথিগুলি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত না হইয়া বিষয়ানুক্রমে সজ্জিত হইলে আলোচনার অনেক সুবিধা হইত।

বাংলা পুথিচর্চার ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থ দুইখানির বৈশিষ্ট্য ও মূল্য যথেষ্ট। বাংলা পুথির দুইটি বিশিষ্ট সংগ্রহের আংশিক পরিচয় ইহাদের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহাদের পুথির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান্ সংগ্রহ দুইটির পরিচয় নানা ভাবে পণ্ডিতমহলে প্রচারিত হইয়াছে— ইহাদের কিছু কিছু বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। ছোটখাট অন্যান্য যে সমস্ত সংগ্রহ পশ্চিম-বাংলা ও পূর্ব-পাকিস্তানের নানা প্রান্তে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিবিশেষের ঘরে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে উপযুক্ত অর্থ ও কর্মীর অভাবে তাহাদের সংরক্ষণ ও বিবরণসংকলনের সুব্যবস্থা না হওয়ায় অমূল্য তথ্যের আধার অনেক পুথি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভারত সরকার সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পুথির বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন— বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথিগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট রক্ষিত প্রাদেশিক ভাষার পুথিগুলির একটা ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সরকারের অবশ্যকর্তব্য কর্ম বলিয়া মনে হয়। প্রাদেশিক পুরাতত্ত্ব পর্যালোচনার সরকারী ব্যবস্থা হইয়াছে— প্রাচীন দলিলপত্র অনুশীলনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পুথিসম্পর্কে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। পুথিপত্র কোথায় কিভাবে রক্ষিত আছে তাহার বিবরণ-সংকলন এবং পুথিগুলির আলোচনার সুবিধার জন্য যথাসম্ভব তাহাদের একত্র সংগ্রহ করা প্রথম কর্তব্য। যে পুথিগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে— সংগৃহীত পুথিগুলির যথোচিত আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শতাধিক বৎসর পূর্বে সমগ্র দেশে মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুথির অনুসন্ধানে এইরূপে কার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। আজ সেই কার্যের হিসাবনিকাশ করা এবং অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্ত করার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার পুথিগুলির কথাও মনে রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ জলবায়ুর অমোঘ প্রভাবে ও উপযুক্ত যত্নের অভাবে দ্রুত ক্ষয়োন্মুখ পুথিগুলি সম্পর্কে অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে দেশের এই অমূল্য সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমাদের গুরু দায়িত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

## জাপানের চিঠি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ১

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সমর, আমার চিঠিপত্র পথের মধ্যে আটকা পড়ে বলে এবার লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলুম। এণ্ড্রুজের হাতে এইগুলি দিচ্চি, আশা করি অক্ষতভাবে পাবে। জাপানটা ভাল করেই দেখেচি। তার কারণ এরা আমাকে এদের ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়েচে। হঠাৎ বাইরের লোকের এতটা সুবিধে ঘটে না। এদের অনেক ভাল জিনিস দেখেচি। সব চেয়ে এদের সত্য এবং দেশব্যাপী হচ্চে এদের আর্ট। সে আর্ট একটা দিকে চূড়ান্ত সীমায় গেছে কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে এদের আর্টের একটা অভাব আছে, এরা মানব-হৃদয়ের গভীরতাকে স্পর্শ করেনি— এরা প্রকৃতিকে নিয়ে চূড়োন্ত করেচে। তোমাদের আর্টের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের একটা আকূতি প্রকাশ পায় সেইজন্যে তাকে লাইনের স্পষ্টতার চেয়ে রঙের আভাসের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে হয়েছে। আমি ভেবে দেখেচি এইটেই ভারতবর্ষের দিক। ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালবাসে— জাপানের আর্টে কালা-গোরার মিলনই প্রধান— এদের কাপড়ে চোপড়েও তাই। ভারতবর্ষের আর্ট যদি পূরো জোরে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এগোতে পারে তাহলে গভীরতায় এবং ভাবব্যঞ্জনায় তার কাছে কেউ লাগ্‌বে না। কিন্তু দরকার হচ্ছে ওর মধ্যে জীবনের জোর পৌঁছনো— যাতে ও খুব ফলাও হয়ে উঠতে পারে। এখন যেন কতকটা কেয়ারি করা ছোট ছোট ফুলগাছের বাগানের মত ওর চেহারা— বনস্পতির অরণ্য চাই যেখানে ক্ষণে ক্ষণে ঝড়ের রুদ্রবীণা বাজে। আমার বোধহয় আয়তন নিতান্ত ছোটো করলে ভাবের পরিমাণও ছোট হয়ে আসে। যাই হোক্ জাপানী আর্টের যতই বাহাদুরি থাক্ ওর পূর্ণতার সীমায় এসে ও পৌঁচেছে। কিন্তু আমাদের আর্টিষ্টের তুলির সামনে অসীম ক্ষেত্র দেখতে পাচ্চি। সরস্বতী চীন জাপানের কাছে উদ্যানের দরজা খুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তাঁর অন্তঃপুরের দরজা খুলচে— এখানে রসের ভোজ। কিন্তু আমাদের এই রংমহালের কারখানা জাপানীরা একেবারে বুঝতেই পারে না— অথচ আমরা ওদের শিল্পকলার ভিতরকার মাহাত্ম্য বেশ বুঝতে পারি। এর থেকে মনে হচ্চে জাপানী চিত্রকলার অতিপরিণতিই ওর পক্ষে বোঝা হয়ে উঠেচে— এখন ও আর চলবে না, পথের পাশে বসে পুনরাবৃত্তি করবে কিম্বা বিলিতি ছবির নকল করতে লাগবে।

এখানকার একজন চিত্রকর নভেম্বর মাসে তোমাদের ওখানে যাবে তাকে দিয়ে তোমাদের ছেলেদের পাকা হাতে তুলির টান টান্‌তে অভ্যাস করিয়ো।— তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

রবিকাকা

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত ২

ওঁ

সুর,

প্রশান্ত সাগরের পূর্ব্ব ঘাট থেকে পশ্চিমঘাটে পাড়ি দিতে চল্লুম। এণ্ড্রুজ ফিরচে তার কাছে সব খবর পাবি। বক্তৃতার আয়োজন একরকম শেষ করেচি। আমেরিকার জন্যে চারটে বক্তৃতা লিখেচি— :

কাছে তার কপি পাঠালুম। এইগুলোর একটা না একটা সহরে সহরে বারবার আউড়ে যেতে হবে। The Nation বলে যেটা লিখেছি সেইটেই সব চেয়ে বেশিবার বল্‌ব— তা ছাড়া নাটক এবং গল্পর reading দিতে পারব। আর্থিক হিসেবে মন্দ হবে না কিন্তু কেবল অর্থ নয়, অনর্থের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে। আমি থাকৃতে থাকৃতে তোরা যদি কেউ জাপানে আস্‌তে পারতিস তাহলে অনেক জিনিস দেখ্‌তে পেতিস। সেদিন ওকাকুরার বাড়িতে গিয়েছিলুম, সে জায়গাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ওকাকুরাকে তার দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারেনি। সেটাতে এদের অগভীরতা প্রকাশ পায়। কেননা অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে দেখলুম ওকাকুরার মত কারো প্রতিভা দেখতে পাইনি। বুদ্ধির দিকে এরা খুবই কাঁচা, এদের হাতের মধ্যেই সমস্ত মগজ। এদের হাত এবং আঙুল দেখতে ভারি চমৎকার। এখান থেকে যদি গুটিকতক জাপানী দাসী নিয়ে যেতে পারতুম তা হলে দেখ্‌তে পেতিস এরা কাজ কিরকম সুন্দর করে করতে পারে এবং এরা কিরকম আশ্চর্য্য সেবা করতে জানে।— জীবনস্মৃতির তর্জ্জমা ত প্রায় শেষ হয়ে এল। আমেরিকার ম্যাকমিলানরা এটা ছাপাতে প্রস্তুত আছে। এটা হয়ে গেলে আস্‌চে বছরের মডার্ণ রিভিয়ুর জন্যে "ঘরে বাইরে"টা যদি তর্জ্জমা করিস তাহলে মন্দ হয় না। কেননা ওটা সমস্ত ভারতবর্ষের জন্যে লেখা। আমেরিকায় লেকচারের কাজে অন্তত আমার প্রায় ছ মাস কাটবে। য়ুনাইটেড ষ্টেট্‌সের প্রত্যেক বড় সহরেই আমাকে ঘুরতে হবে। এই উপলক্ষ্যে তোরা কেউ যদি আস্‌তে পারতিস তাহলে বেশ হত। কিন্তু তোরা ত সকলেই কাজে লেগে গেচিস্। রথীর কাজ কিরকম জম্‌চে কে জানে। যাই হোক পিয়ার্সনকে সঙ্গী পেয়ে আমার খুব সুবিধে হয়েচে— সকল রকমে আমার যত্ন ও সেবা করতে ও কিছুমাত্র ত্রুটি করে না।

তোদের সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি ১১ ভাদ্র ১৩২৩

রবিকাকা

১৯১৬ সালে জাপান-ভ্রমণকালে লিখিত পত্র। মূল পত্র শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

রবীন্দ্রনাথ

জাপান নারী-মহাবিদ্যালয়ে । ২৯ অগস্ট ১৯১৬

'সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য'

সম্মুখে উপবিষ্ট ॥ দক্ষিণ হইতে : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
দণ্ডায়মান ॥ দক্ষিণ হইতে : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯১২ সালে বিলাতযাত্রার প্রাক্‌কালে গৃহীত ফটোগ্রাফ । শ্রীমণীন্দ্রমোহন বাগচীর সৌজন্যে

# পত্রাবলী

## সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত

১

৪৬, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
২০শে ভাদ্র ১৩১৯

পূজ্যবরেষু—

চারু ও মণিলালের চিঠিতে আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ পাইয়াছি। আনন্দে মনে মনে প্রণাম করিয়াছি; কিন্তু চিঠি লিখি নাই। কারণ, বিলাতের অতিব্যস্ত জীবনের মধ্যে, correspondenceএর বোঝা বাড়াইয়া, আপনাকে আর অধিক ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় নাই।

আজ আমার নূতন প্রকাশিত "কুহু ও কেকা" এবং "জন্মদুঃখী" পাঠাইলাম, এবং সেই ছুতায় আপনাকে চিঠি লিখিয়া ধন্য হইলাম।

বাংলার কবির বিলাতে সংবর্দ্ধনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু উহা এতই সংক্ষিপ্ত যে উহাতে তৃপ্তি হয় নাই। সে যাহা হোক্, কবির দিগ্বিজয় জগতের ইতিহাসে, বোধ হয়, একেবারে নূতন জিনিস। কিন্তু প্রতিভার এই প্রাপ্য পূজায় বিস্মিত হইবার বড় বেশী কিছু নাই। আমি জানিতাম, যে, আপনার কবিতার অমৃত আস্বাদ যে পাইবে, সেই আপনার বিশ্বজনীনতায় অপূর্ব্ব সুরে মুগ্ধ হইবে। তা' সে ইংলণ্ডের লোকই হোক আর ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডেরই হোক্।

"জগৎ-কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব্ব,
বাঙালী আজি গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব্ব;
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি' লইবে মানি'
হে গুণী! তব প্রতিভাগুণে জগৎ-কবি সর্ব্ব।"

আপনার সম্মানে দেশের সকলেই সম্মানিত অনুভব করিতেছে। কেহ বলিতেছে, এই ব্যাপারে বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, বাঙালী নূতন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছে, আমাদের কবি-সংবর্দ্ধনার তরঙ্গ বিলাত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; আবার কেহ বলিতেছে, মহম্মদ মক্কার চেয়ে মদিনায় গিয়া বেশী সম্মানিত হইয়াছেন। এ সব বাহিরের কথা। এ ছাড়া, আমাদের পাঁচ সাত জনের ব্যক্তিগত একটি পরম লাভ হইয়াছে। আমরাও যে প্রকৃত সাহিত্যরসের আস্বাদ জানি এবং কবি ও অকবির প্রভেদ বুঝিতে পারি, তাহা ইংলণ্ডের সাহিত্যরসিকেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

Yeats, ··· Rothenstein প্রভৃতির আপনার কবিতার উপর ভক্তির কথা পড়িয়া অবধি আমার একটি কথা মনে হয়। মনে হয়, যে, গোত্রগত প্রাধান্য এবং কুলদেবতার সঙ্কীর্ণ পূজাবিধি উল্টাইয়া দিয়া, সাম্রাজ্য-সম্ভব সমন্বয় এবং বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ বা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের, বিশ্বজনীন পূজাবিধি, যেমন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করিয়াছিল, তেম্‌নি, cultureএর আধার বড় বড় Idealist বা

কবিরাই বর্ত্তমানযুগের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে, যুগধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে মহামিলনের রাখীস্থত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া দিতেছেন। ইহাতে যে বিশ্বজনীনতার স্থত্রপাত হইতেছে তাহার তুলনায় বুদ্ধ, খ্রীষ্ট বা মহম্মদের এক এক মহাদেশ-ব্যাপী মিলন-সঙ্ঘ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাত্র। হয় তো, আমার এই সিদ্ধান্ত ভুল; তবুও ইহা আপনাকে নিবেদন করিলাম। স্থবিধামত এ সম্বন্ধে একটু লিখিলে আনন্দিত হইব। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন। ইতি

স্নেহার্থী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২

৪৬, মস্‌জিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২০শে কার্ত্তিক ১৩১৯

শ্রীচরণেষু—

আপনার চিঠি দু'খানি যথাসময়ে পৌছেচে। 'কুহু ও কেকা' সম্বন্ধে আপনি যা' লিখেচেন তাতে আমি আপনার স্নেহেরই পরিচয় পেয়েছি। আশীর্ব্বাদের করুণ হস্তের স্পর্শ ই লাভ করেছি। আর আপনার কাছে এও আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হবে, যে, মনে মনে একটু গর্ব্বও অনুভব করেছি। ভাল লিখতে পারি বলে নয়,— বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির স্নেহ লাভ কর্ত্তে পেরেছি বলে।

যখন 'তীর্থসলিল' এবং 'তীর্থরেণু'র জন্যে নানা দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ করছিলুম তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোন ইংরেজী কি সংস্কৃত কবিতা পাই তা' হ'লে সেটিকে অনুবাদ ক'রে আমার বিশ্ব-কবিসভা উজ্জ্বল ক'রে তুলি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় আমার সেই মানসী কবি-সভায় একটি উচ্চতম আসনই শূন্য ফেলে রাখতে হ'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষুণ্ণ বইটার খুঁৎ থেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখছেন; এই সময়ে যদি মৌলিক কোনো কবিতা,—অন্ততঃ Whitmanএর ধরণের গদ্য-কবিতা,— বাংলায় না লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'য়ে পড়ে, তবে সে লেখাটি যেন আমি একবার দেখ্‌তে পাই। তা'হলে আমায় অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর্ত্তে পারব।

কলেজ ছেড়ে পর্য্যন্ত ইংরেজীতে কাউকে চিঠি পর্য্যন্ত লিখিনি, নইলে আর এক রকমেও ঐ সাধটা মিট্‌তে পারত। অন্ততঃ আপনার অমূল্য সময় এবং অনুবাদের শ্রম অনেক পরিমাণে বাঁচিয়ে দিতে পারতুম;—অবশ্য আমার নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও সাধ্যের অনুপাতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, artistic expression আয়ত্ত করা দূরে থাক, ইংরেজী রচনার Idiom পর্য্যন্ত একরকম ভুলেই গেছি। স্থতরাং ইংরেজীতে কাব্যানুবাদের চেষ্টা, এখন আমার পক্ষে বিড়ম্বনা।

সর্বশেষে আমার একটি নিবেদন আছে। য়ুরোপীয়েরা আমাদের আনন্দের অংশী হয়,—আমাদের কবির কাব্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় এতে আমাদের একটুও হিংসা হবে না, বরং আনন্দই হবে। আর সেই অমৃতের আস্বাদ যত বেশী পায় ততই ভাল। কিন্তু আপনার অসুস্থ শরীরের কথাটাও একেবারে ভুললে চলবে না। ইতি

প্রণত

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৩

৪৬, মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
১৯শে ডিসেম্বর ১৯১২

শ্রীচরণেষু—

"গীতাঞ্জলি"র ইংরাজীটি পেয়ে অনুগৃহীত হলুম। Nation, Times ও Atheneumএর সমালোচনাও দেখিচি।

'জলে না নাব্‌লে সাঁতার শেখা যায় না' আমাদের স্বদেশী নেতারা যখনই বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় অধিকারের জন্যে সোরগোল স্থরু করে থাকেন তখনই ঐ কথাটার উপরে বেশী করে জোর দেওয়া হয়ে থাকে। কথাটা, একসময়ে, আমারও খুব ভাল লাগ্‌ত এবং ঠিক বলেই মনে হ'ত। কিন্তু, এখন দেখ্‌ছি, জলে নাবাটাও যেমন দরকারী, যে লোকটা সাঁতার শিখ্‌তে চাইছে তার ব্যক্তিগত শক্তিসামর্থ্যের ওজন বোঝাটাও তেম্‌নি দরকারী।

আমাদের দেশে খবরের কাগজের অভাব নেই, কিন্তু সমঝ্‌দার সমালোচক কই? অবশ্য, সবাই যে Matthew Arnold হ'বে কি Walter Pater হ'বে তা' আশা করা যায় না; Creative Criticism করবার মত প্রতিভা চিরকালই দুর্লভ আছে এবং থাকবে। কিন্তু যেটুকু উচ্চশিক্ষিত লোকদের কাছে স্বভাবতঃ আশা করা যেতে পারে তাই বা কই?

Nation বা Timesএ যাঁরা গীতাঞ্জলির সমালোচনা লিখেছেন তাঁরা কেউ Matthew Arnold নন্, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাঁদের মত লেখকই বা আমাদের দেশে কই? তাঁরা যে কথাটি বল্‌তে চেয়েছেন, তা' বেশ অনায়াসেই পরিষ্কার করে বল্‌তে পেরেছেন, যা' বুঝেচেন তা অপরকেও বোঝাতে সমর্থ হয়েছেন; আমাদের সে সামর্থ্য কই?

আমাদের চেয়ে যে ওঁরা বেশী রসগ্রহণ করেছেন এ কথা আমি সহজে স্বীকার করতে পারি নে; কিন্তু যেটুকু পেয়েছেন সেইটুকুতেই মশ্‌গুল্ হ'য়ে উঠেছেন; সেটুকু একলা ভোগ করেন্ নি, সকলকে বেঁটে দিয়েছেন, এইটেই তাঁদের বিশেষত্ব, এইটেই গৌরব। ওখানকার তুলনায় আমাদের দেশে cultureএর হাওয়া বইছে না বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে ভাবের ব্যাপারীরা···নিজের নিজের পুঁজিটুকু নিয়ে ক্রমাগত নাড়াচাড়া করছে; লেনাদেনা একরকম বন্ধ; কোনো কিছুই ফলাও হ'তে পাচ্ছে না; আড়ৎদার চিরকাল আড়ৎদারই থেকে যাচ্ছে; হৌস্‌ওয়ালা সওদাগর হ'তে পাচ্ছে না। ভারি Depressing.

আপনার শরীর এখন কেমন? ওদিকেও একটু নজর রাখতে হ'বে; এটি আমাদের সকলের অনুরোধ।

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

স্নেহার্থী
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

পুনশ্চ—

এবার মাঘোৎসবে আমরা আপনাকে লাভ করতে পেলুম না। ভারি ফাঁকা বোধ হল।

৪

৭ই পৌষ
১৩২৫

শ্রীচরণেষু—

যেদিন জ্যোতির দীক্ষা
পেলেন পরম পুণ্যবান্
অন্তরের পদ্মদলে
আনন্দের পেলেন সন্ধান
সে অমৃত-সিক্ত দিনে
হে কবি! হে বিশ্বের আহ্লাদ!
পুণ্যহীন যাচে তব
পদধূলি আর আশীর্ব্বাদ।

প্রণত
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রথম তিনখানি পত্র ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাতপ্রবাসকালে লিখিত। এই সময় বিদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যে-সমাদর হইয়াছিল চিঠিগুলিতে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। ২-সংখ্যক পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ যে অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছিল; রবীন্দ্রনাথ 'বিগত ইউরোপ-প্রবাসের সময় ইংরেজীতে একটি মাত্র মৌলিক গান রচনা করিয়াছেন তাহারই অনুবাদ "মণি-মঞ্জুষা"য় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।'— দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, "মণিমঞ্জুষা" ( ১৯১৫ ), পৃ ৯৮, 'একটি গান'।

চতুর্থ পত্র বা কবিতা লিখিত হয় ৭ পৌষে মহর্ষির দীক্ষাদিনের স্মরণে।— মূল পত্রগুলি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত।

## পত্রাবলী

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত**

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কয়েকখানি চিঠি বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে— সেই সূত্রে, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের যে তিনখানি পত্রের এ যাবৎ সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সেগুলিও পুনর্মুদ্রিত হইল। 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ' কবিতা-প্রসঙ্গে লিখিত প্রথম চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা প্রকাশের ( ১৯০৯, ১৩১৬ ) পূর্ববর্তী; রবীন্দ্র-রচনাবলী দশম খণ্ডে ( পৃ. ৩৩৬-৩৭ ) মুদ্রিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চিঠিখানি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ১৯ ডিসেম্বর ১৯১২ তারিখের চিঠির উত্তরে লিখিত অনুমান হয়। ১৩৩৭ চৈত্র সংখ্যা 'বিচিত্রা'য় 'সমালোচনার ধারা' নামে প্রকাশিত হয়। ছন্দ-প্রসঙ্গে লিখিত তৃতীয় পত্র রবীন্দ্র-রচনাবলী একবিংশ খণ্ড ( পৃ. ৪৪১-৪২ ) হইতে গৃহীত।

১

বাহিরে যাহার সার্থকতা, বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে সে তীব্র বেদনা অনুভব করে— বস্তুত এই বেদনাই জানায় যে তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে, ইহাই তাহার গর্ভবেদনা— এবং মৃত্যুবেদনারও নিঃসন্দেহ এই তাৎপর্য্য। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থকতা বাহিরের জগতের সহিত মিলনে— যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই মিলন সম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃত্তিগুলি বহির্ম্মুখী হইয়া না আসে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের মধ্যে নানাপ্রকার পীড়ার সৃষ্টি করে— নিখিলের মধ্যে তাহারা বাহির হইয়া আসিলেই সকল পীড়ার অবসান হয়। অতএব যখন আমরা পীড়া অনুভব করি তখন আমরা যেন না মনে করি এই পীড়াই চরম— ইহা মুক্তির বেদনা— একদিন যাহা বাহিরে আসিবার তাহা বাহিরে আসিবে এবং পীড়া-অবসান হইবে— 'কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে' কবিতাটির ভিতরকার তাৎপর্য্য আমার কাছে এইরূপ মনে হয়। সেইজন্য উহার নাম দিতেছি 'মুমুক্ষু'। নামটা কিছু কড়া গোছের বটে— যদি অন্য কোনো সুশ্রাব্য নাম মনে উদয় হয় তবে চয়নিকার প্রকাশককে জানাইয়া দিয়ো।

২

কল্যাণীয়েষু,

সত্যেন্দ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট। নিতান্ত মুদির দোকানের ব্যাপার। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত। সমালোচনার ভঙ্গী দেখলেই সেটা বোঝা যায়—নিতান্ত গেঁয়ো রকমের। সমালোচকেরা সাহিত্য-কারবারীদের মুচ্ছদি— তাদের নিজের পুঁজি-পাটা থাকা চাই, এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক্তি না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের মূলধন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাগে সেইটুকু। সেটুকুর মূল্য কেবলমাত্র আমার ঘরে পাঁচ-দশ জনের কাছে, কিন্তু বড়বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না— এই দৈন্যটি বোঝবার পর্য্যন্ত শক্তি আমাদের নেই।

তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাঝে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবো না কেন ?— কাব্যকে সাহিত্যকে একটা বিশ্বভূমিকার উপর দাঁড় করিয়ে দেখাও না কেন ? যে কবি সেই ত দ্রষ্টা এবং অন্যকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই। · · প্রভৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে আমার বড় কষ্ট বোধ হয়। এ সমালোচনা ত সাহিত্য-পথের মশাল নয়, এ কেবল চক্‌মকি ঠোকা— ছোট্ট ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ কিন্তু তার খটাখট্‌ শব্দটাই বেশি। এতে কি পথিকদের কোনো সুবিধা হয় ? ইতি ২ মাঘ ১৩১৯।

স্নেহানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩

সত্যেন্দ্র, তুমি যদি 'কই' শব্দের শেষ 'ই'টির মাত্রা বাজেয়াপ্ত করতে চাও তবে অন্যায় হবে না ? আমার দৃষ্টিতে দৈবক্রমে 'কই' কথাটা পদের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাঁক পেয়ে সেই ফাঁকির উপর দিয়ে মাত্রাটা চালিয়েছ কিন্তু যদি "কই শয্যা, কই বস্ত্র" হত তা হলে কী রকম করে এমন অবৈধাচরণ করতে পারতে ? বস্তুত ইকারের পরে ফাঁক নেই— ক-এর অ-টাকে দীর্ঘ ক'রে ই-এর হ্রস্বতা পূরণ করা হয়। সে তো সকল হসন্ত বর্ণের সম্বন্ধেই খাটে— "কোথা জল, কোথা স্থল"— এখানে মাত্রার ওজন যদি দেখ তবে দেখবে 'জ' যত বড় 'ল্‌' তত বড় নয়— সেইজন্যে জ-টাকে দেড়মাত্রা করতে হয়েছে। তোমার বিধি অনুসারে 'জল'কে একমাত্রা করে ফাঁকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেটা সাধু ছন্দের নিয়মবিরুদ্ধ। "সেই ত বহিছে বায়ু", এখানে তুমি 'সেই'-এর 'ই'-টিকে কি বিমাত্র বলে গণ্য করবে।

"When we two parted" কবিতাটির সম্বন্ধে অনেক দ্বিধা আমার মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু শেষকালে অন্য কোনো দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি— আমার অভিপ্রায় এই ছিল, যদি কেবলমাত্র প্রথম লাইনটা পড়া যায় তাহলে সম-অসমমাত্রার ছন্দের লয়টা ইংরেজের কানে পরিচিত হতে পারে— মনে কর যদি এমন হত—

When we two parted<br>
Silence and tears

তাহলে তো ছন্দভঙ্গ হত না— এমন অবস্থায় 'In' টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত ছন্দের মধ্যে ফাল্‌তো অংশের লক্ষণই এই যে, সেটাকে বাদ দিলে মূল ছন্দের তাল কাটে না— ও জিনিসটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়ে, আসনে ওর স্থান নেই। তথাপি আমার প্রবন্ধটার মধ্যে একটু বদল করে দেওয়া গেল— কিন্তু আমার বোধ হয় যে সেটা অনাবশ্যক।

কাউণ্ট লিও টলস্টয়

১৮২৮ - ১৯১০

## টলস্টয় ১৮২৮-১৯১০

টলস্টয়ের কাছে সাহিত্যসৃষ্টি ছিল গৌণ। মুখ্য ছিল সত্য কথা বলা ও সত্যভাবে বাঁচা। মিথ্যাকে তিনি বিষম ঘৃণা করতেন। যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে। শেষবয়সে এটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। শুচিবাতিকের মতো সত্যবাতিক।

এর সূচনা প্রথম বয়সেই। উনিশ বছর বয়সে যখন তিনি ডায়েরি লিখতে আরম্ভ করেন তখন তিনি মনে মনে সংকল্প করেন যে লেখনীর মুখে সত্য বলবেন। পূর্ণ সত্য। সত্য ব্যতীত আর কিছু নয়। সাক্ষীরা যেমন ধর্মাধিকরণে দাঁড়িয়ে শপথ নেয়। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞাও এত কঠোর ছিল না। সত্য বলা একরকম চলে, কিন্তু পূর্ণ সত্য বলা আদৌ নিরাপদ নয়। সত্য ভিন্ন আর কিছু না বললে বড় বড় ব্যাপারে মৌন থেকে যেতে হয়।

ডায়েরিতে তিনি প্রাণ খুলে যা লিখেছিলেন তা প্রকাশের জন্যে নয়। এমন কি দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির চোখে পড়বার জন্যেও নয়। তখনো তিনি জানতেন না যে পরে একদিন তিনি সাহিত্যিক হবেন বা বিয়ে করবেন বা তাঁর ডায়েরি স্ত্রীকে পড়তে দেবেন বা জগৎকে দেখতে দেবেন। জানলে হয়তো তাঁর হাত বেঁকে যেত। সত্য লিখলেও পূর্ণ সত্য লিখতেন না। সত্য ভিন্ন আর কিছু না লিখলে লেখা বন্ধ হয়ে যেত। একেই বলে অজ্ঞতা হচ্ছে আশীর্বাদ।

লিখতে লিখতে ক্রমে হাত খুলে যায়। বুঝতে পারেন যে তাঁর লেখার হাত আছে। তাঁর পিসিমা তাতিয়ানাও তাঁকে উৎসাহ দেন এই বলে যে, তাঁর যেমন কল্পনার দৌড়, কেন যে তিনি উপন্যাস লেখেন না এটা আশ্চর্য। কিন্তু হাজার লিপিকুশলতা ও কল্পনাশক্তি থাকলেও মহান লেখক তিনি হতেন না। তেমন প্রতিভাও তাঁর ছিল না। হলেন তা হলে কোন্ মন্ত্রবলে? সত্যভাষণের সাধনাবলে। সত্যভাষণ হল এমন এক ডিসিপ্লিন যার কল্যাণে ক্ষুদ্রও মহান হতে পারে। তবে মহান শিল্পী হবে কি না নির্ভর করছে আরো একটা উপাদানের উপরে। কেউ যদি অসার জীবন যাপন করে তবে তার সেই অসার উপলব্ধি দিয়ে মহান সৃষ্টি হবে কী করে, লিখলই বা সে প্রাণ খুলে সত্য কথা, পুরো সত্য কথা, সত্য ভিন্ন আর কোনো কথা নয়।

সার অভিজ্ঞতার উপরে টলস্টয়ের প্রখর দৃষ্টি ছিল। পাঁকে ডুবে থাকলেও পঙ্কজকে তিনি ভোলেন নি। সত্যকে তিনি কোথায় না অন্বেষণ করেছেন! অস্থানে কুস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আরণ্যকদের মধ্যে, অভিজাত মহলে, কৃষক-সংসর্গে, বন্যপ্রাণী-মৃগয়ায়, বেদে-বেদেনীদের সান্নিধ্যে। লিখতে বসে সব অভিজ্ঞতাই তাঁর কাজে লেগে গেল। কিন্তু যার জন্যে তিনি টলস্টয় তা হচ্ছে যুদ্ধের ভিতরকার সার সত্যকে মোহমুক্ত ভাবে দেখা ও দেখানো। তাকে রোমান্টিক করতে গিয়ে অসত্য করে না তোলা। যুদ্ধবিষয়ক রিপোর্টে বা রচনায় কেউ সত্য কথা লেখে না। ঘটনা ঘটে যাবার পর রটনায় পল্লবিত হয়। ঐতিহাসিকরাও সেই রটনার নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ করতে জানেন না। সত্য এমন লজ্জাকর বা জঘন্য যে তাকে ইচ্ছা করে বিকৃত করা হয়। পরম কাপুরুষও পরম বীর বলে পরিচিত হয়। ঘোড়া হয়তো প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, বীর ভাবছেন

তিনিই তাকে রাশ ধরে চালাচ্ছেন। ঘটনা হয়তো আপনি ঘটে যাচ্ছে। সেনাপতি ভাবছেন তাঁর আদেশে ঘটছে। গৌরবের জন্যে বানানো গল্পও সত্য বলে প্রচলিত হয়। টলস্টয় এই চক্রান্ত ফাঁস করে দেন।

"সমর ও শান্তি" লিখে টলস্টয় বহুলোকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বছর পাঁচেক লাগল ও-বই লিখে শেষ করতে ও আরো বছর দশেক স্বদেশের স্বীকৃতি পেতে। এর পরে তিনি যা নিয়ে লেখেন সেও এক বিপজ্জনক বিষয়। নরনারীর সাজানো সংসারে স্বতঃস্ফূর্ত অদম্য প্যাশন। যতক্ষণ নীতির সীমার মধ্যে থাকে। যখন সীমার বাইরে চলে যায়। "আনা কারেনিনা" তখনকার দিনে এক দুঃসাহসিক কীর্তি। টলস্টয় যাকে নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ মনে করেছিলেন একালের বিদগ্ধ পাঠক তাকে বলবেন সংস্কার সংসার ও সমাজবিধির সঙ্গে সংঘাত। আনা এমন কোনো চিরন্তন মহাপাতক করেনি যার জন্যে অত বড় একটা শাস্তিই ছিল তার নিয়তি। তা সত্ত্বেও তার কাহিনীতে নিত্যকালের ট্র্যাজেডির উপাদান, ছিল। প্রেমিকের একনিষ্ঠতায় সন্দেহ। তাই ও-বই শিল্পলক্ষ্যভ্রষ্ট নীতিগ্রন্থ হয় নি। অপর পক্ষে নীতিনিরপেক্ষ বাস্তববাদী চিত্রকর্মও নয়। সত্যের অন্বেষক অত সহজে সন্তুষ্ট হতে পারেন না। এইখানে সমসাময়িক ফরাসী কথাশিল্পীদের সঙ্গে তাঁর প্রতিতুলনা। পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গেও।

তাঁর ওই দুখানি মহা-উপন্যাস মহাকাব্যজাতীয়। বলা যেতে পারে একালের মহাভারত ও রামায়ণ। অবশ্য অন্যপ্রকার। মানুষের জীবনে নিয়তির হাতই তিনি লক্ষ্য করেছেন। তাই মানুষকে ক্ষমাযোগ্য করেছেন। এক নেপোলিয়ন বাদে অমার্জনীয় কেউ নয়। যারা নিজের মতো করে বাঁচতে চায়, অথচ নিয়তির দ্বারা চালিত হয় তাদের প্রতি তাঁর অপার করুণা। কিন্তু মন্দ মানুষকে বা মন্দকারীকে ভালোবাসেন বলে তিনি মন্দকে ভালো বলেন না। মন্দত্বের প্রতি তাঁর লেশমাত্র সহানুভূতি নেই। এইখানেও তাঁর সঙ্গে তাঁর বাস্তববাদী সহযোগী ও পরবর্তীদের প্রতিতুলনা। ভালো আর মন্দকে তিনি যেমন শাদা আর কালোর মতো স্বতোবিরুদ্ধ মনে করতেন একালের বিদগ্ধ সাহিত্যিকরা তেমন মনে করেন না। বহুক্ষেত্রে ভালোমন্দ একাকার বা অনুপস্থিত। সত্য অনেক সময় ভালোমন্দের অতীত। সত্য শুধুমাত্র সত্য। ভালোও নয়, মন্দও নয়। সর্ববিশেষণবর্জিত।

গোড়াতেই বলেছি যে সাহিত্যসৃষ্টি টলস্টয়ের কাছে গৌণ ছিল। ইংরেজরা যেমন বাণিজ্য করতে এসে সাম্রাজ্য লাভ করে তিনিও তেমনি ডায়েরি লিখতে গিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। বছর পঞ্চাশ বয়সে কীর্তির ও যশের ও বিত্তের শিখরে উঠে কোথায় তিনি আনন্দ করবেন, তা নয়। চাইলেন সত্যভাবে বাঁচতে। জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করতে। প্রথমে তাঁর আপনার। পরে তাঁর স্বদেশের ও স্বকালের। জীবনজিজ্ঞাসা বরাবর তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। অল্প বয়স থেকেই তিনি জীবন মৃত্যু, ইহকাল পরকাল, ঈশ্বর ও অমরত্ব নিয়ে চিন্তাকুল। বাণপ্রস্থের বয়স যখন হল তখন তিনি সাহিত্যসৃষ্টি ছেড়ে পরমার্থে মন দিলেন। সাহিত্যের দিক থেকে এটা মস্ত বড় একটা লোকসান। কি রাশিয়ায় কি অন্য দেশের কথাশিল্পে "আনা কারেনিনা-র পরে আর ক্লাসিক লেখা হল না। হতে পারত যদি টলস্টয় মন খোলা রাখতেন। কিন্তু মনটা হল তাঁর দায়বদ্ধ। আত্মোদ্ধারের দায়। মানব উদ্ধারের দায়। সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে হিংসার হাত থেকে, অসত্যের হাত থেকে। তার জন্যে সত্যভাবে বাঁচতে হবে।

বিশেষ করে রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে বিপ্লবের হাত থেকে, যুদ্ধের হাত থেকে। এমনি গভীর ছিল তাঁর ইতিহাসদৃষ্টি যে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বিপ্লব আসছে, যুদ্ধ আসছে।

বাইবেলে আছে পয়গম্বর নূ (Noah) আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন যে মহাপ্লাবন আসছে, সৃষ্টি লুপ্ত হবে। তাঁর স্ত্রীকে সে কথা বলায় ভদ্রমহিলা বিশ্বাসই করলেন না। টলস্টয়ের পরিবারেও সেই পুরাণবর্ণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হল। টলস্টয় উঠে-পড়ে লেগে গেলেন জীবনযাত্রার ধরনধারন বদলাতে ও শোধরাতে। যাদের পিঠে চড়ে বসেছেন তাদের পিঠ থেকে নামতে। চাষীদের সঙ্গে একাত্ম হতে। তাদেরই একজন বনে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কে একজন গান্ধী পর্যন্ত তাঁর কথা শুনে তাঁর অনুসরণ করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের গৃহিণীর কানে একটি কথাও গেল না। যুদ্ধ আর বিপ্লব দুই দেখতে বেঁচে রউলেন কাউণ্টেস। টলস্টয় বেঁচে গেলেন তার আগে মরে।

যুদ্ধ আর বিপ্লবের মতো মৃত্যু ছিল তাঁর আর-এক ধ্যান। সত্যভাবে বাঁচলে যুদ্ধ ও বিপ্লব এড়ানো যায়, মৃত্যু অনিবার্য। তাঁর জীবনের শেষ ত্রিশ বছর এই নিয়েও মেঘলা ছিল। জীবনের অর্থের জন্যে তিনি খ্রীস্টমার্গে বিশ্বাসী হন। কিন্তু প্রচলিত খ্রীস্টধর্মে তাঁর ঘোর অনাস্থা। পেছিয়ে যেতে যেতে তিনি চলে গেলেন যীশুখ্রীস্টের জীবনকালে। আদি খ্রীস্টবচনই হল তাঁর ধর্ম। শোষণ ও হিংসার বিরুদ্ধতা করতে গিয়ে বেধেছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাত। এবার বাধল খ্রীস্টমার্গচ্যুত চার্চের সঙ্গে। একা টলস্টয় লড়তে লাগলেন দুই মহাশক্তির সঙ্গে। রাষ্ট্রের সঙ্গে। চার্চের সঙ্গে। সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা বড় কম। বলা বাহুল্য মিলটনের মতো টলস্টয়ও লেখনীকে তরবারি করেছিলেন। খরধার তরবারি। কিন্তু মিলটনের পিছনে সম্প্রদায় ছিল। টলস্টয় সম্পূর্ণ একলা। দানবের বল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। দানবও ছিলেন প্রথম যৌবনে। সেই বলের যেই সদ্ব্যবহার হল অমনি তাঁরও রূপান্তর ঘটল। তিনি হলেন মহামানব। যে হাতে কলম সেই হাতে বন্দুক ছিল একদা। বন্দুক গেল। তার বদলে এল চাষী ও মুচির হাতিয়ার। মদ্য মাংস ইত্যাদি পঞ্চ ম-কার গেল। রাজসিক হলেন সাত্ত্বিক। কিন্তু সব পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি যোদ্ধা। বার্ধক্যে তাঁর যুদ্ধ যুদ্ধের বিরুদ্ধে, হিংসার বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, চার্চের বিরুদ্ধে।

সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হল, ঠিক। কিন্তু লাভবানও হল। কারণ তাঁর শেষবয়সের লেখা গল্পগুলি নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক বলে বিস্মরণীয় নয়। শিল্পীসুলভ চাতুরী তিনি ষষ্ঠ ম-কারের মতো বর্জন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও— বোধহয় সেইজন্যেই— "আইভান ইলিচের মৃত্যু", "প্রভু ও ভৃত্য" প্রভৃতি কাহিনীগুলি অন্তরকে উদ্বেল করে, সারা জীবন মনে থাকে, অলক্ষিতে জীবনকে বদলে দেয়। কী করে বলি যে এসব আর্ট নয়? হাঁ, এগুলিও আর্ট। তবে এই একমাত্র আর্ট নয়। টলস্টয় বললেও না। অপর পক্ষে "সমর ও শান্তি"ও আর্ট। "আনা কারেনিনা"ও আর্ট। টলস্টয় না বললেও আর্ট। শেষের দিকে তিনি "দ্বিতীয় এক ধূম্রলোচন" হয়েছিলেন। তাই নিজের কীর্তিকেও ভস্ম করতে না চান, ছাইভস্ম মনে করেছিলেন। এটাও একপ্রকার শুচিবাতিক। কিন্তু এর আরো একটা কারণ আছে। সেটা আরো গভীর।

নিজের পূর্বজীবনকে কাটিয়ে ওঠা এক কথা। তাকে খারিজ করা অন্য জিনিস। তিনি কাটিয়ে উঠে ক্ষান্ত হবেন না। সরাসরি খারিজ করবেন। যেহেতু রিপুর তাড়নায় অনেকগুলো পাপ করে ফেলেছিলেন। না জেনে কারো কারো সর্বনাশও। অনুতাপ তাঁর মতো আর কে এত করেছে! দুনিয়াকে নিজের স্খলন-পতন-ত্রুটির কথা কে এমন নির্মম ভাবে শুনিয়েছে! ডায়েরিও প্রকাশ করা হল তাঁর ইচ্ছায়। তবে পরিবারের মুখ চেয়ে কতক বাদসাদ দিয়ে। লোকে তাঁকে জুতো মারুক, এই তিনি চেয়েছিলেন। ভাবীকাল তাঁকে মাথায় করে রেখেছে। তিনি সত্যকুলজাত।

অন্নদাশঙ্কর রায়

## টলস্টয়-সদন

রুশ ভাষায় লেভ্ মানে সিংহ আর টলস্টয় মানে বিশালবপু। টলস্টয়ের পূর্বপুরুষরা সপ্তদশ শতাব্দীতেই তাঁদের বংশের ইতিহাস খুঁজেছিলেন। সেই সন্ধান অনুযায়ী ইন্‌দ্রোস নামে এক ব্যক্তি ১৩৫৩ সালে দুই ছেলে আর তিন হাজার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে জার্মানি থেকে চলে আসেন রাশিয়ায়। ইন্‌দ্রোসের পৌত্র আন্দ্রেই হেরিংটনোভিচ মস্কোয় বসবাস শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে ভাব ছিল মস্কোর রাজকুমার ভাসিলি ভাসিলিয়েভিবের। রাজকুমার নাকি তাঁকে টলস্টয় বা বিশালবপু বলে ডাকতেন। তা থেকেই তার পরিবার এমন-কি বংশধররা পর্যন্ত হয়ে যান টলস্টয়। পরবর্তী গবেষণায় অবশ্য ইন্‌দ্রোসের বৃত্তান্ত অলীক প্রমাণ হয়েছে, তবে পদবীর ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত বোধ হয় এখনো বদলায় নি। রাষ্ট্রীয় টলস্টয়-মিউজিয়মের গাইডদের কথায়ও তাই মনে হয়।

টলস্টয়-অনুরাগীদের সৌভাগ্য, তাঁর অনেক জিনিস সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত মস্কোর রাষ্ট্রীয় টলস্টয়-মিউজিয়মের সংগ্রহশালা—যা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে সোভিয়েট আমলে— একেবারে শিশু টলস্টয়ের নানা জিনিসও বাঁচিয়ে রেখেছে। একটি ছোট্ট খাতা আছে, তাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা গ্র. ল. নি. ট. (গ্রাফ লেভ নিকলায়েভিব্ টলস্টয়)। এই বোধ হয় টলস্টয়ের সবচেয়ে পুরনো সই যা সংগৃহীত হয়েছে। টলস্টয়ের বয়স তখন সাত। খাতাটা হচ্ছে প্রকৃতিপাঠের খাতা। তাতে লেখা আছে—

ঈগল পাখি

'ঈগলপাখি, পাখিদের রাজা। শোনা যায়, একটি ছেলে নাকি একবার ঈগলপাখির পিছনে লেগেছিল। ঈগলপাখি তখন তার উপর রেগে গিয়ে তাকে ঠুকরে দিয়েছিল।'

আরো কিছু পরের একটি খাতায় দেখা যায় 'দিন' 'হেমন্ত' 'বসন্ত' 'রাত্রি' 'আগুন' 'ক্রেমলিন্' 'পম্পেই' প্রভৃতি নিয়ে টলস্টয় রচনা লিখছেন। সে সবই তাঁর ভাষাচর্চার পাঠ।

এগারো বছর বয়স থেকে টলস্টয় কবিতা লিখতে শুরু করেন। সংরক্ষিত প্রথম কবিতাটি বারো বছর বয়সে লেখা। নাম 'আদরের পিসিমাকে'; পিসিমা হলেন ইয়েগ্রল্‌স্কায়া। টলস্টয়ের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। তবে টলস্টয়দের সঙ্গেই থাকতেন। টলস্টয়ের ছোটবেলাকার পড়াশুনোর ভার অনেকটা তাঁর উপরেই ছিল। কবিতাটিতে টলস্টয় ইয়েগ্রল্‌স্কায়াকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, শুভকামনা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতা পড়ে সাঁ তমাস নামে টলস্টয়ের ফরাসীভাষার শিক্ষক প্রশংসা করে এক চিঠিও লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'কবিতাটি আমার এত ভালো লাগে যে রাজকুমারী গর্চাকোভাকেও পড়ে শোনাই…আমাদের একান্ত অনুরোধ এ কাজে [ কবিতা লেখায় ] তুমি ছেদ দিয়ো না।…'

টলস্টয় ষোলো বছর বয়সে কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তারও কিছু কাগজপত্তর রাখা আছে। গাইড জানালেন এক পরীক্ষায় টলস্টয় খুবই খারাপ করেন অধিকাংশ বিষয়েই। ভূগোলে পেয়েছিলেন পাঁচে এক। টলস্টয় পরে তাঁর জীবনীকারকে বলেছেন— 'মনে আছে ফ্রান্সের বিষয়ে প্রশ্ন

ছিল। মুসিন-পুশ্‌কিন ছিলেন পরীক্ষক। তিনি আমাদের বাড়ির চেনা লোক। তাই আমায় বাঁচাবার জন্যেই বলেন— "ফ্রান্সের সাগরতীরের কয়েকটি শহরের নাম করো!" একটা নামও বলতে পারি নি।'

ছাত্রাবস্থাতেই টলস্টয় জমিদারির কাজকর্ম দেখাশুনো শুরু করেছিলেন। সে সময়ের দুটি বড় খাতায় টলস্টয়ের লেখা জমিদারি-সংক্রান্ত হিসেবপত্র রাখা আছে। তাতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মত টলস্টয়ও শুধু সাহিত্যসেবা নয় বিষয়কর্মেও নিপুণ ছিলেন। এই সময়ই টলস্টয় একবার তাঁর পাশের জমিদারের এক এস্টেটে যান বিখ্যাত তিরোলী বাছুর কিনতে। রাতটা তাঁকে সেখানেই কাটাতে হয়। শুতে যাবার সময় টলস্টয় দু-চার লাইন কিছু পড়ার জন্য হাতের কাছে যা বই পান টেনে নেন। বিছানায় শুয়ে বইটা খুলে দেখেন— কবিতা। পড়তে পড়তে পুরোটাই পড়ে ফেলেন। তার পর আবার গোড়া থেকে শুরু করেন। ঐ করেই ভোর হয়ে যায়। বইটা ছিল পুশ্‌কিনের য়েভগেনি ওনেগিন।

সোভিয়েত দেশে টলস্টয় সংক্রান্ত চারটি মিউজিয়ম। এতক্ষণ যেটির কথা বলছিলাম তাকে বলা যায় হেড্ আপিস। ইয়াসগায়া পলিয়াগা, লেভ্ টলস্টয় রেলওয়ে স্টেশন, আর মস্কোরই লেভ্ টলস্টয় স্ট্রীটে টলস্টয়ের আবাসগৃহটির ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা সবই করেন ক্রপোৎকিন্‌স্কায়ার এই মিউজিয়মটি। এই চারটি মিউজিয়মে প্রায় দশ লাখ জিনিস আছে। ক্রপোৎকিন্‌স্কায়া স্ট্রীটের রাষ্ট্রীয় মিউজিয়মের ন'টি ঘর সাজানো হয়েছে অনেকটা এই পর্যায়ে: শৈশব ও কৈশোর, টলস্টয় সেভাস্তোপোলে, টলস্টয় ও সভ্‌রেমেন্নিক পত্রিকা এতেই তিনি লিখতে শুরু করেন ('সমর ও শান্তি' উপন্যাস, আন্না কারেনিনা, রেজারেকশন্) সোভিয়েট দেশে টলস্টয়ের উত্তরাধিকার, টলস্টয়ের বিষয়ে লেনিন ও স্টালিন। এই কয়টি ঘরে টলস্টয়ের রচনাবলীর সবরকম সংস্করণ ও অনুবাদ, তাঁর ব্যবহৃত বহু বই ও পত্রিকা, তাঁর বিষয়ে নানা রচনা, মূর্তি, ফোটো, ছবি, টলস্টয়ের কথার রেকর্ড, মুভি-ফিল্ম্ প্রভৃতি আছে। বরিস পাস্তেরনাকের বাবার আঁকা টলস্টয়ের কয়েকটি প্রতিকৃতিও এখানে আছে।

টলস্টয়ের পাণ্ডুলিপি এখানে যা আছে তা ষোলো হাজার পাতারও বেশি। সমর ও শান্তিরই প্রায় ৫০০০ পাতা, আন্না কারেনিনার ২৫০০, রেজারেকশনের ৭০০০। টলস্টয়ের সঙ্গে পত্রবিনিময় ছিল তাঁর সময়ের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির, যেমন, তুর্গেনেভ, রেপিন— যাঁর আঁকা টলস্টয়ের কয়েকটি সুন্দর ছবি আছে এই মিউজিয়মে— গর্কি, চাইকভস্কি, চেখভ, রমাঁ রলাঁ, বার্নার্ড শ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি। গান্ধীজীর উল্লেখ টলস্টয়ের লেখায় প্রথম পাই তাঁর দিনপঞ্জীতে, ১৯ মার্চ ১৯১০ তারিখে। টলস্টয় লিখছেন, 'ভারতীয়কে লেখা আমার চিঠিটা পড়লাম। ভালো হয়েছে।' তার এক মাস পর আবার লিখছেন, 'সন্ধ্যাবেলা সভ্যতার বিষয়ে কান্দির লেখাটা পড়লাম। খুবই ভালো লেখা।' তখনো যে গান্ধী নামটা তাঁর তেমন পরিচিত নয়, তা বোঝা যায় বানানের ঐ ভুলটা দেখে। আরো মাসখানেক পরে লিখছেন, 'Gandhiর বিষয়ে বইটা পড়লাম। খুবই প্রয়োজনীয়।' বইটি হল জোসেফ ডোক-এর লেখা *M. K. Gandhi, An Indian Patriot in South Africa*। টলস্টয় তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী চের্ৎকভ্‌কে লিখছেন (যাঁকে টলস্টয়পত্নী মোটে সহ্য করতে পারতেন না, টলস্টয়ের জীবনের শেষ পর্বের দাম্পত্য অশান্তির মূলে অনেকটা রয়েছে চের্ৎকভের প্রতি সোফিয়া আন্দ্রেইয়েভনার অহেতুক বিরাগ), 'এখনই আর কাল সন্ধ্যায় পড়লাম, আমার কাছে চিঠিসুদ্ধ পাঠানো দুটি বই (একটি *M. K. Gandhi, An Indian Patriot*, অন্যটি *Indian Home*

*Rule* )· ·তার একটি ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে Passive Resistanceএর পথে সংগ্রামী গান্ধীর লেখা।· ·তাঁর ইণ্ডিয়ার হোম-রুল ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে। আমার মত জানতে চেয়েছেন [ গান্ধী ]। তাঁকে চিঠি লিখতে আমি খুবই ব্যগ্র।'

টলস্টয়ের চিঠিপত্রের সংকলনটি বিরাট। সংরক্ষিত চিঠির মোট সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। উপর-উপর চোখ বোলাতে দেখা গেল বিখ্যাত রুশ কবি শেভকে টলস্টয় সমর ও শান্তি বইটির বিষয়ে লিখছেন, 'এই হেমন্তে আমার উপন্যাসের অনেকটা লিখেছি। Ars longa, vita brevis, এ কথাটাই সারাদিন মনে পড়ে।'· · এ সময়েই আবার একদিন ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর ডান হাতটাই ভাঙে। বিরাট উপন্যাসের প্রেরণা রয়েছে মনে। সেই সঙ্গে ভয়, হয়তো তা শেষ করে যেতে পারবেন না। এমন সময় এই বিপত্তি। তর না সওয়ায় মুখেই বলে যেতে থাকেন। সমর ও শান্তি উপন্যাসটিকে সে-সময় টলস্টয় তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলে মনে করতেন। যখন কোনো অংশ লিখে সন্তুষ্ট হতেন তখন বাড়ির লোকেদের বলতেন 'আজ আমার প্রাণের কিছু অংশ রেখে দিয়ে এসেছি ঐ দোয়াতদানিতে।' ক্রপোকিনস্কায়া স্ট্রীটের মিউজিয়মের ছ'নম্বর ঘরটিতে রয়েছে এই উপন্যাসটি সংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস। তার মধ্যে আছে কয়েকজন লোকের ছবি যাঁরা বস্তুতঃ সমর ও শান্তি উপন্যাসটির কোনো কোনো চরিত্র। যেমন কাউণ্ট রস্তোভের অন্তরালে আছেন টলস্টয়ের ঠাকুর্দা কাউণ্ট ইলিয়া আন্দ্রিয়েভিচ টলস্টয়। সিনিয়র প্রিন্স্ ভল্‌কন্‌স্কি হলেন লেখকের দাদামশায় নিকলাই- সের্গিয়েভিচ ভল্‌কন্‌স্কি। নিকলাই রস্তোভ হলেন টলস্টয়ের বাবা। তেমনি প্রিন্সেস মারিয়া হলেন টলস্টয়ের মা। আন্দ্রেই ভল্‌কন্‌স্কির মডেল হলেন টলস্টয়ের সহোদর সের্গেই নিকলায়েভিচ টলস্টয়। নাতাশা রস্তোভায় চিত্রিত হয়েছেন প্রধানত টলস্টয়ের শ্যালিকা তাতিয়ানা আন্দ্রেইয়েভ্‌না বের্স।

চিঠির সূত্রেই সমর ও শান্তির কথা এল বলে গাইড জানালেন, 'দুঃখের বিষয় টাগোরের সঙ্গে টলস্টয়ের পরিচয় হয় নি। কারণ টাগোর ইয়োরোপে পরিচিত হবার আগেই টলস্টয় মারা গেছেন। তবে টাগোরের চিঠিও আমাদের সংগ্রহে আছে।' সে চিঠি লেখা রবীন্দ্রনাথের মস্কো-সফরের সময়ে। শারীরিক অসুস্থতাবশত টলস্টয়-মিউজিয়ম দেখা হল না বলে তাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

এই মিউজিয়মটির চার পাশে যে উঠোন আছে তারই এক দিকে একটি বাড়ি দেখিয়ে গাইড জানালেন ওখানে টলস্টয়ের এককালের সেক্রেটারি নিকলাই গুসেভের বাস। গুসেভ টলস্টয়ের প্রামাণিক জীবনী-রচয়িতা হিসেবেও খ্যাত। শুনলাম এখনো তিনি সে কাজ নিয়েই ব্যস্ত। শীঘ্রই তাঁর রচিত টলস্টয় জীবনীর আর-একটি খণ্ড প্রকাশিত হবে। কথাপ্রসঙ্গে গাইড জানালেন, টলস্টয়-সদন শুধু সংগ্রহশালাই-নয়; এখান থেকে টলস্টয়ের জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা গবেষণামূলক রচনাও প্রকাশিত হয়; দেশ-বিদেশের নানা গবেষককে তথ্য জুগিয়ে সাহায্য করা হয়।

শুভময় ঘোষ

## টলস্টয়-গান্ধী পত্রাবলী

মহাত্মা গান্ধী তাঁর আত্মচরিতে আধুনিক কালের তিনজন মানুষের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁদের জীবন বা রচনা তাঁর জীবনে গভীর রেখাপাত করেছে— এই তিন জনের অন্যতম টলস্টয়। তাঁর *The Kingdom of God is within You* পড়ে গান্ধীজি 'অভিভূত' হয়েছিলেন—'এই বই আমার জীবনে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে'। ক্রমশঃ গান্ধীজি টলস্টয়ের *The Gospel in Brief, What to Do* ও অন্যান্য গ্রন্থও অধ্যয়ন করেন। গান্ধীজির জীবন ও কর্মের ধারা যে পথে চলেছিল টলস্টয়ের রচনায় তার সমর্থন লাভ করে গান্ধীজি টলস্টয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, টলস্টয়কে তাঁর অন্যতম গুরু বলে উল্লেখ করেছেন; দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহীদের আশ্রয়ভূমি টলস্টয়ের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল, টলস্টয়কে চিঠি লিখে গান্ধীজি দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ-সংবাদ নিবেদন করেন, টলস্টয়ও গান্ধীজির চিঠি ও রচনা পড়ে প্রীতিলাভ করেন ও উৎসাহিত বোধ করেন। উভয়ের মধ্যে পত্রব্যবহার হয়েছিল তার কয়েকটি নিদর্শনের মর্মানুবাদ নিয়ে প্রকাশিত হল; অন্যান্য চিঠিপত্র ও আনুষঙ্গিক উপকরণ শ্রীকালিদাস নাগ -সংকলিত *Tolostoy and Gandhi* পুস্তকে মুদ্রিত আছে। শ্রী ডি. জি. টেণ্ডুলকর -লিখিত *Mahatma* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে গান্ধীজি ও টলস্টয়ের কয়েকখানি চিঠির প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে।

### টলস্টয়ের প্রতি গান্ধীজি

১

Westminster Place Hotel
4 Victoria Street,
London, S. W.
1st October, 1909

বছর তিনেক ধ'রে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে যা ঘটে চলেছে তার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই।

এই উপনিবেশে প্রায় তেরো হাজার ভারতীয় প্রজার বাস। এরা বহুকাল ধরে নানা আইনগত অসুবিধার মধ্যে জীবন নির্বাহ করে চলেছে। বর্ণবিদ্বেষ, কোনো কোনো ব্যাপারে এশিয়াবাসীর প্রতি বিদ্বেষ এখানে অত্যন্ত তীব্র। এশিয়াবাসীর ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষের বড় কারণ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। তিন বছর আগে একটি আইনের ফলে অবস্থা চরমে পৌঁছয়। আমার ও অন্য অনেকের ধারণা এই আইন অবমাননাকর, যাদের সম্পর্কে প্রযোজ্য তাদের মনুষ্যত্বহীন করবার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা-প্রসূত এই আইন। আমি মনে স্থির জেনেছি যে এ ধরণের আইনের কাছে নতিস্বীকার সদ্ধর্মোচিত নয়। আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু সহিংস সংঘাতের বিরোধী মতবাদে দৃঢ় বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস আমাদের

এখনও অটুট। আপনার রচনা পাঠ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তা আমার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানকার ভারতীয়দের কাছে সকল অবস্থা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার পর তারা একমত হয়েছে যে এই আইনের কাছে নতিস্বীকার করা অকর্তব্য— এই আইনভঙ্গের ফলে কারাদণ্ড বা অন্য যে-কোনো শাস্তি নির্দিষ্ট হয় তাই স্বীকার্য। ফল হয়েছে এই যে প্রায় অর্ধেকসংখ্যক ভারতীয় সংগ্রামের তাপ বা কারাবাসের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ট্রান্সভাল ছেড়ে চলে গিয়েছে তবু যে-আইনকে তারা অসম্মানজনক বলে জানে তার কাছে নত হয় নি। যারা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার অধিবাসী বিবেকের নির্দেশে স্বেচ্ছায় কারাদণ্ড স্বীকার করেছে। কেউ কেউ পাঁচবার পর্যন্ত কারাবরণ করেছে। চারদিন থেকে ছ মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সশ্রম। অনেকের আর্থিক দুর্গতির চরম হয়েছে। বর্তমানে ট্রান্সভালের বিভিন্ন দেশে শতাধিক সত্যাগ্রহী রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত দরিদ্র, দিনমজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার ফলে সাধারণের দানের উপর নির্ভর করে তাদের স্ত্রীপুত্রদের ভরণপোষণ করতে হচ্ছে ; এবং সত্যাগ্রহীদের ভিতর থেকেই সে চাঁদার বেশির ভাগ আদায় করতে হয়েছে। এতে ভারতীয়দের উপর কষ্টের চাপ আরও বেড়েছে ; তবু আমি বলব তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লড়াই এখনও চলছে, কবে শেষ হবে কে বলতে পারে। আমরা এটা স্পষ্ট দেখেছি যে যেখানে পশুশক্তি হার মানে সেখানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সফল হতে পারে, আর তা হবেই। আমরা এও লক্ষ্য করছি যে প্রধানতঃ আমাদের দুর্বলতার জন্যই কোনো কোনো স্থানে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ছে— ফলে সরকারের মনে এই ধারণা গড়ে উঠছে যে আমরা দীর্ঘকাল ধরে কষ্ট সহ্য করে যুঝতে পারব না।

একজন বন্ধুকে নিয়ে রাজকীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে ও সমস্যার সমাধানকল্পে সকল ঘটনা তাদের কাছে পেশ করতে আমি এখানে এসেছি। সত্যাগ্রহীদের বিশ্বাস সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অনাবশ্যক। তবুও দলের দুর্বল অংশের প্ররোচনায় এই ডেপুটেশন এসেছে ; এতে আমাদের শক্তির চেয়ে দুর্বলতাই প্রকট হচ্ছে বেশি। এখানকার ব্যাপার দেখেশুনে আমার ধারণা হচ্ছে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নৈতিকতা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে রচনা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে আমাদের আন্দোলনের খবর আরও ছড়িয়ে পড়বে, মানুষ এ নিয়ে ভাবতে শুরু করবে। জনৈক বন্ধু প্রস্তাবিত প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপিত করেছেন। তিনি মনে করেন এ-জাতীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন অসহযোগের মূলধর্মের সঙ্গে অসংগত। এ যেন মত ক্রয় করার মতো হবে। এই নৈতিক প্রশ্ন প্রসঙ্গে আপনার অভিমত জানতে পারি কি ? আপনি যদি মনে করেন এ-জাতীয় রচনা আহ্বানে কোনো দোষ নেই তবে বিশেষ করে কাদের কাছে রচনার জন্য অনুরোধ জানাব অনুগ্রহ করে এমন কয়েকটি নাম আমাকে পাঠাবেন।

আর একটি প্রসঙ্গে আপনার কালহরণ করতে চাই। আমার এক বন্ধুর মারফত ভারতের বর্তমান অশান্তি প্রসঙ্গে 'একজন হিন্দু'র কাছে লেখা আপনার পত্রের একটি কপি আমার হাতে এসেছে। দেখে মনে হয় এতে আপনার মতামত ব্যক্ত হয়েছে। আমার বন্ধুবরের অভিপ্রায় তাঁর ব্যয়ে এই পত্র কুড়ি হাজার কপি ছাপিয়ে বিতরণ করা হোক। তিনি এর অনুবাদেও আগ্রহী। আমরা মূল রচনাটি সংগ্রহ করতে না পারায় এটা আপনারই পত্র কিনা না জেনে এবং এই কপির নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত

না হয়ে ছাপতে পারি না। সেই কপির একটি প্রতিলিপি এর সঙ্গে পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে জানাবেন এটা আপনারই রচনা কিনা এবং এর পাঠ নির্ভুল কিনা। আমাদের প্রস্তাবে আপনার সম্মতি আছে কিনা তাও অনুগ্রহ করে জানাবেন আশা করি। এই পত্রে যদি আর কিছু যোগ করতে চান দয়া ক'রে করে দেবেন। আমার একটি নিবেদন— অন্তিম অনুচ্ছেদে আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস থেকে পাঠককে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন। আমি জানি না আপনি এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করেছেন কিনা ( আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন )। পুনর্জন্মবাদে ভারত ও চীনের কোটি কোটি মানুষের চিরলালিত বিশ্বাস। অনেকের কাছে এটা কেবল তাত্ত্বিক বিশ্বাস মাত্র নয়, অভিজ্ঞতাজাত প্রত্যয়। জীবনের বহু রহস্যের যুক্তিসহ ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যায়। ট্রান্সভালে যারা কারাদণ্ড ভোগ করেছে তাদের মধ্যে অনেকেরই এই বিশ্বাসই পরম সান্ত্বনা। আমি আপনাকে ওই মতবাদে আস্থাশীল হবার জন্য লিখছি না, আমি কেবল যেখানে আপনি নানা বিষয়ে পাঠককে নিবৃত্ত করতে চেয়েছেন সেখান থেকে 'পুনর্জন্ম' শব্দটি বাদ দিয়ে দেবেন এই অনুরোধ করব। আপনার পত্রে আপনি বহুস্থানে কৃষ্ণের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এবং শ্লোকের উল্লেখও করেছেন। কোন্ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে তার নামটি জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

আপনি এই দীর্ঘ পত্রে ক্লান্তিবোধ করবেন। আপনাকে যারা শ্রদ্ধা করে এবং আপনাকে অনুসরণ করতে চায় আপনার সময় নষ্ট করার কোনো অধিকার তাদের নেই তা আমি জানি। যতদূর সম্ভব আপনাকে কোনো কষ্ট না দেওয়াই তাদের অবশ্য কর্তব্য। তথাপি, আমি আপনার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও, কেবল সত্যের অনুসন্ধিৎসায় আপনাকে পত্র লিখছি, এবং যে সকল সমস্যা সমাধান আপনার জীবনের ব্রত সে বিষয়েই আপনার উপদেশ প্রার্থনা করছি।

শ্রদ্ধাসহ<br>আপনার অনুগত<br>মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজির প্রতি টলস্টয়

২

Yasnaya Polyana<br>October 7, 1909

এইমাত্র আপনার অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ আনন্দলাভ করলাম। ঈশ্বর আমাদের ট্রান্সভালের সকল ভাই ও সহকর্মীদের মনে শক্তিসঞ্চার করুন। পাশবিক শক্তি ও মানবিক শক্তির মধ্যে এই যে সংগ্রাম এর এক দিকে প্রেম ও নম্রতা, অপর দিকে শঠতা ও হিংসা। এ সংগ্রাম আমাদের চিত্তেও অভূতপূর্ব অনুভূতি জাগিয়েছে— বিশেষতঃ যেখানে সামরিক চাকুরি গ্রহণে বিবেকের অসম্মতিতে সরকারী আইন ও ধর্মীয় আনুগত্যের ভিতর তীব্র সংঘর্ষ বেধেছে। এ-জাতীয় অসম্মতি প্রায়ই দেখা দিচ্ছে।

"A Letter to a Hindu" আমারই রচনা। ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য খুব খুশি হয়েছি। কৃষ্ণ সম্পর্কে গ্রন্থের নাম মস্কো থেকে আপনাকে জানিয়ে দেবে। পুনর্জন্মবাদ সম্বন্ধে আমার দিক দিয়ে কিছুই বাদ দিতে চাই না। কারণ আমার ধারণা পুনর্জন্মে বিশ্বাস কিছুতেই মানবচিত্তে আত্মার অবিনশ্বরতা এবং

ভগবৎপ্রেম ও সত্যে বিশ্বাসের মতো গভীর রেখাপাত করতে পারবে না বা মানুষকে সংযত করতে সক্ষম হবে না। তবুও আপনি যদি চান প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি বর্জন করে আপনার সন্তোষবিধান করব। আপনার অনুবাদে সাহায্য করতে আমি সানন্দে প্রস্তুত। ভারতীয় ভাষায় আমার রচনার অনুবাদ ও প্রচার আমার আনন্দেরই কারণ হবে নিঃসন্দেহ।

আর্থিক লভ্যাংশের কোনো প্রশ্ন এ-জাতীয় ধর্মীয় ব্রতানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না।

আমার সৌভ্রাত্র্যসম্ভাষণ গ্রহণ করুন। আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে আমি আনন্দিত।

লিও টলস্টয়

৩

৮ মে ১৯১০

প্রিয় বন্ধু,

এইমাত্র আপনার বই *Indian Home Rule* এবং আপনার চিঠি পেলাম।

গভীর আগ্রহের সঙ্গে আপনার বইখানি পড়েছি— যে প্রশ্ন নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন তা শুধু ভারতের পক্ষেই নয় সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার প্রথম চিঠিখানি খুঁজে পাই নি, কিন্তু Doke-এর লেখা আপনার জীবনী থেকে আপনার সম্বন্ধে জানবার সুযোগ পেয়েছি। বইখানা থেকে আপনাকে আরও ভালোভাবে জানবার ও বোঝবার সুযোগ পেলাম।

আমার শরীর খুব সুস্থ নয়। আপনার বইয়ের প্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্ন ও আপনার কর্মধারার প্রতি আমার আগ্রহ অসীম, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ সব প্রশ্নের আলোচনা করতে পারছি না। আমার শরীর সেরে উঠলে সবিস্তারে লিখব।

আপনার ভাই ও বন্ধু
লিও টলস্টয়

**টলস্টয়ের প্রতি গান্ধীজি**

৪

21-24, Court Chambers
Johannesburg
15th August, 1910

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ৮ মে তারিখের সৌহার্দ্যপূর্ণ চিঠির জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার পুস্তিকা *Indian Home Rule* সম্বন্ধে আপনার অনুমোদন আমার কাছে মহামূল্যবান। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার চিঠিতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেইমতো আপনার সময় হলে আপনার কাছ থেকে বিশদ সমালোচনা আশা করব।

Mr. Kallenbach আপনাকে টলস্টয় ফার্মের কথা লিখেছেন। তিনি আমার বহুকালের বন্ধু। আপনার *My Confession* গ্রন্থে যে সব অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আপনি দিয়েছেন, তার অধিকাংশের ভিতর দিয়েই তিনি জীবনে গিয়েছেন। আপনার লেখার মতো এত অধিক অন্য কিছু তাঁকে প্রভাবিত

করে নি। আপনার নির্দেশিত পথে আরও শক্তি নিয়োগের চেষ্টাস্বরূপ তিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর ফার্মের নামের সঙ্গে আপনার নাম যুক্ত করেছেন।

তিনি দয়া করে সত্যাগ্রহীদের ফার্মের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন। এই সঙ্গে *Indian Opinion*এর যে সংখ্যাগুলি পাঠাচ্ছি তা থেকে এ সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ পাবেন। বিস্তারিত সংবাদ দিয়ে আপনাকে ভারাক্রান্ত করা আমার পক্ষে অনুচিত। তবু আপনি ট্রান্সভালের সত্যাগ্রহ সম্পর্কে যে ব্যক্তিগত আগ্রহ দেখিয়েছেন, সেই কারণেই সাহস পাই।

আপনার একান্ত অনুগত

মো. ক. গান্ধী

গান্ধীজির প্রতি টলস্টয়

৫

"Kotchety"

[ টলস্টয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার ভবন ]

7th September, 1910

আপনার *Indian Opinion* পত্রিকা পেয়েছি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে সেই পত্রে প্রকাশিত রচনা পাঠ করে সুখী হয়েছি। এই রচনাগুলি পাঠ করতে করতে আমার মনে যে সব চিন্তা জেগেছে তা আপনাকে জানাতে চাই।

আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। মৃত্যু যতই সন্নিকট হচ্ছে ততই যে সব চিন্তা আমার সত্তাকে প্রতিনিয়ত আলোড়িত করছে তা সাধারণ্যে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করছি। আমার কাছে এসব চিন্তার গুরুত্ব অসীম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ তো প্রেমের সহজ অভিব্যক্তি ভিন্ন কিছুই নয়। এই অভিব্যক্তিকে অপব্যাখ্যার দ্বারা বিকৃত করা যাবে না। ভালোবাসা জনহৃদয়ের সান্নিধ্য ও দৃঢ়বন্ধনবাসনার অভিব্যক্তি। প্রেমাকাঙ্ক্ষা জীবনে মহৎ কর্মোদ্যোগের উৎসকে উন্মোচিত করে। যে ভালোবাসা প্রতি মানবের অন্তরে নিত্য অনুভূত তাই মানবজীবনের মহত্তম ও অনন্য বিধান। এর সর্বোত্তম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই শিশুহৃদয়ে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যতদিন পর্যন্ত না সংসারের ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় ততদিন ভালোবাসার অনুভূতি তার অন্তরে জাগরূক থাকে।

ভারতীয় চীন ইহুদী গ্রীক রোমান সব দর্শনে প্রেমের বিধান বর্ণিত আছে। আমার ধারণা যীশুখৃষ্টই সবচেয়ে স্পষ্টভাবে এর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ভালোবাসার মধ্যেই জীবনের মূল নীতি ও প্রাজ্ঞপুরুষের জীবন বিধৃত। শুধু তাই নয় এই নীতির সম্ভাব্য বিকৃতির কথা স্মরণ করে যেসব মানুষ কেবল পার্থিব স্বার্থে জড়িত তাদের কাছে এই নীতির বিকৃতির বিপদ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। প্রধান বিপদ হল স্বার্থরক্ষার জন্য হিংসাত্মক কার্যকলাপের শরণ নিতে সম্মত হওয়া। একেই তিনি বলেছেন চড়ের বদলে চড় মারা বা গায়ের জোরে আমাদের অপহৃত দ্রব্য পুনরুদ্ধার করা! খৃষ্ট জানতেন এবং সকল সৎ মানুষই জানেন যে প্রেম ও হিংসা কখনোই এক সঙ্গে বাস করতে পারে না। তিনি জানতেন একবার একটি উপলক্ষ্যেও হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে প্রেমের আদর্শ ব্যর্থ হয়ে যাবে, ভালোবাসার আদর্শের

অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে। অথচ এই খৃষ্টান সমাজ ও সভ্যতা বহিরঙ্গ চাকচিক্য সত্ত্বেও তীব্র একটি অসংগতির মধ্যেই গড়ে উঠেছে। এই অদ্ভুত ও শোচনীয় পরস্পর বিরোধিতা কোথাও সজ্ঞান কোথাও অজ্ঞতাপ্রসূত।

বস্তুতঃ, প্রেমের আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষকে এতটুকু মেনে নিলেই প্রেমভাবের অস্তিত্ব অন্তর্হিত হতে বাধ্য। এবং প্রেমাদর্শ অপসৃত হলে হিংসানীতি ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। হিংসানীতি হল শক্তিমানের অধিকার। বিগত উনিশটা শতাব্দী এই পথে খৃষ্টীয় সমাজ চলে এসেছে। দেখা গিয়েছে মানুষ সর্বদাই সমাজকে সংহত করতে হিংসার আশ্রয় নিয়েছে। তথাপি খৃষ্টীয় জনসংঘ ও অন্যান্য জাতির আদর্শের মধ্যে পার্থক্য আছে। খৃষ্টান ধর্মে প্রেমাদর্শের কথা যত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে অন্য কোনো ধর্মের আদর্শে তা নেই। খৃষ্টান সমাজ এই আদর্শকে নিষ্ঠাসহকারে মেনেও নিয়েছে। যদিও তারাই আবার হিংসার উপর ভিত্তি করে জীবনকে গড়ে তুলেছে এও স্বীকার করতে হয়। ফলে, খৃষ্টান মানুষের জীবনে তাদের কর্ম ও অন্তরে আদর্শের মধ্যে এক চরম বৈপরীত্য প্রকট। প্রেমকে জীবনের ভিত্তি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, আবার একই সঙ্গে শাসকশক্তি বিচারব্যবস্থা বা সামরিক বিভাগের ক্ষেত্রে হিংসাকে অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং তার গুণকীর্তনও করা হয়েছে এইখানেই সেই বৈপরীত্য। এই বৈপরীত্য খৃষ্টীয় সমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে বেড়েই চলেছে এবং সাম্প্রতিককালে এটি এক ব্যাধির আকারে দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে সমস্যাটি এইভাবে দেখা দিয়েছে— হয় আমাদের মেনে নিতে হবে যে ধর্মীয় বা নৈতিক কোনো বিধানকে আমরা স্বীকার করি না, আমরা জীবনে কেবলমাত্র গায়ের জোরেরই বশীভূত; অন্যথা জোর করে যেসব কর আদায় করা হয় এবং আমাদের বিচারবিভাগ, পুলিশ, সর্বোপরি সেনাবাহিনী এই মুহূর্তে তুলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

সম্প্রতি মস্কোর মেয়েদের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় পরীক্ষায় এক বিশপ-অধ্যাপক মেয়েদের কাছে Ten Commandments সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন। বিশেষতঃ ষষ্ঠ নির্দেশ 'হত্যা করিও না'— সম্পর্কে প্রশ্ন করে তিনি যখন সন্তোষজনক উত্তর পেলেন, তখন বিশপ আবার প্রশ্ন করলেন, 'এই পবিত্র বিধান অনুযায়ী হত্যা কি সর্ব অবস্থায় পরিত্যাজ্য?' বিকৃতশিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা উত্তর করল, 'না, সব সময় নয়। যুদ্ধে, বা অপরাধীকে শাস্তিদানের সময় হত্যা অনুমোদনযোগ্য!' কিন্তু তাদেরই মধ্যে একটি মেয়েকে সেই প্রশ্ন করা হলে সে আবেগে বিচলিত হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, সর্ব অবস্থাতেই হত্যা পাপ।' (আমি যা বর্ণনা দিলাম তা গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমাকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন)। বিশপ যে সব কৃত্রিম প্রশ্নে অভ্যস্ত তারই জবাবে মেয়েটি প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, ওল্ড টেস্টামেণ্টে বারবার হত্যা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, এবং স্বয়ং যীশুখৃষ্ট শুধু হত্যাকেই নিষিদ্ধ করেন নি, আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি সর্বপ্রকার অন্যায় ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।' সেদিন বিশপের সমস্ত আড়ম্বর ও বক্তৃতানৈপুণ্য সত্ত্বেও তাঁকে সেই বালিকাটির কাছে পরাভব স্বীকার করতে হয়েছিল।

আমাদের পত্রিকায় আমরা আকাশযাত্রার উন্নতিবিষয়ে আলোচনা করি, নানা আবিষ্কারের কথা বলি, দুরূহ কূটনৈতিক সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি বা অভিনব শিল্পসৃষ্টি সম্বন্ধে মুখর হয়ে উঠি অথচ সেই বালিকাটি যা ব্যক্ত করেছে সে সম্বন্ধে আমরা নীরব। কিন্তু এ নীরবতা আত্মঘাতী। কেননা খৃষ্টীয় সমাজে প্রত্যেকেই স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাবে সেই মেয়েটির মতোই অনুভব করছে। সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, নৈরাজ্যবাদ, মুক্তিফৌজ, অপরাধের সংখ্যাবৃদ্ধি, বেকার-সমস্যা, ধনীর বিপুল বিলাস,

দরিদ্রের দুঃসহ কষ্ট, আত্মহত্যার ভয়াবহ সংখ্যাবৃদ্ধি—এ সবই হচ্ছে সেই আন্তর বৈপরীত্যের অভিব্যক্তি। এই আন্তর বৈপরীত্য সর্বত্র প্রকট এবং এর সমাধান সুদূরপরাহত। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই বৈপরীত্য দূরীকরণের একমাত্র পথ প্রেমাদর্শকে স্বীকার করে সর্বপ্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকা। সেই কারণে ট্রান্সভালে আপনাদের সংগ্রাম যদিও আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু থেকে অনেক দূরে তথাপি তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের কার্যাবলী আমাদের কাছে এক অভ্রান্ত বাস্তব প্রমাণ উপস্থিত করেছে যে, এই পথই জগতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পথ এবং এই কাজে শুধু খৃষ্টীয় জাতিপুঞ্জই নয় পৃথিবীর সকল মানুষের যোগ দেওয়া কর্তব্য।

আমার বিশ্বাস আপনি শুনে আনন্দিত হবেন রাশিয়াতেও এই ধরণের এক আন্দোলন গড়ে উঠছে। সেনাবাহিনীতে যোগদানে অস্বীকৃতি এখানে প্রতি বছর প্রবল হয়ে উঠছে। আপনার নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে যোগদানকারীর সংখ্যা বা রাশিয়ায় যারা সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকার করছে তাদের সংখ্যা যত কমই হোক-না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই এ কথা জোর করে বলা যেতে পারে যে, 'ঈশ্বর আমাদের পক্ষে' এবং 'ঈশ্বর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান…।'

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ
লিও টলস্টয়

অনুবাদক ॥ শ্রীশুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

# বাংলা ভাষার স্বর ও ছন্দ

পুণ্যশ্লোক রায়

১. ইতিহাস

বাংলা ছন্দ নিয়ে এ পর্যন্ত খুব কম আলোচনা হয় নি। যতদূর জানি এ-বিষয়ে প্রথম লেখক J. D. Anderson। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *A Manual of the Bengali Language* বইখানিতে তিনি দেখান যে বাংলায় একটি প্রধান যতি এবং একটি প্রধান ঝোঁক আছে এবং ঝোঁকটা সাধারণত বাক্যের গোড়াতেই পড়ে। উদাহরণ—'উত্তুরে হাওয়া' 'বর্ষাকাল একেবারে'। পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর *A Bengali Phonetic Reader* এবং 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' বই দুটিতে অ্যাণ্ডারসন সাহেবের থিয়োরিই স্বীকার করে নেন। তবে তাঁর সংগৃহীত উদাহরণের মধ্যে দেখা যায় যে বাংলায় ঝোঁকটা সবসময় গোড়াতেই পড়ে তা নয়, প্রায়ই পড়ে একটা শব্দ ছেড়ে। উদাহরণ—'আমি যেতে পারি নি'। 'তুমি কাল এসো'। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত স্নীতিবাবু দেখান যে, প্রশ্ন, অসমাপিকা ও সমাপিকা বাংলায় এই তিন রকম ভাবে বাক্য বা উপবাক্য শেষ হতে পারে। এর পর W. Sutton Page তাঁর *An Introduction to Colloquial Bengali* (১৯৩৪)-তে লক্ষ করেন যে বাক্যের মধ্যে কোনো একটা শব্দের উপর বিশেষ জোর পড়লে তার আরম্ভটা উদারায় নেমে যায়। গদ্যছন্দ নিয়ে এর বেশি কিছু আমার চোখে পড়ে নি।

পদ্যছন্দ নিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা হয়েছে। শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন তাঁর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইটিতে দেখান যে বাংলা পদ্যে তিন রকম ছন্দের ব্যবহার আছে। লৌকিক ছন্দে রুদ্ধদলের দৈর্ঘ্যের বাঁধন নেই, কখনো দীর্ঘ কখনো বা হ্রস্ব হতে পারে। উদাহরণ—'শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান'। ("শিব" হ্রস্ব; "রের" "তিন" "দান" দীর্ঘ)। যৌগিক ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের অন্তে দীর্ঘ ও অন্যত্র হ্রস্ব। উদাহরণ—'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়'। ("দুর" "ভাগ" ও "মঙ্" হ্রস্ব, "দেশ" ও "ময়" দীর্ঘ)। মাত্রিক ছন্দে রুদ্ধদল সর্বত্র দীর্ঘ। উদাহরণ—'ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর'। ("মের" "ঘুম" ও "স্বর" দীর্ঘ। "মের-অ", "ঘুম-অ", "স্বর-অ" পড়লেও ছন্দপতন হয় না; "ভাঙল" "উঠল" পড়লেও না)।

শ্রীযুত স্কুমার সেন এই তিনটি পদ্যের ছন্দের পুরনো ও বিভিন্ন প্রস্তাবিত নাম বদলে দিয়ে চমৎকার তিনটি নাম ঠিক করে দেন— বলপ্রধান, তানপ্রধান ও মানপ্রধান। তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ' বইটিতে তিনি দেখান যে তিনটি ছন্দের একটিতে নির্ভর করা হয় তালে তালে আসা ঝোঁকের উপর, অন্যটিতে টানের উপর, অপরটিতে স্বরের পরিমাণের উপর।

শ্রীযুত অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' বইখানিতে বিচার করে দেখান যে বাংলা ছন্দের মধ্যে একটা দু'য়ের তাল ফোটে। উপরোক্ত তিনপ্রকার ছন্দের কোনোটির বেলা এ নিয়মের অন্যথা হয় না। তবে বলপ্রধানে এর প্রকাশ স্পষ্টতম এবং তানপ্রধানে অস্পষ্টতম। উদাহরণ—'শিবঠা—কুরের। বিয়ে—হল ॥ তিন—কন্যে। দান॥' 'এদুর—ভাগ্য। দেশ—হতে॥ হেমঙ—গল। ময়॥' 'ঘুমের—দেশে। ভাঙিল—ঘুম॥ উঠিল—কল। স্বর॥' পদ্যছন্দের আলোচনা আমার জানতে এই পর্যন্ত।

লক্ষ করতে হয় যে গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দ দুয়ের একত্র আলোচনা এপর্যন্ত হয় নি। অবশ্য অবিশ্লেষিত অনুভূতিনির্ভর মন্তব্য যথেষ্ট হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য গদ্য ও পদ্য মিলিয়ে বাংলার সামগ্রিক ছন্দটার স্বরূপ বিশ্লেষণ।

২. পদ্ধতি

কোনো ভাষার ছন্দ বিচার করতে বসলে কি কি লক্ষ করতে হবে সেটা আগেই বুঝে নেওয়া ভালো। প্রথমে দিঙ্‌নির্ণয়। নিরীক্ষণ করতে হবে চার ধরণের ঘটনার গতি ও সংগতি।

ক. যতিবিচার। প্রথমেই দেখতে হবে যে ছেদ কোথায় কোথায় পড়ছে এবং তা কত ধরণের। প্রত্যেকবার একইভাবে ছেদ পড়ছে এরকম ছেদ ছাড়াও পড়লেও-পড়তে-পারে এই ধরণের ছেদও থাকতে পারে। বাস্তব ছেদ ও সম্ভবপর ছেদেরই কত প্রকার, ছেদের স্থান পরিবর্তন করা যায় কি না এবং বদলালে সঙ্গে সঙ্গে অর্থও বদলায় কি না তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

খ. স্বুরবিচার। স্বর একঘাটে উদ্ধারিত হয় না। (ঙ ন ম ল চারটি ধ্বনিও স্বরধর্মী, কারণ মুখের বা নাসার দ্বার তাদের বেলা মুক্তই থাকে।) স্বুরের যে ওঠা-পড়া হতে থাকে তার মধ্যে কোনো নিয়ম পাওয়া যায় কি? দুই যতির মাঝখানের অংশ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে স্বুরের ওঠা-পড়া নির্ধারণ করতে কটা ঘাটের প্রয়োজন। তবে কথ্যভাষায় ঘাটগুলি সেতারের মত বাঁধা নয়। পরবর্তী যতিনির্দিষ্ট অংশে সব কটা ঘাট একসঙ্গে নেমে বা একসঙ্গে উঠে যেতে পারে, ঘাটগুলির পারস্পরিক ব্যবধান বেড়ে যেতে পারে বা কমে যেতে পারে। ঠিক থাকবে শুধু তাদের সংখ্যা ও উঁচু নীচু ভেদ। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করে দেখতে হবে স্বুরের গং বদলালে অর্থের আভাস বদলায় কি না এবং কয় প্রকার অর্থপূর্ণ নকশা আছে।

গ. বলবিচার। সব স্বর সমান জোরের সঙ্গে উচ্চারণ হয় না। কোনোটা বেশি জোর, কোনোটা কম। বল বেশি হলেই যে স্বুরের উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাণও বেশি হবে এটা সব ভাষার বেলা সত্য নাও হতে পারে। বলের মাত্রা বিচার করে এক দুই তিন বা চার অর্থের বদল করে এমন কটা বল আছে দেখতে হবে।

ঘ. সব স্বর সমান দীর্ঘভাবে উচ্চারণ হয় না। এই হ্রস্বদীর্ঘ ভেদের মধ্যে কোনো নিয়ম দেখা যায় কি? এমন হতে পারে যে বিশেষ শব্দের উপর বিশেষ ঝোঁক ছাড়া নিয়মিত দীর্ঘতা দেখা যাচ্ছে না। এমন হতে পারে ভাষাতেই হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ভিন্নার্থসূচক বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে। এমন হতে পারে যে কোনো বিশেষ পরিবেশে, ধরুন রুদ্ধদলে বা একদল শব্দে, স্বর নিয়মিত দীর্ঘ এবং অন্যত্র হ্রস্ব।

কোন্ কোন্ দিকে চোখ ফেলতে হবে এ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চাই যথাযোগ্য পদ্ধতি। পদ্ধতি মূলত দু রকম। বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে রেকর্ড করে যেতে হয় কি বাস্তবিক উচ্চারিত হচ্ছে, কেমনভাবে হচ্ছে, এবং বাস্তবিক কেমন শোনাচ্ছে। এ পদ্ধতিতে আপনার আমার কান ছাড়াও যন্ত্রপাতির সাহায্য প্রয়োজন। অমন যন্ত্রপাতি আমাদের নেই। সুখের কথা এই যে তার বেশি দূর দরকার নেই। কারণ আমাদের বিশ্লেষণের বস্তু একটা মানবিক শ্রবণনিরপেক্ষ প্রাকৃতিক সত্য নয়। আমরা বিচার করতে বসেছি যা তা আপনি-আমি যা প্রত্যহ হাজার বার গ্রহণ ও প্রস্তাব করছি—তারই নিতান্ত মানবিক সত্য। অতএব শ্রেয়

হচ্ছে অতি আধুনিক ভাষাতত্ত্বের স্বীকৃত তুলনানুগ পদ্ধতি। এর প্রধান প্রক্রিয়া হচ্ছে ধ্বনিতে স্বল্পতম পার্থক্যবিশিষ্ট একজোড়া বাক্য নিয়ে সেই পার্থক্যের সঙ্গে অনুরূপ স্বল্পতম পার্থক্যবিশিষ্ট আর-একজোড়া বাক্যের তুলনা।

৩. যতিবিচার

এদের মধ্যে পার্থক্য কী? 'রোজ আমি ও হাসি ক্লাস থেকে ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে বসে পুতুল খেলি।' এবং 'রোজ আমি ও হাসি ক্লাস থেকে ফিরে এসে পুতুল খেলি আমাদের বাড়িতে বসে।' পার্থক্য এই যে দ্বিতীয়টাতে "· ·বসে"র পরে একটা যতি পড়ছে, প্রথমটার "· ·বসে"র পর তা পড়ছে না। প্রথম "বসে"র সঙ্গে "খেলি"র যে পার্থক্য, সেটা কি প্রথম "বসে"র থেকে দ্বিতীয় "বসে"র পার্থক্যের সঙ্গে অভিন্ন? তাই তো মনে হচ্ছে। প্রথম "বসে"র পর চালিয়ে যাবার প্রত্যাশা থাকছে, "খেলি" বা দ্বিতীয় "বসে"র বেলা তা থাকছে না। এই যতিটার লেবেল দেওয়া যাক p এবং প্রথম "বসে"র পর যা ঘটছে তার লেবেল দেওয়া যাক q। এইভাবে তুলনা করে করে এগলে দেখব যে প্রথম বাক্যটাতে q পড়ছে "রোজ" "হাসি" "এসে" এবং "বসে"র পরে আর p পড়ছে "খেলি"র পরে। বাংলায় তা হলে অন্তত দু-ধরণের যতি আছে। একের জায়গায় অন্যের প্রয়োগ অর্থ বদলে দেয়।

কিন্তু দুটোতেই ইতি নয়। "আপনি এলেন?" আর "আপনি এলেন।" তুলনা করে দেখলে মনে হবে p, q ছাড়া r নামে আর-একটা যতি বাংলা ভাষায় সম্ভব এবং সেটা প্রথম বাক্যটাতে শোনা যাচ্ছে। "রাম ছাত্র?" আর "রাম ছাত্র।" এই জোড়াতেও সেই প্রভেদ। অর্থের তফাত তো স্পষ্ট। তা হলে কি যতি তিনটে? একটু যত্ন করে "রোজ" এবং "হাসি"র মধ্যে তুলনা করলে বোঝা যায় ধ্বনির একটা পার্থক্য আছে। "রোজ" এবং প্রথম বাক্যের "বসে"র মধ্যেও সেই একই পার্থক্য। "রোজ" আর "এসে"র পরে যে ধ্বনি, "হাসি" আর "বসে" র পরে যে ধ্বনি— তারা এক নয়। দ্বিতীয়টিকে যদি q বলি, প্রথমটিকে s বলে তার থেকে আলাদা করতে হবে। অর্থের পার্থক্য এ ক্ষেত্রে সামান্য। sএর বেলা ঝোঁকটা যেন বেশি। তা ছাড়া আরও বাক্যের সঙ্গে তুলনা করে করে দেখলে বোঝা যাবে যে পর পর দুটো q আসে না, শেষেরটা থেকে গুনলে দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ স্থানে qএর স্থানে s পড়ে। বাহুল্যভয়ে প্রমাণ স্থগিত রাখলাম।

তা হলে কি চারটে যতি আছে বাংলা ভাষায়? সন্দেহ হচ্ছে এতগুলো যতি যতিই নয়, অন্য কিছু। আর-একদিকে তুলনা করলে এ সন্দেহটা যে ভিত্তিহীন নয় তা প্রমাণ হবে। "আমি ও হাসি" "ক্লাস থেকে ফিরে এসে" এবং "পুতুল খেলি," বাক্যাংশগুলো তুলনা করা যাক। "থেকে"র পর যে ছেদ পড়ছে, তা "হাসি" "এসে" বা "খেলি"র পর যা যা পড়ছে তার কোনোটার সঙ্গেই অভিন্ন নয়। "থেকে"র পরের ছেদ "আমিও"র পরেকার ছেদের সঙ্গে অভিন্ন। "পুতুল"এর পরের ছেদের সঙ্গেও। এ ছেদের উপর থামা সম্ভব নয়; থামতে গেলেই তার জায়গায় এসে পড়বে p q r s-এর কোনো একটি।

তা হলে বাংলায় সত্যিকার ছেদ আছে মাত্র দুটোই। একটাকে বলা যেতে পারে যতি, তার উপর থামা যায়। অন্যটার নাম দেওয়া যাক উপযতি, তার উপর থামা যায় না। প্রথমটা দেখানো

যাক ± চিহ্ন দিয়ে, দ্বিতীয়টা + চিহ্ন দিয়ে। p q r s-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা যতির যতিত্বে নয়। যতিতে পৌঁছবার প্রস্তুতি বা আক্রমে। এদের পার্থক্য স্বর, বল বা দৈর্ঘ্য সংক্রান্ত।

৪. স্বরবিচার.

উপরোক্ত p q r s-এর পারস্পরিক পার্থক্য স্বরগত কি না পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। r-এ যেতে স্বর চড়ে গিয়ে যতিতে পড়ছে এবং p-তে স্বর নেমে গিয়ে যতিতে পড়ছে এ পার্থক্য ধরা বোধ হয় সব চেয়ে সোজা। ব্যাপারটা দুটো লাইন এঁকে দেখানো যেতে পারে। r হচ্ছে —╱± এবং p হচ্ছে —╲± । এর পর বিচার করে শুনলে দেখানো যাবে q-এর রূপ হচ্ছে —±

( অর্থাৎ স্বর সমানভাবে যতিতে পড়ছে ) এবং s-এর রূপ —∨± ( অর্থাৎ স্বর একটু নেমে ফের চড়ে গিয়ে যতিতে পড়ছে )।

এর পর বিচার করা যাক অন্য পরিবেশে স্বরের উঠাপড়া কিরকম হয়। যতি ±এর অব্যবহিত পরে কি স্বরের আক্রম একরকমই ? "আমি ও হাসি"র আরম্ভ আর "পুতুল খেলি"র আরম্ভ এ দুয়ের মধ্যে কি পার্থক্য নেই একটা ? ঠিক সেই পার্থক্যই কি শোনা যায় না—"বর্ষাকাল" আর "রবীন্দ্রনাথ" এ দুই শব্দে। একটাতে আক্রমের রূপ সমান ±—, অন্যটাতে উপক্রমের রূপ ±╱— ।

তার পর দেখা যাক +এর দুই পাশ। +এর পরে স্বরের আক্রম সাধারণত সমান + —, কিন্তু "বর্ষাকাল একেবারে" বাক্যটাতে তার রূপ +__ । +এর আগে তিনরকম আক্রম শোনা যায়। "ক্লাস থেকে ফিরে এল" একটানাভাবে বলে গেলে —+ এর ধ্বনিটা শোনা যায়। কিন্তু সামান্যমাত্র জোর দিলেই যেরকম শোনা যায় তার চিত্র হবে __╱± । এবং "কখনো আসেনি।" প্রথম শব্দটার উপর জোর দিয়ে উচ্চারণ করলে যা শোনা যায় তার রূপ —^+ ।

এই আক্রমগুলি একত্রভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের সংখ্যা মূলত ৬এর বেশি নয়। সমান •—• , উত্তারিত সমান ‥ , উঠতি .╱. , উত্তারিত উঠতি •╱• , পড়তি •╲• , উত্তোলিত পড়তি .╲. । ঘাটের হিসেবে এদের দেখাতে হলে তিনটে ঘাট দরকার হবে। তাদের 1, 2, 3 ( উদারা, মুদারা, তারা ) নাম দেওয়া যেতে পারে। সে হিসেবে আক্রমগুলির রূপ হচ্ছে 22, 11, 23, 12, 21, 32.।

এর পর প্রশ্ন, বিস্ময়, আদেশ, অনুরোধ, আপত্তি, সম্মতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বেশ কিছুসংখ্যক বাক্য নিয়ে শোনা যেতে পারে পদের স্বরের গৎগুলো কিরকম। আমি ১২টার বেশি ছক পাইনি। তালিকা ও উদাহরণ দিচ্ছি। ব্র্যাকেটের অংশ নাও উপস্থিত থাকতে পারে।

±(--+)-/± বা ±(22-22+) 22-23±। এর প্রয়োগ প্রশ্নে, যদি প্রশ্নবাচক কোনো সর্বনাম আগে না থাকে। উদাহরণ ± আপনি + এলেন ? ±

±(--+)-\\± বা ±(22-22+)22-23±। এর প্রয়োগ উত্তর, মন্তব্য বা আদেশে। উদাহরণ—± ক্লাস থেকে + ফিরে এল।±

±(-/+)--± বা ±(11-12+) 22-22± এবং

±(-/+)-/± বা ±(11-12+) 22-12± দুয়ের প্রয়োগ প্রায় একরকম। প্রথমটার প্রয়োগ পরপর দুবার হয় না, দ্বিতীয়টার সঙ্গে পরাবর্তন করতে হয়। একটু ঝোঁক পড়লেই প্রথমটার বদলে দ্বিতীয়টা শোনা যায়। উভয়েরই প্রয়োগবাক্য যে অসম্পূর্ণ, আরও যে বলবার কিছু আছে তা বোঝাতে। উদাহরণ— ± ক্লাস থেকে + ফিরে এসে ±

±/+-± বা ±23+22±। এর প্রয়োগ বিস্ময়, বিরক্তি বা চ্যালেঞ্জ প্রকাশে। উদাহরণ—

(± ধরতে ±) পারে + না ! ±

(±এটা ±) কী + করল ! ± ± পাচ্ছি + না। ±

±--+__ বা ±22-22+11-11±। এর প্রয়োগ নিশ্চিতি জানাতে। উদাহরণ

(±এতো ±) বর্ষাকাল + একেবারে ±

±-\\+-\\± বা ±22-32+22-21। এর প্রয়োগ প্রশ্নসূচক সর্বনামসমেত প্রশ্নে ও বিশেষ ঝোঁক-সমেত মন্তব্যে। উদাহরণ—+ কোন্‌খানে + গেছলে ?± ± কখনো + আসেনি। ±

±_/+/± বা ±11-12+22-23±। এর প্রয়োগ বিশেষ ঝোঁকসম্পন্ন প্রশ্নে, যদি প্রশ্নসূচক সর্বনাম না থাকে। উদাহরণ—± ভালো + তো ? ±

±/-+--± বা ± 12-22+22-22
±/-+-/± বা ± 12-22+22-12
±/-+-/± বা ± 12-22+22-23
±/-+-\\± বা ± 12-22+22-21±। এদের প্রয়োগ উপরোক্তদের অনুরূপ।

পার্থক্য এই যে এরা সমাস বা ফ্রেজ চিনিয়ে দেয়। উদাহরণ—±পুতুল + খেলি।± ± রবীন্দ্র + জীবনী ? ±

৫. বলবিচার

বাংলা শব্দে কোথায় বল পড়বে তা ঠিক করা থাকে না। ইংরেজিতে con'test একটা ক্রিয়াপদ, 'contest একটা বিশেষ্য। বাংলায় তার কোনো তুলনা নেই। বাংলা শব্দের বল নির্ভর করে সুরের ছকে তার স্থানের উপর। ছকের মধ্যে বলের বিতরণের নিয়ম একটা দাঁড় করানো যায়। বল হচ্ছে আগের দিকে এবং উপরের দিকে। ± – – + – / ± বা ±22–22 +22–23 ± ছকটাতে বল বেশি প্রথম ± এর পরে এবং দ্বিতীয় ± এর আগে। +এর পরেও অল্প বল পড়ছে। +এর আগে সবচেয়ে কম বল। ± / – + – \ + বা ± ।2–22+22–2। ± ছকটাতে সবচেয়ে বল পড়ছে প্রথম 2-টাতে ( "পুতুল খেলি" এর "তুল" দলটাতে। ) + এর পরের প্রথম 2-তেও কিছু বল পড়ছে। অন্যত্র বল নেই। বাংলায় বলবিন্যাস স্বরনির্ভর।

বাংলায় বলবিন্যাসের একটা বিচিত্র প্রমাণ পাওয়া যায় শব্দের সংক্ষেপনধারা পর্যালোচনা করলে। দ্রুত কথনে "খাটুনি" হয়ে যায় "খাটনি", "বাঁকুড়া" হয় "বাঁক্‌ড়ো", "পড়ুয়া" হয় "পোড়ো", "ঠাকুরানী" হয় "ঠাকরান" বা "ঠাকরুন"। লিখনে স্বীকৃতি পায়না এমন সংক্ষেপনের উদাহরণে "ভবানীপুর" হয় "ভনিপুর", "রবীন্দ্রনাথ" হয় "রইন্নাত", "জামাইবাবু" হয় "জাঁইউ"। বলহীন দল দ্রুত কথনে প্রায়ই হারিয়ে যায় সামান্য চিহ্নও না রেখেই।

৬. দৈর্ঘ্যবিচার

বাংলা শব্দে কোথায় স্বরটা দীর্ঘ হবে তা ঠিক করা থাকে না। সংস্কৃত বা ইংরেজিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের পার্থক্য আছে। "দিন" আর "দীন" একদিকে, bit, beat আর-একদিকে এই নিয়মের উদাহরণ। অনুরূপ পার্থক্য বাংলায় নেই। "দিন" আর "দীন" এর বাংলা উচ্চারণে কোনো ধ্বনিগত ভেদ নিয়মিতভাবে শোনা যায় না। তাই বলে কি দীর্ঘ স্বর কোথাও শোনা যায় না ?

দীর্ঘ স্বর খুঁজতে বসলে "রোজ আমি ও হাসি· ·খেলি।" বাক্যটাতে তা বেশ কয়েক জায়গায় শোনা যায়। "রোজ" দলটিতে স্বর দীর্ঘ। "ক্লাস" দলটিতে এক-একবারে দীর্ঘ স্বর আসে, এক-একবার হ্রস্ব, "দের" দলটিতেও তাই, "তুল" দলটিও তাই। একটু ঝোঁক দিয়ে বললেই এগুলি দীর্ঘ, হালকাভাবে বললে হ্রস্ব। আরো উদাহরণ নেওয়া যাক। "পা" আলাদা বললে দীর্ঘ, "পা'টা" বলতে "পা" দলটি এমনিতে হ্রস্ব কিন্তু ঝোঁক পড়লে দীর্ঘ। আরও কিছু উদাহরণ নিয়ে বিচার করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় যে বাংলায় স্বরের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে গতের মধ্যে তার স্থানের উপর। একলা একদল শব্দ, অর্থাৎ ± এবং + বা + এবং ± বা + এর অবর্তমানে ± এবং ± এর মধ্যবর্তীস্থানে একদল শব্দের স্বর সর্বদা দীর্ঘ। এ ছাড়া যে দলটাতে বল পড়ছে তার স্বর নিয়মিতভাবে দীর্ঘ না হলেও তাকে দীর্ঘ করা যায়। অন্যান্য স্থানের স্বর নিয়মিতভাবে হ্রস্ব, তাদের দীর্ঘ করা যায় না, যদি না সমস্ত বাক্যের গড়ন ও গৎ বদলে দেওয়া হয়।

এইসঙ্গে আর-একটা প্রশ্ন ওঠে। দুটি যতির মধ্যে ক'টি দল পড়তে পারে ? প্রশ্নটা ঠিক নিখুঁত হল না। কারণ দুই যতির মধ্যে একটি উপযতি থাকলে সমগ্র গৎটা দ্বিগুণ বড় হবে এবং কোনো

বিশেষ দলের স্বর দীর্ঘ হতে পারে। যতি ও উপযতির বা উপযতি না থাকলে দুই যতির মধ্যবর্তী অংশটার নাম দেওয়া যাক উপগং এবং হ্রস্ব স্বরে দৈর্ঘ্যের পরিমাণকে এক মাত্রা বলে ধরা যাক। এবার প্রশ্নটা দাঁড়াবে একটি উপগতে ক'টি মাত্রা থাকতে পারে? "রোজ" দুই মাত্রা, "ক্লাস থেকে" বা "আমাদের" তিন মাত্রা, "ফিরে এসে" চার মাত্রা, "বাড়িতে বসে" পাঁচ মাত্রা, "বাড়িতে বসিয়ে" যদি বলি তা হবে ছয় মাত্রা। লক্ষ করলে অমূল্যবাবুর থিয়োরিটার সত্যতা স্বীকার করতেই হবে যে এদের মধ্যে একটা দু'য়ের তাল ফুটে উঠছে। দুই যেন।—।, তিন যেন ॥—। বা।—॥, চার যেন ॥—॥, পাঁচ যেন ॥।—॥ বা ॥—॥।, ছয় যেন ॥।—॥। প্রতীত হচ্ছে। মাত্রাগুলির ঝাঁকদুটির মাঝখানে উপযতির চেয়েও ছোট যে ছাড় আছে তার নাম দেওয়া যাক ভাজক।

৭. পদ্যের ছন্দ

সকলেই জানেন যে বাংলায় তিনপ্রকার পদ্যছন্দ। বলপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল ইচ্ছামত হ্রস্ব বা দীর্ঘ। তানপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল শব্দের অন্তে হলে দীর্ঘ, অন্যত্র হ্রস্ব। মানপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল সর্বত্র দীর্ঘভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তিনটি নিয়মই কৃত্রিম। কিন্তু কৃত্রিমতা না মানলে তো পদ্যের বাঁধন আসবে না। তাছাড়া প্রথমটাতে যে নাচের এবং দ্বিতীয়টাতে যে গানের আমেজ পাওয়া যায় তা বলপ্রধান ও তানপ্রধান নাম দুটোতেই প্রকাশ হচ্ছে। নতুন পদ্ধতিতে সেই অনুভূতিলব্ধ নাম দুটোর যথার্থতা কতদূর বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বলপ্রধান ছন্দের নমুনা "ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।" সুরের ওঠাপড়া বিচার করলে এর ছক হবে

±—±—±—±-±—±—±—±\\± । নমুনাটাতে "বর্" ও "ধান" দীর্ঘ এবং উপগতের ছক ॥—॥। তাল। সামনের দিকেই ঝোঁক পড়ছে, কারণ তার পরে আর উচ্চতর ঘাট কোথাও ছোঁওয়া হচ্ছে না। "বিষ্টি পড়ে" উদাহরণটা নিলাম না এই কারণে যে কেউ কেউ ওটা তানপ্রধান ছন্দে পড়েন, যদিও ওটা বলপ্রধান ছন্দেই পড়া উচিত। বলপ্রধান ছন্দে পড়লে "বিষ্টি পড়ে"র গং একই, কিন্তু উপগতের ছক ॥—॥ তাল।

তানপ্রধান ছন্দের নমুনা—"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়।" গং

±/—+/—+/—+-±/—+/—+/—+\\± । এর উপগতের ছক ॥—॥ তাল।

লক্ষ করতে হবে যে যতির প্রয়োগ পংক্তির ভিতরে কোথাও নেই। বল পড়ছে প্রত্যেক উপগতের দ্বিতীয় এবং শেষ উপগতের প্রথম দলটিতে। "দুর্"এর উপর একটা ঝোঁক যে পড়ছে তাতে কোনো ভুল নেই। "মঙ্", "ব", "ময়" এবং "ভয়" এর উপরও ঝোঁক পড়ছে: "দেশ", "দূর" এবং "দাও" এর বেলা উচ্চারণ দুই মাত্রার হচ্ছে এবং ঝোঁক পড়ছে দ্বিতীয় মাত্রাটির উপর। আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। "ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী, একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।" এতে ঝোঁক পড়ছে প্রত্যেক দ্বিতীয় দলে এবং পঙ্‌ক্তিশেষে "টনী" আর "প" র উপর। এ ছন্দে গানের রেশ আসে সামনের থেকে ঝোঁকটা সরিয়ে দেওয়া এবং যতির বদলে উপযতির প্রয়োগ এই দুই কৌশলে।

মানপ্রধান ছন্দের নমুনা— "ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বর, গাছের শাখে জাগিল পাখি কুসুমে মধুকর।" এর গৎ ± ⁄— + — ± ⁄— + — ± ⁄— + — ± ⁄— + ╲ ± । এর উপগতের ছক ॥।-॥ তাল। লক্ষ করতে হয় যে যতি ও উপযতি এবং তাদের পরে সমান আক্রম ও উঠতি আক্রমের পরাবর্তন। আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। "হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল, অবিচ্ছিন্ন চলে নিরবধি।" এর গৎ ± — + ⁄— ± ⁄— + — + ⁄— ± ⁄— + — ± — + ⁄— ± । অবিরল, এর উপগতের ছক প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তির গোড়ার দুটোতে।—। তাল, অন্যগুলোতে ॥—॥ তাল। এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই মানপ্রধান ছন্দের অতুলনীয় ঐশ্বর্য।

৯. উপসংহার

বাংলা ভাষায় গদ্যের ও পদ্যের যে ছন্দ তার রূপাবলী নির্ণয় করতে গিয়ে ১০টি পৃথক উপাদান স্বীকার করতে হয়। এদের তালিকা দিচ্ছি—

যতি ±

উপযতি +

ভাজক —

মাত্রা ।

সমান আক্রম •—• বা 22

উত্তারিত সমান আক্রম ˙˙ বা 11

উঠতি আক্রম ./. বা 23

উত্তারিত উঠতি আক্রম ˙˙/˙ বা 12

পড়তি আক্রম ˙˙╲ বা 21

উত্তোলিত পড়তি আক্রম .╲. বা 32

### গীতবিতানের ভূমিকা

প্রথম যুগের উদয়দিগঙ্গনে
　　প্রথম দিনের উষা নেমে এল যবে
প্রকাশপিয়াসি ধরিত্রী বনে বনে
　　শুধায়ে ফিরিল, সুর খুঁজে পাবে কবে ॥
এসো এসো সেই নবসৃষ্টির কবি
নবজাগরণযুগপ্রভাতের রবি—
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে
তরুণী উষার শিশির স্নানের কালে,
　　আলো-আঁধারের আনন্দবিপ্লবে ॥
সে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে
শুনাও তাহারে আগমনীসংগীতে
　　যে জাগায় চোখে নূতন-দেখার দেখা।
যে এসে দাঁড়ায় ব্যাকুলিত ধরণীতে
বননীলিমার পেলব সীমানাটিতে,
　　বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা।
অবাক আলোর লিপি যে বহিয়া আনে
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে,
নব পরিচয়ে বিরহ ব্যথা যে হানে
　　বিহ্বল প্রাতে সংগীতসৌরভে,
　　　　দূর আকাশের অরুণিম উৎসবে ॥

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর　　　　স্বরলিপি : শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

গানটি মীড়-প্রধান ॥　মধ্যলয়ে গেয়

II ন্সা সা সা । রা রা রা I রা রা রা । রা রা -সা I
প্রং থ ম যু গে র উ দ য় দি গ ঙ্

॥
I রা মজ্ঞা -া । -া -া -মা I মা মপা পা । পা পা ধা I
গ নেং ° ° ° ° প্র থং ম দি নে র

I মপা[ম] মা -জ্ঞা । -া -া -মা I মা পা -া । পধা পা -ধা I
উ০ ষা ০ ০ ০ ০ নে মে ০ এ০ ল ০

I মা পা -া । -া -া -া I মা মণা ণা । ণা ধা ণা I
য বে ০ ০ ০ ০ প্র কা০ শ পি য়া সী

I ধা ধা -ণা । ধা -া -ণা I ধা পা -ধা । মা পা -ধা I
ধ রি ০ ত্রী ০ ০ ব নে ০ ব নে ০

I মা পা পধা । মা -পধা [ধ]পা I মা -জ্ঞা -া । -া -া -া I
শু ধা য়ে০ ফি ০০ রি ল ০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞা -মা মা । [জ্ঞ]মা রা সা I রা সা -া । -া -া -রা II
সু র্ খুঁ জে পা বে ক বে ০ ০ ০ ০

-া II {মা পা -া । পা না -া I -া -া -া । -পা না -া I
০ এ সো ০ এ সো ০ ০ ০ ০ ০ সে ই

I না র্সা না । -র্সা র্রা [র্]র্সা I না [র্]র্সা -ণা । ধা ণা -া I
ন ব সৃ ষ্ টি র ক বি ০ ন ব ০

I ধা ণা ধা । ণা ধা ণা I ধা ধা -ণা । ধা -পা পণা I
জা গ র ণ যু গ প্র ভা ০ তে ০ র০

I ধা পা -া । -া -া -া} I মা -া -ণা । ধা ধা -ণা I
র বি ০ ০ ০ ০ গা ০ ন্ এ নে ০

I ধা ধা -ণা । ধা পা -ধা I মা -া -পা । পধা [ধ]পা -া I
ছি লে ০ ন ব ০ ছ ০ ন্ দে০ র ০

I মপা^ম মা -জ্ঞা । -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I

তা০ লে ০ ০ ০ ০ ত০ রু ণী উ ষা র

I সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞরা মজ্ঞা -া । -া -া -া I

শি০ শি র স্না নে র কা০ লে০ ০ ০ ০ ০

I জ্ঞা পা পা । পা পা -ধপা I মা মা -া । ^মজ্ঞা রা -জ্ঞা I

আ লো আঁ ধা রে ০র্ আ ন ন্ দ বি ০

I রা সা -া । -া -ন্া -া II

প্র বে ০ ০ ০ ০

-া II মা পা -া । পা না পা I পা না না । না র্সা র্র্সা I

০ সে গা ন্ আ জি ও না না রা গ রা গি০

I না র্সা -া । -া -ণা -া I ধা ধা -ণা । ধা ধা ণা I

গী তে ০ ০ ০ ০ শু না ও তা হা রে

I ধা ধণা ধা । ধপা পা -ধা I মপা^ম মা -জ্ঞা । {জ্ঞা -া -রসা I

আ গ০ ম নী০ স ঙ্ গী০ তে ০ যে ০ ০০

I সা -া -রা । রা -মমা -জ্ঞা I রা সা -া । -সা -রা -ন্া I

জা ০ ০ গা ০০ য়্ চো খে ০ ০ ০ ০

I ন্া সা সা । রা রা পা I মপা^ম মা -জ্ঞা} । -া -া -া I

নূ ত ন দে খা র দে০ খা ০ ০ ০ ০

I {সগা গা গা । গা গা -সা I সা গা গা । মা পা ধপা I

যে০ এ সে দাঁ ড়া য়্ ব্যা কু লি ত ধ র০

I মগা মা -া । -া -া -া I মগা মপা পমা । পমা মা -জ্ঞা I
নী° তে ° ° ° ° ব° ন° নী° লি° মা র্

I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরসা । সা সমা ^মজ্ঞা I রা সা -া । -া -া (-া)} I -গা I
পে ল ব°° সী মা° না টি তে ° ° ° ° °

I মা পা পা । পা পা -ণা I ণা ণা ণধা । পা -ধণা ণা I
ব হু জ ন তা র্ মা ঝে অ° পূ °র্ ব

I ^পধা পা -া । -া -া -ধপা I মা মগা গা । -া গা সা I
এ কা ° ° ° °° - যে জা° গা য়্ চো খে

I সা গা গা । মা পা ধপা I মগা মা -া । -া -া -া I
নূ ত ন দে খা র° দে° খা ° ° ° °

I {মা পা -া । পা না পা I পা না না । না র্সা র্রর্সা I
অ বা ক্ আ লো র লি পি যে ব হি য়া°

I না র্সা -া । -ণা -া -া I ণা ধা ণা । ধা ধা ণা I
আ নে ° ° ° ° নি ভৃ ত প্র হ রে

I ধা ধা ণা । ধা পা পণা I ^পধা পা -া । -া -া -া} I
ক বি র চ কি ত° প্রা ণে ° ° ° °

I {র্সর্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা । র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্রা র্রর্মা র্জ্ঞা । র্রা র্সা র্রর্সা I
ন° ব প রি চ য়ে বি র° হ ব্য থা যে°

I না র্সা -া । -া -া -া} I সা -া রা । রা রা রসা I
হা নে ° ° ° ° বি ° হ্ব ল প্রা ন্তে°

I রা -া রা । রসা রা -পা I মপা[ম] মা -জ্ঞা । -া -া -া I
স ঙ্ গী তং সো উ রং ভে ০ ০ ০ ০

I মা -পা পা । পা পা -ণা I ণা ণা ণা । ধা পা -ধণা I
দূ র্ আ কা শে র্ অ রু ণি ম উ ০২

I ধা পা -া । -া -া -সা II II
স বে ০ ০ ০ ০

স্বীকৃতি

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্রখানি শ্রীঅলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে মুদ্রিত।
মূর্ছিতা শ্রীরাধা চিত্রের ব্লক প্রবাসী কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে মুদ্রিত।

সংশোধন: পৃ ১১১ - ১২৪ স্থলে পৃ ৩১১ - ৩২৪ হবে।

# বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন

ষোড়শ বর্ষ। শ্রাবণ ১৮৮১ - আষাঢ় ১৮৮২ শক

বিষয়সূচী

এই সকল পরস্পর-বিরোধী গুণের
একত্র সমন্বয়ে প্রস্তুত

অবাধে লেখা এগিয়ে চলে।

লেখা ধুয়ে-মুছে যায় না ;
অথচ কলম পরিষ্কার রাখে।

অন্য কোন কারণে না হ'লেও অন্ততঃ এই কারণেই
সুলেখা আজ সর্বোচ্চ বিক্রয়ের গৌরব অর্জন করেছে।

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • দিল্লী • বম্বে • মাদ্রাজ

আপনার ব্লক
নির্ব্বাচন ও
তদনুরূপ
প্রয়োজনীয়
PHONE: 34·3793
Gram. Otogravure
প্রসেস এনগ্রেভারস
আর্ট প্রিন্টারস
এবং ডিজাইনারস

বিক্রম ৫.৭৫
শেরি ৫.৭৫
আসুন ... বসন্ত মেলায়
বসন্তের পথে শুরু
পায়ে হাওয়া খেলিয়ে চলা।
শীতকালে যেমন আঁটসাট,
এখন তা আর সইবে না। এখন আরাম
খোলামেলায়। চলাফেরায়
যেমন চপ্পল। বাটার চপ্পলের
বৈশিষ্ট্য অনেক।
নকশায় অসীম বৈচিত্র্য, তেমনি
মনোহর বিবিধ উপাদানে।
প্রসিদ্ধ সুঠাম গঠনে।
কান্তা ৬.২৫
সুচেতা ৪.৫০
Bata